আল্-মুতানাব্বী এর কাব্যশৈলী
(Poetry Style of Al-Mutanabbi)

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ]

গবেষক
মোঃ মোহিব্বুল্লাহ আজাদ
রেজিঃ নং- ২০৬/২০১৯-২০২০
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন
সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

মে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

আবু তাইয়্যিব আহমাদ ইব্ন হুসাইন ইব্ন আবদুস সামাদ আল্-মুতানাব্বী (৯১৫ খ্রি.- ৯৬৫ খ্রি.)

Dr. Muhammad Belal Hossain
Associate Professor
Deprtment of Arabic
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh.

بسم الله الرحمن الرحيم

الدكتور محمد بلال حسين
الاستاد المشارك.قسم العربية
جامعة داكا
داكا. ١٠٠٠ بنغلاديش

Ref. No. ..... Date:.....

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগ-এর অধীনে এম.ফিল গবেষক মোঃ মোহিব্বুল্লাহ আজাদ (রেজি: নং-২০৬/২০১৯-২০২০, শিক্ষাবর্ষ ২০১৯/২০২০) কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত **"আল্-মুতানাব্বী এর কাব্যশৈলী" (Poetry Style of Al-Mutanabbi)** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লিখিত হয়েছে। এটি সম্পূর্ণরূপে গবেষকের নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম। এটি তথ্যবহুল ও একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে, ইতোপূর্বে বাংলা ভাষায় এ শিরোনামে কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের চূড়ান্ত কপিটি আদ্যন্ত পাঠ করেছি এবং এম.ফিল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করতে অনুমোদন করছি।

(ড. মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

তারিখ :

Tel: +88-02-96612920-73 Ext: 6100.6101 Mob: +88-01557128313 E-mail: beladu322@yahoo.com

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"আল্-মুতানাব্বী এর কাব্যশৈলী" (Poetry Style of Al-Mutanabbi)** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমি পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে কোথাও প্রকাশ করিনি। এটি আমার একক মৌলিক গবেষণাকর্ম।

গবেষক

(মোঃ মোহিব্বুল্লাহ আজাদ)
রেজিঃ নং-২০৬/২০১৯/২০২০
শিক্ষাবর্ষ-২০১৯/২০২০
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ

অনু.	:	অনুবাদ
ই.ফা.বা	:	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
খ.	:	খণ্ড
খ্রি.	:	খ্রিস্টাব্দ
জ.	:	জন্ম
ড.	:	ডক্টর
তা.বি	:	তারিখ বিহীন
তাং	:	তারিখ
দ্র.	:	দ্রষ্টব্য
পৃ.	:	পৃষ্ঠা
মৃ.	:	মৃত্যু
সং	:	সংস্করণ
সম্পা:	:	সম্পাদনা/সম্পাদিত
সা.	:	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
হি.	:	হিজরি সাল
বাং.	:	বাংলা সন
রা.	:	রাদিয়াল্লাহু আনহু
রহ.	:	রহমাতুল্লাহি আলাইহি

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন নির্দেশিকা

(আরবী বর্ণসমূহের বাংলায় প্রতিবর্ণায়ন)

বাংলা ভাষায় আরবী শব্দের প্রতিবর্ণায়নে অভিসন্দর্ভে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। তবে বহুল প্রচলিত আরবী শব্দসমূহের কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিবর্ণায়ন পদ্ধতির হুবহু অনুসরণ হয়নি। এছাড়া যেসব আরবী শব্দ দীর্ঘদিনের ব্যবহারে বাংলা ভাষার অংশ হিসেবে পরিণত হয়েছে, সেগুলোর বানানে প্রচলিত বাংলা বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ
ا	’ (ঊর্ধ্ব কমা) অ	ز	য	ق	ক/ক্ব
ب	ব	س	স	ك	ক
ت	ত	ش	শ/স	ل	ল
ث	ছ/স	ص	ছ/স	م	ম
ج	জ	ض	দ, দ্ব	ن	ন
ح	হ	ط	ত, ত্ব	و	ও/ব
خ	খ	ظ	জ/য	ة / ه	ত/হ
د	দ	ع	‘ (উল্টা কমা)	ء	’(ঊর্ধ্ব কমা)
ذ	জ/য	غ	গ	ى	ই/য়
ر	র	ف	ফ	ي	ইয়ে/য়ে

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য, যিনি পরম করুনাময় ও দয়ালু। আর দুরূদ ও সালাম মানবতার মুক্তির দূত, বিশ্ব জাহানের মহান শিক্ষক, সমাজ পরিবর্তনের সফল দিশারি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর বংশধরদের প্রতি। আর অন্তরের অন্ত:স্থল থেকে উৎসারিত শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও সালাম জানাচ্ছি সাহাবি আজমাঈনের প্রতি; যারা অক্লান্ত পরিশ্রম, ত্যাগ-তিতীক্ষা ও নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে জীবন বাজি রেখে এই পৃথিবীতে ইসলামের ঝান্ডা সমুন্নত করেছেন।

পৃথিবীতে এমন অনেক প্রতিভাবান মানুষের আগমন ঘটেছে যারা নিজেদের প্রতিভাবলে বিশ্বে খ্যাতি লাভে সক্ষম হয়েছেন। তাদের তালিকায় অন্যান্যদের পাশাপাশি অনেক খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিকও রয়েছেন। বর্তমান বিশ্বে প্রায় চার হাজার ভাষার প্রচলন রয়েছে। এর মধ্যে যেক'টি ভাষা উচ্চ সাহিত্যের রূপ নিয়েছে, আরবী ভাষা তম্মধ্যে অন্যতম। এটি একটি প্রাচীন জীবন্ত ভাষা। ইসলামের মূল উৎস কুরআন ও হাদীস এ ভাষাতেই সংরক্ষিত। তাই কুরআন ও হাদীসে ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য আরবী ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা অতীব জরুরী। এ সম্পর্কে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন-

"تعلموا العربية وعلموها للناس "

'তোমরা আরবী ভাষা শিক্ষা করো এবং মানুষদেরকে তা শিক্ষা দাও'।

ইমাম ইবনু তাইমিয়া (র.) বলেন-

فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

'আরবী ভাষা দ্বীনের সাথে সম্পর্কিত বিষয়। উহা শিক্ষালাভ করা ওয়াজিব। কেননা কুরআন ও হাদীস বুঝা ফরয। আর তা আরবী ভাষা জানা ছাড়া বুঝা সম্ভব নয়। আর যা ছাড়া ওয়াজিব পূর্ণ হয়না তাও ওয়াজিব'। সংগত কারনেই আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক সুনিবিড়। প্রাচীন এ ভাষা জাহেলী যুগে সাহিত্যের রূপ লাভ করে। এভাষা মধ্যযুগে সার্থক ভাষা ও আধুনিক যুগে আধুনিক সাহিত্য হিসেবে প্রতীয়মান। ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের আগমনের পর থেকেই এদেশের মুসলমানগন আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সাথে পরিচিত। বর্তমানেও এধারা অব্যাহত রয়েছে। দেশের সবোর্চ্চ বিদ্যাপিঠ বিশ্ববিদ্যালয়, আলিয়া মাদ্‌রাসা এমনকি কলেজেও আরবী সাহিত্য পাঠ্যসূচীভূক্ত। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থ নিতান্তই অপ্রতুল বললে অতুক্তি হবেনা। তাই এ দৈন্যদশা কিছুটা হলেও লাঘবের জন্য বাংলা ভাষাভাষি পাঠকদের জন্য আরবী সাহিত্যের নীলাভ আকাশের অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রদের মধ্য থেকে আল্-মুতানাব্বীর জীবনালেখ্য ও তার কাব্যশৈলী তুলে ধরার জন্য আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি।

এ কাজে আমাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন। তাঁর একান্ত উৎসাহ ও দিক-নির্দেশনা নিয়ে আমি 'আল-মুতানাব্বী এর কাব্যশৈলী' শিরোনামে এম.ফিলের কাজ শুরু করি। তাঁর শত ব্যস্ততা ও বিভাগীয় বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়েও তিনি আমাকে মূল্যবান পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। এজন্য তার প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাঁকে জাযা খায়ের দান করুন।

আর যে বিশেষ ব্যক্তিত্ব সবসময় আমার থিসিসের খোঁজ-খবর নিয়ে আমাকে উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছেন তিনি হচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর আরবী বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব প্রফেসর ড. মো. আবদুল কাদির।

আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি, সরকারী চাকুরী থেকে অবসর নেয়া আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা জনাব মাওলানা মোঃ আবদুল খালেককে; যিনি আমার এম.ফিল ডিগ্রী নেয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ পরামর্শ দিয়েছেন ও সাহস যুগিয়েছেন। আমার মা মোসাম্মৎ আয়েশা বেগমের আন্তরিক দোয়া ও ভালোবাসা আমার কাজগুলোকে পরিপূর্ণতাদানে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। আমার রক্তের প্রতিটি বিন্দু তাঁদের কাছে ঋণী। তাঁদের দোয়া আমার জীবন পথের পাথেয়। আমাকে বিভিন্নভাবে প্রেরণা জুগিয়েছেন আমার অনেক বন্ধু-বান্ধব, হিতাকাঙ্খী ও শুভাকাঙ্খী। তারা প্রায়শই আমার থিসিসের বিষয়ে খোঁজ-খবর নিয়েছেন এবং দ্রুত সম্পন্ন করতে পরামর্শ দিয়েছেন। আল্লাহ তাদেরকেও জাযা খায়ের দান করুন।

আর যার কথা মোটেও ভুলবার নয়, যিনি আমাকে থিসিস রচনায় মানুষিকভাবে সাহস যুগিয়েছেন ও বিভিন্নভাবে সহযোগিতাসহ বারবার তাগিদ দিয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, তিনি হচ্ছেন-আমার সহধর্মিনী হোসনেয়ারা আক্তার মায়া। আমার থিসিসের কাজে তাঁর নানা উপায়ে ত্যাগস্বীকার আমার কাজকে সহজ করেছে। আল্লাহ তাদেরকেও জাযা খায়ের দান করুন।

গবেষণাকর্মের তথ্য-উপাত্ত ও উপকরণ সংগ্রহে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, জাতীয় গ্রন্থাগারসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহযোগিতায় আমি কৃতজ্ঞ। মুদ্রণ ও সংশ্লিষ্ট কাজে আরবী বিভাগের কর্মকর্তা হুমায়ুন ভাই আমাকে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। আরো সহযোগিতা করেছেন সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট এর সম্মানিত উপ-পরিচালক আমার স্নেহের ছোট ভাই জনাব মুহসিন মাশকুর। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাদেরকে সবাইকে ইহ ও পরকালিন জীবনে অসংখ্য কল্যাণ দান করুন এবং জাতির কল্যাণে আমার শ্রমকে সার্থক করুন- এ কামনায় শেষ করছি।

গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'য়ালার জন্য যিনি মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে নানা প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়েছেন। ফলে পৃথিবীতে এমন অনেক প্রতিভাধারী মানুষের আগমন ঘটেছে যারা নিজেদের প্রতিভাবলে বিশ্বে খ্যাতি লাভে সক্ষম হয়েছেন। তাদের তালিকায় অনেক খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিক রয়েছেন। লক্ষ-কোটি দরুদ ও সালাম বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি যিনি প্রয়োজনের তাগিদে কখনো কখনো কাব্যচর্চাকে উৎসাহিত করেছেন। প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমান বিশ্বে প্রায় চার হাজার ভাষা প্রচলিত। তম্মধ্যে যেক'টি ভাষা উচ্চ সাহিত্যের রূপ নিয়েছে, তম্মধ্যে আরবী অন্যতম একটি প্রাচীন জীবন্ত ভাষা। ইসলামের মূল উৎস কুরআন ও হাদীস এ ভাষাতেই সংরক্ষিত। তাই কুরআন ও হাদীসে ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য আরবী ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা অতীব জরুরী। (ইবনু রাসলান, ফাযলুল আরাবিয়্যাহ (কায়রো : দারুল উলুম আল ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৯ হি.), পৃ. ৫২)। এ সম্পর্কে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন -

"تعلموا العربية وعلموها للناس "

'তোমরা আরবী ভাষা শিক্ষা করো এবং মানুষদেরকে তা শিক্ষা দাও'। (ইমাম ইবনু তাইমিয়া, ইকতিযাউস সীরাতিল মুসতাকিম (রিয়াদ : মাকতাবাতুল উবাইকান, ১৪০৪ হি.), ১ম খন্ড, পৃ.৫২৭)।

তিনি আরো বলেন -

" تعلموا العربية – فإنها من دينكم، وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم "

'তোমরা ফারায়েয শিক্ষা লাভ করো। কেননা তা দ্বীনের সাথে সম্পর্কিত বিষয় এবং আরবী ভাষা শিক্ষা লাভ করো। কেননা তা দ্বীনের সাথে সম্পর্কিত বিষয়। (ইমাম ইবনু তাইমিয়া, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ.৫২৭)। ইমাম ইবনু তাইমিয়া (র.) বলেন-

فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

'আরবী ভাষা দ্বীনের সাথে সম্পর্কিত বিষয়। উহা শিক্ষালাভ করা ওয়াজিব। কেননা কুরআন ও হাদীস বুঝা ফরয। আর তা আরবী ভাষা জানা ছাড়া বুঝা সম্ভব নয়। আর যা ছাড়া ওয়াজিব পূর্ণ হয়না তাও ওয়াজিব। (ইমাম ইবনু তাইমিয়া, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ.৫২৮)। সংগত কারনেই আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক সুনিবিড়। প্রাচীন এ ভাষা জাহেলী যুগে সাহিত্যের রূপ লাভ করে। এভাষা মধ্যযুগে সার্থক ভাষা ও আধুনিক যুগে আধুনিক সাহিত্য হিসেবে প্রতীয়মান। ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের আগমনের পর থেকেই এদেশের মুসলমানগন আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সাথে পরিচিত। বর্তমানেও এধারা

অব্যাহত রয়েছে। দেশের সবোর্চ্চ বিদ্যাপিঠ বিশ্ববিদ্যালয়, আলিয়া মাদ্‌রাসা এমনকি কলেজেও আরবী সাহিত্য পাঠ্যসূচীভূক্ত। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থ নিতান্তই অপ্রতুল বললে অতুক্তি হবেনা। (ড.এস.এম আব্দুছ ছালাম, আরবী সাহিত্য প্রতিভা, (নভেম্বর ২০০৯, ছালেহা প্রকাশনী, রাজশাহী), পৃ. ০৭)। তাই এ দৈন্যদশা কিছুটা হলেও লাঘবের জন্য বাংলা ভাষাভাষি পাঠকদের জন্য আরবী সাহিত্যের নীলাভ আকাশের অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রদের মধ্য থেকে আল্-মুতানাব্বীর জীবনালেখ্য ও তার কাব্যশৈলী তুলে ধরার জন্য এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

আবু তাইয়্যিব আহমাদ ইব্ন হুসাইন ইব্ন আবদুস সামাদ আল্-মুতানাব্বী আল্ জু'ফী আল্ কুফী (৯১৫ খ্রি.–৯৬৫ খ্রি.) ছিলেন আব্বাসীয় যুগের একজন প্রসিদ্ধ আরব কবি। আরবী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে তাকে গণ্য করা হয়। তার অধিকাংশ কাব্য তার জীবনকালে সাক্ষাত পাওয়া নেতা ও শাসকদের প্রশংসা করে লেখা হয়েছে। কারো কারো মতে তার ৩২৬টি কবিতা তার জীবনের প্রতিচ্ছবি হিসেবে রচিত হয়েছে। নয় বছর বয়সে তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও রসবোধের জন্য তিনি পরিচিত ছিলেন। তার অনেক কবিতা তৎকালীন সময়ে এবং বর্তমান আরব বিশ্বে বিস্তৃত। তার কবিতাকে প্রবাদতুল্য গণ্য করা হয়। তিনি প্রশংসামূলক কবিতা লিখে তার সময়কালীন অনেক নেতা ও শাসকদের সান্নিধ্যলাভের সুযোগ পান। বিনিময়ে নেতা ও শাসকরাও তাকে বহু অর্থ ও উপহার প্রদান করেন। সে যুগে তার শক্তিশালী কাব্যিক ধারা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

আলোচনা ও বোঝার সুবিধার্থে এ অভিসন্দর্ভটি ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যাস করে প্রত্যেক অধ্যায়ে পৃথক পৃথক অনুচ্ছেদ নির্ধারণ করেছি। যেমন–

প্রথম অধ্যায় : এ অধ্যায়ে কবি আল-মুতানাব্বী এর সমসাময়িক যুগ তথা আব্বাসীয় যুগের পরিচয় ও তৎকালিন সামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক অবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক অবস্থা এবং সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিকদের নাম ও তাঁদের লেখনীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : এ অধ্যায়ে আরবী সাহিত্যের নীলাভ আকাশের অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র কবি আল্-মুতানাব্বীর জন্ম ও বংশ পরিচয়, তার শিক্ষাজীবন, কর্মজীবন, তার নামকরনের তাৎপর্য, পরিশেষে তার চরিত্র, কৃতিত্ব ও মৃত্যু ইত্যাদি জীবনালেখ্য ইতিহাসের আলোকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : এ অধ্যায়ে তাঁর কাব্য পরিচয়, যুগভেদে কাব্যের বৈশিষ্ট্যাবলী, বিভিন্ন যুগে কাব্যের উন্নতি, ইসলামে কাব্যচর্চা এবং কাব্যচর্চার প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উৎসাহ দান ইত্যাদী বিষয়ে আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় : এ অধ্যায়ে কবি আল্-মুতানাব্বীর কাব্যশৈলীর বিভিন্ন দিক যেমন প্রশংসামূলক কবিতা, নিন্দামূলক কবিতা, বীরত্বপূর্ণ কবিতা, যুদ্ধের বর্ননামূলক কবিতা তুলে ধরার পাশাপাশি তার কিছু শ্লোক যে প্রবাদ সাহিত্য তার বিবরণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় : এ অধ্যায়ে সমসাময়িক কবিদের সাথে কবি আল্-মুতানাব্বীর তুলনা স্থান পেয়েছে। এখানে তুলনামূলক আলোচনা এসেছে আল্-মুতানাব্বী ও বাশ্শার বিন বুর্দ, আল্-মুতানাব্বী ও আল্-মা'আররী এবং আল্-মুতানাব্বী ও আবু তাম্মামের মধ্যকার। পরিশেষে আল্-মুতানাব্বী সম্পর্কে বিভিন্ন পন্ডিতদের বক্তব্য তুলে দরা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় : এ অধ্যায়ে আরবী কাব্য সাহিত্যে আল্-মুতানাব্বীর অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কবি আল্-মুতানাব্বী ছিলেন আরবী কাব্য সাহিত্যাকাশের উজ্জল নক্ষত্র। তিনি ছিলেন আব্বাসীয় যুগের শেষ্ঠ কবি। যাদুকরী ভাষায় কবিতা রচনা করে তিনি কবিতার জগতকে সমৃদ্ধি দান করেছেন। পরিশেষে কবি আল্-মুতানাব্বী সম্পর্কে সমালোচকদের অভিমত তুলে ধরা হয়েছে।

অবশেষে বলব, গবেষণা কর্মে আলোচনার পুনরাবৃত্তিকে দূষণীয় বলে গণ্য করা হলেও আলোচনার গতিধারার সামঞ্জস্য রক্ষা এবং প্রাসঙ্গিকতার দাবী রক্ষার্থে কোথাও কোথাও কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে কিংবা পরিবর্তন ছাড়াই পুনরাবৃত্তি হয়েছে। "আল্-মুতানাব্বী এর কাব্যশৈলী" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার দীর্ঘদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে তৈরী করা এ গবেষণাকর্ম থেকে কেউ যদি উপকৃত হন, তবে সেটা হবে আমার বড় পাওনা। মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন আমাদের সকল পরিশ্রমকে কবুল করুন। আমীন।

মোঃ মোহিব্বুল্লাহ আজাদ

সূচিপত্র

অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ শিরোনাম		পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়	**: আল-মুতানাব্বী এর সমসাময়িক যুগের রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অবস্থা**	**১-৬৫**
প্রথম পরিচ্ছেদ	: আব্বাসীয় আমলের রাজনৈতিক অবস্থা	০২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	: আব্বাসীয় যুগের সামাজিক অবস্থা	২৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	: আব্বাসীয় আমলের শিক্ষা ও সাহিত্য	২৯
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	: আব্বাসীয় আমলের সাংস্কৃতিক অবস্থা	৪৭
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	: আব্বাসীয় যুগের শ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিকদের নাম ও তাঁদের লেখনীর বৈশিষ্ট	৫৬
দ্বিতীয় অধ্যায়	**: আল্-মুতানাব্বী এর জীবন পরিচিতি**	**৬৬-৯৭**
১ম পরিচ্ছেদ	: আল্-মুতানাব্বী এর জন্ম,বংশ পরিচয় ও নামকরণ	৬৭
২য় পরিচ্ছেদ	: আল্-মুতানাব্বী এর শিক্ষাজীবন	৭৮
৩য় পরিচ্ছেদ	: আল্-মুতানাব্বী এর কর্মজীবন	৮১
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	: আল্-মুতানাব্বী এর চরিত্র, কাব্যপ্রতিভা ও মৃত্যু	৯১
তৃতীয় অধ্যায়	**: কাব্য পরিচিতি, প্রকারভেদ, সংগ্রহ ও সংরক্ষণরীতি এবং বিভিন্ন যুগে কাব্যের ধারা**	**৯৮-১৫৯**
১ম পরিচ্ছেদ	: আরবী কাব্য এর পরিচয় ও প্রকারভেদ	৯৯
২য় পরিচ্ছেদ	: আরবী কবিতা সংগ্রহ ও সংরক্ষণরীতি	১১২
৩য় পরিচ্ছেদ	: যুগের আবর্তনে আরবী কাব্যের ধারাসমূহ	১২১
৪র্থ পরিচ্ছেদ	: ইসলামে কাব্যচর্চা ও এর প্রতি মহানবী সা. এর উৎসাহদান	১৩৯
চতুর্থ অধ্যায়	**: আল্-মুতানাব্বী এর কাব্যশৈলী**	**১৬০-২১০**
১ম পরিচ্ছেদ	: প্রশংসামূলক কবিতার বর্ণনা	১৬১
২য় পরিচ্ছেদ	: নিন্দামূলক কবিতার বর্ণনা	১৭৮
৩য় পরিচ্ছেদ	: বীরত্বপূর্ণ কবিতার বর্ণনা	১৮৩
৪র্থ পরিচ্ছেদ	: যুদ্ধের বর্ণনামূলক কবিতা	১৯৭
৫ম পরিচ্ছেদ	: শোকগাঁথা কবিতার বর্ণনা	২০৪
পঞ্চম অধ্যায়	**: সমসাময়িক কবিদের সাথে আল্-মুতানাব্বীর তুলনা**	**২১১-২৪৩**
১ম পরিচ্ছেদ	: আল্-মুতানাব্বী ও বাশ্শার বিন বুর্দ	২১২
২য় পরিচ্ছেদ	: আল্-মুতানাব্বী ও আবূ নুয়াস	২২২
৩য় পরিচ্ছেদ	: আল্-মুতানাব্বী ও আল্-মা'আররী	২২৯
৪র্থ পরিচ্ছেদ	: আল্-মুতানাব্বী ও আবু তাম্মাম	২৩৫
৫ম পরিচ্ছেদ	: আল্-মুতানাব্বী সম্পর্কে পণ্ডিতগণের মন্তব্য	২৪১

ষষ্ঠ অধ্যায়	**: আরবী কাব্যসাহিত্যে আল্-মুতানাব্বী এর অবস্থান**	**২৪৪-২৭৩**
১ম পরিচ্ছেদ	: আরবী কাব্য সাহিত্যাকাশের উজ্জল নক্ষত্র	**২৪৫**
২য় পরিচ্ছেদ	: কবিতার জগতকে সমৃদ্ধিদান	**২৫১**
৩য় পরিচ্ছেদ	: কাব্য প্রতিভার মূল্যায়ন	**২৬৪**
৪র্থ পরিচ্ছেদ	: আল্-মুতানাব্বী সম্পর্কে সমালোচকদের অভিমত	**২৬৮**
উপসংহার		**২৭৪**
গ্রন্থপঞ্জি		**২৭৫-২৮২**

এ্যাবস্ট্রাক্ট (সার-সংক্ষেপ)

অভিসন্দর্ভের শিরোনাম: **"আল্-মুতানাব্বী এর কাব্যশৈলী" (Poetry Style of Al-Mutanabbi)**

বর্তমান বিশ্বে প্রায় চার হাজার ভাষা প্রচলিত। তম্মধ্যে যেক'টি ভাষা উচ্চ সাহিত্যের রূপ নিয়েছে, তম্মধ্যে আরবী অন্যতম একটি প্রাচীন জীবন্ত ভাষা। ইসলামের মূল উৎস কুরআন ও হাদীস এ ভাষাতেই সংরক্ষিত। তাই কুরআন ও হাদীসে ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য আরবী ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা অতীব জরুরী। এ সম্পর্কে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন- 'তোমরা আরবী ভাষা শিক্ষা করো এবং মানুষদেরকে তা শিক্ষা দাও'। (ইমাম ইবনু তাইমিয়া, ইকতিযাউস সীরাতিল মুসতাকিম (রিয়াদ : মাকতাবাতুল উবাইকান, ১৪০৪ হি.), ১ম খন্ড, পৃ. ৫২৭)।

ইমাম ইবনু তাইমিয়া (র.) বলেন-'আরবী ভাষা দ্বীনের সাথে সম্পর্কিত বিষয়। উহা শিক্ষালাভ করা ওয়াজিব। কেননা কুরআন ও হাদীস বুঝা ফরয। আর তা আরবী ভাষা জানা ছাড়া বুঝা সম্ভব নয়। আর যা ছাড়া ওয়াজিব পূর্ণ হয়না তাও ওয়াজিব। (ইমাম ইবনু তাইমিয়া, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৫২৮)। সংগত কারনেই আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক সুনিবিড়। প্রাচীন এ ভাষা জাহেলী যুগে সাহিত্যের রূপ লাভ করে। এভাষা মধ্যযুগে সার্থক ভাষা ও আধুনিক যুগে আধুনিক সাহিত্য হিসেবে প্রতীয়মান। ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের আগমনের পর থেকেই এদেশের মুসলমানগন আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সাথে পরিচিত। বর্তমানেও এধারা অব্যাহত রয়েছে। দেশের সবোর্চ্চ বিদ্যাপিঠ বিশ্ববিদ্যালয়, আলিয়া মাদ্‌রাসা এমনকি কলেজেও আরবী সাহিত্য পাঠ্যসূচীভূক্ত। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থ নিতান্তই অপ্রতুল বললে অতুক্তি হবেনা। তাই এ দৈন্যদশা কিছুটা হলেও লাঘবের জন্য বাংলা ভাষাভাষি পাঠকদের জন্য আরবী সাহিত্যের নীলাভ আকাশের অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রদের মধ্য থেকে আল্-মুতানাব্বীর জীবনালেখ্য ও তার কাব্যশৈলী তুলে ধরা যুগের চাহিদা ও বর্তমান সময়ের দাবী।

আবু তাইয়্যিব আহমাদ ইব্ন হুসাইন ইব্ন আবদুস সামাদ আল্-মুতানাব্বী আল্ জু'ফী আল্ কুফী (৯১৫ খ্রি.-৯৬৫ খ্রি.) ছিলেন আব্বাসীয় যুগের একজন প্রসিদ্ধ আরব কবি। আরবী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে তাকে গণ্য করা হয়। তার অধিকাংশ কাব্য তার জীবনকালে সাক্ষাত পাওয়া নেতা ও শাসকদের প্রশংসা করে লেখা হয়েছে। কারো কারো মতে তার ৩২৬টি কবিতা তার জীবনের প্রতিচ্ছবি হিসেবে রচিত হয়েছে। নয় বছর বয়সে তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও রসবোধের জন্য তিনি পরিচিত ছিলেন। তার অনেক কবিতা তৎকালীন সময়ে এবং বর্তমান আরব বিশ্বে বিস্তৃত। তার কবিতাকে প্রবাদতুল্য গণ্য করা হয়। তিনি প্রশংসামূলক কবিতা লিখে তার সময়কালীন অনেক নেতা ও শাসকদের সান্নিধ্যলাভের সুযোগ পান। বিনিময়ে নেতা ও শাসকরাও তাকে বহু অর্থ ও উপহার প্রদান করেন। সে যুগে তার শক্তিশালী কাব্যিক ধারা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

২৮২ (দুইশত বিরাশি) পৃষ্ঠায় লিখিত অভিসন্দর্ভটিতে ৬ (ছয়) টি অধ্যায় এবং ২৭ (সাতাশ) টি পরিচ্ছেদ স্থান পেয়েছে। এতে যা কিছু উপস্থাপিত হয়েছে, তার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

- এতে কবি আল-মুতানাব্বী এর সমসাময়িক যুগ তথা আব্বাসীয় যুগের পরিচয় ও তৎকালিন সামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক অবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক অবস্থা এবং সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিকদের নাম ও তাঁদের লেখনীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে।
- আরবী সাহিত্যের নীলাভ আকাশের অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র কবি আল্-মুতানাব্বীর জন্ম ও বংশ পরিচয়, তার শিক্ষাজীবন, কর্মজীবন, তার নামকরনের তাৎপর্য, পরিশেষে তার চরিত্র, কৃতিত্ব ও মৃত্যু ইত্যাদি জীবনালেখ্য ইতিহাসের আলোকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।
- কবি আল্-মুতানাব্বীর কাব্য পরিচয়, যুগভেদে কাব্যের বৈশিষ্ট্যাবলী, বিভিন্ন যুগে কাব্যের উন্নতি, ইসলামে কাব্যচর্চা এবং কাব্যচর্চার প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উৎসাহ দান ইত্যাদী বিষয়ে আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে।

- কবি আল্-মুতানাব্বীর কাব্যশৈলীর বিভিন্ন দিক যেমন প্রশংসামূলক কবিতা, নিন্দামূলক কবিতা, বীরত্বপূর্ণ কবিতা, যুদ্ধের বর্ননামূলক কবিতা তুলে ধরার পাশাপাশি তার কিছু শ্লোক যে প্রবাদ সাহিত্য তার বিবরণ উপস্থাপন করা হয়েছে।
- এতে সমসাময়িক কবিদের সাথে কবি আল্-মুতানাব্বীর তুলনা স্থান পেয়েছে। এখানে তুলনামূলক আলোচনা এসেছে আল্-মুতানাব্বী ও বাশ্শার বিন বুর্দ, আল্-মুতানাব্বী ও আল্-মা'আররী এবং আল্-মুতানাব্বী ও আবু তাম্মামের মধ্যকার। পরিশেষে আল্-মুতানাব্বী সম্পর্কে বিভিন্ন পন্ডিতদের বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে।
- এখানে আরবী কাব্য সাহিত্যে আল্-মুতানাব্বীর অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে।
- এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কবি আল্-মুতানাব্বী ছিলেন আরবী কাব্য সাহিত্যাকাশের উজ্জল নক্ষত্র। তিনি ছিলেন আব্বাসীয় যুগের শেষ্ঠ কবি। যাদুকরী ভাষায় কবিতা রচনা করে তিনি কবিতার জগতকে সমৃদ্ধি দান করেছেন।
- পরিশেষে কবি আল্-মুতানাব্বী সম্পর্কে সমালোচকদের অভিমত তুলে ধরা হয়েছে।

এই অভিসন্দর্ভটি রচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে–

ক. আরবী কবিতাসাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টিকারী কবি আল্-মুতানাব্বীর জীবনী, সাহিত্যকর্ম ও কাব্যশৈলীকে সবার দৃষ্টিগোচর করা।

খ. কবি আল্-মুতানাব্বীর কাব্যপ্রতিভা, কাব্যশৈলী ও কবিতা রচনার পারদর্শিতা উপস্থাপন করা।

গ. কবি ও সাহিত্যিক হিসেবে কবি আল্-মুতানাব্বীর সাহিত্যকর্ম পর্যালোচনা করা।

ঘ. 'কবি আল্-মুতানাব্বীর কবিতায় ভুলত্রুটি সীমিত এবং সৌন্দর্য অগণিত' এ বিষয়টি উপমা ও উদাহরণের সাহায্যে তুলে ধরা।

ঙ. প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করার জন্য কবিদের উৎসাহিত করা। কারণ বদনামমূলক কবিতা রচনা শুধু তিক্ততাই বাড়ায়।

চ. শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাঝে আরবী ভাষায় কাব্য চর্চার গুরুত্ব তুলে ধরা।

ছ. কবি আল্-মুতানাব্বীর কাব্যশৈলীর বিষয়ে একটি তথ্য ও তত্ত্বভিত্তিক পর্যালোচনা উপস্থাপন করা।

পরিশেষে বলবো, আল্-মুতানাব্বী আরবী কাব্যসাহিত্যে এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী কবি। ক্বাসিদাজাতীয় কবিতা রচনার ক্ষেত্রে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। অলংকার, সৌন্দর্য ও উচ্চাঙ্গের বর্ণনা চাতুর্যতায় তাঁর স্থান ছিল সকলের উর্ধ্বে। তিনি সর্বস্তরের মানুষের এবং সর্বকালের উপযোগী সুনাম ও দুর্নাম এবং দর্শকদের ভাবধারা বর্ণনায় সুনিপুণ শিল্পীর ন্যায় অপরূপ কারুকার্য ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাই প্রাচীন ও আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ তাঁর কবিতার যথেষ্ঠ প্রশংসা করেছেন। সুতরাং এ জাতীয় একজন কবির জীবনী, তাঁর কাব্যশৈলী ও সাহিত্য প্রতিভা সম্পর্কে জানার আগ্রহ কারো না থেকে পারেনা। এ কারণেই উল্লেখিত শিরোনামটির উপর গবেষণাকর্ম অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। দীর্ঘদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে তৈরী করা এ গবেষণাকর্ম থেকে আশাকরি আরবী সাহিত্য পিপাসুরা খুবই উপকৃত হবেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন আমাদের সকল পরিশ্রমকে কবুল করুন। আমীন।

তত্ত্বাবধায়ক

(ড. মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন)
সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

গবেষক

(মোঃ মোহিব্বুল্লাহ আজাদ)
রেজি: নং-২০৬/২০১৯-২০২০
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

প্রথম অধ্যায়

আল্-মুতানাব্বী এর সমসাময়িক যুগের রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

প্রথম পরিচ্ছেদ : আব্বাসীয় আমলের রাজনৈতিক অবস্থা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আব্বাসীয় যুগের সামাজিক অবস্থা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আব্বাসীয় আমলের শিক্ষা ও সাহিত্য

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : আব্বাসীয় আমলের সাংস্কৃতিক অবস্থা

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : আব্বাসীয় যুগের শ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিকদের নাম ও তাঁদের লেখনীর বৈশিষ্ট্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

আব্বাসীয় আমলের রাজনৈতিক অবস্থা

আব্বাসীয় যুগের পরিচয়

খলিফা আবুল আব্বাস ৭৪৯ খ্রিষ্টাব্দে (হি. ১৩২) সিংহাসন লাভ করেন। ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে যখন জাবির যুদ্ধে উমাইয়া রাজবংশের শেষ শাসক মারওয়ান ইব্নে মোহাম্মদ তথা দ্বিতীয় মারওয়ানের পরাজয়ের মাধ্যমে উমাইয়া রাজবংশের পতন হয় তখন হতেই আব্বাসীয় যুগের সূচনা হয়। ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে মোঙ্গল নেতা দুর্ধর্ষ হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংস এবং শেষ আব্বাসীয় খলিফা আল-মুতাসিমের পতন (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ ৫০৮ বছরের সময়কালকে আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে আব্বাসীয় যুগ (العصر العباسى) হিসেবে অভিহিত করা হয়। আব্বাসীয় খেলাফতের প্রথম শাসক আবুল আব্বাস কুফার মসজিদে প্রথম ভাষণে নিজেকে আস্-সাফফা (রক্ত-পিপাসু) বলে ঘোষণা করে সকল বিদ্রোহীর মূলোৎপাটন করার জন্য দৃঢ়সংকল্প ব্যক্ত করলেন। শুরু হয় আব্বাসীয় খিলাফত। আব্বাসীয় খিলাফত শুরু হওয়ার সাথে সাথে ইসলামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। এই যুগে এসে আরবী সাহিত্য উৎকর্ষতার চরম শিখরে আরোহণ করে এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার আনুকূল্যে সাহিত্যচর্চা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়।[১]

আব্বাসীয় খলিফা ও খেলাফতকাল

আব্বাসীয় খেলাফতকালে সর্বমোট ৩৭ জন খলিফা শাসনক্ষমতা পরিচালনা করেছিলেন। রাষ্ট্রের শীর্ষস্থান ছিল খলিফাদের। তাঁরা ছিলেন রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার উৎস। তাঁরা প্রশাসনিক কর্তৃত্ব উজিরদের হাতে, বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা কাজিদের হাতে আর সামরিক ক্ষমতা আমিরদের হাতে ন্যস্ত করতেন। তবে সকল সরকারি প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেওয়ার একমাত্র অধিকারী ছিলেন খলিফাগণ।

সাম্রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বাগদাদের সাবেক খলিফাগণ পারস্যের প্রাচীন প্রশাসনিক ব্যবস্থা[২] অনুসরণ করতেন। ফলে উমাইয়া সাম্রাজ্যের শেষার্ধে যে ধর্মবিরোধী কার্যকলাপ হয়েছিল তার বিরুদ্ধে জনগণ রীতিমতো ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। আব্বাসীয় খলিফাগণ এর পূর্ণ সুযোগ নিয়ে শুরু থেকেই ধর্মীয় পবিত্রতা

---

[১] . মুহাম্মদ রেজা-ই-করিম, *আরব জাতির ইতিহাস*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯ খ্রি.) ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ২১৩।

[২] . প্রাচীন পারসিকরা ছিল মূলতঃ একটি প্রাচীন ইরানি জাতি, যারা খ্রিষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীর মধ্যে ইরানের পার্সিস অঞ্চলে, অধুনা দক্ষিণ-পশ্চিম ইরানের ফর্স প্রদেশ পরিভ্রমণ করেছিল। তাদের স্বদেশি মিত্রদের সাথে একত্রিত হয়ে তারা বিশ্বের কয়েকটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও শাসন করেছিল, যেগুলো প্রাচীন বিশ্বের বেশির ভাগ অঞ্চল এবং জনসংখ্যা-সমেত তাদের বিশাল সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাবের জন্য সুপরিচিত ছিল। তারা রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্যদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকার কেড়ে নিয়েছিল। তাদের বিরুদ্ধাচরণ করলেই অত্যাচারের স্টিম রোলার নেমে আসত। তবে ইতিহাসজুড়ে পারসিকরা শিল্প ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে ব্যাপক অবদান রেখেছিল।

রক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করেছিলেন। সরকারি কর্মকর্তাদের ভূমিকা ও কার্যক্রম সম্পর্কে তাঁরা সদা সতর্ক ছিলেন। আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের শেষের দিকে তাঁরা সকল ক্ষেত্রে ধর্মকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে এমন কিছু কার্যক্রম করেছিলেন, যা তাঁদের ক্ষমতার সাথে অনেক ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। যেমন, আব্বাসীয় খেলাফতের অষ্টম খলিফা আল-মুতাসিম (৮৩৩-৮৪২)-এর আমল থেকেই খলিফাগণ সমাজে সম্মানিত হওয়ার জন্য নিজেদের নামের শেষে 'আল্লাহ' শব্দটি যোগ করে উপাধি গ্রহণ করা শুরু করেন। ফলে পতনের যুগেও দেখা যায় প্রজাসাধারণ খলিফাগণকে সম্মানীয় উপাধিতে ভূষিত করতেন। যেমন : খলিফাতুল্লাহ বা আল্লাহর খলিফা, জিল্লুল্লাহ ফিল আরদ বা পৃথিবীতে আল্লাহর ছায়া ইত্যাদি। আব্বাসীয় খেলাফতের খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিলকে সর্বপ্রথম এমন সম্মানীয় উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিল তাঁর রাজত্বকাল। তা অটোমান খিলাফতের শেষ দিন পর্যন্ত বজায় ছিল। আল-মুতাসিমের পর তাঁর পুত্র আল-ওয়াসিক (মৃ. ৮৪৭) খেলাফতে অধিষ্ঠিত হন। তিনিই ছিলেন আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের সুবর্ণযুগের শেষ শাসক। তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের শান-গরিমা শেষ হয়ে যায়।

আব্বাসীয় খেলাফতের প্রথম ২৪ জন খলিফা মোট ২৪১ বছর (৭৫০-৯৯১) শাসনক্ষমতা পরিচালনা করেন। বাকি ১৩ জন খলিফা মোট ২৬৭ বছর ধরে (৯৯১-১২৫৮) শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তবে এদের মধ্যে মাত্র ০৬ (ছয়) জনের পুত্র উত্তরাধিকার সূত্রে খলিফা মনোনিত হয়েছিলেন। আব্বাসীয় খলিফাদের একজন করে সহকারী থাকতেন। তাঁদের রাষ্ট্রীয় উপাধি ছিল 'হাজিব'। তাঁদের দায়িত্ব ছিল খলিফার উপস্থিতিতে বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত দূত এবং সম্মানীয় অতিথিদের রাজসভায় পরিচয় করিয়ে দেওয়া। খলিফার সিংহাসনের পাসেই তাদের বসার জায়গা নির্ধারিত ছিল।[৩]

নিম্নে ধারাবাহিকভাবে আব্বাসীয় খেলাফতের খলিফাদের নামের তালিকা তুলে ধরা হলো :

১ম খলিফা : আস-সাফফাহ, তাঁর রাজত্বকাল ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দ।

২য় খলিফা : আল-মানসুর, তাঁর রাজত্বকাল ৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দ।

৩য় খলিফা : আল-মাহদী, তাঁর রাজত্বকাল ৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দ।

৪র্থ খলিফা : আল-হাদি, তাঁর রাজত্বকাল ৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দ।

৫ম খলিফা : আলী-রশীদ, তাঁর রাজত্বকাল ৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৮০৯ খ্রিষ্টাব্দ।

---

[3] . আবুল হাসান আলী ইব্নে হুসাইন ইব্নে আলী আল-মাসউদী, *আত-তানবিহ ওয়াল ইশরাফ*, সম্পাদনা : ডি গোজে (লিডেন, ১৮৯৩), ৭ম খণ্ড, পৃ ২৭৮।

৬ষ্ঠ খলিফা : আল-আমীন, তাঁর রাজত্বকাল ৮০৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৮১৩ খ্রিষ্টাব্দ।

৭ম খলিফা : আল-মামুন, তাঁর রাজত্বকাল ৮১৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দ।

৮ম খলিফা : আল-মু'তাসিম, তাঁর রাজত্বকাল ৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৮৪২ খ্রিষ্টাব্দ।

৯ম খলিফা : আল-ওয়াসিক, তাঁর রাজত্বকাল ৮৪২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দ।

১০ম খলিফা : আল-মুতাওয়াক্কিল, তাঁর রাজত্বকাল ৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ।

১১তম খলিফা : আল-মুনতাসির, তাঁর রাজত্বকাল ৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৮৬২ খ্রিষ্টাব্দ।

১২তম খলিফা : আল-মুস্তাইন, তাঁর রাজত্বকাল ৮৬২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দ।

১৩তম খলিফা : আল-মুতাজ, তাঁর রাজত্বকাল ৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দ।

১৪তম খলিফা : আল-মুহতাদি, তাঁর রাজত্বকাল ৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৮৭০ খ্রিষ্টাব্দ।

১৫তম খলিফা : আল-মুতামিদ, তাঁর রাজত্বকাল ৮৭০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৮৯২ খ্রিষ্টাব্দ।

১৬তম খলিফা : আল-মুতাজিদ, তাঁর রাজত্বকাল ৮৯২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৯০২ খ্রিষ্টাব্দ।

১৭তম খলিফা : আল-মুক্তাফি বিল্লাহ, তাঁর রাজত্বকাল ৯০২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৯০৭ খ্রিষ্টাব্দ।

১৮তম খলিফা : আল-মুক্তাদির বিল্লাহ, তাঁর রাজত্বকাল ৯০৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৯৩২ খ্রিষ্টাব্দ।

১৯তম খলিফা : আল-কাহির বিল্লাহ, তাঁর রাজত্বকাল ৯৩২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দ।

২০তম খলিফা : আল-রাজী বিল্লাহ, তাঁর রাজত্বকাল ৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৯৪০ খ্রিষ্টাব্দ।

২১তম খলিফা : আল-মুত্তাকি বিল্লাহ, তাঁর রাজত্বকাল ৯৪০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দ।

২২তম খলিফা : আল-মুস্তাকফি বিল্লাহ, তাঁর রাজত্বকাল ৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দ।

২৩তম খলিফা : আল-মুতি বিল্লাহ, তাঁর রাজত্বকাল ৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দ।

২৪তম খলিফা : আল-তায়ী বিল্লাহ, তাঁর রাজত্বকাল ৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৯৯১ খ্রিষ্টাব্দ।

২৫তম খলিফা : আল-কাদিও বিল্লাহ, তাঁর রাজত্বকাল ৯৯১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০৩১ খ্রিষ্টাব্দ।

২৬তম খলিফা : আল-কাইম বিল্লাহ, তাঁর রাজত্বকাল ১০৩১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০৭৫ খ্রিষ্টাব্দ।

২৭তম খলিফা : আল-মুকতাদি, তাঁর রাজত্বকাল ১০৭৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০৯৪ খ্রিষ্টাব্দ।

২৮তম খলিফা : আল-মুস্তাজহির, তাঁর রাজত্বকাল ১০৯৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১১৮ খ্রিষ্টাব্দ।

২৯তম খলিফা : আল-মুস্তারশিদ, তাঁর রাজত্বকাল ১১১৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১৩৫ খ্রিষ্টাব্দ।

৩০তম খলিফা : আল-রশিদ বিল্লাহ, তাঁর রাজত্বকাল ১১৩৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১৩৬ খ্রিষ্টাব্দ।

৩১তম খলিফা : আল-মুকতাকি বিল্লাহ, তাঁর রাজত্বকাল ১১৩৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১৬০ খ্রিষ্টাব্দ।

৩২তম খলিফা : আল-মুসতানজিদ বিল্লাহ, তাঁর রাজত্বকাল ১১৬০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১৭০ খ্রিষ্টাব্দ।

৩৩তম খলিফা : আল-মুসতাজি বিল্লাহ, তাঁর রাজত্বকাল ১১৭০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১৮০ খ্রিষ্টাব্দ।

৩৪তম খলিফা : আল-নাসির বিল্লাহ, তাঁর রাজত্বকাল ১১৮০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২২৫ খ্রিষ্টাব্দ।

৩৫তম খলিফা : আল-জাহির বিল্লাহ, তাঁর রাজত্বকাল ১২২৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২২৬ খ্রিষ্টাব্দ।

৩৬তম খলিফা : আল-মুস্তানসির বিল্লাহ, তাঁর রাজত্বকাল ১২২৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২৪২ খ্রিষ্টাব্দ।

৩৭তম খলিফা : আল-মুতাসিম বিল্লাহ, তাঁর রাজত্বকাল ১২৪২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ।

আব্বাসীয় আমলের রাজনৈতিক অবস্থা

আব্বাসীয় আমলকে দুভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগ ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৮৪২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত আর দ্বিতীয় ভাগ ৮৪২ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১২৫২ খ্রিষ্টাব্দে মোঙ্গল নেতা হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংস পর্যন্ত। আব্বাসীয় আমলে সর্বশ্রেষ্ঠ খলিফাদের মধ্যে অন্যতম দুজন খলিফা যথাক্রমে হারুন ও মামুন প্রথম ভাগের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এ ভাগের অপর ছয়জন খলিফা হারুন ও মামুনের মতো তেমন প্রসিদ্ধ না হলেও তারা সাম্রাজ্যের ভাগ্যনিয়ন্তা ছিলেন এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় স্ব-স্ব কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন।[৪] ক্ষমতা প্রয়োগের দিক বিবেচনায় আব্বাসীয় খিলাফত মূলত ৮৪২ খ্রিষ্টাব্দে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। পরবর্তী খলিফাদের মধ্যে অনেকে এমন অধঃপতিত ও অকর্মণ্য ছিলেন যে, রাজধানী বাগদাদ নগরীতেও তাঁরা শক্তিশালী উমারাদের নিকট প্রায় বন্দিদশায় বসবাস করতেন। এ শক্তিশালী উমারাদের কিছু কিছু ছিল পারস্যবাসী; কিন্তু অধিকাংশই ছিল তুর্কি। তারা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী খলিফাদেরকে সিংহাসনে বসাত এবং সিংহাসন থেকে নামাত। খলিফাগণ অনেক কাজকর্মই তাদের ইচ্ছানুযায়ী করতে হতো। তৎকালে বাগদাদের পূর্ব ও পশ্চিমে অনেকগুলো ছোটো ছোটো রাজ্য গড়ে উঠেছিল; যেগুলোকে উমারাগণ খলিফার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ না করেই স্বাধীন রাষ্ট্রের মতো পরিচালনা করত।[৫]

উল্লেখ্য যে, শিয়া, খারেজি, রক্ষণশীল ধর্মপন্থি, পারস্যবাসী এবং অন্যান্য খণ্ড খণ্ড দলের ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে মূলত আব্বাসীয়গণ ক্ষমতায় আসেন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর আব্বাসীয়গণ প্রত্যেক দলের নিকট বিভিন্ন কাজের প্রতিশ্রুতি প্রদান করার কারণে প্রত্যেক দল নিজ নিজ উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য মেতে ওঠে এবং আব্বাসীয়গণকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখার জন্য নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করতে থাকে। আব্বাসীয়দের আমলে একটি অনুশাসন বাক্য প্রচলিত ছিল—"যে ব্যক্তি উজিরকে মান্য করে সে খলিফাকে মান্য করে আর যে ব্যক্তি খলিফাকে মান্য করে সে আল্লাহকে মান্য করে।"[৬] এতৎসত্ত্বেও আব্বাসীয়দের আমলে "শো'বিয়া"-এর আত্মপ্রকাশ পারস্য সাহিত্যিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। এর উদ্দেশ্য ছিল মৌলিক রচনা, ফার্সি গ্রন্থসমূহের অনুবাদের মাধ্যমে পারস্য সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ এবং পারস্য সামাজিক কাঠামো ও ঐতিহ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। তারা ছিলেন সাহিত্য সমালোচকদের অগ্রসৈনিক, যারা ধর্ম ও নৈতিকতায় সন্দিগ্ধতার ভাব উৎসাহিত করতেন এবং ধর্মচ্যুতিকে আশ্রয় দিতেন।[৭]

---

[4] . মাসউদী, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৭৭।

[5] . মুহাম্মদ রেজা-ই-করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮।

[6]. হান্না আল-ফাখূরী, *আল-জামি' ফিল আদাবিল আরাবী ওয়া তারীখিহী*, ২য় সং, বৈরুত : দারুল জীল, ১৯৯১, খ. ১, পৃ. ২০৫।

[7]. মুহাম্মদ রেজা-ই-করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮-২৫৯।

উমাইয়াদের সাথে আব্বাসীয়দের রাজনৈতিক মতপার্থক্য

আব্বাসীয়দের রক্ষণশীল জনসাধারণের সমর্থন লাভের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল উমাইয়াদের তথাকথিত ধর্মবিমুখতা। উমাইয়াদের পার্থিব দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে আব্বাসীয়গণ একটি খাঁটি ধর্মীয় রাষ্ট্র গঠনের প্রতিশ্রুতি দান করেন। খেলাফতে অধিষ্ঠিত হলে এই প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য তারা সামগ্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। মূলত এটা ছিল তাদের রাজনৈতিক কৌশল। আসল বিষয়টি হলো, আব্বাসীয়গণ উমাইয়াদের চাইতে কোনো অংশেই কম জাগতিক ছিলেন না। তবে তারা ধার্মিকতার ভান করতে পারতেন। তারা ধর্মীয় নেতাদের মতামতকে সম্মান প্রদর্শন করতেন, জনসাধারণকে ইসলামের বিধি-বিধান পালন করার প্রতি তাগিদ দিতেন, নিজেরা যথাসম্ভব ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতেন এবং ইসলামের নামে তারাই সর্বপ্রথম একটি অনুসন্ধিৎসু সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ধার্মিকতার প্রতীক হিসেবে আব্বাসীয় খলিফাগণ বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানাদি ও জুমার নামাজে রাসূল সা.-এর জামা পরিধান করতেন। ধর্মীয়ভাবে তারা গোঁড়া ধার্মিকতার লক্ষণ হিসেবে খলিফা মুতাসিম হতে শুরু করে পরবর্তী খলিফাগণ তাঁদের নামের শেষে আল্লাহ শব্দ যোগ করে নেন। যেমন : খলিফা মুতাসিম বি-আল্লাহ তথা মুতাসিম বিল্লাহ।[৮]

আব্বাসীয়দের নিকট উমাইয়াগণ ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় ইরানের গ্রামাঞ্চলে জনসাধারণের একটি বিরাট অংশ তখনও মুসলমান হয়নি। উমাইয়াগণ আরব প্রাধান্যে বিশ্বাস করার কারণে তাঁদের নীতি উচ্চ শ্রেণির পারস্যবাসীদের স্বার্থে আঘাত হানে। ফলে সমস্যা তৈরি হয় এবং তারা জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তবে আব্বাসীয়গণ আরব প্রাধান্য পরিত্যাগ করে ধর্মকর্মের ওপর জোর দেন এবং জনসম্পৃক্ততা বাড়াতে সক্ষম হন। যেসব দল আব্বাসীয়গণকে ক্ষমতায় আসতে সহযোগিতা করেছিল তারা উমাইয়াদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে উমাইয়া খেলাফতের বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে। এসব দলের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সংখ্যাগুরু ছিল পারস্যবাসীগণ। একসময় তারা উমাইয়াদের মতো আব্বাসীয়দেরও বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে। পারস্যবাসীদের বিরোধিতার রূপ ছিল তিনটি : ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক। মূলত তাদের কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য অপরিবর্তিত থাকে। আর সেটি ছিল আরব শাসন থেকে মুক্তি অর্জন।[৯]

ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, আব্বাসীয়গণ তাঁদের সফলতার জন্য আবু মুসলিম ও তাঁর পারস্য সৈন্যদের নিকট ঋণী। এরপরও আব্বাসীয়গণ তার কবলমুক্ত হতে চেয়েছেন। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী আব্বাসীয়গণ দ্রুততার সাথে অগ্রসর হন। ৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা মানসুর তাঁর প্রাসাদে আবু মুসলিমকে এক নৈশ ভোজে দাওয়াত করেন এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী সেখানেই তাকে হত্যা

---

৪ . মাসউদী, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৭৮।

৯. ফিলিপ. কে. হিট্টি, *আরব জাতির ইতিহাস*, দশম সংস্করণ, তন্ময় ভট্টাচার্য সম্পা., কলকাতা; দ্বিজেন্দ্র অফসেট, ১৯৭০ খ্রি., পৃ. ৩০৪।

করেন। খলিফার এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিক্রিয়া ইরানে বিশেষ করে খোরাসানে এমন প্রবলভাবে দেখা দেয় যে, এটা নিয়ন্ত্রণ করতে আব্বাসীয়দের প্রায় এক শতাব্দী সময় লেগে যায়।[১০]

আব্বাসীয় রাজনীতি সম্পর্কে কবি ও কবিতা

আব্বাসীয় রাজনীতি সম্পর্কে কামাসক্ত কবি এবং খলিফা হারুনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু কবি আবু নোয়াস[১১] কবিতা লিখেছেন—

الشباب وأنا ركضنا ** تشغيل المغامرة من المرح

لا يوجد دليل على الخطيئة ** لكن سأقيسها من القريب

"যৌবন এবং আমি, আমরা দৌড়াইলাম

প্রমোদের এক দুঃসাহসিক দৌড়

পাপের কোনো খতিয়ান নাই

কিন্তু শীঘ্রই আমি ইহার পরিমাপ করিলাম।"[১২]

খলিফার বন্ধু কবি আবু নোয়াস এই কবিতাটি আবৃত্তি করার সময় খলিফা হারুন খুব সম্ভব উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন—

تعال سليمان! أغني عندى ** وأحضر لي النبيذ بسرعان

أنظر الصباح قد اقترب ** فى جبة الصافى الذهبي

لفي الزجاجة وتقليبها ** أعطني كأسا لأغرق فيها

في زاوية السماء مهما كانت عالية ** دع المؤذن يصوت الأذان

---

10. ফিলিপ. কে. হিট্টি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪-৩০৫।

11. আবু নুয়াস আল হাসান ইব্নে হানি আল হাকামি। তিনি আবু নুয়াস বলে পরিচিত। তিনি ধ্রুপদি আরবি কবিতার শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম। আরবি ছাড়াও তিনি ফারসি ভাষায়ও কবিতা রচনা করেছেন। বর্তমান ইরানের অন্তর্গত আহবাজ শহরে ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয় এবং ৮১৪ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর বাবা ও মা যথাক্রমে আরব ও পারসিয়ান বংশোদ্ভূত ছিলেন। সমসাময়িক আরবি কাব্যের সকল ধারার ওপর তিনি দক্ষ ছিলেন। লোককথায়ও তাঁর সরব উপস্থিতি রয়েছে।

12. *এনথোলজি অব ইসলামিক লিটারেচার*; সম্পাদক : জেমস ক্রিটজেক, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৬-৮৮।

"এসো সুলাইমান! আমার নিকট গান করো,

এবং তাড়াতাড়ি আমার জন্য শরাব আনো।

দেখো, ইতিমধ্যে প্রাতঃকাল সমুপস্থিত,

পরিষ্কার সোনালি জোব্বায়।

কাচের বোতল ঘুরাইতে ঘুরাইতে,

আমাকে এক পেয়ালা দাও যাহাতে ডুবিয়া যাইতে পারি

আকাশ কোণে, তা যত উচ্চই হোক

মুয়াজ্জিনকে আজানের সুর ধ্বনিতে দাও।"[১৩]

খলিফা হারুনের একজন সমালোচক কবি ছিলেন আবু আল-আতাহিয়্যা।[১৪] তিনি আব্বাসীয় খেলাফতের চকচকে সবকিছুতে ধ্বংস অবলোকন করেন এবং খলিফাকে সতর্ক করে বলেন—

ما زالت الدنيا منغصة ** لم يخل صاحبها من البلوى

دار الفجائع والهموم ودا ** ر البيت والاحزان والشكوى

بينا الفتى فيها بمنزلة ** إذ صار تحت ترابها ملقى

تقفو مساويها محاسنها ** ل شيئ بين النعى والبشرى

يا بانى الدار المعد لها ** ماذا عملت لدارك الاخرى

وممهد الفرش الوثيرة لا ** تغفل فراش الرقدة الكبرى

"দুনিয়া বরাবরই কদর্যপূর্ণ; দুনিয়াদার কখনোই বিপদমুক্ত নয়।

দুনিয়া হচ্ছে ভয়, দুশ্চিন্তা, দুঃখ-দুর্দশা ও নানা অভিযোগের আলোয়।

---

13. *এনথোলজি অব ইসলামিক লিটারেচার*; সম্পাদক : জেমস ক্রিটজেক, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৬-৮৮।

14. আবুল আতাহিয়্যা তাঁর উপাধি। নাম ইসমাইল। উপনাম আবু ইসহাক। পিতা কাসিম বিন সুওয়াইদ বিন কায়সান। মাতা জিয়াদ আল মুহারেবীর কন্যা উম্মে জায়েদ। তিনি ১৩০ হিজরি মোতাবেক ৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে 'আয়নুত তামর' নামক অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন, যা ইরাকের কারবালা অঞ্চল থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আবুল আতাহিয়্যা মানব, প্রকৃতি, জগৎ ও নৈতিকতা সম্পর্কে নতুন কোনো চিন্তা ও দর্শনের অধিকারী ছিলেন না। বরং তিনি বিভিন্ন ধারার দর্শন নিজের মাঝে আত্মীকৃত করেছিলেন এবং তিনি তত্ত্বকথাকে কবিতায় রূপ দিয়েছিলেন। তার বেশকিছু কর্ম ও কবিতার সাথে ইসলামের বিরোধ রয়েছে। এই মহান দুনিয়াবিমুখ কবি বাগদাদে ২১৩ হিজরি মোতাবেক ৮২৬ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

ঐ পৃথিবীতে যুবক যতই উঁচু মর্যাদার হোক না কেনো পরিশেষে সে পৃথিবীর মাটির নিচেই (সমাধিস্থ) হবে।

পৃথিবীর ভালোমন্দ একটি অপরটির অনুগামী; শোকবার্তা আর সুসংবাদ তার কাছে কোনো তফাত নেই।

ওহে এই দুনিয়ার জন্য গৃহ প্রস্তুতকারী; আখিরাতের গৃহের জন্য তুমি কী করেছ?

ওহে আরামদায়ক শয্যাপ্রস্তুতকারী, মহানিদ্রার শয্যা (মৃত্যু তথা আখিরাত) নিয়ে তুমি উদাসীন হয়ো না।"[১৫]

আব্বাসীয় খলিফার সাথে সাক্ষাৎপ্রার্থী বিদেশি অতিথিবৃন্দ ভবনের বিভিন্ন কক্ষের সম্পদ ও সৌন্দর্য দেখে এতই হতবাক হয়ে যেতেন যে, তারা প্রায়ই গৃহাধ্যক্ষের দফতরকে দরবারকক্ষ ভেবে ভুল করতেন। এই ধরনের উন্নত ও বিলাসবহুল পরিবেশে থেকেই প্রাথমিক আব্বাসীয় খলিফাগণ তাঁদের বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করতেন।

ভূমি, ব্যবসা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় আব্বাসীয় রাজনীতির প্রভাব

আব্বাসীয়গণ উমাইয়াদের কাছ থেকে ক্ষমতা দখল করার পর বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনভার লাভ করেন। ভূমি, ব্যবসা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় আব্বাসীয় রাজনীতির প্রভাব পড়তে থাকে। নিম্নে এ সংক্রান্ত আলোচনা তুলে ধরা হলো–

ভূমি

প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে রাজস্ব বিভাগ। আব্বাসীয় আমলে রাজ্য জয়ে যেহেতু কোনো যুদ্ধলব্ধ সম্পদ পাওয়া যায়নি, তাই বিজিত দেশসমূহ হতে রাজস্ব আদায় করা হতো। নীতিগতভাবে রাজ্যের সমস্ত ভূমির মালিক ছিল মুসলমানগণ।[১৬] কার্যত সে আমলে ভূমি ছিল ছয় ধরনের। যেমন–

১. কতিপয় ভূমি ছিল খলিফাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এসব ভূমির জাকাত ও উশর ছাড়া তাঁরা রাষ্ট্রকে অন্য কোনো কর প্রদান করতেন না।

---

15. *এনথোলজি অব ইসলামিক লিটারেচার*; সম্পাদক : জেমস ক্রিটজেক, প্রাগুক্ত,পৃ ৮৬-৮৮।
16. মুহাম্মদ রেজা-ই-করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮।

২. কিছু ভূমি ছিল সৈনিকদের মালিকানাধীন। সামরিক বিভাগের লোক হিসেবে এসব ভূমি ভোগ-দখল করার জন্য তাদেরকে দেওয়া হতো। রাষ্ট্রকে এসব ভূমির কর দিতে হতো।

৩. খলিফাদের অধীনস্থ পতিত ভূমি। এসব ভূমির ভোগ-দখল ছিল খলিফাদের ইচ্ছাধীন। তাঁরা যাকে ইচ্ছা এসব ভূমি দান করতেন।

৪. এমন ভূমি যেগুলোর মালিক ছিল অমুসলিম। তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে এসব ভূমি মুসলিমদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে। এসব ভূমির শুধু জাকাত আদায় করা হতো, রাষ্ট্রকে কোনো প্রকার কর প্রদান করা হতো না।

৫. এমন ভূমি যেগুলোর মালিককে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তাড়িয়ে দেওয়া হয়নি কিংবা ইসলাম গ্রহণ করে ফিরে এসেছে। এসব ভূমির কর প্রদান করতে হতো।

৬. এমন ভূমি যেগুলোর মালিক ও রাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার কারণে তারা ভোগ-দখলের সুযোগ লাভ করেছে। এসব ভূমির একটি নির্দিষ্ট অংশ কর প্রদান করতে হতো।

ব্যবসা

আব্বাসীয় আমলে ব্যবসায়ীদের ব্যবসার লভ্যাংশের ওপর একটি বিশেষ কর আরোপ করা হয়েছিল, তবে এর পরিমাণ নির্ধারিত ছিল না। এ নিয়মের কারণে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সম্পদের এক তৃতীয়াংশ সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হতো বলে ব্যবসায়ীরা সব সময় অভিযোগ করত। অমুসলিম ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মাথাপিছু কর (জিজিয়া) বা নিরাপত্তা কর আদায় করা হতো। বলপ্রয়োগের রীতি ছিল চিরাচরিত। এ কাজের জন্য 'বাজেয়াপ্তি সংস্থা' নামে একটি সংস্থাই ছিল।[১৭]

খলিফার অধঃস্তন রাজ্যের কোনো কর্মকর্তা দেশদ্রোহিতা, খলিফার বিরুদ্ধাচরণ কিংবা অন্য কোনো কারণে পদচ্যুত হলে তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হতো। নীতিগতভাবে সরকারি খাজাঞ্জিখানা বা বায়তুল মালের দুটি হিসাব থাকত; একটি খলিফার হিসাব আর অপরটি রাষ্ট্রের হিসাব। কার্যত উভয়রূপ হিসাবের ওপরই খলিফার আধিপত্য থাকত। মুসলমানদের নিকট হতে আদায়কৃত সকল কর মুসলমানদের মধ্যকার দরিদ্র, অসহায়, নিঃস্ব, এতিম, আগন্তুক ও যুদ্ধের জন্য খরচ করার কথা থাকলেও বাস্তবে তা কমই করা হয়েছিল। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, প্রথম আব্বাসীয় খলিফা মৃত্যুর সময় ৪টি জামা ও ৫টি পায়জামা রেখে গিয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় খলিফা মানসুর মৃত্যুর সময় ৬ লক্ষ দিনার রেখে যান। আব্বাসীয় যুগের প্রথম

[17]. মুহাম্মদ রেজা-ই-করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯।

দিকে খলিফাদের বাজেট সংগতিপূর্ণ থাকলেও পরবর্তীকালে তা অসংলগ্ন হয়ে ওঠে। সময়ের পরিক্রমায় তা আরও খারাপ হতে থাকে।

প্রশাসন

আব্বাসীয় আমলে প্রশাসনে তিনটি বিভাগ ছিল। ক. পুলিশ বিভাগ, খ. বিচার বিভাগ, গ. অডিট বিভাগ। পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তাদের মধ্যে একজনের উপাধি ছিল মুহতাসিব; যিনি নৈতিকতা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। বিচার বিভাগ রাজধানীর প্রধান বিচারকের তত্ত্বাবধানে ছিল। প্রত্যেক শহরে তাঁর প্রতিনিধি ছিল। তাকে কাজি বলা হতো। প্রত্যেক কাজি ধর্মীয় আইন ও ইসলামি শরিয়তে অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁরা স্থানীয় বিচারালয়ের সভাপতিত্ব করতেন। তাঁদের দায়িত্ব ছিল ধর্মীয় দানপত্র নিশ্চিত করা, এতিম ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের সম্পত্তির জটিলতা নিরসন করা, বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রি করা এবং উত্তরাধিকার আইনের বাস্তবায়ন করা ইত্যাদি। বিচার বিভাগের অধীন একটি পর্যবেক্ষণ সংস্থা ছিল; যার কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ছিল অত্যাচারিত প্রজাদের সহযোগিতা করা, করসংক্রান্ত অভিযোগের নিষ্পত্তি করা, বিচারকের সিদ্ধান্ত কার্যকর করা এবং সরকারি ইবাদতখানার রক্ষণাবেক্ষণ করা।[১৮]

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আব্বাসীয় সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতা

শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর আব্বাসীয়গণ রাজ্য জয়ের উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। তখন আরব যোদ্ধাগণ হয় মরুভূমিতে ফিরে গিয়েছে অথবা জনস্রোতের সাথে মিশে গিয়েছে। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ভূখণ্ডের সাথে খুব কমই আব্বাসীয়গণ যুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। বাগদাদে অবস্থানকারী দেহরক্ষীগণ ছাড়া তারা আর কোনো স্থায়ী সেনাবাহিনী গঠন করেনি। তারা বৈদেশিক সম্পর্ক বজায় রাখত প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে এবং রাষ্ট্রীয় উপঢৌকন আদান-প্রদানের মাধ্যমে।[১৯]

পাশ্চাত্যের শার্লমানের সাথে সম্পর্ক

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দুটি নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল। একদিকে পাশ্চাত্যের শার্লমার আর অপরদিকে প্রাচ্যের হারুন-অর-রশিদ। তবে এই দুইজনের মধ্যে হারুনই ছিল বেশি শক্তিশালী এবং উচ্চতর সংস্কৃতির ধারক-বাহক। এই দুই সাম্রাজ্য-অধিপতি নিজ নিজ স্বার্থের কথা বিবেচনা করেই পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনে প্রয়াসী হন। শার্লমান মনে করতেন, তাঁর চিরশত্রু বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে হারুনই হতে পারে তাঁর সেরা মিত্র। আবার হারুনও মনে করতেন, তাঁর পরম শত্রু স্পেনীয়

18. মুহাম্মদ রেজা-ই-করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯।
19. ফিলিপ. কে. হিট্টি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১।

উমাইয়াদের বিরুদ্ধে শার্লমানই হতে পারে তাঁর সেরা মিত্র। পশ্চিমা ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, হারুন ও শার্লমানের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক হয়েছিল একাধিকবার দূত প্রেরণ ও উপহারসামগ্রী বিনিময়ের মাধ্যমে।[২০] 'আল-ইক্‌দুল ফরীদ' শীর্ষক গ্রন্থে এসেছে, শার্লমানের দূতগণ একবার খলিফা হারুনের জন্য উপহার হিসেবে একটি সূক্ষ্ম টাইপের ঘড়ি এনেছিলেন। আর খলিফা হারুন শার্লমানের জন্য উপহার হিসেবে তামাক খাওয়ার একটি পাইপ পাঠানোর যে কথা প্রচলিত আছে তা ছিল অনেকটাই কল্পিত। উভয়ের মধ্যকার দূত এবং উপহার আদান-প্রদানের এসব ঘটনা ঘটেছিল ৭৯৭ থেকে ৮০৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। অথচ মুসলিম ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে বিস্ময়করভাবেই নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন। তারা অন্য অনেক কূটনৈতিক তথ্য তুলে ধরলেও এ ব্যাপারে একটি শব্দও লেখেননি।

'ইক্‌দ'[২১] গ্রন্থের বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়, বাইজান্টাইন সম্রাট এবং উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে চিঠিপত্র লেনদেন হতো। ঐ গ্রন্থের বর্ণনা থেকে আরও পাওয়া যায় যে, তৎকালীন ভারতের রাজা তাঁর প্রতিনিধিদলের মাধ্যমে খলিফা হারুনের জন্য মূল্যবান উপহারসামগ্রী পাঠিয়েছিলেন। তারা উপহার নিয়ে খলিফার দরবারে এলে তাদেরকে জাঁকজমকপূর্ণ অভ্যর্থনা প্রদান করা হয়। অন্য এক সূত্রে জানা যায়,[২২] খলিফা হারুনের পুত্র আল-মামুন সমকালীন রোমের রাজা দ্বিতীয় মাইকেলের কাছ থেকে প্রচুর উপহারসামগ্রী পেয়েছিলেন। ইতিহাস থেকে জানা যায়, উপহারসামগ্রীর আদান-প্রদানের কারণে বাগদাদ ও কনস্টান্টিনোপলের মধ্যে বিবদমান অবস্থা শার্লমানকেই উপকৃত করে। এ ছাড়া আর কোনো লাভ হয়েছে বলে মনে হয় না।

বাইজান্টাইদের সাথে বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক

আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের তৃতীয় খলিফা আল-মাহদীর (৭৭৫-৭৮৫ খ্রি.) আমলে প্রাচীন বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য ও খিলাফতের মধ্যকার বিরোধ আবার শুরু হয়। অভ্যন্তরীণ বিরোধই আরব রাষ্ট্রকে উত্তাল করে তোলে। ফলে খলিফাগণ রাজ্যের রাজধানী বাগদাদে সরিয়ে নিতে বাধ্য হন। এই কারণে ৫ম কনস্ট্যানটাইন (৭৭১-৭৭৫ খ্রি.) স্বীয় রাজ্যের সীমানা আরও পূর্ব দিকে সরিয়ে নেন। একই সঙ্গে এশিয়া মাইনর এবং আর্মেনিয়ার

---

20 . *অ্যানালস রয়্যালস*; অ্যানালেস রেগনি ফ্র্যানকোরাম, সম্পাদনা : জি এইচ পারজি এবং এক কুরজের *স্কিপটরস রেরাম জার্মানিকরাম*: ৪র্থ খণ্ড (হ্যানোভার, ১৮৯৫), পৃ ১১৪, পৃ ১২৩-১২৪।

21. আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্‌দে রাব্বিহি আল-আন্দালুসী, আল-ইকদুল ফরীদ, (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৩ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৯৭-১৯৮।

22. মুহাম্মদ ইব্‌ন শাকের আল-কুতুবি, কিতাবু ফাওয়াতিল ওয়াফয়াত, (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০০ খ্রি.), ১ম খণ্ড; পৃ. ৩০৭, ২য় খণ্ড; পৃ ১২-১৩।

পুরো সীমানাও তিনি সরিয়ে নেন।[২৩] বাইজান্টাইন সীমান্ত যখন এগিয়ে আসে তখন সিরিয়া থেকে আর্মেনিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী দুর্গগুলো পিছিয়ে নেওয়া হয়।

আব্বাসীয় বংশের আল-মাহদীই প্রথম খলিফা, যিনি বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। তিনি শত্রু দেশের রাজধানীতে বুদ্ধিমত্তার সাথে হামলা চালিয়ে সাফল্য লাভ করেন। তাঁর তরুণ পুত্র এবং ভবিষ্যৎ সিংহাসনের অধিকারী হারুন এই অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।[২৪] ৭৮২ খ্রিষ্টাব্দে আরব বাহিনী বসফরাস পৌঁছে যায়।[২৫] অবশ্য কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত তাদের পৌঁছানো হয়নি। তৎসময়ে তাঁর পুত্র ৬ষ্ঠ কনস্ট্যানটাইনের নামে রাজত্ব দেখাশোনা করতেন সম্রাজ্ঞী আইরিন (৭৯৭-৮০২ খ্রি.)। শেষপর্যন্ত তিনি আরব বাহিনীর সাথে শান্তিচুক্তি করতে বাধ্য হন।

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের ইতিহাসে সম্রাজ্ঞী আইরিনই প্রথম মহিলা, যিনি সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।[২৬] আইরিনের পর বাইজান্টাইন সম্রাট হন প্রথম নাইসফোরাস।[২৭] ৮০২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৮১১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। তিনি আরবদের সঙ্গে সম্রাজ্ঞী আইরিনের চুক্তি প্রত্যাখ্যান করেন। এমনকি তিনি তৎকালীন খলিফা হারুনের কাছে চিঠি লিখে ইতোমধ্যে দেওয়া সকল কর ফেরত চান। চিঠি পেয়ে খলিফা হারুন খুবই ক্ষুব্ধ হন এবং তার চিঠির পেছনেই তার প্রতি ঘৃণাভরে একটি চিরকুট লিখে পাঠান। সে চিরকুটে লেখা ভাষাগুলো ছিল এরকম—"করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের অধিনায়ক হারুন রোমান কুকুর নাইসফোরাসকে লিখছি। তোমার প্রেরিত চিঠির আদ্যোপান্ত আমি পড়েছি। হে অবিশ্বস্ত মায়ের সন্তান, চিঠির জবাব চাও তো মুখোমুখি হও। কানে শোনার মতো কোনো জবাব আমার কাছে নেই। সালাম।"[২৮]

এই কথানুসারেই খলিফা হারুন তৎক্ষণাৎ আল-রাকা থেকে অভিযান শুরু করেন। ইউফ্রেটিস নদীর তীরে সিরীয় সীমান্তে অবস্থিত এই শহর থেকেই অভিযান চালিয়ে হারুন এশিয়া মাইনর এলাকা তছনছ করে দেন এবং হেরাক্লিয়া (হিরাক্লাহ) ও তিয়ানা (আল-তুয়ানা) দখল করেন। পাশাপাশি তিনি সম্রাটকে বিপুল পরিমাণ বার্ষিক কর দিতে বাধ্য করেন। শুধু তা-ই নয় সম্রাটের পরিবারের প্রত্যেকের ওপর করারোপ করে

---

23. এ. এ ভাসিলিয়েড, *হিস্ট্রি অব দি বাইজান্টাইন এম্পায়ার*, অনুবাদ : এস রাগোজিন, ১ম খণ্ড, (ম্যাডিসন, ১৯২৮), পৃ ২৯১; চার্লস দিয়েল, *হিস্ট্রি অব দি বাইজান্টাইন এম্পায়ার*, অনুবাদ : জি বি ইভস (প্রিন্সটন: ১৯২৫), পৃ ৫৫।

24. *কিতাব আল-উয়ূন*, ৩য় খণ্ড, পৃ ২৭৮-তে বলা হয়েছে, অভিযান চালানো হয় ১৬৩ হিজরি মোতাবেক ৭৮০ খ্রিষ্টাব্দে, ইয়াকূবী, ২য় খণ্ড, পৃ ৪৭৮-৪৮৬-তে বলা হয়েছে ১৬৪ হিজরি সনের কথা। তাবারীর ৩য় খণ্ড, পৃ ৫০৩-৫০৪-তে বলা হয়েছে ১৬৫ হিজরি সনের কথা।

25. ৮১৩ খ্রিষ্টাব্দে থিওফ্যানিস লিখেছেন, হারুন আধুনিক স্কুটারির কাছাকাছি ক্রিসোপোলিস ধরে অগ্রসর হয়েছিলেন।

26. ভাসিলিভে, ১ম খণ্ড, পৃ ২৮৭।

27. আরবীতে বলা হয় নিকফূর। তিনি মূলত আরব বংশোদ্ভূত। সম্ভবত গাস্সানি গোষ্ঠীর জাবালার উত্তরপুরুষ। তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃ ৬৯৫। মাইকেল লেসিরিয়েন; *ক্রনিকল*, সম্পাদনা: জে বি চ্যাবট, ৩য় খণ্ড, (প্যারিস, ১৯০৫) পৃ ১৫।

28. আবু জাফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী, তারীখুত তাবারী, (স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউ ইয়র্ক প্রেস: ১৯৮৯ খ্রি.), ৩য় খণ্ড, পৃ ৬৯৬।

তাদের জর্জরিত করেন।[২৯] খলিফা হারুনের আমলে এই ঘটনাটি আব্বাসীয় রাজশক্তির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি হিসেবে স্বীকৃত রয়েছে। বাইজান্টাইন সম্রাজ্য তৎকালীন উমাইয়া ও আব্বাসীয় উভয় আরব শক্তির জন্যই বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল। ফলে তারা সর্বশক্তি প্রয়োগ করে বাইজান্টাইন করতলগত করতে সক্ষম হয়। এদিকে বাইজান্টাইনরাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পায়। পরিশেষে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করে।

সমকালীন ক্ষুদ্র রাজবংশের সূচনা

প্রচারণা ও শূন্য প্রতিশ্রুতিনির্ভর আব্বাসীয় সাম্রাজ্যেও পায়ের তলায় মাটি ছিল না। অবজ্ঞা করার ফলে আরবগণ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল, নিজেদের ক্ষমতা হারিয়ে সিরিয়াবাসীগণ চরম অসন্তুষ্ট হন, প্রতারণার জন্য শিয়াগণ ক্ষুব্ধ হন, উত্তরাধিকার হারিয়ে পারস্যবাসীগণ ক্ষোভে ফেটে পড়েন, অপমানের জ্বালায় অমুসলিম নাগরিকগণ অসন্তুষ্ট হন, খারেজিগণ প্রায় নাস্তিক হয়ে ওঠেন এবং সর্বদা সরকারি কার্যক্রমের বিরোধিতায় লিপ্ত থাকেন। কিন্তু খলিফাগণ এদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে ক্ষমতার স্বাদ আস্বাদন ও উপভোগে মত্ত হয়ে পড়েন এবং নিজেদেরকে ঘাতক ও দেহরক্ষীদের দ্বারা আবৃত রাখেন।[৩০]

সময় যত গড়াতে থাকে খলিফাগণ ততই নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন। একপর্যায়ে তাঁদের খোরাসানি দেহরক্ষীগণ নিস্তেজ হয়ে পড়েন এবং খলিফাদের প্রতি বিরক্ত হয়ে পদত্যাগ করেন। স্বীয় নিরাপত্তার জন্য খলিফা মুতাসিম বিল্লাহ (৮৩৩-৮৪২) দেহরক্ষী হিসেবে তুর্কিদের আনয়ন করেন। কিন্তু দেহরক্ষী হিসেবে খোরাসানিদের স্থলাভিষিক্ত তুর্কিগণ ভয়াবহ প্রাণীতে পরিণত হয়। কয়েক বছরের মধ্যে তাদের অহরহ ব্যভিচার ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ গোটা বাগদাদে এমন ত্রাসের সৃষ্টি করে যে, খলিফা নিকটবর্তী সামাররায় রাজধানী স্থানান্তর করতে বাধ্য হন। ৫০ বছর অতিক্রম হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত খলিফাগণ আর বাগদাদে ফিরে যাননি।[৩১]

তুর্কিগণ খলিফার দেহরক্ষী হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার কয়েক বছরের মধ্যে তারা রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে কৃতিত্ব ও দক্ষতা দেখাতে সক্ষম হন। ৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তুর্কিগণ নিজেদেরকে এমন শক্তিশালী পর্যায়ে নিয়ে যান যে, তারা খলিফা মুতাওয়াক্কিলকে হত্যা করে তাঁর পুত্রকে সিংহাসনে বসান। তখন থেকে ৯৪১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তুর্কিগণ খলিফাদের মনোনীত ও পদচ্যুত করত এবং সাম্রাজ্যের প্রকৃত শাসক হয়ে উঠত। অবস্থা সে পর্যন্ত গিয়ে গড়িয়েছিল যে, তাদের নেতা আমীর-উল-উমারা তথা প্রধান সেনাপতি উপাধি নিয়ে প্রধান

---

29. তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃ ৭০৯-৭১০; ইয়াকূবী, ২য় খণ্ড, পৃ ৫১৯-৫২৩; দিনাওয়ারি, পৃ ৩৮৬-৩৮৭; মাসউদী, ২য় খণ্ড, পৃ ৩৩৭-৩৫২।
30. ফিলিপ. কে. হিট্টি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১-২৯৩।
31. মাসউদী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ ৩৪০-৩৫২।

উজির হয়ে যান এবং হতভাগ্য খলিফাদেরকে তাঁদের অর্থহীন মর্যাদা নিয়েও থাকতে দেননি। তাঁদের তিনজনকে অন্ধ করে ফেলা হয় এবং তাদেরকে বাগদাদের রাস্তায় ভিক্ষা করতে দেখা যায়। বাগদাদের এই অবস্থায় আঞ্চলিক শাসনকর্তাগণ সাম্রাজ্যের প্রায় সমগ্র অংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গঠন করে রাজধানীর আধিপত্য হতে স্বাধীন হয়ে যায়।[৩২]

পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহ

আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে আব্বাসীয় আধিপত্য থেকে যেসব এলাকা পৃথক হয়ে যায় এদের মধ্যে প্রথম হলো স্পেন। উমাইয়াদের পতনের ছয় বছর পর তাদের এক যুবরাজ আবদুর রহমান সুদূর আন্দালুসিয়ায়/স্পেনে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। ক্ষুদ্র রাজ্য হিসেবে মুসলমানগণ সেখানে ১৬০৯ খ্রিসাব্দ পর্যন্ত বসবাস করেন। অতঃপর তৃতীয় ফিলিপ তাদেরকে সেখান থেকে চিরতরে বহিষ্কার করেন। স্পেনে খেলাফত প্রতিষ্ঠার প্রধান অবদান হচ্ছে, সেখানে মুসলিম দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও স্থাপত্যশিল্পের এক মহাসমাবেশ ঘটে। পরবর্তী সময়ে এখান থেকে তা ইউরোপে প্রবেশের বিরাট সুযোগ লাভ করে।[৩৩]

উত্তর আফ্রিকায় ইমাম হাসানের একজন প্রপৌত্র ইদ্রিস ইব্নে আবদুল্লাহ এক শিয়া বিদ্রোহের মুখে পড়ে সেখান থেকে পলায়ন করে মরক্কের ফেজ নামক স্থানে চলে যান এবং তথায় একটি ক্ষুদ্র রাজ্য গঠন করে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই ক্ষুদ্র রাজ্য ৭৮৮ হতে ৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয় এবং প্রথম মুসলিম রাষ্ট্রের গৌরব অর্জন করে।[৩৪]

পশ্চিমাঞ্চলে আরেকটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন খলিফা হারুন কর্তৃক নিযুক্ত একজন শাসনকর্তা। তাঁর নেতৃত্বে ইব্রাহীম ইব্নে আল-আঘলবের নামানুসারে পরিচিত আঘলবীগণ (৮০০-৮০৯ খ্রি.) এই ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আবার তিউনিসিয়ায় একটি স্বাধীন সুন্নি রাজ্য স্থাপন করেন।

মিশরে আবার দুটি স্বল্প স্থিতিশীল ক্ষুদ্র রাজ্য একের পর এক স্থাপিত হয়। উভয়টিই ছিল তুর্কি নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্র। প্রথমটি তুলুনীয়গণ ৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে একজন ক্রীতদাসের পুত্র আহমদ ইব্নে তুলুনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা করেন। শাসনকর্তাকে সহযোগিতা করার জন্য তাঁকে মিশরে পাঠানো হয়েছিল। তিনি গোলযোগের সুযোগ কাজে লাগিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।[৩৫]

---

32. তাবারী, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ ৬৯৫-৩৯৭।

33. ফিলিপ. কে. হিট্টি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০-২০৫।

34. তাবারী, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৯৬।

35. আবু বকর আহমদ ইবন আলী ইবন সাবেত ইবন আহমাদ ইবন মাহদী আল-খাতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, (বৈরুত: দারুল গারাবিল ইসলামী, ১৪২২ হি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৯।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষুদ্র রাজ্য হলো ফাতেমীয় নামে পরিচিত শিয়া বংশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজ্য। পরবর্তীকালে এই বংশ একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা উবাইদুল্লাহ; যিনি ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে আঘলবীয় বংশের ধ্বংসস্তূপের ওপর নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ইরানের ইসমাঈলী সম্প্রদায়ের নেতা আবদুল্লাহ ইব্নে মাইমুনের বংশধর। মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র মিশনারি শাখা বিস্তারকারী ইসমাঈলী শিয়াগণ তাদের মূলকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য উত্তর আফ্রিকাকে বেছে নেন। ৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ তারা সমগ্র মিশরে আধিপত্য বিস্তার করেন। সেখানে তারা কায়রোকে রাজধানী ঘোষণা করে খেলাফতের দাবি করেন। এভাবে দশম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইসলামে তিনটি প্রতিদ্বন্দ্বী খেলাফতের সৃষ্টি হয়; উমাইয়া, আব্বাসীয় ও ফাতেমীয়।[৩৬]

পূর্বাঞ্চলের ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহ

আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে বাগদাদের কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অনেক পরে শুরু হয়। খোরাসানের এক পারস্য ক্রীতদাসের পুত্র তাহের নামে জনৈক ব্যক্তি প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি খলিফা মামুনের বিশ্বস্ত সেনাপতি ছিলেন।[৩৭]

প্রথম পারস্য রাজ্য হলো ইয়াকুব সাফফার (তাম্রকার) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাফফারীয় রাজত্ব (৮৬৭-৯০৩ খ্রি.)। তার কার্যক্রম সম্পাদনের কেন্দ্রস্থল ছিল পূর্ব ইরানের সিস্তান। তিনি একসময় সমগ্র ইরানের ওপর কর্তৃত্ব করতেন। খলিফা মু'তামিদের (৮০৭-৯০৩ খ্রি.) বিরুদ্ধে তিনিই প্রথম অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি পারস্য সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি সকল সরকারি চিঠিপত্রে পারস্য ভাষা পুঃপ্রতিষ্ঠা করেন।[৩৮]

দ্বিতীয় পারস্য ক্ষুদ্র রাজ্য সামানীয়গণ (৮৭৪-৯৯৯ খ্রি.) প্রতিষ্ঠা করেন। সামান ছিলেন পারস্য অভিজাত বংশের একজন লোক। তাঁর নামানুসারে তাঁর বংশীয় লোকদেরকে সামানীয় বলা হয়। মধ্য ও উত্তর ইরানের এবং ট্রান্স অক্সিয়ানার বিশাল ভূখণ্ডে তাদের আধিপত্য ছিল আর তাদের রাজধানী ছিল বোখারায়।

৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদ অভিমুখে তুর্কিদের ক্ষুদ্র স্রোত বৃহদাকার ধারণ করে এবং শতাব্দীর মধ্যভাগে তাদের কেউ কেউ নিজস্ব রাজত্ব স্থাপন করে। এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো গজনবীয়গণ (৯৬২-১১৮৬ খ্রি.)। এর প্রতিষ্ঠাতা আলপতিগীন সামানীয়দের একজন ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি কালক্রমে আধুনিক আফগানিস্তান ও পাঞ্জাবের এলাকাভুক্ত অঞ্চলে এক রাজত্ব গড়ে তোলেন। গজনবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন মাহমুদ

---

36. মাসউদী, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৮-২৯৯।

37. ইব্নে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আইয়ান ওয়া আনবা আবনাউয যামান*, (বৈরুত: দা'রুস সাদের, ১৯৭২ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৭।

38. খাতীব, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২০।

(৯৯৯-১০৩০ খ্রি.); যিনি সুলতান উপাধি ধারণ করেন। তিনি পশ্চিম ইরান হতে উত্তর ভারত এবং ট্রান্স অক্সিয়ানার সীমান্ত পর্যন্ত সুবিস্তৃত অঞ্চলের সর্বজনস্বীকৃত শাসক ছিলেন। ইরানে রাজ্য প্রতিষ্ঠাকারী অনেক তুর্কি যোদ্ধাদের মধ্যে গজনবিগণ ছিলেন প্রথম। যদিও তারা তুর্কি ছিলেন, কিন্তু কালক্রমে তারা পারস্যবাসী হয়ে যান এবং শিল্পকলা ও সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকে পরিণত হন। বিখ্যাত কবি ফেরদৌসী তার প্রসিদ্ধ *শাহনামা* গ্রন্থ সুলতান মাহমুদের নামে উৎসর্গ করেন।[৩৯]

এ সময়ের খলিফা সুন্নি তুর্কিদের চাইতে পারস্য শিয়াদের হাতে তেমন নিরাপদ ছিলেন না। পারস্য শিয়ারা দৃঢ়-মানব খলিফা মুস্তাকফীকে অন্ধ করে মূ'তিকে (৯৪৬-৯৭৪ খ্রি.) নিযুক্ত করেন। অদৃষ্টের পরিহাস তার নামের অর্থ 'অনুগত'! মূ'তিরা রাষ্ট্রক্ষমতায় এসে শিয়া আচার-আচরণ চালু করেন।

তুর্কিদের এই নতুন দল মধ্য এশিয়ার কিরঘিজ তুর্কিদের গুজ বংশের অর্ন্তভুক্ত। খুব সম্ভব তারা পূর্ববর্তী শতাব্দীগুলোতে মিশনারি দল প্রেরণকারী নেসতোরীয় খ্রিষ্টানদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। তবে মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসে তারা খাঁটি সুন্নি মুসলমান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তাদের যুদ্ধংদেহী ও আগ্রাসী স্বভাব তৎসঙ্গে বিবাদী ক্ষুদ্র রাজ্যগুলার দুর্বলতার সুযোগে তারা দক্ষিণে ও পশ্চিমে রাজ্য বিস্তার করতে সক্ষম হন। ১০৩৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তারা খোরাসান, রায় ও মধ্য ইরান অধিকার করে। ১৮ বছর পর (১০৫৫ খ্রি.) তাদের নেতা তুঘরিল বাগদাদে প্রবেশ করেন এবং খলিফা আল-কাইম (১০৩১-১০৭৫ খ্রি.) কর্তৃক আমির-উল-উমারা নিযুক্ত হন।[৪০]

প্রায় তিন শত বছর স্থায়ী ক্ষুদ্র রাজ্যের যুগ পানে তাকালে দেখা যায়, মূলত বংশগত ও ধর্মীয় কারণে পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। আঘলাবীয় ও তুলনয়ীদের মতো কেউ কেউ নিজস্ব খ্যাতি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাবশত কাজ করে। অপরদিকে অন্যরা প্রধানত ফাতিমীয়গণ ধর্মীয় কারণে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তবে পূর্বাঞ্চলে কোনো ধর্মীয় কারণ বিশেষ ভূমিকা পালন করেনি। সেখানে ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পারস্য পৃষ্ঠপোষকতা। পারস্যবাসীগণ সক্রিয়ভাবেই আরববিদ্বেষী ছিল। ফলে পারস্য আধিপত্য বিস্তার করতে তারা খুবই সচেষ্ট ছিল।[৪১]

বাগদাদ ধ্বংসের পরও আব্বাসীয় বংশ ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত টিকে থাকে। সে সময়ও উসমানীয় সুলতান সেলিম মামলুকদেরকে পরাজিত করে এই প্রহসনের সমাপ্তি ঘটান এবং খলিফাকে বন্দি করেন।[৪২]

---

39. মাসউদী, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩০০-৩০২।

40. ইব্নে খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৯।

41. ফিলিপ. কে. হিট্টি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩-২০৮।

42. আবুল ফারাজ আল-আস্পাহানী, *কিতাবুল আগানী*, (কায়রো: তা. বি) ৯ম খণ্ড, পৃ. ৮৩।

আব্বাসীয় রাজনীতিতে বুদ্ধিজীবী জাগরণ

আব্বাসীয় খলিফা আল-মাহদী এবং আল-রশিদের আমলে মুসলিম বাহিনী কর্তৃক বাইজান্টাইন বাহিনীকে পরাজিত করার ঘটনা নিঃসন্দেহে সে যুগের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সে যুগে বিলাসবহুল জীবনযাপনের ঘটনা ইতিহাসখ্যাত। আর সে যুগেই একদল সেরা বুদ্ধিজীবীর জাগরণ ঘটে। এই বুদ্ধিজীবী জাগরণ বিশ্ব সংস্কৃতির ইতিহাসে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মূলত বিদেশি প্রভাব বিশেষ করে ভারত-পারস্য এবং সিরীয় প্রভাবে এই জাগরণ ঘটে। বিদেশি প্রভাব বলতে গ্রিক প্রভাবই ছিল বেশি। পাশাপাশি সে সময়ে ফারসি, সংস্কৃত, সিরীয় এবং গ্রিক থেকে আরবী অনুবাদকর্মও প্রচুর পরিমাণে হয়েছে। এ ছাড়া আরবীয় মুসলমানদের বিজ্ঞান, দর্শন এবং সাহিত্যচর্চার স্বল্প-বেশি ঐতিহ্য পূর্ব থেকেই ছিল। মরু দেশ থেকে তাঁরা নিয়ে এসেছিলেন বুদ্ধিদীপ্ত আগ্রহ, শেখার অদম্য ইচ্ছা। এর ফলে আরবরা বিজিত দেশের সংস্কৃতিবান জনগণের কাছ থেকেও অনেক কিছু শিখেছে। গ্রিক সভ্যতা থেকে আহরিত জ্ঞানতত্ত্বগুলোর বিকাশে তারা মন দিয়েছে। এভাবে গ্রিক ও পারসি সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হৃদয়ঙ্গম করার ফলে ইসলামধর্মীয় কৃষ্টি-কালচার তারা অনেকটাই হারিয়ে ফেলে। এর ফলে মরুদেশে নতুন হাওয়ার জন্ম হয়; যার নাম আরবীয় জাতীয়তাবাদ। এভাবে মধ্যযুগীয় সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে দক্ষিণ-ইউরোপীয় এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপীয় সভ্যতার মিলন ঘটে। এটা মনে রাখতে হবে যে, এ সংস্কৃতি একটি ধারাতেই বজায় ছিল; যে ধারার উৎস ছিল প্রাচীন মিশরে, ব্যাবিলনে এবং ইহুদি সংস্কৃতিতে। এসব সংস্কৃতিই গ্রিক সংস্কৃতির দিকে ধাবমান হয়ে আবার ইউরোপে হেলেনিজমের আকারে ফিরে আসে।[৪৩]

আরবগণ সিরিয়ার আরাম সভ্যতার উন্নত দিকগুলো যেমন তারা গ্রহণ করেন তেমনি ইরাকে পারস্য সভ্যতার অনুপ্রেরণায় যে সভ্যতা উন্নত হয় তা গ্রহণ করতেও তারা ইতস্তত করেননি। বাগদাদ প্রতিষ্ঠার পরের শতাব্দীর তিন চতুর্থাংশ আরবীভাষী লোকেরা অ্যারিস্টটলের মূল দার্শনিক তত্ত্বগুলো তাদের আয়ত্তেই রেখেছিল। এ ছাড়া নয়া প্লেটোপন্থি মতবাদের লেখকদের নানা লেখা, গ্যালেনের সুবিখ্যাত চিকিৎসাবিষয়ক লেখা এবং ফারসি ও ভারতীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্রও আরবগণ সংগ্রহ করে আত্মস্থ করতে মনোনিবেশ করেন।[৪৪]

বিচারিক এবং প্রশাসনিক পর্যায়ে আব্বাসীয় রাজনীতির প্রভাব

ন্যায়বিচার সব সময়ই মুসলিম সমাজে ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবে দেখা হয়। তাই এই ন্যায়বিচারের দায়িত্ব আব্বাসীয় খলিফারা বা তাঁদের উজিররা অর্পণ করেছিলেন ফকিহ (ধর্মতাত্ত্বিক) সম্প্রদায়ের লোকজনের

43. ফিলিপ. কে. হিট্টি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১।
44. ফিলিপ. কে. হিট্টি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২।

ওপর। এরাই হলেন কাজি।[৪৫] বাগদাদের প্রধান বিচারপতি 'কাজি আল-কুজাত' নামে পরিচিত ছিলেন। বাগদাদের প্রথম 'কাজি আল-কুজাত' ছিলেন খ্যাতনামা ইউসুফ (মৃ. ৭৯৮ খ্রি.)। তিনি খলিফা আল-মাহদী এবং তাঁর দুই পুত্র আল-হাদি ও আল-হারুনের সময়ও প্রধান বিচারপতি ছিলেন।[৪৬]

মুসলিম আইন অনুসারে বিচারককে সব সময় পুরুষ হতে হবে, তাঁকে হতে হবে প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ বিবেকসম্পন্ন, ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী এবং সচ্চরিত্রের অধিকারী মুক্ত নাগরিক। তাঁর দৃষ্টিশক্তি এবং ঘ্রাণশক্তি তীক্ষ্ণ হতে হবে এবং ইসলামি আইনশাস্ত্রে পণ্ডিত হতে হবে।[৪৭] অমুসলিমরা নাগরিক অধিকারের প্রশ্নে নিজস্ব ধর্মীয় প্রধান বা ম্যাজিস্ট্রেটের ইখতিয়ারাধীন ছিলেন।

খলিফা দু-ধরনের বিচারব্যবস্থা সুনির্দিষ্ট করে দেন।[৪৮] তিনি ঠিক করে দেন, একধরনের বিচারব্যবস্থার কর্তৃত্বে থাকবেন সাধারণ বিচারপতি। তাঁর ক্ষমতা হবে অসীম (আম্মাহ মুতলাকাহ)। আর অন্যধরনের বিচারব্যবস্থার কর্তৃত্বে থাকবেন প্রধান বিচারপতি। তাঁর ক্ষমতা হবে সীমিত (খাস্সাহ)। প্রথম শ্রেণির কাজির প্রধান কর্তব্য ছিল মামলার নিষ্পত্তি করা। তিনি অনাথ, উম্মাদ এবং নাবালেগদের অভিভাবক হিসেবে কাজ করতেন। তিনি বিভিন্ন ধরনের বিধি পরিচালনা করতেন। তিনি ধর্মী আইন ভঙ্গকারীদের শাস্তি দেওয়ার অধিকারী ছিলেন। বিচার বিভাগীয় সহকারী (নাইব) নিযুক্ত করার ক্ষমতা ছিল তাঁর। বিভিন্ন প্রদেশে সহকারী বিচারকদেরকে নিয়োগ করা হতো। প্রথম শ্রেণির কাজিরা শুক্রবারে নামাজের ইমামতি করতে পারতেন। প্রাদেশিক রাজ্যপালরাই প্রাদেশিক বিচারপতি নিয়োগ করতেন। কিন্তু মুসলিম শাসনের চতুর্থ শতকে এই বিচারপতিরাই ছিলেন সাধারণভাবে বাগদাদের প্রধান বিচারপতির সহকারী। খলিফা আল-মামুনের আমলে মিশরের বিচারপতির মাসিক সম্মানী ছিল চার হাজার দিরহাম।[৪৯] দ্বিতীয় শ্রেণির বিচারপতির ক্ষমতা ছিল সীমিত। খলিফা বা উজির বা রাজ্যপাল তাদেরকে নিয়োগ দিতেন আর নিয়োগের সময় তাঁদের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে দিতেন।[৫০]

রাজ্যপালের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ

কেন্দ্রীয় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের নিমিত্ত আব্বাসীয় আমলে সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন প্রদেশে ভাগ করে রাজ্যপালের অধীনে দেওয়া হয়। সাবেক বাইজান্টাইন এবং পারস্যের আদলে গঠিত হয়েছিল এই প্রাদেশিক

---

45. কাজি শব্দটিকে ১৩টি ভিন্ন ভঙ্গিতে অনুবাদ করা হয়েছে। সরকারি ব্রিটিশ নথিতে ৬টি ভাষায় উল্লিখিত হয়েছে: Qadi, Qazi, Kazi, Cadi, Al-kali, Kathi.

46. ইব্নে খাল্লিকান, ৩য় খণ্ড, পৃ ৩৩৪; ডি স্লেন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ২৭৩।

47. আবু আল-হাসান মুহাম্মদ ইব্ন হাবিব আল-বাসরী আল-মাওয়ারদি, *উসদাত আকিদাত আহ্ল আল-সুন্নাহ*। সম্পাদনা: ডবলিউ কিউরটন (লণ্ডন, ১৮৪৩ খ্রি.) পৃ ১০৭-১১১।

48. মাওয়ারদি; প্রাগুক্ত, পৃ ১১৭-১২৫।

49. রচার্ড গথেল এবং Revue des etuds ethnogrsphiques (১৯০৮), পৃ ৩৮৫-৩৯৩।

50. মুত্তাওবিয়া, তাবারি, ৩য় খণ্ড, পৃ ১০০৮; ইব্নে খালদুন, তয় খণ্ড, পৃ ২৬০।

ব্যবস্থা। আব্বাসীয় প্রদেশের তালিকা এক এক খলিফার আমলে এক এক রকম ছিল। *আল-ইসতাখরি*, *ইব্নে হাওকাল*, *ইব্নে আল-ফকীহ*সহ অনুরূপ আরও অনেক গ্রন্থ থেকে যেরূপ ভৌগোলিক বিভাজন জানা যায়, আব্বাসীয় আমলে ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক বিভাজন সর্বদা তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। বাগদাদের প্রথম দিকের খলিফাদের নিয়ন্ত্রণে যেসব প্রদেশ ছিল সেগুলো হলো :

১. লিবিয়ান মরুভূমিসহ পশ্চিম আফ্রিকা এবং সিসিলি।

২. মিশর।

৩. সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন; এই দুটি প্রদেশ কিছুকাল বিচ্ছিন্ন ছিল।

৪. আল-হিজাজ এবং আল-ইয়ামামা (মধ্য আরব)।

৫. আল-ইয়ামান বা দক্ষিণ আরব।[৫১]

৬. আল-বাহরাইন ও ওমান। এদের রাজধানী ছিল যথাক্রমে আল-বাসরা ও আল-ইরাক।

৭. আল-সাওয়াদ বা আল-ইরাক; এর বড়ো শহর ছিল ছিল বাগদাদ, কুফা এবং ওয়াসিত।

৮. আল-জাজিরা (এটা ছিল দ্বীপ, বদ্বীপ নয়, প্রাচীন অ্যাসেরিয়ার অন্তর্ভুক্ত)-এর রাজধানী ছিল আল-মাওসিল (মসুল)।

৯. আজারবাইজান; এর বড়ো শহর ছিল আরজাবিল, তিবরিজ এবং মারাগা।

১০. আল-জি-বাল (পাহাড় প্রাচীর মেডিয়া); পরবর্তী সময়ে এই প্রদেশকে বলা হতো আল-ইরাক আল-আজমি।[৫২] এই প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলো ছিল হামদান (প্রাচীন একবাতান), আল-রাজি, ইসবাহান (ইসফাহান, ইসপাহান)।

১১. খুজিস্তান; এর মুখ্য শহর ছিল আল-আহ্ওয়াজ এবং তুসতার[৫৩]

১২. ফারিস; এর রাজধানী ছিল শিরাজ।

১৩. কারমান; এর রাজধানীর নামও কারমান। এখনো এ নামেই পরিচিত।

১৪. মুকরান; যা আধুনিক বেলুচিস্তানের মধ্যে পড়েছে। আজ তা সিন্ধু উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত।

১৫. সিজিস্তান বা সিস্তান; এর রাজধানী ছিল জারান্জ।

১৬. কুহিস্তান।

১৭. কুমিস।

---

51. এই পাঁচটি প্রদেশকে প্রায়শই 'আকালিম আল-মাগরিব' নামে অভিহিত করা হতো। আর 'আকালিম আল-মাশরিক' বলা হতো প্রতীচ্যের প্রদেশগুলোকে।

52. আল-ইরাক আল-আরাবি অর্থাৎ আরবি ইরাক। মেসোপটেমিয়ার অববাহিকা অঞ্চলের বিপরীতে এই শব্দ ব্যবহৃত হতো।

53. পারসিরা বলত 'সুসতার' বা 'শুশতার"।

১৮. তাবারিস্তান।

১৯. জুরজান।

২০. আর্মেনিয়া।

২১. খুরাসান। বর্তমানে এই অংশ উত্তর-পশ্চিম আফগানিস্তান। এর বড়ো বড়ো শহরগুলো ছিল নাইসাবুর, মার্ভ, হিরাত এবং বলখ।

২২. কাওয়ারিজম; এর সাবেক রাজধানী ছিল কথ।

২৩. আল-সুগদ (প্রাচীন সগদিয়ানা)। এর প্রধান দুটি শহর ছিল বুখারা ও মরকন্দ।

২৪. আল-শাশ (আধুনিক তাসকন্দ)।[৫৪] উল্লেখ্য যে, পশ্চিম এশিয়ার তুর্কি গ্রামগুলো ভৌগোলিকভাবে সাবেক আরব প্রদেশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আব্বাসীয় খলিফাগণ তাদের সাম্রাজ্যকে কেন্দ্রীয় শাসনর অধীনে রাখতে জান-প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ফলে বিস্তৃত সাম্রাজ্যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা ছাড়া বিকল্প কোনো পথ ছিল না। এরই ধারাবাহিকতায় স্থানীয় সমস্যা সমাধানে রাজ্যপালই ছিল সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। তত্ত্বগতভাবে উজিরের খেয়ালখুশির ওপরই ছিল রাজ্যপালের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। উজির খলিফার কাছে রাজ্যপালের নাম সুপারিশ করতেন। তাঁর দয়ার ওপরই রাজ্যপাল নিয়োগ করা হতো। যে উজির রাজ্যপাল নিয়োগ করতেন, সে উজির ক্ষমতাচ্যুত হলে রাজ্যপালও ক্ষমতাচ্যুত হতেন। আল-মাওয়ারদি[৫৫] দু-ধরনের রাজ্যপালের কথা বলেছেন। এক. উমারাহ আম্মাহ (সাধারণ আমির)। এই ধরনের রাজ্যপাল সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। সামরিক বিষয়, বিচারপতি নিয়োগ ও তাদের কার্যাবলি তদারকি, কর আরোপ, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার দেখাশোনা, রাষ্ট্রীয় ধর্মের পবিত্রতা রক্ষা, পুলিশ প্রশাসনের কাজ তদারকি, শুক্রবারে জুমার নামাজের পৌরোহিত্য ইত্যাদি সকল কাজের দায়িত্ব ছিল রাজ্যপালের ওপর ন্যস্ত। দুই. উমারাহ খাস্‌সাহ (বিশেষ আমির)। এই ধরনের রাজ্যপালের ক্ষমতা ছিল সীমিত। এরা ছিলেন বিশেষ ধরনের রাজ্যপাল। এই ধরনের রাজ্যপালরা বিচার ও করের ব্যাপারে কোনোরূপ সিদ্ধান্ত দিতে পারতেন না।

কার্যত প্রাদেশিক রাজ্যপালের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেত তার দক্ষতার ওপর নির্ভর করে। যিনি যত দক্ষ হতেন, তিনি তত ক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারতেন। খলিফা দুর্বল হলে এবং রাজধানী থেকে প্রদেশের দূরত্ব বেশি হলে যোগাযোগের অভাবে প্রতিটি প্রদেশের নিজস্ব আয় থেকেই প্রদেশের সব ধরনের ব্যয় নির্বাহ করতে

---

54. লিস্ট্রেঞ্জ; *ইস্টার্ন ক্যালিফেট*। জায়দান; তামাদ্দুন, ২য় খণ্ড, পৃ ৩৪-৪৪। ভনক্রেমার: Culturgeschichte ১ম খণ্ড, পৃ ১৮৪।

55. ফিলিপ. কে. হিট্টি, *আরব জাতির ইতিহাস*, সম্পাদনায়: তন্ময় ভট্টাচার্য (কোলকাতা ২০০৩), পৃ ৪৭-৫৪।

হতো। প্রদেশের ব্যয় নিজস্ব আয় থেকে বেশি হলে কেন্দ্রীয় কোষাগার থেকে সীমিত অনুদান পাওয়া যেত। প্রদেশের বিচারব্যবস্থা সামলাতেন প্রাদেশিক বিচারকরা। তাঁদের সাহায্যে থাকতেন একাধিক সহকারী। প্রদেশের বিভিন্ন মহকুমায় তাদের অফিস/কার্যালয় ছিল।

আব্বাসীয় রাজনীতির সার্বিক মূল্যায়ন

আব্বাসীয় খলিফা আল-সাফফাহ, আল-মানসুর কেউই কুফায় নিরাপদ বোধ করেননি। খলিফা আল-সাফফাহ নিকটবর্তী হাশিমিয়ায় রাজধানী স্থানান্তর করেন এবং খলিফা মানসুর টাইগ্রিস নদীর তীরে বাগদাদ নামক এক ক্ষুদ্র পারস্য গ্রামে রাজধানী স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই নগর অতীব সুন্দর পার্ক, দৃষ্টিনন্দন বাগান, প্রশস্ত রাজপ্রাসাদ, শত-সহস্র মসজিদ ও সরকারি স্নানাগারের জন্য বিখ্যাত ছিল। ক্ষমতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য, অবসর বিনোদন এবং আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা কাহিনির দৃশ্যাবলির কেন্দ্র হিসেবে বাগদাদ সে সময় খ্যাতি অর্জন করে।[৫৬]

রাজ্যের সব রাস্তাঘাট ছিল বাগদাদ অভিমুখী। রাস্তায় রাস্তায় সমসাময়িক বিশ্বের সকল অঞ্চলের লোক দেখা যেত। নগরী ছিল সমৃদ্ধশালী ও দৃষ্টি কাড়ার মতোই সুন্দর। খলিফা ও উজিরগণ নগরীর সৌন্দর্যের জন্য এবং বিলাসবহুল চলাচলের জন্য প্রচুর টাকাপয়সা খরচ করতেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, খলিফা হারুনের স্ত্রী জোবায়দা স্বর্ণের পাত্র ছাড়া খাবার পরিবেশন করতেন না এবং অতি মূল্যবান প্রস্তরখচিত জুতা না হলে তিনি পরিধান করতেন না। একবার মক্কার হজ যাত্রায় তিনি ৩০ লক্ষ দিনার খরচ করেন। পরবর্তী উত্তরাধিকারী মামুন ও তাঁর নববধূ বিবাহের দিন অলংকার খচিত সোনালি সোফায় উপবিষ্ট থাকাকালে এক হাজার মানানসই মুক্তা তাদের ওপর বর্ষণ করা হয়েছিল। একসঙ্গে অনেকগুলো ক্রীতদাসী উপহার দেওয়া এবং খলিফাদের তোষামোদকারীদেরকে সহস্র সহস্র স্বর্ণমুদ্রা উপহার দেওয়া ছিল তাদের নিকট মামুলি ব্যাপার।[৫৭]

[56]. ফিলিপ. কে. হিট্টি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪।

[57]. মুহাম্মদ রেজা-ই-করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮-২৬০।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আব্বাসীয় যুগের সামাজিক অবস্থা

আব্বাসীয় যুগের সামাজিক অবস্থা

প্রাচীন আরবদের সমাজব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল গোত্রপ্রথা। তবে বৈদেশিক প্রভাবের ফলে আব্বাসীয় যুগে এই প্রথা বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়। আব্বাসীয় খলিফাগণ এই প্রথার বাহিরে এসে নিজেদের পরিবারিক সদস্যদের বৈবাহিক বিষয়ে আরবদেরকে বিশেষ মূল্য দিতেন না। ফলে দেখা যায় আব্বাসীয় বংশের অনেক খলিফাই বৈদেশিক নারীর গর্ভজাত ছিলেন।[৫৮] নিম্নে আব্বাসীয় যুগের সামাজিক অবস্থার কতিপয় দিক তুলে ধরা হলো–

০১. বহুবিবাহ ও দাসপ্রথা

যুগ যুগ ধরে চলে আসা আরবদের গোত্রপ্রথাকে রহিত করার জন্য আব্বাসীয় আমলে বহুবিবাহ, উপপত্নী রাখার প্রথা এবং দাসপ্রথা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। এতে আব্বাসীয়দের সাথে অনারবদের রক্তের মিশ্রণ ঘটার সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে নিরঙ্কুশ আরবীয় অভিজাত্য লোপ পেতে থাকে এবং শাসনকার্যে প্রথমে পারস্যদের এরপর তুর্কিদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫৯]

০২. নারী স্বাধীনতা

আব্বাসীয় খেলাফত আমলে নারী সমাজ উমাইয়া যুগের নারীদের মতোই স্বাধীনতা ভোগ করত। সে আমলের প্রথম যুগে শুধু রাজবংশের খায়জুরান, উলাইয়া, জুবাইদা এবং বুরান প্রমুখ নারীরাই যে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল তা নয়, আরবের অনেক সাধারণ নারীও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং পুরুষদের সাথে প্রতিযোগিতায় কবিতা ও সংগীত রচনা করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। আব্বাসীয় খলিফা আল-মুতাসিমের সময় উবায়দা আল-তুনবুরিয়া নামক এক নারী তাঁর সৌন্দর্য এবং সংগীত-প্রীতির জন্য জাতীয় গৌরব অর্জন করেছিলেন।[৬০]

---

58 . মুহাম্মদ রেজা-ই-করিম, আরব জাতির ইতিহাস, (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯) ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ২৬১।

59 . মুহাম্মদ রেজা-ই-করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১।

60 . মুহাম্মদ রেজা-ই-করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২।

০৩. বিলাসপ্রিয়তা

আরব্য উপন্যাসে দেখা যায়, আব্বাসীয় খিলাফতের পতনের যুগে উপপত্নীর সংখ্যাধিক্য, আব্বাসীয়দের বিলাসপ্রিয়তা এবং নারীদের অধঃপতনের সীমা ছাড়িয়ে যায়। সচ্ছল পুরুষদের জন্য ইসলামে বিবাহ একটি অবশ্যপালনীয় ধর্মীয় বিধান। নারীর কর্তব্য হলো স্বামীর সেবা, সন্তানের লালন-পালন এবং অন্য সময় সাংসারিক কাজকর্ম করা। কিন্তু আব্বাসীয় আমলের নারীরা তাঁদের কর্তব্য কাজ বাদ দিয়ে ভোগ-বিলাসিতায় মত্ত হয়ে পড়ে। আর পুরুষরাও এক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল না।[৬১]

০৪. পোশাক-পরিচ্ছেদ

আব্বাসীয় আমলে পুরুষগণ ঢিলা-ঢালা জামা ও পায়জামা পরিধান করতেন। অব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশিদের আমলে প্রধান কাজি আবু ইউসুফের নির্দেশে ধর্মবিদগণ কালো পাগড়ি পরিধান করতেন। সে যুগের প্রেমের কবিতা আলোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রাচীন আরবদের নারী সৌন্দর্যের পোশাক-আশাকের সাথে আধুনিক কালের পোশাক-আশাকের পার্থক্য খুব একটা বেশি লক্ষণীয় নয়।[৬২]

০৫. খাদ্য-পানীয়

আব্বাসীয় আমলে ভাতের চেয়ে রুটিই ছিল উপাদেয় খাদ্য। সমাজে মাদকতাহীন, মিষ্ট, সুগন্ধময় শরবতের প্রচলন ছিল। তৎকালে কফি এবং তামাকের প্রচলন ছিল না। গ্রীষ্মকালে বরফ দিয়ে ঘরকে শীতল করে খানা-পিনার আসর বসানো হতো।[৬৩]

০৬. শিষ্টাচার

নবম-দশম শতাব্দীর জনৈক লেখক[৬৪] তাঁর *কিতাবুল মুওয়াশ্‌সা* নামক গ্রন্থে আব্বাসীয় আমলের ভদ্রলোকদের শিষ্টাচারিতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, তাদের শিষ্টাচারিতার মধ্যে অন্যতম ছিল নম্র ব্যবহার, পৌরুষত্ব, সদ্‌সঙ্গ, কৌতুক না করা, গোপন কথা গোপন রাখা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, মিতভাষণ, স্মিত হাসি, স্বল্প পানাহার, ধীরে ধীরে পানাহার, পেঁয়াজ-রসুন না খাওয়া, জনসমক্ষে কিংবা রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় দাঁত খোঁচাখুঁচি না করা ইত্যাদি।[৬৫]

---

61. মুহাম্মদ রেজা-ই-করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২।
62. মুহাম্মদ রেজা-ই-করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২।
63. মুহাম্মদ রেজা-ই-করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২।
64. আল-তাইয়িব আল-ওয়াশ্‌শা (মৃত্যু ৩২৫ হি./৯৩৭ খ্রি.)
65. মুহাম্মদ রেজা-ই-করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩২।

০৭. মদ্যপান

আব্বাসীয় আমলে মদ্যপান সমাজের প্রায় সকল স্তরেই প্রচলত ছিল। মদ্যপান ইসলামবিরোধী হলেও সরকারিভাবে একে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়নি। তৎকালীন সময়ে মদের প্রশংসায় বিভিন্ন কবিতা রচনা এবং *কিতাবুল আঘানী*তে ও *আরব্য উপন্যাসে* মাতলামির যেসব কাহিনি বর্ণিত হয়েছে, তা হতে আব্বাসীয় যুগে মদ্যপানের বিস্তৃতি এবং পরিমাণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। এই প্রথা পারস্য রাজদরবারে উৎপন্ন হয়ে আব্বাসীয় খলিফাদের দরবারের মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরে প্রসার লাভ করেছিল। অনেকে ধর্মীয় বিধান পালনের নিমিত্ত আঙুর রস ও বাদাম ইত্যাদি হতে উৎপন্ন 'নাবিয' পান করত। ইব্নে খালদুন বলেছেন,[৬৬] আব্বাসীয় খলিফা হারুন এবং মামুন এই নাবিয পান করত।[৬৭]

০৮. আনন্দমেলা

আব্বাসীয় আমল সাময়িক আনন্দমেলা এবং গানের আসরের আয়োজন সমাজে ব্যাপক হারে প্রচলিত ছিল। মূলত মাতাল মেলাই ছিল এর প্রকৃত নাম। আব্বাসীয় যুগের সাহিত্য পাঠে জানা যায়, এসব মেলায় যেসব গায়িকা অংশগ্রহণ করত তাদের গানের প্রভাবে তৎকালীন সমাজের যুবকদের নৈতিক পদস্খলন দেখা দিয়েছিল।[৬৮]

০৯. গোসলখানা

ইতিহাস থেকে জানা যায়, মহানবি হজরত মুহাম্মদ সা.-এর আগমনের পূর্বে আরবদেশে সাধারণের জন্য কোনো গোসলখানা ছিল না। কিন্তু আব্বাসীয় আমলে আমোদ-প্রমোদের সাথে গোসল করার জন্য গোসলখানার আয়োজন ছিল। এসব গোসলখানায় গোসল করা এত জনপ্রিয়তা পেয়েছিল যে, শুধু প্রয়োজনেই নয়; বরং এটি আমোদ-প্রমোদ ও বিলাসিতার বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। বিভিন্ন লেখকের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, এক বাগদাদ নগরীতেই অসংখ্য গোসলখানা বিদ্যমান ছিল। এসব গোসলখানায় ঠান্ডা ও গরম উভয় ধরনের পানিই সরবরাহ করা হতো। গোসলখানাগুলোর মধ্যবর্তী কামরার চার পাশের অংশ দেওয়াল দ্বারা বিভক্ত ছিল। মধ্যবর্তী

---

66. ইব্নে খালদুন। তাঁর পুরো নাম আবু জায়েদ আবদুর রহমান ইব্নে মুহাম্মদ ইব্নে খালদুন আল-হাদরামি। তিনি মে ২৭, ১৩৩২ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ মে মোতাবেক ৭৩২ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪০৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ মার্চ মোতাবেক ৮০৮ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন একজন আরব মুসলিম পণ্ডিত। আধুনিক সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস ও অর্থনীতির জনকদের মধ্যে তিনি অন্যতম বিবেচিত হন। ইব্নে খালদুন তাঁর রচিত বই *মুকাদ্দিমা*-এর জন্য অধিক পরিচিত। এই বই ১৭ শতকের উসমানীয় ইতিহাসবিদ কাতিফ চেলেবি ও মোস্তফা নাইমাকে প্রভাবিত করে। তাঁরা উসমানীয় সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে এই বইয়ের তত্ত্ব ব্যবহার করেন। ১৯ শতকের ইউরোপীয় পণ্ডিতরা এই বইয়ের গুরুত্ব স্বীকার করেন এবং ইব্নে খালদুনকে মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের অন্যতম হিসেবে গণ্য করতেন।

67. মুহাম্মদ রেজা-ই-করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২।

68. মুহাম্মদ রেজা-ই-করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩।

কামরার উপরিভাগে গম্বুজের নিচে ফাঁকা থাকায় বাহির থেকে আলো আসার ব্যবস্থা ছিল। আর গোসলখানার চারপাশের কামরাগুলো সাধারণত আমোদ-প্রমোদের জন্যই ব্যবহার হতো।[৬৯]

১০. খেলাধুলা

আব্বাসীয় আমলে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার আয়োজন ছিল। ঘরোয়া খেলার মধ্যে দাবা ও পাশা খেলাই ছিল প্রধান। খলিফা হারুনই সর্বপ্রথম দাবা খেলার প্রতি জনগণকে উৎসাহিত করেছেন। ফলে দাবা খেলা সে যুগের অভিজাত পরিবারে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। আব্বাসীয় সাম্রাজ্যে শুষ্ক আবহাওয়ার জন্য বহিরাঙ্গনের খেলাগুলো বিশেষভাবে প্রসার লাভ করতে পারেনি। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল, ধনুর্বিদ্যা, পোলো, বল খেলা, তরবারি সঞ্চালন, বর্শা নিক্ষেপ, ঘোড় দৌড় ইত্যাদি। এসব খেলাধুলায় যারা পারদর্শী ছিল তারা খুব সহজে খলিফাদের নৈকট্য লাভে সক্ষম হতো। খলিফাদের অনেকেই ঘোড় দৌড় উপভোগ করতেন।[৭০]

১১. শিকার

প্রাচীনকাল হতেই রাজা-বাদশাদের মধ্যে শিকারযাত্রা প্রচলিত ছিল। আব্বাসীয় খলিফাদের ক্ষেত্রেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল না। পারস্যবাসীদের অনুকরণে বাজপাখির মাধ্যমে শিকার করার বিষয়টি আরবে প্রচলিত হয়েছিল। এই জাতীয় শিকারকার্য এখনো পারস্য, ইরাক এবং সিরিয়ার কিয়দাংশে পরিলক্ষিত হয়। আব্বাসীয় আমলে এই শিকার ও শিকারযাত্রা বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।[৭১]

১২. ভৃত্যদের সামাজিক অবস্থান

আব্বাসীয় আমলে সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে ছিলেন খলিফা, তাঁর পরিবারবর্গ, রাজকর্মচারী হাশেমী বংশের লোক আর সর্বনিম্ন স্তরে ছিলেন ভৃত্য তথা দাসদাসী। ভৃত্যগণ সাধারণত অমুসলিম সম্প্রদায় হতে এবং যুদ্ধের সময় বন্দিদের মধ্য হতে সংগৃহীত হতো। এদের মধ্যে নিগ্রো, তুর্কি এবং শ্বেতবর্ণের ভৃত্য ছিল। শ্বেতবর্ণের ভৃত্যদের মধ্যে গ্রিক, স্লাভ, আর্মেনীয় এবং বার্বাররাই ছিল প্রধান। খোজা ভৃত্যরা হারেমের অভ্যন্তরে থাকত। 'গিলমান' নামে কথিত ভৃত্যরা তাদের প্রভুদের আনন্দ বিনোদনের জন্য আকর্ষণীয় পোশাক ও সুগন্ধি ব্যবহার করত। তৎকালীন আরবী সাহিত্যের বর্ণনায় পাওয়া যায়, এ জাতীয় ভৃত্যদেরকে তাদের প্রভুরা নীতিহীনভাবে ব্যবহার করত। দাসীদের অনেকেই গায়িকা ও উপপত্নী হিসেবে ব্যবহৃত হতো। অনেক দাসী খলিফাদের ওপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হতো। তার প্রমাণ পাওয়া যায়, খলিফা হারুন তাঁর জাজ-উল-খাল নামক

---

[69] . মুহাম্মদ রেজা-ই-করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩।

[70] . মুহাম্মদ রেজা-ই-করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩।

[71]. মুহাম্মদ রেজা-ই-করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩।

এক দাসীর অনুরোধে তার স্বামীকে ফারসের শাসনকর্তা পদে নিযুক্ত করেছিলেন। *আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা* এবং অন্যান্য আরবী উপন্যাস থেকে জানা যায় যে, এ দাসীদের মধ্যে অনেকেই উচ্চ শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান ছিল। আব্বাসীয় খলিফা মুকতাদীরের প্রাসাদে ১১,০০০ খোজা এবং মুতাওয়াক্কিলের প্রাসাদে ৪,০০০ ক্রীতদাস রক্ষিত ছিল। রাজদরবারের এই প্রথা আব্বাসীয় আমলে সমাজের সর্বস্তরে বিস্তৃতি লাভ করেছিল।[৭২]

[72] . মুহাম্মদ রেজা-ই-করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩-২৬৪।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আব্বাসীয় আমলের শিক্ষাব্যবস্থা

শিক্ষাব্যবস্থা

আব্বাসীয় খেলাফত আমলে শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হতো নিজ নিজ বাড়িতে। শিশু যখনই কথা বলতে শিখত তখন তাকে তার বাবা-মা সর্বপ্রথম শেখাত 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, মুহাম্মদ সা. আল্লাহর রাসূল)। যখন তার বয়স ছয় বছর হতো তখন তাকে নিয়মমাফিক নামাজ শিক্ষা দেওয়া হতো। আর সে সময় শুরু হতো তার প্রথাগত শিক্ষা।[৭৩]

প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষালয় ছিল মক্তব। মক্তবের জন্য আলাদা কোনো ঘর ছিল না; বরং মসজিদেরই এক অংশে তা পরিচালিত হতো। কুরআন ছিল মূল পাঠ্যবই। এর ওপর ভিত্তি করেই তাদের পাঠ্যক্রম তৈরি হতো। পড়ার সাথে সাথে লেখা শেখার কাজও শুরু হতো। ১১৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ইব্নে জুবাইর দামেস্ক ভ্রমণের সময় লক্ষ করেছিলেন যে, ছাত্ররা লেখার অনুশীলনের ক্ষেত্রে আয়াতে কুরআনের পরিবর্তে কবিতার লেখা অনুশীলন করত। কারণ, কুরআনে আল্লাহ শব্দটি রয়েছে। এটি লিখে মুছে দিলে তাতে আল্লাহর সম্মানহানি হতে পারে আশঙ্কায় লেখার অনুশীলনে কুরআনের অনুলিপি অনুসরণ করা হতো না।[৭৪] পড়ালেখার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদেরকে আরবী ব্যাকরণ, ধর্মপ্রচারকদের জীবনকাহিনি বিশেষত শেষ নবি হজরত মোহাম্মদ সা. সম্পর্কে হাদিসের কাহিনি, পাটি গণিত ও কবিতা শেখানো হতো।

শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রম থেকে প্রেমের কবিতাগুলো বাদ দেওয়া হতো। গোটা পাঠ্যক্রমজুড়েই মুখস্থ বিদ্যার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হতো। বাগদাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে যোগ্য শিক্ষার্থীরা প্রায়ই পুরস্কার পেত। পুরস্কারস্বরূপ তাদেরকে বাগদাদের রাস্তায় উটের পিঠে চড়িয়ে ঘোরানো হতো এবং সে সময় দর্শকরা তাদেরকে বাদাম ছুড়ে মারত। এমনি এক অনুষ্ঠানের সময় একবার একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। দর্শকদের ছোড়া বাদামের আঘাতে এক কিশোরের চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।[৭৫] এসব শিক্ষার্থীর কেউ যদি কুরআনের একটি অংশ মুখস্থ শোনাতে পারত, পুরস্কার হিসেবে তাকে পুরো দিনের জন্য ছুটি দিয়ে দেওয়া হতো।

---

73. তুলনীয়: ইমাম গাজ্জালী, *ইহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন*, ১ম খণ্ড, পৃ ৮৩।
74. তুলনীয়: ইমাম গাজ্জালী, *ইহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন*, ১ম খণ্ড, পৃ ২৭২।
75. আগানি, প্রাগুক্ত, অষ্টাদশ খণ্ড , পৃ ১০১।

সমসাময়িক যুগে নারীশিক্ষা

আব্বাসীয় আমলে নারীদের বেলায় অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের ধর্মীয় শিক্ষার রেওয়াজ চালু থাকলেও উচ্চ স্তরের শিক্ষা গ্রহণে তাদেরকে উৎসাহ দেওয়া হতো না। মনে করা হতো, নারীদের প্রধান কাজই হলো সাংসারিক কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকা।[৭৬] ধনী পরিবারে মেয়েদের শিক্ষার জন্য গৃহ শিক্ষক নিয়োগ করা হতো। তাঁরা ধনী পরিবারের সন্তানদের ধর্ম, সাহিত্য ও কবিতা রচনার কৌশল শিক্ষা দিতেন। সাধারণত বিদেশি পণ্ডিতদেরকেই গৃহ শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হতো। খলিফা হারুন স্বীয় পুত্র আল-আমিনের গৃহ শিক্ষককে যে নির্দেশনা দিয়েছিলেন তার থেকে জানা যায়, শিক্ষকদের প্রতি দিকনির্দেশনা থাকত এরূপ—"এত কঠোর হবেন না, যাতে তার বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়, আবার এত নরম হবেন না, যাতে সে অলস হয়ে পড়ে এবং অলসতা তার অভ্যাসে পরিণত হয়। স্নেহ ও দয়ার স্পর্শে তাকে সহজ-সরল ও অমায়িক করে গড়ে তুলুন। এতে যদি সে সাড়া না দেয় তাহলে তার প্রতি কঠোরতা আরোপ করতে প্রয়োজনে মারধর করতেও দ্বিধা করবেন না।"[৭৭]

সে আমলের শিক্ষকগণ প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদেরকে বেত্রাঘাত করত। ওপরে বর্ণিত শিক্ষকদের প্রতি দিকনির্দেশনা থেকে জানা যায় যে, শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনে বেত্রাঘাত করার নির্দেশ ছিল। লেখক ইব্নে সীনার লেখা *রিসালাত আল-সিয়াসা* গ্রন্থটিতে 'সন্তান লালন-পালনে পিতা-মাতার ভূমিকা' অধ্যায়ে তিনি বলেছেন, শিক্ষকগণ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে শাসনের বেলায় নিজ হাত ব্যবহার করবে।[৭৮]

সে যুগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে মুয়াল্লিম বলা হতো। আবার ধর্মীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হলে তাদেরকে ফকিহ বলেও ডাকা হতো। তাদের সামাজিক পদমর্যাদা ছিল কিছুটা কম। এ ব্যাপারে একটি কথা চালু ছিল—"যে পুরুষ শিক্ষক, মেষপালক ও মেয়েদের সঙ্গে বেশি থাকে তার কাছ থেকে উপদেশ চেয়ো না।"[৭৯]

খলিফা আল-মামুনের রাজত্বকালে একজন বিচারক জনৈক শিক্ষকের সাক্ষ্যকে সন্তোষজনক বলে গ্রহণ করতে সম্মত হননি। আরবী সাহিত্যে বেশকিছু ছোটো কাহিনি রয়েছে, যেগুলোতে শিক্ষকদেরকে মোটামাথার লোক বলে তুলে ধরা হয়েছে। কাউকে হেয়প্রতিপন্ন করতে সে সময়ের একটি জনপ্রিয় প্রবাদ ছিল, "তুমি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের চেয়েও মূর্খ।"[৮০] তবে উচ্চস্তরের শিক্ষকদের সমাজে যথেষ্ট মর্যাদা ছিল। তাঁরা নিজেরা একটি বোর্ড তৈরি করেছিলেন। যেসব শিক্ষার্থীরা সে বোর্ডের নির্বাচিত পাঠ্যক্রম

---

76. আল্লামা আবুল আব্বাস মুহাম্মদ ইয়াজীদ ওরফে আল-মুবাররাদ, আল-কামিল ফিল্ লোগাহ ওয়াল আদাব, (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১৯৫১ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ ১৫০।

77. মাসউদী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ ৩২১-৩২২; ইব্নে খালদুন, *মুকাদ্দিমা*, পৃ ৪৭৫-৪৭৬।

78. এডওয়ার্ড লুইস মারুফ আল-মাশরিক, ৯ম খণ্ড (১৯০৬), পয়েন্ট ১০৭৪।

79. আবু উসমান আমর ইব্ন বাহর আল-কিনানী আল-বাসরী (ইমাম জাহিয), *আল-বায়ান ওয়াল তাবিইন*, ১ম খণ্ড, পৃ ১৭৩।

80. ইমাম গাজ্জালী, *ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, (আল-কাহেরা, মিশর: মারকাযুল আহরাম লিত-তরজমাহ ওয়ান নাশরে, ১৯৮৮ খ্রি.) ১ম খণ্ড, পৃ ৮-১১।

অনুযায়ী লেখাপড়া করে পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করত তাদেরকে সে বোর্ড থেকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হতো। ১২০৩ খ্রিষ্টাব্দে আল-জারনূজি শিক্ষাবিজ্ঞান সম্পর্কে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাতে তিনি লিখেছেন, "সমাজে শিক্ষকদের সম্পর্কে এমন শ্রদ্ধাবোধ থাকা উচিত, যাতে একজন ছাত্র শিক্ষকতার মহান পেশায় ব্রত হবেন।" তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, "হজরত আলী রা.-এর একটি বাণী হচ্ছে, আমি তার ক্রীতদাস যে আমাকে অন্তত একটি বর্ণ শিখিয়েছে।" শিক্ষা সম্পর্কে আরবী ভাষায় দুই শত প্রবন্ধ রয়েছে; তন্মধ্যে আল-জারনূজির প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য।[৮১] এসব প্রবন্ধের অধিকাংশই এখনও পাণ্ডুলিপি আকারে বিদ্যমান।[৮২]

উচ্চশিক্ষার পরিবেশ

মুসলিম দুনিয়ায় উচ্চশিক্ষার প্রথম উল্লেখযোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হলো 'বায়তুল হিকমাহ'। এটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আব্বাসীয় খলিফ আল-মামুন (৮৩০ খ্রি.)। একটি অনুবাদকেন্দ্র হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি এই প্রতিষ্ঠানটি একটি শিক্ষায়তন ও সর্বজনীন গ্রন্থাগারের ভূমিকা পালন করত। এই প্রতিষ্ঠানটির সাথে একটি পর্যবেক্ষণকেন্দ্রও ছিল। উল্লেখ্য যে, সে সময়ে গড়ে ওঠা পর্যবেক্ষণকেন্দ্রগুলো জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষার বিদ্যালয় হিসেবেও কাজ করত।

আব্বাসীয় আমলেই সর্বপ্রথম হাসপাতাল গড়ে উঠেছিল; যেখানে চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হতো। তবে ইসলামি দুনিয়ায় চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রথম শিক্ষায়তনের নাম ছিল নিজামিয়া শিক্ষাকেন্দ্র।[৮৩] এখানে শিক্ষার্থীদেরকে চিকিৎসাবিদ্যা শেখানোর জন্য মানুষের শরীরের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হতো এবং প্রয়োজনে অস্ত্রপাচার করা হতো। উমর আল-খাইয়ামের পৃষ্ঠপোষকতায় শালিকশাহ ও সালজুক সুলতান আলপ আরসালানের পারসীয় উজির সুশিক্ষিত নিজাম আল-মূলক (১০৬৫-১০৬৭ খ্রি.) নিজামিয়া শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রগুলো এটির অনুসরণেই গড়ে ওঠে।

বুওয়াইহি ও অন্যান্য অনারবীয় সুলতানগণ ইসলামের সর্বময় কর্তৃত্ব দখলে নিয়েছিল। ঠিক তাদের মতো সালজুক সুলতানরাও জনসাধারণের অনুগ্রহ লাভের উদ্দেশ্যে শিল্পকলা ও উচ্চশিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করার ক্ষেত্রে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করতেন। শাফেয়ি মাজহাবের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও নিষ্ঠাবান আশআরি পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে নিজামিয়াকে একটি ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করা হয়।

---

81. *তালীম আল-মুতাআল্লিম ওয়া তারিখ আত-তাআল্লুম*, সি. কারপারি সম্পাদিত, (লিপজিগ, ১৮৩৮), পৃ ১৪১৯; ইমাম গাজ্জালী, *ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, ১ম খণ্ড, পৃ ৮-১১।

82. খলীল এ তোতাহ, *দি কন্ট্রিবিউশন অফ দি আরব্স টু এডুকেশন*, (নিউইর্য়ক ১৯২৬), পৃ ৬৭-৭৬।

83. জালালুদ্দিন সুয়ূতি, *হুস্নুল মুহাদারা ফী তারীখে মিশর ওয়াল কাহেরাহ*, (বৈরুত: দারু এহইয়া আল-কুতুব আল-আরাবিয়্যাহ, ১৯৬৭ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ ১৫৬-১৫৭।

এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কুরআন ও প্রাচীন কবিতা এবং কলাশিক্ষার মূল বুনিয়াদ গড়ে দিয়েছিল। ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ঠিক যে ভূমিকা ছিল ধ্রুপদী সাহিত্যের। শিক্ষার্থীরা নিজামিয়াপ্রতিষ্ঠানে থেকেই লেখাপড়া করত এবং অনেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ বৃত্তি পেত।

উল্লেখ্য যে, ইউরাপের প্রথম দিকের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজামিয়া শিক্ষাকেন্দ্রের বেশ কিছু সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য অনুকরণ করেছিল।[৮৪] ঐ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিজেদের সম্পর্কে এটি আত্মমর্যাদার মনোভাব ছিল। একটি ঘটনা থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। ঘটনাটি হলো—এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এক শিক্ষার্থী ১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দে মারা যায়। কিন্তু তার থাকার ঘরের জন্য কোনো উত্তরসূরি রেখে যাননি।[৮৫] আদালতের এক প্রতিনিধি যখন সে ঘরটি তালাবদ্ধ করতে এসেছিল, তখন তাকে অন্য শিক্ষার্থীদের কাছে যথেষ্ট অপদস্থ হতে হয়েছিল।

নিজামিয়া ছিল রাষ্ট্র কর্তৃত স্বীকৃত একটি ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ইব্নে আল-আসীর সে প্রতিষ্ঠানের একজন অধ্যাপকের নিয়োগসংক্রান্ত বিষয়ে একটি ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, সে অধ্যাপক ঐ প্রতিষ্ঠানের নিয়োগপত্র পেলেও খলিফার সম্মতি না পাওয়ায় শেষপর্যন্ত কাজে যোগ দিতে পারেননি।[৮৬] সাধারণত সে প্রতিষ্ঠানে একবারে একজন অধ্যাপককেই নিয়োগ দেওয়া হতো।[৮৭] অধ্যাপকের নিচে দুই বা ততোধিক সহকারী নিয়োগ করা হতো। তাদের কাজ ছিল ক্লাস শেষ হওয়ার পর অধ্যাপকের বক্তৃতা পুনরায় পাঠ করা এবং কম মেধাবী শিক্ষার্থীদের সেটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়া।[৮৮] একবার ইব্নে জুবাইর জোহরের নামাজের পর প্রথম শ্রেণির একজন অধ্যাপকের বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলেন। অধ্যাপক একটি ছোট্ট মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছিলেন আর শিক্ষার্থীরা বেঞ্চের ওপর বসে বক্তৃতা শুনছিল। মাগরিবের নামাজের পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা তাঁর কাছে লিখিত ও মৌখিক নানা প্রশ্ন করে যাচ্ছিল।[৮৯]

নিজামিয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই ইমাম আল-গাজ্জালী চার বছর (১০৯১-১০৯৫ খ্রি.) অধ্যাপনা করেছিলেন।[৯০] তাঁর লিখিত *ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন* গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায়টিই ছিল শিক্ষাসংক্রান্ত।[৯১] শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য যে জ্ঞানের সঞ্চার করা—এই ধারণার বিরোধিতা করে আল-গাজ্জালী শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক চেতনা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। আর এর মাধ্যমেই ইসলামি দুনিয়ায় নৈতিক চেতনার সঙ্গে

---

84. রুবেন লেভি, *বাগদাদ ক্রোনিকল* (কেমব্রিজ ১৯২৯), পৃ ১৯৩।
85. ইব্নে আল-আসীর, *আল-কামেল ফিত তা'রীখ*, (বৈরুত: দারুল কিতাব আল-আরাবী), ১১ শ খণ্ড, পৃ ১১৫।
86. ইব্নে আল-আসীর, প্রাগুক্ত, ১১ শ খণ্ড, পৃ ১০০।
87. ইব্নে আল-আসীর, প্রাগুক্ত, ১১ শ খণ্ড, পৃ ১২৩।
88. ইব্নে খাল্লিকান, ৩য় খণ্ড, পৃ ৪৩০।
89. প্রাগুক্ত, পৃ ২১৯-২২০।
90. ইব্নে খাল্লিকান, ২য় খণ্ড, পৃ ২৪৬; *আল-মুনকিয মিন আল-জালাল* (কায়রো ১৩২৯)।
91. *আয়্যুহা আল-ওয়ালাদ*, ১ম খণ্ড, পৃ ৪৩-৪৯, সম্পাদনা ও অনুবাদ: হ্যামার-পার্গস্টল (ভিয়েনা ১৮৩৮); ইংরেজি অনুবাদ: জি এইচ শিরার, (বৈরুত ১৯৩৩)।

শিক্ষার একটা গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা সর্বপ্রথম তাঁর লেখার মাধ্যমেই ফুটে উঠেছিল। পরবর্তীকালে নিজামিয়ার বিশিষ্ট শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বাহা উদ্দিন। তিনি ছিলেন সুলতান সালাহ উদ্দিন (সালাদিন)-এর জীবনীকার। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, স্মৃতিশক্তিকে ক্ষুরধার করার জন্য কয়েকজন শিক্ষার্থী এত অতিরিক্ত মাত্রায় কাজুবাদামের নির্যাস পান করেছিল যে, তাদের একজন বোধশক্তি হারিয়ে উলঙ্গ হয়ে শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত হয়েছিল। শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের প্রবল হাসির মধ্যে যখন তার কাছে এই আচরণের কৈফিয়ত তলব করা হয়েছিল, তখন সে শিক্ষার্থী গম্ভীরভাবে উত্তর দিলো, সে এবং তার কয়েকজন সহপাঠী কাজুবাদামের[৯২] শাঁস থেকে তৈরি নির্যাস পান করেছে। ফলে সে বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছে।[৯৩]

১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে হুলাগুরা রাজধানী দখল করা সত্ত্বেও এবং পরবর্তীকালে তাঁতার আগ্রাসনের পরেও আল-নিজামিয়া টিকেছিল। তবে ১৩৯৩ খ্রিষ্টাব্দে তাইমুর ল্যাং (টেমারলেন) বাগদাদ দখল করার দুই বছর পর নিজামিয়া অপেক্ষাকৃত ছোটো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আল-মুস্তানসিরীয়ার সাথে মিলে একাকার হয়ে যায়। সর্বশেষ আব্বাসীয় খলিফার পূর্ববর্তী খলিফা আল-মুস্তানসির চারটি নিষ্ঠাবান মাজহাব বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে শিক্ষাদানের জন্য ১২৩৪ খ্রিষ্টাব্দে এই শিক্ষায়তনটি নির্মাণ করেছিলেন। তাঁরই নামানুসারে শিক্ষায়তনটির নাম হয়েছিল আল-মুস্তানসিরীয়া।[৯৪] শিক্ষাকেন্দ্রটির প্রবেশপথে একটি ঘড়ি (জলঘড়ির আদলে) জুলন্ত ছিল। এ ছাড়া এর অভ্যন্তরে ছিল স্নানঘর, রান্নাঘর, একটি হাসপাতাল ও গ্রন্থাগার। ১৩২৭ খ্রিষ্টাব্দে ইব্‌নে বতুতা বাগদাদ ভ্রমণ করেন। তিনিই ঐ শিক্ষাকেন্দ্রটি সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা পেশ করেন। ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে এই শিক্ষাকেন্দ্রটি পুনর্নির্মিত হয়। আব্বাসীয় শাসনের সময় থেকেই এটি এবং আল-কাস্‌র আল-আব্বাসী (আব্বাসীয় রাজপ্রাসাদ) টিকে আছে। তবে বর্তমানে আল-কাস্‌র আল-আব্বাসীকে একটি মিউজিয়ামে পরিণত করা হয়েছে।

বাগদাদের নিজামিয়া ছাড়াও সালজুকের উজির নাইসাবুরও সাম্রাজ্যের অন্যান্য শহরে অনেকগুলো শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সালাহ উদ্দিনের পূর্বে তিনিই ছিলেন ইসলামি দুনিয়ায় উচ্চ শিক্ষার সবচেয়ে বড়ো পৃষ্ঠপোষক। খুরাসান, ইরাক এবং সিরিয়াতে নিজামিয়া টাইপের অনেকগুলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (মাদ্‌রাসা) স্থাপিত হয়েছিল। পর্যটকদের ভ্রমণকাহিনিতে পাওয়া যায়, মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করা ইসলামে সর্বদাই প্রশংসনীয় কাজ বলে গণ্য হতো বিধায় তৎকালীন অসংখ্য মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার এটিই ছিল মূল কারণ। ইব্‌নে জুবাইরের বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়, বাগদাদে এই ধরনের ৩০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল। সালাহ

---

92. পারসি 'বালাদুর' শব্দ থেকে আরবী 'বালাযূর' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। বলা হয় যে, পারসীয় ঐতিহাসিক আল-বালাযূরী অ্যানাকার্ডিয়ার (কাজুবাদাম)-এর রস পান করে মারা গিয়েছিলেন, সে কারণে তাঁকে এই পদবিতে ভূষিত করা হয়।

93. ইব্‌নে খাল্লিকান, ৩য় খণ্ড, পৃ ৪৩৫-৪৩৬।

94. আবু আল-ফিদা, *তারীখু আবিল ফিদা*, (বৈরুত: দারু এহইয়াহ আল-কুতুব আল-আরাবিয়্যাহ, ১৯৩৩ খ্রি.), ৩য় খণ্ড, পৃ ১৭৯।

উদ্দিনের শাসনামালে দামাস্কাসের তখন স্বর্ণযুগ। সেখানে প্রায় ২০টির মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল। হিম্‌সে ছিল একটি আর মাউসিলে ছিল ছয় বা তার বেশি।[৯৫]

আব্বাসীয় যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা

০১. আইনশাস্ত্র (علم الفقه)

রোমানদের পরে মধ্যযুগে একমাত্র আরবগণই আইনশাস্ত্রের চর্চা করেছিল। গ্রিক ও রোমান আইন দ্বারা প্রভাবিত হলেও মুসলিম আইনশাস্ত্র প্রধানত কুরআন ও হাদিসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামে এই আইন শাস্ত্রকে "ফিকহ" বলা হয়। এতে সামাজিক এবং ধর্মীয় সকল প্রকার বিধি-বিধানই স্থানলাভ করেছে।[৯৬]

কুরআনুল কারিমের প্রায় ছয় হাজার আয়াতের মধ্যে প্রায় দুইশত আয়াত বিশেষ করে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সূরা মুসলিম আইনশাস্ত্রেরই অংশ। কিন্তু পরবর্তীকালে পরিবর্তনশীল সমাজে নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হওয়ায় এবং মুসলিম সমাজ বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে যাওয়ায় এসব বিধি-বিধানের পাশাপাশি উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে ইসলামি আইনশাস্ত্রের মৌলিক গবেষণা আরম্ভ হয়। ইসলামি আইনশাস্ত্রের মৌলিক চিন্তার ভিত্তি ছিল 'ইজমা' (ধর্মবেত্তাদের সম্মিলিত মত) এবং 'কিয়াস' (সাদৃশ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত)। এভাবে কুরআন ও হাদিসের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ইজমা এবং কিয়াস ইসলামি আইনের উৎস হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ইসলামি আইনশাস্ত্রে কুরআন ও হাদিসের সাথে সম্পর্কহীন ব্যক্তিগত মতামতের কোনো স্থান নেই।[৯৭]

আইনের প্রতিষ্ঠানসমূহ

কুরআন ও হাদিসের বিভিন্ন ব্যাখ্যা এবং পরিবর্তনশীল সমাজে নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হওয়ায় এসব সমস্যার সমাধানে প্রায় সাতটি আইনের প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়; তন্মধ্যে চারটি সুন্নিদের আর তিনটি শিয়াদের প্রতিষ্ঠান। নিম্নে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরা হলো—

ক. **হানাফি প্রতিষ্ঠান (সুন্নি) :** এর নামকরণ করা হয় ইমাম আবু হানিফার নামে। তিনি ৬৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ইরানে জন্মগ্রহণ করেন। কর্মজীবনে তিনি একজন কাপড়ের ব্যবসায়ী ছিলেন। পেশাদার ব্যবসায়ী হয়েও তিনি প্রথম শ্রেণির আইনবিদ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।[৯৮] তিনি উমাইয়াদের বিরোধী ছিলেন এবং পরে আব্বাসীয়দেরও বিরোধী হয়ে পড়েন। তাঁকে বন্দি করা হয় এবং ৭৬৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি জেলখানায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি কোনো গ্রন্থ নিজে লিপিবদ্ধ করেননি।

---

95. আবু আল-ফিদা, ৩য় খণ্ড, পৃ ২২৯, ২৫৮, ২৮৩।
96. মুহাম্মদ রেজা-ই-করিম, *আরব জাতির ইতিহাস*, (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯) ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ২৮৮।
97. মুহাম্মদ রেজা-ই-করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮।
98. মুহাম্মদ রেজা-ই-করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮।

তাঁর প্রখ্যাত শিষ্য আবু ইউসুফ *কিতাব-উল-খারাজ* নামক গ্রন্থে নিজের শিক্ষকের প্রধান মতগুলো লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। আইন প্রণয়নে ইমাম আবু হানিফা কিয়াসের ব্যবহার করেছেন। মদিনার ইমাম মালেকের মতো কোনো মাজহাব/মতবাদ গঠনের প্রত্যক্ষ ইচ্ছা না থাকলেও তাঁর মৃত্যুর পর তদীয় মতবাদকে কেন্দ্র করে ইসলামের প্রাচীনতম, বৃহত্তম ও উদারতম হানাফি মতবাদের সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর সুন্নি মুসলমানদের প্রায় অর্ধেকই এই মতবাদভুক্ত। তুরস্ক, ভারত এবং মধ্য-এশিয়া এই মতবাদের আবাসভূমি।[৯৯]

খ. **মালেকি প্রতিষ্ঠান (সুন্নি) :** আইনের এই প্রতিষ্ঠান মদিনার অধিবাসী ইমাম মালেক ইব্নে আনাস (৭১৫-৭৯৫ খ্রি.) প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রচিত *আল-মুয়াত্তা* গ্রন্থটি ইসলামি আইনশাস্ত্রের সর্বপ্রাচীন নিদর্শন। এটি আজও রক্ষিত আছে। প্রায় ১৭০০ বিধান সংবলিত এই বিখ্যাত গ্রন্থে 'ইজমা' ব্যবহারের পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। এই গ্রন্থ মাগরিব ও আন্দালুসিয়া হতে আল-আওজাই এবং আজ-জাহেরী কর্তৃক প্রবর্তিত নীতিগুলোকে অপসারিত করে আজও উত্তর আফ্রিকা এবং পূর্ব আরবে বেঁচে আছে। ইমাম আবু হানিফা এবং মালেকের পরে ইসলামি আইনশাস্ত্র এতই সমৃদ্ধি লাভ করেছিল যে, এটা আরবদের জ্ঞান-সাধনার একমাত্র ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল।[১০০]

গ. **শাফেয়ি প্রতিষ্ঠান (সুন্নি) :** রক্ষণশীল মালেকি এবং উদারপন্থি হানাফিদের মধ্যবর্তী হচ্ছে শাফেয়ি প্রতিষ্ঠান। এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন কুরাইশ বংশোদ্ভূত মুহাম্মদ ইব্নে ইদ্রিস আশ-শাফেয়ি। তিনি কুরাইশ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে মদিনার ইমাম মালেকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষাপ্রাপ্ত হলেও তাঁর কর্মস্থল ছিল বাগদাদ এবং কায়রোতে। তিনি দুই চরমপন্থির মধ্যে একটি যোগসূত্র রক্ষা করেন এবং সকল মাজহাব/মতবাদকে প্রভাবান্বিত করতে সক্ষম হন বলে ধারণা করা হয়। তাঁর প্রবর্তিত মাজহাব মিশরের নিম্নভাগ, পূর্ব আফ্রিকা, ফিলিস্তিন, পশ্চিম ও দক্ষিণ আরব, ভারতের উপকূলীয় অঞ্চল এবং পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ব্যাপক হারে প্রচলিত।[১০১]

ঘ. **হাম্বলি প্রতিষ্ঠান (সুন্নি) :** ইসলামের চতুর্থ মাজহাব/মতবাদের নাম হাম্বলি। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইমাম শাফেয়ির শিষ্য আহমদ বিন হাম্বল। এই হাম্বলি মাজহার সবচেয়ে বেশি কট্টরপন্থি। হাদিসের বাহিরে হাম্বলিগণ ইসলামি আইনশাস্ত্রে কোনো উৎসকে স্বীকার করে না। এই মাজহাবই বাগদাদে মুতাজিলা সম্প্রদায়ের বল্গাহীন চিন্তাধারাকে বাধা প্রদান করেছিল। খলিফা আল-মামুন এবং আল-মুতাসিম কর্তৃক বন্দি হয়েও ইব্নে হাম্বল কখনো তাঁর মতবাদ ত্যাগ করেননি। ইব্নে

---

99. মুহাম্মদ রেজা-ই-করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮।
100. মুহাম্মদ রেজা-ই-করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮।
101. মুহাম্মদ রেজা-ই-করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯।

হাম্বল সে যুগের এক বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারলেও আধুনিক কালে ওহাবিদের বাহিরে এই মতবাদের অনুসারী খুব একটা বেশি চোখে পড়ে না।[১০২]

ঙ. **জাফরি প্রতিষ্ঠান (শিয়া) :** এই প্রতিষ্ঠানটি ইমামি প্রতিষ্ঠান নামেও পরিচিত। এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আইন ও ধর্মব্যবস্থা। এটা ইজমা, কিয়াস ও রায় প্রত্যাখ্যান করে। সুন্নিগণ বিশ্বাস করে যে, তাদের চারটি মাজহাব ইসলামি আইন সম্পর্কে যা যা প্রয়োজন সবই ব্যক্ত করেছে, কাজেই নতুন কোনো মাজহাব/মতবাদের প্রয়োজন নেই। তবে জাফরিগণ বিশ্বাস করেন যে, লুক্কায়িত ইমামই সত্যিকারের রাষ্ট্রপ্রধান। তাঁর অবর্তমানে তিনি তাঁর মুখপাত্রগণের দ্বারা শাসন করেন; যাদেরকে 'মুজতাহিদ' বলা হয়। অর্থাৎ তাঁরা ইমামের আদর্শ ব্যাখ্যাকারী। সাধারণত তিন বা চারজন মুজতাহিদ থাকে। সম্প্রদায়ের সবাই তাঁদেরকে জ্ঞানী, ধার্মিক ও ফতোয়া দেওয়ার অধিকারী বলে মনে করেন এবং স্বীকার করেন। সকল শিয়া দ্বাদশপন্থি এই মতবাদের অনুসারী। শিয়া মতবাদীরা যেহেতু সংখ্যালঘু এবং সুন্নিরা যেহেতু তাদের ওপর প্রায় সময় নির্যাতন চালিয়ে আসছে; সেহেতু ইমামি প্রতিষ্ঠান তাদের অনুসারীদেরকে ধর্মমত লুক্কায়িত রাখতে অনুমতি দান করে। কারণ তারা মনে করে, ধর্মমত প্রকাশ করলে তাদের জীবনাশঙ্কা রয়েছে।

ইমামি প্রতিষ্ঠান বিবাহের ব্যাপারে এই অনুমতি দেয় যে, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সাময়িক আইনানুগ বিবাহ (মুতা বিবাহ) করা যাবে। এই বিবাহে স্বামী-স্ত্রীর মিলনে যে সন্তান জন্ম নেবে তার মালিক হবে পিতা আর এসব সন্তান স্থায়ী বিবাহের সন্তানদের সমান অংশ লাভ করবে না।

চ. **ইসমাইলি প্রতিষ্ঠান (শিয়া) :** ষষ্ঠ ইমামের পুত্র ইসমাইলের নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়। এই প্রতিষ্ঠান ও জাফরিদের মধ্যে পার্থক্য হলো, এতে ইমামের শুধু একজন মুখপাত্র থাকে; যার মধ্যে ইমামের 'আত্মা' বাস করে এবং যার মধ্যে ইমামের আলো বিচ্ছুরিত হয়। ফলে সে নেতার ন্যায় উদার ও রক্ষণশীল। তাদের এই পদটি বংশানুক্রমিক। এর অতি প্রসিদ্ধ নেতা হলেন আগা খান (১৮৭৭-১৯৫৭ খ্রি.)। তিনি তাঁর বংশানুক্রমিক ধারা ইমাম হাসানের সাথে যুক্ত করেন। তিনি তাঁর পৌত্র করিম খানকে নতুন নেতা হিসেবে নিযুক্ত করেন। ইসমাইলিগণ ভারতবর্ষ, ইরান ও পূর্ব আফ্রিকায় ইতঃস্তত ছড়িয়ে আছে।

ছ. **জায়দি প্রতিষ্ঠান (শিয়া) :** চতুর্থ ইমামের পুত্র জায়েদের নামানুসারে এই প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয়। এরা লুক্কায়িত ইমামে বিশ্বাস করে না। এরা সুন্নিদের অতি নিকটবর্তী। ইয়েমেনে এদের সংখ্যাধিক্য বিরাজমান।

---

[102]. মুহাম্মদ রেজা-ই-করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯।

ইসলামি আইনশাস্ত্রে গ্রিক ও রোমান আইনশাস্ত্রের প্রভাব আজ পর্যন্ত কোনো যোগ্য পণ্ডিত আলোচনা করেননি। অথচ ইসলামি আইনশাস্ত্রের সর্বত্রই এই প্রভাব অল্প-বেশি পরিলক্ষিত হয়।[১০৩]

০২. নীতিশাস্ত্র (علم الشريعة)

নীতিশাস্ত্র আইন (শরিয়ত) মুসলিম জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করে এবং মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকসহ সার্বিক জীবনধারাকে পরিচালিত করে। ফলে এই আইনশাস্ত্র থেকেই মুসলিম নীতিশাস্ত্র গড়ে উঠেছে। এই নীতিশাস্ত্র অনুযায়ী মানুষের সকল কার্যক্রমকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে।[১০৪] যেমন :

ক. অবশ্য কর্তব্য (ফরজ) : এসব কাজ পালন করলে ব্যক্তি পুরস্কারপ্রাপ্ত হবে আর অবহেলা করলে তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।

খ. মুস্তাহাব : এসব কাজ পালন করলে ব্যক্তি পুরস্কারপ্রাপ্ত হবে আর না করলে তাকে কোনোরূপ শাস্তি দেওয়া হবে না।

গ. জায়েজ : এসব কাজ হচ্ছে অনুমোদিত কর্তব্য; যা পালন করার অনুমোদন রয়েছে তবে না করলে পুরস্কার বা তিরস্কার কিছুই নেই।

ঘ. মাকরুহ : যেসব কাজ করা অন্যায়, তবে কেউ করলে তজ্জন্য শাস্তি হবে না।

ঙ. হারাম : যেসব কাজ ইসলামি শরিয়তে নিষিদ্ধ। ফলে এসব কাজ করলে শাস্তি ভাগ করতে হবে।

কুরআন ও হাদিসকে ভিত্তি করে নীতিশাস্ত্রের ওপর অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হলেও মানুষের জীবনযাপনের সকল বিধান ও প্রণালি এতে উল্লিখিত হয়নি। উল্লেখযোগ্য যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে তা হচ্ছে, সহিষ্ণুতা, উদারতা, সাহসিকতা ও পারদর্শিতা ইত্যাদি। ইব্নে আল-মুকাফ্ফা কর্তৃক রচিত *আদ-দুররাহ আল-ইয়াতিমাহ* এবং লোকমানের নামে প্রচলিত বহু উপাখ্যান ও প্রবাদে এসব বিষয়র উল্লেখ দেখা যায়। বাগদাদের বিখ্যাত আল-মাওয়ারদীর নীতিশাস্ত্রীয় গ্রন্থে হজরত মুহাম্মদ সা. এবং তাঁর সাহাবিদের অনেক মূল্যবান বাণী উদ্ধৃত হয়েছে। অ্যারিস্টটলের চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত আরও এক প্রকার ইসলামি নীতিশাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল। অ্যারিস্টটলের নীতিশাস্ত্র হুনাইন ও তাঁর পুত্র ইসহাক *কিতাবুল আখলাক* নাম দিয়ে অনুবাদ করেছিলেন। অন্য আরেক প্রকারের নীতিশাস্ত্র যা ছিল বহুলাংশেই আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক। ইমাম আল-

---

103. মুহাম্মদ রেজা-ই-করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯।
104. মুহাম্মদ রেজা-ই-করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯।

গাজ্জালী এবং আরও অনেক সুফি সাধক এই ধারার প্রবর্তক। মুসলিম নীতিশাস্ত্রে প্রতিটি দোষ তিরস্কৃত আর প্রতিটি গুণ প্রশংসিত।[১০৫]

০৩. দর্শনশাস্ত্র (علم الفلسفة)

মানব মনীষার প্রয়োগে বস্তুজগতের সৃষ্টির প্রকৃত কারণ নির্ণয়ই আরব দর্শনশাস্ত্রের প্রধান বিষয়। প্রকৃতপক্ষে, গ্রিক চিন্তাধারা প্রাচ্যের প্রভাবে মুসলিম সাম্রাজ্যের বিদগ্ধ মানুষের মনে পরিশুদ্ধি লাভ করে এবং আরবী ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে এই দর্শনের সৃষ্ট করেছে। আরবদের মতে অ্যারিস্টটল গ্রিক দর্শনশাস্ত্রের এবং গ্যালন গ্রিক চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রতিভূ। মূলত তৎকালে পাশ্চাত্যের চিন্তারাশি বোঝাতে গ্রিকদের দর্শন এবং চিকিৎসাশাস্ত্রই বোঝাত। মুসলমানদের মতে, কুরআন এবং ইসলামি ধর্মতত্ত্বই সকল ধর্মীয় আইনের সমষ্টি। এসব কারণে দর্শন, ধর্মতত্ত্ব এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের ওপরই আরবগণ তাদের মৌলিক চিন্তা আরোপ করেছিল। কালক্রমে তারা ঐশ্বরিক ধর্মের ওপর ভিত্তি করে মৌলিক চিন্তাকে প্রসারিত করেছিলেন। তাঁরাই দার্শনিক আখ্যা লাভ করেছিলেন। আরব দার্শনিকদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন আল-কিন্দি, আল-ফারাবি এবং ইব্নে সিনা।[১০৬]

আল-কিন্দি আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইব্নে ইসহাক নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে কুফায় জন্মগ্রহণ করে বাগদাদে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি 'আরবদের দার্শনিক' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। দর্শন-তত্ত্বের দিক থেকে আরবদের মধ্যে তিনিই অ্যারিস্টটলের একমাত্র শিষ্য। তিনি অ্যারিস্টটল এবং প্লেটোর দর্শনের মধ্যকার মিলন ঘটিয়ে পীথাগোরাসের অঙ্কশাস্ত্রকেই সকল বিজ্ঞানের ভিত্তি বলে মত প্রকাশ করেছেন। আল-কিন্দি একাধারে জ্যোতির্বিদ, রসায়নবিদ, চক্ষু-চিকিৎসাবিদ এবং সংগীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি প্রায় ২৬৫টি পুস্তক রচনা করেছেন বলে জানা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তার অধিকাংশই কালের অতল গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। ইউক্লিডের *অপটিক্স* গ্রন্থের ওপর ভিত্তি করে রচিত তাঁর চক্ষুশাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রাচ্যে এবং পাশ্চাত্যে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এই গ্রন্থটি রজার বেকনকেও প্রভাবিত করেছিল। আল-কিন্দির রচিত গ্রন্থের আরবী মূল্যের চেয়ে এর ল্যাটিন অনুবাদই অধিকসংখ্যক পাওয়া গিয়েছে।[১০৭]

গ্রিক দর্শনের সাথে ইসলামের সমন্বয় প্রচেষ্টার অগ্রদূত আরব দার্শনিক আল-কিন্দির এই প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখেন তুর্কি দার্শনিক আল-ফারাবি এবং এর পূর্ণতা লাভ করে পারসীয় দার্শনিক ইব্নে সিনার হাতে।[১০৮]

---

105. মুহাম্মদ রেজা-ই-করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯-২৯০।
106. মুহাম্মদ রেজা-ই-করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫।
107. মুহাম্মদ রেজা-ই-করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫।
108. মুহাম্মদ রেজা-ই-করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬।

মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন তারখান আবু নাসর আল-ফারাবি ট্র্যান্স অক্সিয়ানায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শিক্ষাজীবনে বাগদাদের এক খ্রিষ্টান চিকিৎসাবিদের নিকট শিক্ষাগ্রহণ করে আলেপ্পোর সাইফ-উদ-দৌলা আল-হামদানীর রাজদরবারে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ৮০ বছর বয়সে ৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি দামেশকে মৃত্যুবরণ করেন। প্লেটো, অ্যারিস্টটল এবং সুফিবাদের মিলন চেষ্টার ওপরই তাঁর দার্শনিক চিন্তা প্রতিষ্ঠিত। এজন্যই তিনি 'আল-মুয়াল্লিমুস সানি' বা দ্বিতীয় শিক্ষক নামে আখ্যায়িত হয়েছিলেন। গ্রিক দার্শনিকদের আলোচনা ছাড়াও তিনি মনস্তত্ত্ব, রাজনীতি এবং দর্শনশাস্ত্রের ওপর অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে *রিসালাত ফুসুস-উল-হিকাম* এবং *রিসালাহ-ফি-আরা-আহ্‌ল-উল-মদিনা উল-ফাযিল'* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত গ্রন্থে তিনি তাঁর আদর্শ নগরীর বর্ণনা দিতে গিয়ে প্লেটোর *রিপাবলিক* এবং অ্যারিস্টটলের *পলিটিক্‌স* গ্রন্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।[১০৯]

আল-ফারাবি ছিলেন একাধারে চিকিৎসাবিদ, অঙ্কবিদ, বৈজ্ঞানিক ও সংগীতজ্ঞ। তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ আরবী সংগীতজ্ঞ বলা হয়। সংগীতের ওপর তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থের নাম *কিতাব-উল-সিকি আল-কবির*। তাঁর সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি বীণা বাজিয়ে শ্রোতাদেরকে হাসাতে, কাঁদাতে এবং ঘুম পাড়াতে পারতেন। তাঁর রচিত ভক্তিমূলক গীত এখনো মাওলাবিয়া[১১০] দরবেশ কর্তৃক গীত হয়।

আল-ফারাবির পরে আরবী সংগীতে ইব্‌নে সিনার অবদানই সবচেয়ে বেশি। অবশ্য দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে আল-ফারাবির নিকট ইব্‌নে সিনা ঋণী। ইব্‌নে খাল্লিকান বলেছেন, দার্শনিক চিন্তায় মুসলমানদের মধ্যে আল-ফারাবির সমকক্ষ আর কেউ নেই। আল-ফারাবির গ্রন্থ অধ্যয়ন করেই ইব্‌নে সিনা এই শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করতে পেরেছিলেন এবং তাঁর মূল্যবান গ্রন্থগুলো রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তারপরও বলা যায়, ইব্‌নে সিনাই গ্রিক দার্শনিক চিন্তার সামগ্রিক রূপের সাথে ইসলামি চিন্তাধারার মিলন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন।[১১১]

০৪. গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্র (علم الحساب والتنظيم)

গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্রের ক্ষেত্রে মুসলমানগণ গ্রিক ও ভারতীয় সূত্র হতে তথ্য আহরণ করে। গণিতশাস্ত্রে মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো আরবী সংখ্যা, যা তারা ভারতীয়দের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করে। অবশ্য এগুলো আয়ত্ত করতে তাদের বেশ সময় লেগেছিল। জ্যোতিষশাস্ত্রে বড়ো বড়ো মনীষীদের মধ্যে

[109]. মুহাম্মদ রেজা-ই-করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬।

[110]. মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমির শিষ্যদেরকে মাওলাবিয়া দরবেশ বলা হয়।

[111]. মুহাম্মদ রেজা-ই-করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫-২৭৬।

উল্লেখযোগ্য হলেন মুহাম্মদ আল-খারাজামি;[১১২] যার গ্রন্থ অনুবাদের মাধ্যমে ইউরোপে আরবী সংখ্যা ও বীজগণিতের প্রবর্তন হয়। গণিতের 'এলগরিজম' নামকরণ হয় তাঁরই নামানুসারে। জ্যোতিষশাস্ত্র ও গণিতশাস্ত্রে আরেকজন পণ্ডিত হলেন আবু রায়হান আল-বেরুনি[১১৩] (৯৭৩-১০৫০ খ্রি.)। তিনি গজনবি রাজ্যের নৃপতিদের জন্য কাজ করতেন। পৃথিবীর নিজস্ব কক্ষপথে আবর্তনের ভিত্তিতে তিনি মধ্যপ্রাচ্যের অনেক শহরের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ নিরূপণ করেন।

দিনপঞ্জি সংস্কারে ওমর খৈয়ামের[১১৪] বিরাট অবদান ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। বাগদাদ ধ্বংসকারী হালাকু খান আজারবাইজানে একটি মানমন্দির নির্মাণ করেন। এখানে প্রসিদ্ধ জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ খোরাসানের নাসির উদ্দিন তুসি জটিল জ্যোতিষশাস্ত্রীয় যন্ত্রসমূহ আবিষ্কার করেন। যেমন : আর্মিলারি চক্র (Armillary Sphere), সরল্লোনিত উচ্চতা পরিমাপক যন্ত্র (Mural Quadrant), অয়ন্তকালীন আর্মিল (Solastitide Armil)। তাঁর জ্যোতিষশাস্ত্রীয় তালিকাসমূহ (Tables) বহু শতাব্দী পর্যন্ত আদর্শ হিসেবে কাজ করে। বিভিন্ন কেন্দ্রে বহু মানমন্দির ছিল। অধিকাংশ মুসলিম জ্যোতিষী সে যুগে ধারণা করেছেন যে, পৃথিবী গোল এবং তারা পৃথিবীর আকার ও ব্যাস পরিমাপ করেছেন; যা পরবর্তী সময়ে নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

মুসলিম পণ্ডিতবর্গ রসায়নবিদ্যা (আল-কিমিয়া), পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা এং উদ্ভিদবিদ্যায়ও খুব উৎসাহী ছিলেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য তাদের ল্যাবরেটরি ছিল। গুরুত্বপূর্ণ রসায়নবিদদের একজন ছিলেন জাবির ইব্নে হাইয়ান। তিনি মধ্যযুগীয় ইউরোপীয়দের নিকট 'গবির' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি পদার্থকে উত্তাপ দ্বারা চূর্ণ ও লঘুকরণের প্রক্রিয়া বর্ণনা করেন। তিনি বাষ্প পরিষ্করণ, তরলকরণ ও বাঁধনের নিয়ম জানতেন। মধ্যযুগীয় মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের নিকট ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকরা ঋণী।[১১৫]

০৫. ভূগোলশাস্ত্র (علم الجغرافية)

বিজয় ও বাণিজ্যের মাধ্যমেই মুসলমানরা পৃথিবী সম্পর্কে অবহিত হয়। আব্বাসীয় যুগে এসে ভূ-পর্যটক, ব্যবসায়ী, বৈজ্ঞানিক ও ভূগোলবিদের উদ্ভব হয়; যারা তাদের পর্যবেক্ষণসমূহ লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। তাঁরা টলেমীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিলেন। কিন্তু ভ্রমণের পর তাঁরা ভিন্নরূপ লক্ষ করেন। ফলে ভারতবর্ষ,

---

112. খারাজাম বর্তমান খিওয়া, আমু দরিয়ার (প্রাচীন অক্সাস নদী) নিম্ন প্রবাহের কাছে অবস্থিত একটি শহর। তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৬৪-তে একে আল-মাজুসি বলা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি এক ম্যাজিয়ানের বংশধ ছিলেন।

113. ইব্নে আবি উসাইবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০-২১; ইব্নে আল-ইবরি, পৃ. ৩২৪-৩২৫। খাওয়ারিজমের রাজধানী কাথের সংলগ্ন নগর বিরুন (পারসীয় ভাষায় বাইরের) থেকে তাঁর পদবিটি এসেছে। যদিও *ইসলামিক কালচার*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (১৯৩২)-এর ১ম পৃষ্ঠায় 'আল-বাইরুনী' কথাটি তাঁর নিজের হাতের লেখা। আবার একই বইয়ের ৫৩৪ পৃষ্ঠায় একই বানান পরিলক্ষিত হয়।

114. আরবী ভাষায় তার পুরো নাম আবু আল-ফাত্হ ওমর ইব্নে ইব্রাহীম আল-খৈয়ামি (তাঁবু প্রস্তুতকারী)। কিফতি, পৃ. ২৪৩-২৪৪; কাজবিনি, আসার, পৃ. ৩১৮।

115. মুহাম্মদ রেজা-ই-করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭।

সিংহল, চীন ও রাশিয়া সম্পর্কে তাঁরা অনেক বৃত্তান্তমূলক উপাদান তৈরি করতে সক্ষম হন। খারাজামী পৃথিবীর একটি মানচিত্র তৈরি করেছিলেন; যা চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত চলমান ছিল।[১১৬]

৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের দিকে ইব্নে খোরদাদবেহ পশ্চিম ইরানের পোস্টমাস্টার ছিলেন। তাঁর পিতা ছিল একজন জরথুস্ত্র। তাঁর রচিত *আল-মাসালিক ওয়া আল-মামালিক*[১১৭] (সড়ক ও দেশসমূহ) নামক গ্রন্থে তিনি অন্যান্য বিষয় আলোচনার পাশাপাশি সে যুগের চারটি প্রধান বাণিজ্যিক পথের বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। প্রথম পথটি স্পেন হতে দক্ষিণ ইউরোপ ও এশিয়া মাইনর হয়ে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত। দ্বিতীয় পথটি সিরিয়া ও ইরানের মধ্য দিয়ে উত্তর আফ্রিকাকে ভারতবর্ষের সাথে সংযুক্ত করেছিল। তৃতীয় পথটি পূর্ব ভূমধ্যসাগরের কোলঘেঁষে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। আর চতুর্থ পথটি একটি সমুদ্রপথ; যা লোহিত সাগর ও ভারত মহাসাগরের মধ্য দিয়ে সিংহল ও চীন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। নবম শতাব্দীতে খোরাসানের বিখ্যাত ইয়াকুবী[১১৮] ৮৯১-৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে *কিতাব আল-বুলদান*[১১৯] (দেশসমূহের গ্রন্থ) নামক একটি পুস্তক রচনা করেন। এ গ্রন্থটিতে তিনি ভূ-সংস্থান ও অর্থনৈতিক ভূগোল নিয়ে আলোচনা করেছেন।

সে যুগের দুজন ভূগোলবিদ ছিলেন পার্সাপালিশের ইসতাখরী (আনুমানিক ৯৫০ খ্রি.) এবং জেরুজালেমের মুজাদ্দাসী (আনুমানিক ৯৮০ খ্রি.)। প্রথমোক্ত ব্যক্তি সম্ভবত পৃথিবীর প্রথম রঙিন মানচিত্র তৈরি করেন। আর শেষোক্ত ব্যক্তি অধিকাংশ মুসলিম বিশ্বে ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ভ্রমণ করতঃ তাঁর মৌলিক ভৌগোলিক পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে সিসিলিতে বসবাসকারী একজন বিখ্যাত ভূগোলবিদ ছিলেন ইদ্রিসী (মৃ. ১১৬৬ খ্রি.) যিনি তাঁর পূর্বের মুসলিম ভূগোলবিদদের অবদানের সারসংক্ষেপ রচনা করেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল পৃথিবী গোলাকার এবং তাঁর তৈরি করা মানচিত্র ছিল অতি নির্ভুল। তাঁর মানচিত্র আধুনিক মানচিত্রের উল্টো। অর্থাৎ উত্তর নিচের দিকে আর দক্ষিণ ওপরের দিকে।[১২০]

০৬. ইতিহাসশাস্ত্র (علم التاريخ)

ইসলাম একটি অহীভিত্তিক ধর্ম। আর অহীর সাথে জড়িত রয়েছে ব্যক্তি, সময়, স্থান ও ঘটনা; যার সবকিছুই ইতিহাসের উপাদান সৃষ্টি করে। অন্যান্য অহীপ্রাপ্ত ধর্মগুলোর ন্যায় ইসলামের ইতিহাস উম্মাহর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত একটি ঐশী পরিকল্পনা। সময় পর্যালোচনা করলে জানা যায়, একদিকে দেশজয়ের ব্যস্ততা আর অপরদিকে কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির অভাবের দরুন আব্বাসীয় যুগ পর্যন্ত ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার

116. মুহাম্মদ রেজা-ই-করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১।
117. দ্য গোজে সম্পাদিত (লিডেন, ১৮৮৯), পৃ. ২৯৩।
118. আল-আব্বাসি, ইয়াকূত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৬-১৫৭।
119. দ্য গোজে সম্পাদিত (লিডেন, ১৮৯২), পৃ. ২৯৪।
120. ফিলিপ. কে. হিট্টি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৬-৩৬৮।

কাজ বলতে গেলে একরকম বন্ধই ছিল বলা যায়। তবে উমাইয়া যুগে ইতিহাস রচনার জন্য বেশ উপাদান তৈরি করা হয়।[১২১]

উল্লেখ্য যে, ইব্নে মুকাফ্ফা কর্তৃক পারস্য নৃপতিদের বিষয়ে লিখিত গ্রন্থের আরবী অনুবাদ ইতিহাস এবং অন্যান্য সাহিত্যকর্মের আদর্শ হয়ে ওঠে। মুসলিম ঐতিহাসিতগণ শুধু বাইবেলের বর্ণনা এবং ইসলামধর্মীয় রাজনৈতিক ঘটনাবলির ওপর আগ্রহী হন। তাঁরা চীন, রোম বা যেসব জাতির কথা বাইবেলের ইতিহাসে উল্লেখ নেই, ওসব দেশের ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন না। তারা হাদিস-বিজ্ঞান শিক্ষালাভের ফলে বক্তার ক্রমধারা হতে সরাসরি উদ্ধৃত বচন নিয়ে ধারাবাহিকভাবে ইতিহাস রচনা করেন।[১২২]

আরব, পারস্যবাসী শিয়া ও সুন্নি ইত্যাকার বিবিধ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন ইতিহাস রচনাকারীর সংখ্যা এত অধিক যে, তা উল্লেখ করার মতো নয়। এদের এক বিরাট অংশ তাঁদের লিখিত পূর্ব ইতিহাসের পনরাবৃত্তি করেছেন; যা সাধারণত আদম আ. হতে শুরু করে লেখকের সময় পর্যন্ত বিস্তৃত। পরবর্তীকালে ক্ষুদ্র রাজ্যের যুগে ইতিহাস রচনা প্রাধান্য লাভ করে; যা ছিল পূর্ববর্তী রীতি ও অভ্যাস থেকে পৃথক।

আরব বিজয়ের বিষয়ে বর্ণনাদানকারী দুজন ঐতিহাসিকের একজন হলেন মিশরীয় ইব্নে আবদ আল-হাকিম (মৃ. ৮৭০ খ্রি.); যিনি মিশর বিজয়ের ইতিহাস বর্ণনা করেন। আর অন্যজন হলেন পারস্যবাসী ইব্নে ইয়াহইয়া আল-বালাজুরী (মৃ. ৮৯২ খ্রি.); যিনি আরব বজয়ের একটি ব্যাপক বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন।[১২৩] আরও দুজন বিশ্ববিখ্যাত ইতিহাস লেখকের মধ্যে একজন হলেন কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ উপকূলের তাবারিস্তান প্রদেশের মুহাম্মদ আল-তাবারি (৮৩৮-৯২৩ খ্রি.); যিনি কুরআনের ওপর একটি আদর্শ আলোচনা ছাড়াও নবি ও রাজন্যবর্গের ইতিহাস রচনা করেন। এই আলোচনায় তিনি তাঁর সংগৃহীত উপাদানগুলো সতর্কতার সাথে বক্তাদের উদ্ধৃত লাইনসহ পৃথিবী সৃষ্টি হতে ৯১৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দক্ষতার সাথে সাজিয়ে পরিবেশন করেছেন। তার এই গ্রন্থ পরবর্তী ঐতিহাসিকদের জন্য আদর্শে পরিণত হয়েছিল।[১২৪]

ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদ হিসেবে খ্যাতি অর্জনকারী আরেকজন হলেন বাগদাদের ভূ-পর্যটক আবুল হাসান আলী আল-মাসউদী (মৃ. ৯৫৬ খ্রি.)।[১২৫] হাতেগোনা কয়েকজনের মধ্যে তিনিও একজন; যিনি বর্ণনানুক্রমিক ধারা হতে পৃথক ইতিহাস রচনা করেন। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *মুরুজ আয-যাহাব ওয়ামাআদিন আল-জাওহার*[১২৬]

---

121. মুহাম্মদ রেজা-ই-করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩।
122. মুহাম্মদ রেজা-ই-করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪।
123. চার্লস সি টোরি সম্পাদিত (নিউ হেভেন, ১৯২২), পৃ. ৩২২।
124. দ্য গোজে সম্পাদনা, ১৫শ খণ্ড (লিডেন, ১৯৭৯-১৯০১), পৃ. ২০৪।
125. আবদুল্লাহ ইব্নে মাসউদ রা. এর বংশধর।
126. সম্পাদনা ও অনুবাদ: ডি মেনার্ড ও ডি কোর্টেইল, ৯ম খণ্ড (প্যারিস, ১৮৬১-১৮৭৭), পৃ. ৫০৪।

(স্বর্ণক্ষেত্র ও মূল্যবান রত্নের খনি) সভ্যতার একটি সমকালীন ইতিহাস। তিনি ভারতীয়, পারস্যবাসী, রোমান ও অন্যান্য পৌত্তলিকদের সম্পর্কে লিখে প্রচলিত রীতিতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। তঁর গ্রন্থটি ছিল ঐতিহাসিক ঘটনাবলিসমৃদ্ধ; যার তথ্যগুলো তিনি পর্যটনের সময় সংগ্রহ করেছিলেন।

০৭. ধর্মতত্ত্ব

আব্বাসীয় যুগে ধর্মতত্ত্বের উচ্চতর প্রতিষ্ঠানে ইলমুল হাদিস বা হাদিসতত্ত্বই ছিল পাঠ্যক্রমের মূলভিত্তি। সে সময়ে মুখস্থ বিদ্যার ওপর খুবই গুরুত্ব দেওয়া হতো। সে সময়ে ডায়েরি বা লিখিত বয়ানের কোনো প্রচলন ছিল না। সে সময়কার খবরের উৎসগুলোকে যদি আমাদের বিশ্বাস করতে হয়, তাহলে মানতে হবে যে, স্মৃতিতে ধরে রাখার ক্ষমতাটি বিস্ময়কর মাত্রায় পৌঁছেছিল। ০৩ লক্ষ হাদিস মুখস্থ করে ইমাম আল-গাজ্জালী 'হুজ্জাতুল ইসলাম' উপাধি পেয়েছিলেন। শোনা যায় ইমাম আহমাদ ইব্নে হাম্বলের ১০ লক্ষ হাদিস মুখস্থ ছিল।[১২৭] একবার এক মজলিসে ইমাম বুখারির পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। তাঁকে এমন ১০০টি হাদিস বলতে বলা হয়েছিল; যার একটিতে বর্ণনাকারীদের ক্রমধারা (সনদ) অপরটির মূল হাদিসের (মতন) সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি তাঁর স্মৃতি থেকে সব কটি হাদিস নিখুঁতভাবে মুখস্থ বলে দিয়েছিলেন।[১২৮] স্মৃতিশক্তি নিয়ে কবিদের সাথে হাদিসবিদদের প্রতিযোগিতা চলত। সে যুগের প্রখ্যাত কবি আল-মুতানাব্বী এক বইবিক্রেতার কাছ থেকে বই ধার নিয়ে একবার পড়ার পর আর বইটি কেনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। কারণ, এর বিষয়বস্তু ইতিমধ্যে তাঁর স্মৃতিতে সংরক্ষিত হয়ে গিয়েছে। আবার কবি আবু তাম্মাম ও আল-মা'আর্রীর বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তির প্রমাণ বহু ছোটো ছোটো ঘটনা থেকে পাওয়া যায়।

আব্বাসীয় আমলে সর্বজনীন শিক্ষার পদক্ষেপ

০১. বয়স্কশিক্ষা

মুসলিম বিশ্বের কোনো স্থানেই বয়স্কশিক্ষার তেমন সুশৃঙ্খল পদ্ধতি চালু ছিল না। তবে সকল মুসলিম অধ্যুষিত শহরের মসজিদগুলো শিক্ষাদানের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করত। যখন একজন দর্শনার্থী কোনো নতুন শহরে আসত, সে এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে মসজিদে যেত যে, সেখানে গেলেই সে মুহাদ্দিসের মুখে হাদিসের দারস শুনতে পাবে। আল-মাকদিসি বলেছেন, তিনি আল-মুসে গিয়ে এই কাজই করেছিলেন।[১২৯] দশম শতাব্দীর এই পর্যটক স্বীয় জন্মস্থান প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, মিশর ও প্যারিসের মসজিদসমূহে মুহাদ্দিস, ফকিহ, ক্বারি ও সাহিত্যিকদের অনেক আলোচনাচক্র কিংবা জনসমাবেশ

127. ইব্নে খাল্লিকান, ১ম খণ্ড, পৃ ২৮।
128. ইব্নে খাল্লিকান, ২য় খণ্ড, পৃ ২৩০-২৩১।
129. ইব্নে খাল্লিকান, ১ম খণ্ড, পৃ ৪১৫।

দেখেছিলেন।[১৩০] আল-ফুস্তাতের মসজিদে অনুষ্ঠিত এমনি একটি মজলিস ইমাম শাফেয়ি পরিচালনা করতেন। ৮২০ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল বেলা এখানে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে তালিম দিতেন।[১৩১]

ইব্নে হাওকাল সিজিস্থানে এরকম একাধিক সমাবেশ লক্ষ করেছেন।[১৩২] এসব সমাবেশে শুধু ধর্মীয় বিষয় নয়, বরং কাব্য ও ভাষাগত বিষয়বস্তু নিয়েও আলোচনা হতো।[১৩৩] মসজিদে এ ধরনের আলোচনা শোনার জন্য যেকোনো মুসলিম সেখানে প্রবেশ করতে পারত। একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এ ধরনের মজলিসগুলো ইসলামি শিক্ষাদানের সম্প্রসারিত বিদ্যাপীঠ হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করেছিল। মসজিদের এ সমাবেশগুলো বিশেষ সাহিত্যিক গোষ্ঠীর কথা মনে করিয়ে দেয়। অভিজাত ও শিক্ষিত পরিবারে এ ধরনের গোষ্ঠীগুলোর আসর বসত। এর নাম ছিল মজলিস-উল-আদব বা সাহিত্যিক বৈঠক।[১৩৪] আব্বাসী আমল থেকেই এ ধরনের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতে থাকে। খলিফার উপস্থিতিতে কবিতা প্রতিযোগিতা, ধর্মীয় বিতর্ক ও সাহিত্য সম্মেলন প্রায় সময়ই অনুষ্ঠিত হতো। খলিফারা এই ধরনের অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

০২. গ্রন্থাগার

আব্বাসীয় আমলে মসজিদগুলো ছিল সংগৃহীত বই দিয়ে সাজানো গ্রন্থাগার। উপহার ও দানের মাধ্যমে প্রাপ্ত বইসামগ্রী দিয়ে মসজিদের গ্রন্থাগারগুলো সাহিত্যসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। ঐতিহাসিক আল-খাতীব আল-বাগদাদী (১০০২-১০৭১ খ্রি.) তাঁর বইগুলোকে মুসলিমদের জন্য ওয়াক্ফ হিসেবে উইল করে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই বইগুলো তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে রাখা হয়েছিল।[১৩৫] সে সময়ে বিশিষ্ট ব্যক্তি বা ধনবান মানুষের উদ্যোগে যেসব আধা-সরকারি ও বেসরকারি গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল, সেগুলো তর্কশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা ও অন্যান্য বিজ্ঞানসংক্রান্ত বইয়ের বিরাট ভান্ডার ছিল।[১৩৬] সে সময়ের গ্রন্থাগারগুলোতে বিশিষ্ট ব্যক্তি ও পণ্ডিত ব্যক্তিসহ সর্বসাধারণের প্রবেশে কোনো বাধা ছিল না। এমনকি ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারগুলোতেও সব ধরনের লোকের প্রবশাধিকার ছিল। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে একজন নগরবাসীর উদ্যোগে আল-মাওসিলে একটি গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল। সেখানে শিক্ষার্থীদেরকে বিনা পয়সায় লেখার কাগজ সরবরাহ করা হতো।[১৩৭] বুওয়াইহী শাসক আয-উদ-দৌলা (৯৭৭-৯৮২ খ্রি.) নিজের উদ্যোগে শিরাজে একটি গ্রন্থাগার (খিজানাত আল-কুতুব) গড়ে তুলেছিলেন, সেখানে বইগুলো বাক্সের মধ্যে সাজিয়ে রাখা হতো।

---

130. মাকদিসি, ১ম খণ্ড, পৃ ১৭৯, ১৮২।
131. ইয়াকূত, *মুজাম আল-উদাবা*, সম্পাদনা: মা গোলিয়থ, (লিডন ১৯০৭), ৬ষঠ খণ্ড, পৃ ৩৮৩; সুয়ূতি, হুসন, ১ম খণ্ড, পৃ ১৩৬।
132. ইয়াকূত, *উদাবা*, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ ৩১৭।
133. ইয়াকূত, *উদাবা*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ১৩৫; ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ ৪৩২।
134. আগানি, প্রাগুক্ত, ১৮তম খণ্ড, পৃ ১০১।
135. ইয়াকূত, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ ২৫২; ৪র্থ খণ্ড, পৃ ২৮৭।
136. ইয়াকূত, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ ৪৪৬।
137. ইয়াকূত, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ ৪২০।

বইগুলোর একটি তালিকা ছিল। এটি পরিচালনা করার জন্য একজন লোককে স্থায়ীভাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।[১৩৮]

সে সময়ে আল-বাসরাতে একটি গ্রন্থাগার ছিল। গ্রন্থাগারে এসে যেসব পণ্ডিতগণ জ্ঞানচর্চা করতেন, তাদেরকে গ্রন্থাগারের মালিক নিয়মিত অনুদান দিতেন।[১৩৯] আল-রায়িতেও একটি গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল। চারশোরও বেশি উট বোঝাই করা যায় এমন বিপুলসংখ্যক পাণ্ডুলিপি সেখানে মজুত ছিল আর সেগুলোকে ১০টি খণ্ডে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল।[১৪০] সেকালে বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও বিতর্ক করার উদ্দেশ্যে সমবেত হওয়ার উপযুক্ত স্থান ছিল গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারগুলো এতই সমৃদ্ধ ছিল যে, মার্ভ ও খাওয়ারিজমের গ্রন্থাগার থেকে ইয়াকূত সুদীর্ঘ তিন বছর ধরে তাঁর ভূগোল অভিধানের জন্য তথ্য সংগ্রহ করছিলেন। চিঙ্গিস খানের নেতৃত্বে মোঙ্গলরা আব্বাসীয় সাম্রাজ্য দখল করার পর তারা গ্রন্থাগারগুলো পুড়িয়ে দেয়।

০৩. বইয়ের দোকান

আব্বাসীয় আমলেই ব্যবসা ও শিক্ষাসংস্থা হিসেবে প্রথম বইয়ের দোকান চালু হয়। আল-ইয়াকূবী উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর আমলেই (৮৯১ খ্রি.) রাজধানীর একটি রাস্তাতে একশোরও বেশি বইয়ের দোকান গড়ে উঠেছিল।[১৪১] কায়রো ও দামেস্কের মতো অনেক বইয়ের দোকানই মসজিদ পরিচালিত ছোটো ছোটো বই বিক্রির কেন্দ্র হিসেবে চালু হয়েছিল। কিন্তু অনেকগুলো বইয়ের দোকান ছিল খুবই বড়ো। সেগুলো বই পাগল ও বইপড়ুয়া লোকদের পড়াশোনার কেন্দ্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত।

বই বিক্রেতারা ছিলেন হস্তাক্ষরবিদ, অনুলিপিকার ও পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁদের দোকানগুলো যে শুধু বই বিক্রি ও বই তৈরির কেন্দ্র ছিল তা নয়, বরং সেগুলো ছিল সাহিত্য আলোচনার জীবন্ত কেন্দ্র। সমাজে এই বইবিক্রেতাদের যথেষ্ট মর্যাদা ছিল। ইয়াকূত নিজে বইবিক্রেতার কেরানি হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। আল-নাদীম (মৃ. ৯৫৫ খ্রি.) পরিচিত ছিলেন আল-ওয়াররাক (লেখার দ্রব্যবিক্রেতা) নামেও। তিনি নিজে একজন গ্রন্থাগারিক ও বইবিক্রেতা ছিলেন। মূলত এর ফলেই তালিকাবিষয়ক তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য পুস্তক *আল-ফিহরিস্ত* আমাদের হস্তগত হয়েছে।

এ ছাড়া আমরা ইরাকের এক বিখ্যাত বইপড়ুয়ার কথা জানতে পারি। তাঁর একটি বিরাট সিন্দুক পাণ্ডুলিপিতে ভর্তি ছিল। আর এই পাণ্ডুলিপিগুলো পশুর চামড়া, মিশরীয় নলখাগড়া, চীনা কাগজ ও চামড়ার পাকানো কাগজে লিপিবদ্ধ ছিল। প্রতিটি পাণ্ডুলিপিতেই লেখকের নাম লেখা ছিল। এ ছাড়াও পাঁচ-ছয় প্রজন্মের পণ্ডিত

---

138. মাকদিসি, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৪৯; ইয়াকূত, ৫ম খণ্ড, পৃ ৪৪৬।
139. মাকদিসি, প্রাগুক্ত, পৃ ৪১৩।
140. ইয়াকূত, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ ৩১৫।
141. ইয়াকূত, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ ২৪৫।

ব্যক্তিরা পাণ্ডুলিপির বিষয়বস্তু সম্পর্কে যে টীকাগুলো উল্লেখ করেছেন, সেখানে সে টীকাগুলোরও উল্লেখ ছিল।[১৪২]

সে সময়কার কাগজ

৩য় মুসলিম শতাব্দী পর্যন্ত লেখার সাধারণ উপাদান ছিল পশুর চামড়া ও মিশরের নলখাগড়া। পশুর চামড়ার ওপর লিখিত কয়েকটি সরকারি দলীল খলিফা আল-আমীন ও আল-মামুনের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সময় লুণ্ঠন হয়ে যায়।[১৪৩] তৃতীয় শতাব্দীর শুরুতে ইরাকে চীনের কাগজ আমদানি শুরু হয়। পাশাপাশি তারা কাগজ তৈরির কাজও শুরু করে দেয়। সমরকন্দে কিছু চীনদেশীয় বন্দি ৭৫১ খ্রিষ্টাব্দে কাগজ তৈরি করতে শুরু করে।[১৪৪] কাগজকে প্রাচীন আরবীয় ভাষায় 'কাগায' বলা হয়। সম্ভবত শব্দটি চীনা ভাষা থেকে পারসীয় ভাষার মাধ্যমে আরবীতে অন্তর্ভুক্ত হয়। সমরকন্দের পর ইরাকেও কাগজ তৈরি শুরু হয়। ৭৯৪ খ্রিষ্টাব্দে খুরাসানে অধিষ্ঠিত বার্মাকি গভর্নর আল-ফজল ইব্নে ইয়াহইয়ার নির্দেশে বাগদাদে প্রথম কাগজের কল তৈরি হয়।[১৪৫] তাঁর ভাই ও খলিফা হারুনের উজির জাফর সরকারি অফিসগুলোতে পশুর চামড়ার পরিবর্তে কাগজ ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন।[১৪৬] সমরকন্দের কাগজকলের অনুকরণে অন্যান্য মুসলিম শহরেও কাগজকল চালু হয়। আল-মাকদিসির সময়েও সমরকন্দের কাগজই ছিল সবচেয়ে সেরা কাগজ।[১৪৭] কিন্তু একাদশ শতাব্দীতে ত্রিপোলির মতো সিরিয়ার শহরগুলোতে আরও উন্নত মানের কাগজ তৈরি হতে থাকে।[১৪৮] নবম শতাব্দীর শেষ দিকে পশ্চিম এশিয়া থেকে মিশরের বদ্বীপ অঞ্চলে কাগজ শিল্প ছড়িয়ে পড়ে। এখানকার অনেকগুলো শহর দীর্ঘদিন ধরে গ্রিকভাষী দেশগুলোতে কারাতীস নামের প্যাপিরাস জাতীয় কাগজ রপ্তানি করত।[১৪৯] দশম শতাব্দীর শেষ দিকে গোটা মুসলিম দুনিয়াতেই প্যাপিরাস ও পার্চমেন্টের পরিবর্তে কাগজের ব্যবহার শুরু হয়

---

142. ইয়াকূত, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ ৪০।
143. ফিহরিস্ত, প্রাগুক্ত, পৃ ২১।
144. ডব্লিউ বার্টহোল্ড, *তুর্কিস্থান ডাউন টু দি মোঙ্গল ইন-ভেসন*, ২য় সংস্করণ (অক্সফোর্ড ১৯২৮), পৃ ২৩৬-২৩৭; তুলনীয়: *ফিহরিস্ত*, পৃ ২১।
145. ইব্নে খালদুন, *মুকাদ্দিমা*, আল-কালকাশান্দি, সুব্হ আল-আশা, ৪র্থ খণ্ড, (কায়রো ১৯১৪), পৃ ৩৫২।
146. মাকরিজি, খিতাত, সম্পাদনা: উইয়েট, ২য় খণ্ড, পৃ ৩৪; তুলনীয় কালকাশন্দি, ২য় খণ্ড, পৃ ৪৭৫-৪৭৬।
147. *ফিহরিস্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ ৩২৬।
148. নাসির-ই-খসরু, *সেদের নামেহ*, সম্পাদনা ও অনুবাদ: চার্লস, স্কিফার (প্যারিস ১৮৮১), মূল পাঠ্যাংশ, পৃ ১২, অনুবাদ: পৃ ৪১।
149. গ্রিক ভাষা কার্তেস থেকে আগত আরবী, একবচনে কিরতাস, ইয়াকূবী, পৃ ৩৩৮; কালকাশন্দি, ২য় খণ্ড, পৃ ৪৭৪, হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থেও পৃ ৩৪৭।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আব্বাসীয় আমলের সাংস্কৃতিক অবস্থা

আব্বাসীয় সমাজে কতিপয় উচ্চশিক্ষিত লোক বিদ্যমান থাকলেও সমাজের সামগ্রিক সংস্কৃতিমান কতটা উন্নত ছিল, তা বলা অনেকটাই মুশকিল। তবুও প্রচলিত বহু কাহিনি থেকে কিছুটা ধারণা করা যায়।[১৫০] ইয়াকুত বলেছেন, বাগদাদের কোনো এক দরিদ্র ব্যক্তি তার কন্যার চরম অসুস্থতার সময়ও পুস্তক বিক্রি করতে সম্মত হয়নি।[১৫১] মানুষের মেধা ও বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে সেকালে সাধারণ লোকদের ধারণা ছিল : মানুষের মেধা দুই ধরনের। এক. সহজাত, দুই. অর্জিত। আল্লাহ তায়ালা এই মেধাকে হৃৎপিণ্ডে স্থান দিয়েছেন। এখান থেকে এটা মস্তিষ্কে আরোহণ করে।

আরবদের সাংস্কৃতিক দিক বিবেচনা করলে বলা যায় যে, ফারটাইল ক্রিসেন্ট ও ইরানে আরব বিজয় ছিল বাইজান্টাইন ও পারস্য সাম্রাজ্যদ্বয়ের অগ্রগামী সভ্যতাগুলোর ওপর অসভ্যতার আক্রমণ। এ পর্যন্ত জারিকৃত এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের চারটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যুগের উল্লেখ করা যায়।

০১. **নেতৃস্থানীয় খলিফাদের যুগ :** এ যুগের প্রধান কার্যক্রম ছিল সামরিক বিজয়গুলোর স্থিতিশীলতা আনয়ন করা এবং মরুভূমি হতে আমদানিকৃত সরল ধর্ম প্রচার করা।

০২. **উমাইয়া যুগ :** এই যুগটি ছিল প্রাচীন বেদুইন সংস্কৃতিঘেঁষা এবং গৃহযুদ্ধে ভারাক্রান্ত। তা সত্ত্বেও এটা ধর্মকে বাইজান্টাইন এবং পারস্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে আনয়ন করে এবং ইসলামি সম্প্রদায়ের মনে ধর্ম ও আচারসম্পর্কিত অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করে।

০৩. **আব্বাসীয়দের প্রাথমিক যুগ :** এই যুগে অনৈসলামিক বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখালেখি সংগ্রহ করা হয় এবং সুশৃঙ্খলভাবে আরবীতে অনুবাদ করা হয়।

০৪. **আব্বাসীয়দের আমলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উত্থানের সময় সৃজনশীলতার যুগ :** এই যুগে মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদ, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও অন্য পণ্ডিতরা তাদের করায়ত্ত জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে মৌলিক গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেন।

মহিলা-পুরুষদের গার্হস্থ্য জীবন

আব্বাসীয় মহিলাগণ উমাইয়া মহিলাদের মতোই ব্যাপক স্বাধীনতা ভোগ করতেন। তবে দশম শতকের শেষার্ধে বুওয়াইহিদদের আমলে নারী-পুরুষের মধ্যে কঠোর বিভাজন রাখার নিয়ম তৈরি হয়। তৎকালীন উচ্চ মহলের মহিলাদের উঁচুপদে থেকে প্রভূত ক্ষমতা করায়ত্ত করার কথা জানা যায়। প্রশাসনে তাদের

---

150. মুহাম্মদ রেজা-ই-করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫-২৯৬।

151. ইয়াকূত, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ ৩৮-৩৯।

দাপট ছিল সর্বজনবিদিত। খলিফা মাহদীর স্ত্রী এবং খলিফা রশিদের মা এমনই মহিলা ছিলেন। খলিফা মাহদীর কন্যা উলাইয়া, খলিফা রশিদের স্ত্রী, খলিফা আল-আমিনের মা যুবাইদা এবং খলিফা আল-মামুনের স্ত্রী বুরান; এরা সবাই যুদ্ধে অংশগ্রহণপূর্বক সৈন্যবাহিনী পরিচালনা থেকে শুরু করে কবিতা লেখা এবং সাহিত্যক্ষেত্রে পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া পর্যন্ত কোনো কাজেই তাদের অনপুস্থিতি ছিল না। সংগীত প্রতিভা এবং বাগ্মিতায়ও তারা এগিয়ে ছিলেন। এমনই একজন ছিলেন উবাইদা আল-তুনবুরিয়া। তিনি খলিফা মুতাসিমের আমলে সুন্দরী, গায়িকা এবং সংগীতজ্ঞ হিসেবে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।[১৫২]

সে সময়কার অনেক মহিলারা সেলাই বা তাঁত বোনার কাজ করতেন। খলিফা রশিদের সৎবোন উলাইয়া সেকালের মহিলাদের মাথায় পরার জন্য অনেকটা গম্বুজের আদলে টুপির মতো একধরনের পোশাক চালু করেন। তার নিচের দিকে থাকত একটি টিকলি; যাতে স্বর্ণ লাগানো হতো। এ ছাড়া তখনকার মেয়েরা পায়ে নূপুর এবং হাতে ব্রেসলেট পরতেন।

পুরুষেরা নানা রকম পোশাক পরিধান করতেন। বেশির ভাগ পুরুষই কালো চুড়াওয়ালা টুপি পরিধান করতেন। একে বলা হতো 'কালানসুওয়া'। এটা সাধারণত উল বা পশম দিয়ে তৈরি করা হতো। খলিফা মানসুর এই টুপি চালু করেন।[১৫৩] ভদ্র পুরুষমাত্রই পরিধান করতেন পারসি আদলের ঢোলা ট্রাউজার (সারাবিল),[১৫৪] শার্ট, গেঞ্জি, জ্যাকেট (কাফতান) ও জুব্বা।[১৫৫] খলিফা হারুনের সময়কার বিখ্যাত বিচারক আবু ইউসুফের নির্দেশক্রমে ধর্মপ্রচারকগণ মাথায় কালো পাগড়ি এবং লম্বা ঢিলা আঙরাখা (তায়লাসান) পরতেন।[১৫৬]

সে যুগের কবিগণ নারীর সৌন্দর্য নিয়ে কবিতা রচনার ক্ষেত্রে সাবেক আরবীয় আদর্শ থেকে তেমন একটা বের হয়ে আসতে পারেনি। বিশিষ্ট কবি আল-নুওয়াইরি তাঁর রচনাবলির বৃহৎ অংশজুড়েই মহিলাদের দেহের সৌন্দর্য বর্ণনা করে গেছেন।[১৫৭]

সেকালে বাড়ি-ঘরে বসার জন্য সোফা (দিওয়ান)-এর প্রচলন বেশি ছিল। যেকোনো কক্ষের তিন দিকে তিনটি সোফা থাকত। পূর্বতন রাজবংশের আমলে একধরনের আরামকেদারা ব্যবহার করা হতো; যার বসার আসনগুলো ছিল উঁচু। এ ছাড়া মেঝেতে ছোট্ট চারচৌকো মাদুরের ওপর কুশন চাপিয়ে বসার ব্যবস্থা ছিল। পুরো মেঝেজুড়ে হাতে বোনা কার্পেট লাগানো থাকত। সোফার সামনে নিচু টেবিলে বড়ো গোলাকার

---

152. আগানি, প্রাগুক্ত, ১৯তম খণ্ড, পৃ ১৩৪-১৩৭।
153. ঐতিহাসিক পি.কে হিট্টির মূল ইংরেজি গ্রন্থ, পৃ ২৯৪।
154. জাহিয, বায়ান, ৩য় খণ্ড, পৃ ৯; আর পি ডোজি, ডিক্সনারি ডিটেল দাস ও নমসম দাস ভেটিমেন্টস (আমস্টার্ডাম ১৮৪৫), পৃ ২০৩ ২০৪।
155. আর পি ডোজি, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬২-১৬৩।
156. ইবনে খাল্লিকান, ৩য় খণ্ড, পৃ ৩৩৪; দ্য স্লেন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ২৭৩; আগানি, ৫ম খণ্ড, পৃ ১০৯।
157. *নিহায়া*, ২য় খণ্ড, পৃ ১৮; ইবনে কায়্যিম আল-জাওযীয়া, *আখবার আন-নিসা*, (কায়রো ১৩১৯), পৃ ১১৯।

তামার তৈরি ট্রে-তে করে অতিথিদের খাবার দেওয়া হতো। আর্থিকভাবে সচ্ছল লোকদের বাড়িতে রুপার তৈরি ট্রে থাকত। টেবিল সাজানো হতো আবলুস কাঠ, কচ্ছপের খোল এবং মুক্তো দিয়ে।

তারা সেসময়ে নামিদামি খাবার খেত। দামি খাবারের খোঁজে তারা বিশ্বের সেরা খাদ্যরীতির আমদানি করেছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল পারসি খাবার স্টু, সিকবাজ এবং মিষ্টান্ন ফালুযাজ। গ্রীষ্মকালে ঘর ঠান্ডা করা হতো বরফের সাহায্যে।[১৫৮] শরবত হিসেবে সুরা জাতীয় পানীয় পান করতেন। স্বাদের জন্য শরবতের সাথে চিনি মেশানো হতো। আর তাতে সুগন্ধি আনয়ন করা হতো কলা, গোলাপফল, ভায়োলেট ফুল ও তুঁতফুলের নির্যাস দিয়ে। পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত কফি পানের তেমন প্রচলন ছিল না।

তৎকালীন সময়ে ভদ্রলোক চিহ্নিত করা হতো কতিপয় বৈশিষ্ট্য দিয়ে। আর তা হলো :

১. যার আচার-আচরণ নম্র প্রকৃতির

২. যিনি পুরুষালি সংস্কৃতির বাহক

৩. যার ব্যবহার মানুষের সাথে সৎ

৪. যিনি অযথা কৌতুক করবেন না

৫. যার বন্ধুত্বের পরিমণ্ডল হবে ক্ষুদ্র তবে বাছাই করা

৬. যার নজর থাকবে উঁচু

৭. যিনি কথা দিয়ে কথা রাখেন

৮. যিনি গোপনীয়তা রক্ষার ক্ষেত্রে ভুল করেন না

৯. যিনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করবেন

১০. যিনি অতি ভোজনপ্রিয় হবেন না

১১. যিনি খাবার টেবিলে কথা বলবেন না আর বললেও সামান্য বলবেন এবং কম হাসবেন

১২. যিনি খাবার খাওয়ার সময় আস্তে আস্তে চিবিয়ে খাবেন

১৩. যিনি খেতে খেতে আঙুল চাটবেন না

---

158. ইব্নে আবি উসাইবিয়া, *উয়ূন আল-আসবা ফি তাবাকাত আল-আতিব্বা*, সম্পাদনা: এ ম্যুলার (কায়রো ১৮৮২), ১ম খণ্ড, পৃ ১৩৯-১৪০।

১৪. যিনি রসুন-পেঁয়াজ খাবেন না

১৫. খাবার খেয়ে মুখ ধোয়ার পর কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাবেন না

১৬. শুধু মুখ ধোয়ার পরেই নয়; বরং স্নানঘরে, জনসভায় কিংবা রাস্তা-ঘাটেও তিনি দাঁত খোচাবেন না।

আব্বাসীয় আমলে প্রায় মজলিসেই এবং একান্ত নিভৃতে মদ্যপান করা হতো।[১৫৯] মদ্যপানের প্রশংসা করে আবু নুওয়াসের (মৃ. ৮১০ খ্রি.) লেখা অনেক গান ও কবিতায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। খলিফা ইব্নে আল-মুতাজ (মৃ. ৯০৮ খ্রি.) এবং সমকালীন অনেক চারণকবি এ নিয়ে অসংখ্য কবিতা লিখেছেন এবং গান গেয়েছেন। মুসলিম ধর্মে মদ্যপানে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও অনেক খলিফা, উজির, রাজকুমার এবং বিচারপতিরা পর্যন্ত এ ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞাকে আদৌ সম্মান করতেন না।[১৬০] পণ্ডিত, কবি, সাহিত্যিক, গায়ক এবং সংগীতজ্ঞদের বিশেষভাবে মদ্যপানের আসরে আশীর্বাদ হিসেবে মনে করা হতো। আদতে মদ্যপানের এই প্রচলনটা ছিল পারস্য ঘরানার। তা শেষ পর্যন্ত আব্বাসী আমলের গোড়ায় প্রতিষ্ঠিত সংস্কারে পরিণত হয়।[১৬১] খলিফা হারুনের আমলে তা আরও বিকশিত হয়। এ খলিফা ছাড়াও খলিফা আল-হাদি, আল-আমীন, আল-মামূন, আল-মুতাসিম, আল-ওয়াসিক এবং আল-মুতাওয়াক্কিল সবাই ছিলেন পদ্যপায়ী। তবে খলিফা আল-মানসুর এবং আল-মুহতাদি ছিলেন মদ্যপানের বিরোধী। খেজুর থেকে একধরনের মদ তৈরি হতো; এর নাম ছিল নাবীয। এর খুব চাহিদা ছিল। ইব্নে খালদূন লিখেছেন, খলিফা হারুন এবং আল-মামূনের মতো ব্যক্তিরা এই নাবীয পান করতেন।[১৬২] এটা তৈরি করা হতো আঙুর, কিসমিস এবং খেজুর পানিতে ভিজিয়ে রেখে সামান্য ঝাঁঝবিশিষ্ট করে। মুসলিম শাস্ত্রের একটি ধারা আবার এই পানীয়কে কিছু শর্তে বৈধ বলে মনে করে। মহানবি সা. নিজেও এটি পান করতেন। তবে তিন দিন ধরে পচার আগেই তা পান করতেন।[১৬৩]

তৎকালীন প্রায়ই পানোৎসব এবং গানের আসরের আয়োজন করা হতো। এসব আসরে (মজলিস আল-শিরাব)[১৬৪] আপ্যায়নকারী ও অতিথি সবাই নিজ নিজ দাড়িতে গোলাপজলের সুগন্ধি লাগিয়ে আসতেন এবং উজ্জ্বল রঙের দামি পোশাক পরে আসতেন। মজলিসক সুগন্ধিদ্রব্য পুড়িয়ে সুবাসিত করা হতো। এসব অনুষ্ঠানে যেসব গায়িকারা গান করতেন তাদের অধিকাংশই ছিল অসচ্চরিত্রের অধিকারিণী। সমসাময়িক যুগের যুবকদের নৈতিক চরিত্র নষ্টকরণে তাদের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। এ জাতীয় মজলিসের প্রধান গায়িকা

159. আগানি, প্রাগুক্ত, ১৩ খণ্ড, পৃ ১২৮।
160. নুওয়াইরি, *নিহায়া*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ৯২।
161. জাহিয, তাজ, পৃ ২৩, ৭২; নওয়াজি, হালবাহ, পৃ ২৬।
162. ইব্নে খালদূন, মুকাদ্দিমা, পৃ ১৬।
163. মিশকাত, ২য় খণ্ড, পৃ ১৭২-১৭৩; ইব্নে হাম্বল, মুসনাদ, (কায়রো ১৩১৩), ১ম খণ্ড, পৃ ২৪০, ২৮৭, ৩২০।
164. নওয়াজি, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৮।

ছিলেন নীলচোখের সাল্লামা আল-জারকা।[১৬৫] সেসময়ে ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা ছিল মদের ব্যবসায়ী ও সরবরাহারী।

স্নানাগার (হাম্মাম)

পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ। মহানবি সা.-এর এ বাণীটি আজও মুসলিম দেশে দেশে সবারই কণ্ঠস্থ। মহানবির আবির্ভাবের পূর্বে আরবের লোকেরা হাম্মামখানায় গোসল করত বল শোনা যায়নি। পবিত্রতা অর্জনের জন্য কেবল পুরুষরাই হাম্মাম বা স্নানাগারে প্রবেশ করতে পারত। সবাইকে পোশাক পরে যেতে হতো। আব্বাসীয় আমলে গণস্নানাগার (হাম্মাম) শুধু আনুষ্ঠানিক গোসল এবং ধোয়াধুয়ির জন্যই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি; পাশাপাশি তা বিনোদন এবং বিলাসিতারও কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এসব স্নানাগার বিশেষ দিনে মহিলাদেরকে ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হতো। আল-খাতীব এর বর্ণনা অনুযায়ী খলিফা আল-মুকতাদিরের আমলে (৯০৮-৯৩২) বাগদাদে ২৭ হাজার গণস্নানাগার গড়ে উঠেছিল।[১৬৬] পরে তা বেড়ে ৬০ হাজারে উন্নীত হয়।[১৬৭] আরবীয় সূত্রগুলোর অধিকাংশের মতে, এসব স্নানাগারের সংখ্যা বর্ণনার মধ্যেও যথেষ্ট অতিরঞ্জন রয়েছে। আল-ইয়াকূবীর তথ্যানুযায়ী, বাগদাদ প্রতিষ্ঠার পরপরই সেখানে এ রকম স্নানাগারের সংখ্যা ছিল ১০ হাজার।[১৬৮] আফ্রিকার পর্যটক ইব্নে বতুতা ১৩২৭ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদ সফরে আসেন। বাগদাদে এসে তিনি ১৩টি বাড়ি ভিজিট করেন; যার প্রতিটিতে তিনি দুটি বা তিনটি করে আধুনিক স্নানাগার দেখতে পান। প্রতিটি স্নানাগারে গরম ও ঠান্ডা উভয় ধরনের পানির ব্যবস্থা ছিল।[১৬৯]

বর্তমান সময়ের ন্যায় ঐসব স্নানাগারে একাধিক কক্ষ ছিল। মেঝে ছিল মোজাইকের আর দেওয়াল ছিল মার্বেল পাথরের তৈরি। স্নানাগারগুলো একটি বড়ো ধরনের ঘরে তৈরি করা হতো। এ ঘরটির মাথায় গম্বুজ তৈরি করা থাকত। গম্বুজের মাথায় এমন কিছু কাচজাতীয় চকচকে দ্রব্য ব্যবহার করা হতো, যাতে বাইরের আলো আসতে সুবিধা হয়। এ ছাড়া স্নানাগারের পানি গরম করার জন্য বাষ্পশক্তি ব্যবহারের বন্দোবস্ত ছিল। বাহিরে ছোটো ছোটো ঘর ছিল; যেগুলো মদ্যপান এবং ফুর্তির জন্য ব্যবহৃত হতো।

বিনোদন

আব্বাসীয় আমলে চারুকলার মতো ক্রীড়া ও সংস্কৃতিতেও ভারতীয় এবং ইউরোপীয় প্রভাব ছিল লক্ষণীয়। খলিফাদের সময়ে কিছু ঘরোয়া খেলা ছিল জনপ্রিয়। উমাইয়া আমলে মক্কায় একটি ক্লাব হাউস ছিল।

---

165. আগানি, প্রাগুক্ত, ১৩ খণ্ড, পৃ ১২৮; নুওয়াইরি, ৫ম খণ্ড, পৃ ৭২।
166. তারিখ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ ১১৮-১১৯।
167. তারিখ, প্রাগুক্ত, পৃ ১১৭।
168. বুলদান, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ ৯-১০, ২৫০; তুলনীয়, ২য় খণ্ড, পৃ ৮-৯, ২৫৪।
169. বুলদান, প্রাগুক্ত, পৃ ১০৫-১০৭।

সেখানে দাবা ও পাশা খেলার ব্যবস্থা ছিল। হারুনুর রশিদই প্রথম খলিফা যিনি নিজে দাবা খেলতেন এবং দাবা খেলাকে প্রশ্রয় দিতেন।[১৭০] দাবাকে আরবী ভাষায় 'শিতরঞ্জ' বলা হয়। চূড়ান্ত বিচারে 'দাবা' শব্দটি সংস্কৃত ভাষা থেকে এসেছে। 'দাবা' আদতে ছিল ভারতীয় খেলা।[১৭১] সমাজের অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে পাশা খেলার পরিবর্তে দাবা খেলা দ্রুত প্রসার লাভ করে।[১৭২]

মাঠের খেলার মধ্যে নামকরা খেলা ছিল তিরন্দাজি প্রতিযোগিতা, পোলো খেলা (হকির মতো বাঁকা লাঠি নিয়ে যা খেলা হতো), বল খেলা, অসিক্রীড়া, তির-বল্লম ছোড়া, ঘোড়ার দৌড় এবং শিকার ইত্যাদি। আল-জাহিযের বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়, সে সময়ে যারা তির-বল্লম ছোড়া, শিকার করা, বল খেলা এবং দাবায় খেলায় পারদর্শী হতেন তারা খুব সহজেই খলিফার নৈকট্য লাভে সক্ষম হতেন।[১৭৩]

আব্বাসীয় খলিফাদের মধ্যে বিশেষভাবে পোলো খেলার প্রিয় ভক্ত ছিলেন খলিফা আল-মুতাসিম। একবার তাঁর তুর্কি সেনাধ্যক্ষ আল-আফশিন তাঁর সাথে পোলো খেলতে অস্বীকার করলে তিনি রাগান্বিত হন। পরে আফশিন খলিফাকে বুঝিয়ে বলেন যে, খেলাচ্ছলে হলেও আমি আমিরুল মুমিনিনের বিপক্ষে অবতীর্ণ হওয়াকে সমীচীন মনে করি না। তাই আমি আপনার সাথে খেলতে অস্বীকার করেছি।[১৭৪] আব্বাসীয় আমলের আরও একটি খেলার কথা জানা যায়; যা একটি লম্বা কাঠের টুকরা এবং বল দিয়ে খেলা হতো। এই লম্বা কাঠের টুকরোটিকে বলা হতো তবতব।[১৭৫] সেটাই সম্ভবত আজকের টেনিস খেলা।

আব্বাসীয় আমলে খলিফা এবং যুবরাজদের বিনোদনের বড়ো মাধ্যম ছিল শিকার। খলিফা আল-আমীন সিংহ শিকার করতে ভালোবাসতেন।[১৭৬] তাঁর এক ভাই শিকার করতে গিয়ে বন্য শূকরের আক্রমণে মারা যান।[১৭৭] আবু মুসলিম আল-খোরাসানি এবং আল-মুতাসিম উভয়েই চিতাবাঘ শিকার করতে পছন্দ করতেন। সে সময়ে বাজপাখিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে অন্য পশু-পাখিকে শিকার করার প্রচলন ছিল। এটা পারস্য দেশ থেকে আমদানি হয়। পরে খলিফাগণ এই খেলার প্রিয় ভক্ত হয়ে ওঠেন। পরে ধর্মযুদ্ধের এই প্রশিক্ষিত বাজপাখিকে শত্রুর আক্রমণে কাজে লাগানো হতো।[১৭৮] এখনো বাজপাখি এবং বাজপাখির মতো বাশিক পাখিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে শিকার কাজে ব্যবহার করার প্রচলন রয়েছে। পারস্য, ইরাক, দাইর আল-জূর এবং সিরিয়ার আলাবাই অঞ্চলে এভাবে শিকার করার প্রচলন রয়েছে বলে *আরব্য রজনী* নামক উপন্যাসে লেখা

---

170. মাসউদী, *কিতাব আল-তানবিহ*, সম্পাদনা: ডি গোজে, (লিডেন ১৮৮৩), ৮ম খণ্ড, পৃ ২৯৬।
171. মাসউদী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৯-১৬১।
172. মাসউদী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৭-১৫৮।
173. তাজ, প্রাগুক্ত, পৃ ৭২; নওয়াজি, প্রাগুক্ত, পৃ ২৫-২৬।
174. ইব্নে আল-আব্বাস, আসার আল-উওয়াল, পৃ ১৩০।
175. মাসউদী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯৬।
176. মাসউদী, প্রাগুক্ত, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ ৪৩২-৪৩৩।
177. আগানি, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ ৯৭।
178. ফিহরিস্ত, পৃ ৩১৫; ইব্নে খাল্লিকান, ২য় খণ্ড, পৃ ১৭২ ও ৩য় খণ্ড, পৃ ২০৯।

রয়েছে। বাজপাখিকে সাধারণত ছোটো হরিণ, খরগোশ, তিতি পাখি, বুনো রাজহংসী, পাতিহাঁস, কাতা (মেঠো মোরগবিশেষ) ইত্যাদি টাইপের পাখিকে শিকার করার কাজে ব্যবহার করা হয়। শিকারি দল মিলে শিকারস্থলকে ঘিরে একটি বৃত্ত (হলকা) বানাত এবং সেখানেই শিকার করা হতো। খলিফা আল-মুতাসিম টাইগ্রিস নদীর পাড়ে ঘোড়ার খুরের আকৃতিতে একটি দেওয়াল নির্মাণ করেছিলেন। তিনি শিকারি দলকে ঐ দেওয়ালের অভ্যন্তরে থেকে শিকার কার্যক্রম পরিচালনা করতে বলতেন আর তিনি শিকার খেলা উপভোগ করতেন।[১৭৯]

শিকারের ক্ষেত্রে সালজুকরাও এমন পদ্ধতির অনুসরণ করতেন।[১৮০] খলিফা আল-মুস্তানজিদ (১১৬০-৭০) পরবর্তীকালে একাধিক শিকারিদল গঠন করেছিলেন। আব্বাসীয় বংশের কতিপয় খলিফা প্রজা এবং দর্শনার্থীদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্য বাঘ, সিংহ ও অপরাপর বন্য পশু পুষতেন। আবার অনেকে কুকুর ও বানর পুষতেন। খলিফা মুক্তাদিরের জনৈক উজিরের এক পুত্র কায়রোতে সরকারের উচ্চপদে সমাসীন ছিলেন। তাঁর শখ ছিল সাপ, বেজি এবং অন্যান্য বিষধর জন্তু সংগ্রহ করা। এসব জন্তুকে তিনি তাঁর প্রাসাদের কাছে বিশেষ ঘরে যত্নের সাথে লালন-পালন করতেন।[১৮১]

আব্বাসীয় সংস্কৃতি বিকাশে অনুবাদের প্রভাব

আরব শাসকবৃন্দ রাজ্য পরিচালনায় উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বহির্বিশ্বের নানা ক্ষেত্রের বিভিন্ন উপাদান হতে সহযোগিতার অনুসন্ধান করেন। প্রাথমিক আব্বাসীয়দের রাজত্বকালে বিশেষত খলিফা হারুনুর রশিদ ও খলিফা মামুনের সময় রাজ্য পরিচালনায় সহযোগিতা লাভের অংশ হিসেবে ব্যাপকভাবে বহির্বিশ্বের নানা বিষয় অনুবাদ করা হয়। এরই সূত্র ধরে খলিফা আল-মামুন 'বায়তুল হিকমাহ' (জ্ঞান ভবন) প্রতিষ্ঠা করেন; যার প্রধান কাজ ছিল বিশ্বের সমগ্র অঞ্চলের নামিদামি গ্রন্থাবলি সংগ্রহ করা ও অনুবাদ করা। প্রাথমিক আব্বাসীয়রা যদিও নিষ্ফল উপভোগে বিরাট অঙ্কের অর্থ অপচয়ে লিপ্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁরা বুদ্ধিজীবীগণকে পৃষ্ঠপোষকতা করতে কখনো পিছপা ছিলেন না। কোনো কোনো খলিফা তাদের চির শত্রু বাইজান্টাইন শাসকদের নিকট বিভিন্ন গ্রন্থ চাইতে দ্বিধা করতেন না। প্রামাণ্য নথিপত্রে দেখা যায়, অনুবাদ বিভাগের সদস্যবৃন্দ ছিলেন বিশ্বেও ইতিহাসে সর্বোচ্চ বেতনভুক্ত বুদ্ধিজীবীদের অর্ন্তভুক্ত।

অনুবাদকগণ অনেক ভাষা থেকেই প্রায় সকল বিষয়ে তাদের অনুবাদ কার্যক্রম পরিচালনা করেন। গ্রিক, পাহলভী, লাতিন, সংস্কৃত, চীনা, সিরীয়, নাবাতিয়ান ও অন্যান্য ভাষা হতে এসব অনুবাদ করা হয়। তাদের

---

179. হান্না ফাখুরী, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৩-৭৪।
180. আসার আল-উওয়াল, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৮।
181. কুতুবি, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ ১৩৪-১৩৫।

অনুবাদের তালিকা দেখলে সহজেই ধারণা করা যায় যে, তারা গ্রিক ভাষা হতে দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র ও সাহিত্য অনুবাদ করেন। আর সংস্কৃত ভাষা হতে অঙ্ক, চিকিৎসাশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যা এবং নাবাতিয়ান ভাষা হতে জাদুবিদ্যার গ্রন্থ অনুবাদ করেন।

অনুবাদকবৃন্দ

অনুবাদকরা আরবী ভাষায় অনুবাদের সময় মূল গ্রিক গ্রন্থের সাহিত্যিক ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখার কথা ভাবতেন না। এর ফলে আরবী চিন্তাধারার সাথে গ্রিক নাটক, কাব্য ও গ্রিক ইতিহাসের তেমন মিলন ঘটেনি। বরং এক্ষেত্রে আরবীয়রা পারসী প্রভাবে বিরাট প্রভাবিত হয়েছিলেন। হোমারের ইলিয়াড তাওফিল (থিওফিলাস) ইব্নে তুমা অনুবাদ করেছিলেন। এটি সিরীয় ভাষায় অনূদিত হয়। 'আল-রুহার থিওফিলাস' ছিলেন খলিফা আল-মাহদীর মারোনাইট গোষ্ঠিভুক্ত জ্যোতিষী।[১৮২]

গ্রিক থেকে অন্য ভাষায় যারা অনুবাদ করেছেন তাদের মধ্যে যারা পথিকৃত ছিলেন, তাদের অন্যতম হচ্ছেন আবু ইয়াহইয়া ইব্নে আল-বাতরীক (মৃ. ৭৯৬ থেকে ৮০৬ এর মধ্যভাগ)। তিনি খলিফা আল-মানসুরের নির্দেশে গ্যালেন এবং হিপোক্রেটিসের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলো অনুবাদ করেন। পাশাপাশি টলেমির 'কোয়াদ্রিপারটিটাস'ও তিনি অনুবাদ করেন।[১৮৩] ইউক্লিডের এলিমেন্টাস এবং টলেমির জ্যোতির্বিদ্যা-সংক্রান্ত মূল্যবান গ্রন্থ অ্যালমাজেন্ট বা আরবী ভাষায় আল-ম্যাজিস্তি বা আল-মিজিস্তি (মূল গ্রিক শব্দ 'মেজিস্ত', মহান) ঐ সময়ই অনূদিত হয়।[১৮৪] আল-মাসউদীতে তেমনই বর্ণনা পাওয়া যায়।[১৮৫] তবে শুরুর দিকে এসব অনুবাদে অনেক ভুলভ্রান্তি ছিল। পরে খলিফা হারুন ও আল-মামুনের আমলে সংশোধিত হয়। আরেক বিখ্যাত অনুবাদক ছিলেন সিরীয় খ্রিষ্টান ইউহান্না (ইয়াহইয়া) ইব্নে মাসওয়াইহ[১৮৬] (মৃ. ৮৫৭ খ্রি.)। তিনি ছিলেন জিব্রিল ইব্নে বখতিসুরের ছাত্র এবং আরেক অনুবাদক হুনায়ন ইব্নে ইসহাকের শিক্ষক। খলিফা হারুন যেসব গ্রন্থ আঙ্কার ও অ্যামোরিয়াম থেকে আনিয়েছিলেন, সেসব গ্রন্থই (চিকিৎসাবিদ্যা-সংক্রান্ত) তিনি অনুবাদ করেন।[১৮৭] ইউহান্না খলিফা হারুনের উত্তরাধিকারীদের আমলেও অনুবাদের কাজ করতেন।

---

182. ইব্নে আল-ইবরি, প্রাগুক্ত, ৪১তম খণ্ড, পৃ ২২০।

183. ফিহরিস্ত, প্রাগুক্ত, পৃ ২৭৩।

184. ইয়াকূবী, তারীখ, সম্পাদনা: এম. থ হাউটসমা, (লিডেন ১৮৮৩), ১ম খণ্ড, পৃ ১৫০-১৫১)।

185. ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ ২৯১।

186. লাতিন ভাষায় মেসু (মেসুয়া) মেজর (বড়ো)। ছোটো থেকে পৃথক করতে এভাবে আলাদা শব্দ ব্যবহার হয়। 'ছোটো' অর্থাৎ মেসুদি ইয়াংগার (মাসাওয়াইহ আল-মারিদিনি)। এই জ্যাকোবাইট চিকিৎসক ফাতেমীয় খলিফা আল-হাকিমের কায়রোর রাজসভায় বিখ্যাত হন। তিনি ১০১৫ খ্রিষ্টাব্দে মারা যান।

187. ইব্নে আল-ইবরি, পৃ ২২৭; ইব্নে আবু উসাইবিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ ১৭০; কিফতি, পৃ ৩৮০।

বস্তুত আব্বাসীয় আমলে সকল অনুবাদকই ছিলেন অনারব। আবার এদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন অমুসলিম। প্রখ্যাত অনুবাদকদের মধ্যে তিনজন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও ইসলামি সংস্কৃতির বিবিধ ধারায় তারা বিশেষ অবদান রেখে গিয়েছেন। তারা হলেন :

১. ইব্নে মুকাফ্ফা (মৃ. ৭৫৭ খ্রি.) তিনি একজন জরথুস্ত্র

২. হুনায়েন ইব্নে ইসহাক (৮০৯-৮৭৩ খ্রি.) তিনি একজন খ্রিষ্টান

৩. সাবিত ইব্নে কর্রাহ (মৃ. ৯০১ খ্রি.) তিনি একজন সার্বিয়ান।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আব্বাসীয় যুগের শ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিকদের নাম ও তাঁদের লেখনীর বৈশিষ্ট্য

আব্বাসীয় যুগের শ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিকদের নাম

আব্বাসীয় যুগের সাহিত্যের পরিব্যাপ্তি বিশাল। এ যুগে আরবী সাহিত্যের শাখা-প্রশাখা বেশ বিস্তার লাভ করে। এ যুগে কবি সাহিত্যিকদের সংখ্যা অন্যান্য যুগের কবি সাহিত্যিকদের তুলনায় অনেক বেশি। এ যুগে গদ্যসাহিত্য, পদ্যসাহিত্য, ভাষাসাহিত্য এবং আরবী ব্যাকরণসহ সাহিত্যের সব শাখায় বেশ গবেষণা হয়েছে।[১৮৮] নিম্নে আব্বাসীয় যুগের প্রখ্যাত কতিপয় কবির নাম তুলে ধরা হলো–

ক্রম	নাম	মৃত্যুসন
০১	বাশ্‌শার ইব্‌নে বুরদ	১৬৭ হিজরি
০২	সাইয়েদ আল-হুমায়রী	১৭৩ হিজরি
০৩	আবু নুওয়াস	১৯৮ হিজরি
০৪	মুসলিম ইবনুল ওয়ালিদ	২০৯ হিজরি
০৫	আবুল আতাহিয়্যাহ	২১১ হিজরি
০৬	আবু তাম্মাম	২৩২ হিজরি
০৭	আবু দালমাহ	১৬১ হিজরি
০৮	হাম্মাদ আজরাদ	১৬১ হিজরি
০৯	মারওয়ান ইব্‌নে আবি হাফছাহ	১৮১ হিজরি
১০	আলী ইবনুল জাহম	২৪৯ হিজরি
১১	ইবনু মানযির	১৯৮ হিজরি
১২	আর-রাকাশি	২০০ হিজরি
১৩	দিকুল জিন	২২৫ হিজরি
১৪	আবু আশ-শারছ	১৯৬ হিজরি
১৫	আল-আকুক	২১৩ হিজরি

188. শায়খ ওয়ালী উদ্দিন আল-খাতিব, মিশকাতুল মাসাবীহ, কানপুর, ইন্ডিয়া; জুরযি যায়দান, তারীখুল আদাবিল আরবী, ১ম ও ২য় খণ্ড, কায়রো, মিশর, ১৯৫৭; ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরবী মনীষা*, রিয়াদ প্রকাশনী, ঢাকা ২০০৩; জি. এম মেহেরুল্লাহ, *আরবী কবি সাহিত্যিক ও সাহিত্য*, আন-নাহদা প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৩; মুহাম্মদ হাদীসুর রহমান, *ইসলামের ইতিহাস* (প্রথম পত্র; ফাযিল শ্রেণির পাঠ্য), আরিফ পাবলিকেশন্স, ১৯৮৮।

১৬	ছালেহ ইব্নে আবদুল কুদ্দুস	১৬৭ হিজরি
১৭	আব্বাস ইবনুল আহনাফ	১৯২ হিজরি
১৮	ইব্নে রুমী	২৮৩ হিজরি
১৯	আল-বুহতুরী	২৮৪ হিজরি
২০	মুতানাব্বী	৩৫৩ হিজরি
২১	আবু ফারেস হামদানী	৩৯৮ হিজরি

আব্বাসীয় যুগের কবিতার রাবিদের নাম

আব্বাসীয় যুগে কবিতার রাবিদের সংখ্যাও একেবারে কম নয়। নিম্নে আব্বাসীয় যুগের প্রখ্যাত কতিপয় কবিতার রাবিদের নাম তুলে ধরা হলো–

ক্রম	নাম	মৃত্যুসন
০১	হাম্মাদ আর-রাবিয়াহ	১৫৬ হিজরি
০২	মুফাদ্দাল আদ্দব্বী	১৬৮ হিজরি
০৩	আবু আমর আশ-শাইবান	২৩৬ হিজরি
০৪	মুহাম্মদ ইবনু ছালাম	২৩২ হিজরি
০৫	কাতাদাহ ইবনু দাআমাহ	১১৭ হিজরি
০৬	আবু আমর ইবনুল আ'লা	১৫৪ হিজরি
০৭	আবু উবাদাহ মা'মার ইবনুল মাছান্না	২০৯ হিজরি
০৮	আল-আছমায়ী	২১৪ হিজরি
০৯	আবু যায়দ আল-আনসারি	২১৫ হিজরি
১০	আবু উবায়দ আল-কাছেম	২২৩ হিজরি
১১	আবুল কাছেম আয-যুজাযী	৩২৯ হিজরি

আব্বাসীয় যুগের আরবী ব্যাকরণবিদদের নাম

আব্বাসীয় যুগে আরবী ব্যাকরণবিদদের সংখ্যাও নগণ্য নয়। নিম্নে আব্বাসীয় যুগের প্রখ্যাত কতিপয় ব্যাকরণবিদের নাম তুলে ধরা হলো–

ক্রম	নাম	মৃত্যুসন
০১	সি-বাওয়াই	১৮৩ হিজরি
০২	মায়াজ আল-হির্‌রাহ	১৮৭ হিজরি
০৩	আল-কিসা-ই	১৮৯ হিজরি
০৪	ইবনুস সাকিত	২৪৪ হিজরি

আব্বাসীয় যুগের আরবী ভাষাবিদদের নাম

আব্বাসীয় যুগে আরবী ভাষাবিদদের সংখ্যা একেবারে কম নয়। নিম্নে আব্বাসীয় যুগের প্রখ্যাত কতিপয় ভাষাবিদের নাম তুলে ধরা হলো–

ক্রম	নাম	মৃত্যুসন
০১	খলিল ইব্‌নে আহমাদ	১৮০ হিজরি
০২	মুয়ার্‌রিখ আস-সাদুসি	১৯৫ হিজরি
০৩	আল-নদর ইব্‌নে শামিল	২০৩ হিজরি
০৪	আবদুল্লাহ ইবনুল মুকাফ্‌ফা	১৪৩ হিজরি
০৫	ইব্‌নে দুরাইদ	৩২১ হিজরি

আব্বাসীয় যুগের কবি-সাহিত্যিকদের লেখনীর বৈশিষ্ট্য

আব্বাসীয় যুগকে আরবী সাহিত্যের স্বর্ণযুগ (আল-আসরুজ জাহাবি) বলা হয়। আব্বাসীয় যুগের কবিরা পূর্বের জাহেলি যুগের কবিদের লিখিত বিষয়ে কবিতা রচনা করেন। তবে তারা এতে কিছুটা ভিন্নতা আনয়ন করেন এবং নতুনত্বের বিকাশ ঘটান। এ যুগে এসে আরবী সাহিত্যের বৃক্ষটি নতুন নতুন শাখা ও পত্র-পল্লবে বিকশিত হয়ে ব্যাপক প্রসার লাভ করে। সাহিত্যের বিষয়বস্তুতে বেশ পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন : হান্না ফাখুরী সে যুগের কবিতা প্রসঙ্গে বলেন–[১৮৯]

" ضعف الشعر السياسى والحماسى واهمل الغزل العذرى

و ظهر الشعر الفلسفى والصوفى والنعلمى والعصصى

[189]. হান্না আল-ফাখূরী, *আল-জামি ফিল আদাবিল আরাবী ওয়া তারীখিহী*, ২য় সং, বৈরুত: দারুল জীল, ২০০৫, খ. ১, পৃ ৩৫৯।

والتهكمى والرسائلى واستقل الزهدى والخمرى والطردى

وقوى المدحى والرثائى والهجائى وازداد الشعر الحكمى عمثاو

الغزلى فاذا ومال الشعر الوصفى الى ذكر مظاهر المدينة الجديدة "

"রাজনৈতিক এবং বীরত্বগাঁথা কবিতা দুর্বল হয়ে পড়ল, নারী প্রণয়গাঁথা অবহেলিত হলো,

দার্শনিক, সুফিবাদমূলক, শিক্ষনীয়, ঘটনামূলক কবিতা চিঠিপত্রাদির ন্যায় বিকশিত হলো;

বিদ্রুপাত্মক, হাস্যকর কবিতা বিকাশ লাভ করল, বৈরাগ্যবাদ, মদবিষয়ক ও পতিত কবিতা স্বাতন্ত্র্যতা পেল,

প্রশংসা, শোক, কুৎসামূলক কবিতা শক্তিমত্তা লাভ করল, প্রজ্ঞামূলক কবিতার বৃদ্ধি ঘটল,

তারপর বর্ণনামূলক কবিতায় নতুন শহরের উদ্ভাস উল্লেখ করার প্রবণতা ছিল।"

আব্বাসীয় যুগের কবিতার বিষয়বস্তু

যেসব বিষয় ইতোপূর্বে জাহিলি-ইসলামি যুগে চর্চিত হয়েছে, আব্বাসীয় যুগে তা নতুনরূপে রূপায়িত হয়ে কবিতার স্থান দখল করে নিয়েছে। নিম্নে আব্বাসীয় যুগের কবিতার কতিপয় বিষয়বস্তু তুলে ধরা হলো :[১৯০]

০১. গোত্রীয় মর্যাদার লড়াই ও বংশজাত অহংকারের স্থলে আরব-অনারব স্বজাত্যবোধ কবিতার বিষয়বস্তুরূপে স্থান পায়।

০২. কবিতাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পূর্বে যেখানে হাশেমি-উমাইয়া দ্বন্দ্ব সেখানে আব্বাসীয়-আলাভী দ্বন্দ্ব জায়গা করে নেয়।

০৩. পাপাচারিতা, অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতার বর্ণনা কবিতায় সরাসরি আলোচিত হতে থাকে।

০৪. অট্টালিকা, গৃহ-উদ্যান, লোকসমাগমের মজলিস ও পুরাতন কীর্তির বর্ণনা কবিতার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়।

০৫. পারসিক, গ্রিক ও ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা দিক কবিতায় প্রাসঙ্গিকভাবে স্থান পায়।

এ ছাড়া যেসব বিষয় সম্পূর্ণ নতুনরূপে কবিতার উপজীব্য হয়ে উঠে আসে তম্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিষয় হচ্ছে–

[190]. আহমদ হাসান আয-যয়্যাত, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, (বৈরুত, দারুল মা'আরিফ, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ ১৪৫-১৫৫।

০৬. পারসিক মাওয়ালি প্রজন্মের সুবাদে সমবর্ণ প্রেম (যার সাথে ইতোপূর্বে আরবরা পরিচিত ছিল না) আরবদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে এবং কবিতায় স্থান করে নেয়। কবি আবূ-নূয়াস ও আল-হুসাইন ইব্নে আদ্-দাহ্হাকের নাম এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

০৭. মদ ও শরাবের বর্ণনায় মুসলিম কবিদের উৎসাহ ও তৎপরতা; যা ইতোপূর্বে অমুসলিম কবিগণের কবিতার উপজীব্য ছিল।

০৮. পার্থিব-বিরাগ (যুহদ) সম্বলিত কবিতা। এক্ষেত্রে আব্বাসীয় কবি আবুল আতাহিয়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখগ্যে।

০৯. শিক্ষামূলক কবিতার আমদানি। সন্তানদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে নামাজ, রোজা ইত্যাদির পাশাপাশি জ্ঞানাহরণ ও চরিত্র গঠনের লক্ষ্যে কবিতায় তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের অবতারণা করা হয়।

আব্বাসীয় যুগে কাব্যসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

আব্বাসীয় যুগে নবরাজ্যের উন্নতি-অগ্রগতির স্বার্থে আরবী ভাষার দিগন্ত দিনদিন প্রসারিত হতে লাগল। গ্রিক, পারস্য ও ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণের প্রয়োজনে বহু পরিভাষা জন্মলাভ করল। এক্ষেত্রে খলিফা হারুনুর রশিদের (শাসনকাল : ৭৮৬-৮০৯ খ্রি.) প্রতিষ্ঠিত এবং তদীয় পুত্র খলিফা আল-মামুনের (শাসনকাল : ৮১৩-৮৩৩ খ্রি.) পৃষ্ঠপোষকতায় লালিত 'বায়তুল হিকমাহ'[১৯১] অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। উপরন্তু মাওয়ালিগণ[১৯২] কর্তৃক সহজ-সরল শব্দচয়ন ও বাক্যগঠনে স্বাচ্ছন্দ্য রীতি প্রাধান্যদান আরবী ভাষাকে আরও পরিশীলিত করে তোলে। কেননা, তারা আরবী ভাষাকে আত্মস্থ করেছে পঠনপাঠনের মাধ্যমে; স্বভাবগত ও ঐতিহ্যসূত্রে নয়।[১৯৩] যদ্দরুন আব্বাসীয় সাহিত্যে ভাব, ভাষা ও বিষয়বস্তুতে খাঁটি আরবীয় আমেজ অক্ষুণ্ন থাকেনি। এ সময় আরবী সাহিত্যে এমন অনেক বিষয়ের আগমন ঘটে যার সাথে আরব সংস্কৃতি ইতোপূর্বে পরিচিত ছিল না। সাহিত্যে বেদুইন আরবের মরুপ্রীতি ও গোত্রপ্রীতির পরিবর্তে নগরজীবনের বিস্তৃত আলোচনা আব্বাসীয় সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করছে। রচনাশৈলীতে সংক্ষিপ্ত ছন্দে

---

191 . বায়তুল হিকমাহ (بيت الحكمة) ছিল আব্বাসীয় আমলে ইরাকের বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত একটি গ্রন্থাগার, অনুবাদকেন্দ্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এটিকে ইসলামি স্বর্ণযুগের একটি প্রধান বুদ্ধিবৃত্তিক কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাইতুল হিকমাহ খলিফা হারুনুর রশিদ (শাসনকাল : ৭৮৬-৮০৯ খ্রিষ্টাব্দ) প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার পুত্র আল মামুন (শাসনকাল : ৮১৩-৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দ) এর সময় তা সর্বোচ্চ চূড়ায় উপনীত হয়। জ্ঞানের আদান-প্রদানের জন্য আল মামুন অনেক জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিকে বাইতুল হিকমাহতে নিয়ে আসেন। ৯ম থেকে ১৩ শতক পর্যন্ত পারসিয়ান ও খ্রিষ্টানসহ অসংখ্য পণ্ডিত ব্যক্তি এই গবেষণা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন। আরবিতে গ্রন্থ অনুবাদ ও সংরক্ষণের পাশাপাশি পণ্ডিতরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে মৌলিক অবদান রাখেন। নবম শতকের মধ্যভাগে বায়তুল হিকমাহ ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ গ্রন্থভান্ডার।

192 . মাওয়ালি (موالي) হলো ধ্রুপদি আরবির একটি পরিভাষা, যা দ্বারা অনারব মুসলিমদের বোঝানো হতো। উমাইয়া খিলাফতের সময় বিপুলসংখ্যক অনারব যেমন পারসিয়ান, আফ্রিকান, তুর্কি ও কুর্দি ইসলাম গ্রহণ করলে এই পরিভাষাটি গুরুত্ববহ হয়ে ওঠে। নতুন ইসলাম গ্রহণকারীদের কারণে গোত্রীয় আরবসমাজে কিছু সামাজিক জটিলতা সৃষ্টি হয়। এর সমাধান হিসেবে অনারবদের জন্য আরব পৃষ্ঠপোষক ব্যবস্থা চালু করা হয়। এরূপ মুসলিমদেরকে জিজিয়া কর দিতে হতো এবং তারা সরকার ও সামরিক বাহিনীতে স্থান পেত না। এ অবস্থা উমাইয়া খিলাফতের শেষ অবধি চালু ছিল।

193. আহমদ হাসান আয-যয়্যাত, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৫।

নাতিদীর্ঘ কবিতা অধিকহারে লক্ষণীয়।[১৯৪] নবসভ্যতার রস আস্বাদনে ও নব আবিষ্কৃত বিষয়ের ব্যবহারিক প্রয়োজনে ভাষা ও সাহিত্যের পরিসর ব্যাপকতা লাভ করে। নৌবিহার, নৌবহর ও নৌপথে যুদ্ধের বর্ণনা সাহিত্যের উপজীব্য বিষয় হিসেবে সংযোজিত হয়, যা পূর্বেকার কবি সাহিত্যিকদের লেখনীতে পরিদৃষ্ট হয়নি। তা ছাড়া বুদ্ধিভিত্তিক জাগরণের ফলে যেকোনো বিষয় উপস্থাপনে যুক্তির অবতারণা আব্বাসীয় সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।[১৯৫] চিন্তার ধারাবাহিকতা ও প্রসঙ্গান্তরে আনুপূর্বিকতা রক্ষা করা এ সময়কার কাব্যসাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যা তৎপূর্ববর্তী প্রাচীন আরবী কাব্যে সুরক্ষিত হতো না।[১৯৬]

আব্বাসীয় সমাজে নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা ও ইন্দ্রিয় লালসার সয়লাব সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করে। বেহায়াপনা ও পাপাচারিতার খোলামেলা আলোচনা কাব্যসাহিত্যে ব্যাপকহারে প্রতিফলিত হয়। এ প্রসঙ্গে ড. ত্বাহা হুসায়ন মন্তব্য করেন–দ সেভ করুন

كانت الفاحشة في ذلك العصر في الممارسة والكتابة كثيرالتعدى أن العديد من القصائد كانت من النوع الذي يمكن قرائته في الكتاب ولكن ليس للمناقشة في الفصل.

"সে যুগের বেহায়াপনা ও বেলেল্লাপনা বাস্তবে ও লেখায় এত বেশি সীমালঙ্ঘন করে যে, বহু কবিতা এমন ছিল, যা কাব্যগ্রন্থে পড়া যাবে কিন্তু শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করার মতো নয়।" তিনি আরও বলেন যে, মিশরীয় প্রকশনা সংস্থা 'দারুল কুতুবে' আবূ নুওয়াসের জীবন তথ্য সংবলিত এমন একটি গ্রন্থ রয়েছে, যা রাষ্ট্রীয় আইনের কারণে অদ্যাবধি প্রকাশ করা যাচ্ছে না।[১৯৭] তা ছাড়া ইসলামবিরোধী কবিতাগুলো সংরক্ষণে বর্ণনাকারীগণ সচেষ্ট হননি। ফলে এ সময়ের বহু কবিতা কালের অতল গহ্বরে হারিয়ে গেছে।[১৯৮] অবশ্য এর বিপরীতে সে সময়ে চারিত্রিক পদস্খলন ও ধর্মীয় শৈথল্যের প্রতিকারস্বরূপ সুফিবাদ ও পার্থিববিমুখ নির্ভর এমন কিছু কাব্য সৃষ্টি হয় যা ইতোপূর্বে আরবী কাব্যে আর দেখা যায়নি। এক্ষেত্রে কবি আবুল আতাহিয়ার নাম শ্রদ্ধাভরে স্বরণ করা যায়। আব্বাসীয় কাব্যসাহিত্যকে বিষয়গত দিক থেকে প্রাচীন ধারার অনুবর্তন মনে হলেও সে যুগের কবিগণ আরবী কবিতার পুরাতন দেহে নবপ্রাণের সঞ্চার করেছেন এবং প্রাচীন অবয়বের ওপর কারুকার্য প্রদর্শনে নতুনত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। এই নতুনত্ব কেবল সহজ-সরল শব্দচয়নেই নয়; বরং উক্ত শব্দাবলির অলংকরণ ও শোভাবর্ধনেও দেদীপ্যমান। আব্বাসীয় কবিগণ

194. ড. উমার ফাররূখ, *তারীখুল আদাবিল আরাবী*, ৫ম সং, বৈরুত: দারুল ইলম লিল মালাঈন, ১৯৮৪, খ. ২, পৃ ৪০।
195. আহমদ ইব্নে ইব্রাহীম আল-হাশেমী, পূর্বোক্ত, খ. ২, পৃ. ৩০০।
196. আহমাদ আল-ইসকান্দারী ও মোস্তফা আনানী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৬।
197. ড. তুহা হোসাইন, *হাদীসুল আরাবিয়্যাহ*, ১১শ সং, মিশর: দারুল মা'আরিফ, তা. বি., খ. ২ পৃ. ২৪।
198. ড. ইউসুফ খালীফ, *তারীখুশ শি'র ফিল আসরিল আব্বাসী*, কায়রো: দারুস সাকাফাহ, ১৯৮১, পৃ ২৪-২৫।

খলিফাদের ন্যায় তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ি ও গৃহস্থালিসামগ্রী যেমন সুসজ্জিত ও আধুনিকায়নের চেষ্টা করেছেন, তেমনি কাব্যে ব্যবহৃত শব্দাবলিকেও তারা অপরূপ সাজে সাজাবার চেষ্টা করেছেন।[১৯৯]

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায় যে, আব্বাসীয় কাব্যের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যাবলি হচ্ছে–[২০০]

০১. সহজ সরল ও লঘু ছন্দের ব্যবহার, যা নবসমাজ ও নবপরিবেশ তৈরির সহায়ক হিসেবে বিবেচ্য।

০২. কাব্যে এমন ছন্দের ব্যবহার, যা আমোদ-প্রমোদ ও সংগীত উপযোগী হিসেবে বিবেচ্য।

০৩. কবিতায় প্রাচীন রীতির দীর্ঘ ভূমিকার পরিহার।

০৪. সহজবোধ্য অথচ গভীর তাৎপর্যবাহী শব্দের ব্যবহার।

০৫. প্রাচীন কাব্যের বিষয়গুলোকে চলমান জীবন প্রকৃতির সাথে খাপ খাইয়ে নিয়ে নবরূপে উন্নীত করা।

০৬. আরবী কাব্যে দার্শনিক অর্থবহ বিষয়ের আমদানি।

০৭. সংগীত ও নৃত্যের আসর উপযোগী কাব্য তৈরি।

০৮. অশ্লীল ও নির্লজ্জ কবিতার প্রসার।

০৯. শিক্ষামূলক কাব্যরচনা।

১০. কবিদের ওপর মরুমানসের চেয়ে নগরমানসের প্রভাব বেশি হওয়ার কারণে ভাষাতাত্ত্বিক ও বৈয়াকরণিকগণের কাছে আব্বাসীয় যুগের কবিতা প্রামাণ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য বিবেচ্য নয়।

উল্লেখ্য যে, আব্বাসীয় আমলে সাহিত্যিকগণ বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন : التراسل – نقد – الخطبة – اللغة – صرف – نحو – عروض – بلاغة – الادب ইত্যাদি।[২০১]

আব্বাসীয় যুগে গদ্যসাহিত্য

এ যুগে গদ্য সাহিত্যর বেশ উৎকর্ষতা পেয়েছে এবং এতে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। গতানুগতিক খুতবা (خطبة) সাহিত্য হ্রাস পেয়েছে। এর পরিবর্তে শৈল্পিক গদ্যসাহিত্যের উন্মেষ ঘটেছে। এর মধ্যে বিভিন্ন রকমের গ্রন্থ প্রণয়ন, প্রবন্ধ রচনা, মাকামা সাহিত্য (مقامات) - – مناظرات – مقالات – تصانيف – قصص – عهود এর প্রসিদ্ধি অর্জিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হান্না ফাখুরী বলেন–[২০২]

---

199. বুতরুস আল-বুস্তানী, *উদাবা'উল আরব ফিল আসরিল আব্বাসী*, দারল জীল, ১৯৮৯, বৈরুত, তা.বি., খ. ২, পৃ. ২০।

200. ড. ত্বহা হোসাইন, *হাদীসুল আরাবিয়্যাহ*, ১১শ সং, মিশর: দারুল মা'আরিফ, তা. বি., খ. ২ পৃ. ২৪-২৬।

201. হান্না আল-ফাখূরী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ ৩৪৩।

202. হান্না আল-ফাখূরী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ ৫৯।

"ضعفت الخطابة وتعددت فنون الكتابة فكان منها الرسائل و التصانيف والمقالات والمناظرات والعهود والقصص والمقامات"

"খুতবা সাহিত্য দুর্বল হয়ে পড়েছে, গদ্যসাহিত্যের উন্মেষ ঘটেছে। এর মধ্যে রয়েছে, রিসালাহ, প্রবন্ধ রচনা, অনুচ্ছেদ রচনা, বিতর্ক, প্রতিজ্ঞা, কাহিনি এবং মাকামা সাহিত্য।"[২০৩]

এ যুগে কাব্যের ন্যায় গদ্যসাহিত্যেও নবযুগের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ইতোপূর্বে গদ্যেও পরিমণ্ডল খুবই সীমিত ছিল। আব্বাসীয় যুগে উন্মুক্ত সংস্কৃতির বদৌলতে গদ্যের নতুন নতুন শাখা উন্মোচিত হতে থাকে। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সুফিতত্ত্ব এবং বিচিত্র শরিয়তি ও ফিকহি মতাদর্শের উদ্ভব ও পর্যালোচনা গদ্যের সীমারেখাকে সম্প্রসারিত করে। কাব্যের ন্যায় গদ্যশিল্পও পারস্য এবং গ্রিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়। কারণ, লেখকগোষ্ঠীর এক বৃহৎ অংশই ছিল পারসিক মাওয়ালি সম্প্রদায়। তারা ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে যেমন আরবীকে আত্মস্থ করেছে, তেমনি প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান লালনকারী জাতি হিসেবে আরবীয় জ্ঞানের যেকোনো শাখায় সহজেই ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে তাদের মধ্য হতেই সৃষ্টি হয়েছে ভাষাতাত্ত্বিক, ধর্মতাত্ত্বিক ও কবিসাহিত্যিক। আর তাদেরই মাধ্যমে পারসিক ধ্যানধারণা ও কলাকৌশল আরবী ভাষা ও সাহিত্যে অবারিতভাবে অনুপ্রবেশ করার সুযোগ ঘটে।[২০৪] তারা বহু ফারসি গ্রন্থ অনুবাদের মাধ্যমে আরবী ভাষা আমদানি করেন; যার মাধ্যমে বিষয়বস্তুর পাশাপাশি ফারসিশৈলী আরবী গদ্যে অনুপ্রবেশ করে। অপরদিকে তৎকালে গ্রিক ছিল নিকট প্রাচ্যের জাতীয় ভাষা। এতদ্অঞ্চলে গ্রিক শিক্ষালয় ব্যাপকহারে গড়ে ওঠে; যেখানে দর্শন, সাহিত্য ও গ্রিকীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিখন-শিক্ষণের কাজ চলত। যখন এসব রাষ্ট্রে ইসলাম ও মুসলমানদের আগমন ঘটে তখন এসব দ্বারা আরবদের বিদ্যা-বুদ্ধি ও সাহিত্য প্রভাবিত হয়। যেমন আরবী গদ্যকারদের অগ্রদূত খ্যাত ইবনুল মুকাফ্ফা (মৃ. ৭৫৯ খ্রি./১৪২ হি.)[২০৫] পারস্য বংশোদ্ভূত হওয়া ছাড়াও তিনি গ্রিক সংস্কৃতির বিশাল ভান্ডার অর্জন করেছিলেন।[২০৬] ফলে দেখা যায়, আব্বাসীয় গদ্যে যে রূপান্তর ঘটে তা দুদিক থেকে আসে।

---

203 . মাকামা হচ্ছে ছোটো গল্পের নাম; যার মাঝে অলংকারপূর্ণ সাহিত্য ও হালকা রসিকতাও রয়েছে। এর লেখক হচ্ছেন আবু মুহাম্মদ আল-কাসিম ইবনে আলী আল-হারীরী। তিনি তার লিখিত মাকামাগুলোতে সৃষ্টি করেছেন আবু যায়েদ সারুজীর মতো অনবদ্য এক চরিত্র। লেখক আবু যায়েদ সারুজীকে লেখার মাধ্যমে বানিয়েছেন একাধারে সুসাহিত্যিক, সুবক্তা, অসাধারণ কবি। সাথে সাথে রসিক এবং চতুর। মাকামাতে ব্যবহৃত শব্দ এবং সেগুলোর মর্মোদ্ধার বেশ কঠিন। তবুও বাক্যের অন্ত্যমিল ও ছন্দমিলে মনে হয় আরবী সাহিত্যের জগতে এর মতো মধুর সাহিত্য পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই।

204. ড. আলী মুহাম্মদ হাসান ও যাকী আলী সুওয়ায়লাম, *আল-আদাবু ওয়া তারীখুহু ফিল আসরাইন : আল-উমাভী ওয়াল আব্বাসী*, কায়রো: জমহুরিয়্যাতু মিসর আল-আরাবিয়্যাহ, ১৯৯০, পৃ ৫৪।

205 . ইবনে আল-মুকাফফা ছিলেন বসরার অধিবাসী। তিনি স্থানীয় একটি অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার বাবা রাজ্য সরকারের অধীনে কর আদায়ের দায়িত্ব পালন করতেন। একবার তিনি অর্পিত কিছু অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার পর শাসকগোষ্ঠী তার হাত পিষ্ট করে দেয়। তিনি গদ্য সাহিত্য প্রবর্তনের পথিকৃৎ ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ পণ্ডিত। বেশ কয়েকটি নৈতিক কল্পিত গল্পের লেখক ছিলেন তিনি।

206. ড. ত্বহা হোসাইন, প্রাগুক্ত, তা. বি., খ. ২ পৃ. ৩০-৩১।

এক. অনুবাদের সুবাদে বহির্জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণের মাধ্যমে।

দুই. অনারব নৃগোষ্ঠীর মাধ্যমে যারা নিজেদেরকে আরব জাতিভুক্ত করে নিয়েছিলেন। তারা আরব সংস্কৃতিতে কেবল তাদের স্বজাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষাদীক্ষা আমদানি করেই ক্ষান্ত হননি; বরং তাদের স্বভাব-চরিত্র, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও জীবনাচার সবই সাথে করে নিয়ে আসেন। আর এসব শক্তিশালী উপাদান আরবী গদ্যে বিচিত্র শাখাপ্রশাখার উদ্ভবে নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।[২০৭]

ইতোপূর্বে আরবী গদ্যচর্চা সাধারণত ভাষণ (খুতবা), পত্রসাহিত্য, শাসকবর্গের বিভিন্ন বার্তা ও ফরমানের মধ্যে সীমিত ছিল। বদিউয্ যামান আল-হামদানি 'মাকামা' রচনার মধ্য দিয়ে আরবী গদ্যে গল্প-রীতিতে কথাসাহিত্যের বীজ বপন করেন। বলা যায় আরবী গদ্যরীতিতে এটি একটি নতুন সংযোজন। শাব্দিক অলংকারের দিকে লেখক অত্যধিক মনোনিবেশী না হয়ে সমাজ-মানসের প্রতি আরও অধিক যত্নশীল হলে হয়তো এই মাকমা সাহিত্য মানুষের সমাজ ও মনোজাগতিক চিত্র আরও সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হতো এবং তৎকালেই আরবী কথাসাহিত্যের দিগন্ত আরও বিস্তৃত হতো বলে মনে হয়।[২০৮] সে যুগের উল্লেখযোগ্য গদ্যকারদের মধ্যে রয়েছেন আল-জাহিয (মৃ. ৮৬৮ খ্রি.), ইবনুল মুকাফ্ফা (৭২৪-৭৫৯ খ্রি.), সাহ্ল ইব্নে হারুন (৭৫৮-৮৩০ খ্রি.), বদিউয্ যামান আল-হামদানি (৯৬৯-১০০৭ খ্রি.), আবূ মুহাম্মদ আল-কাসিম আল-হারীরী (১০৫৪-১১২২ খ্রি.) প্রমুখ।

আব্বাসীয় যুগে গদ্যসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

আব্বাসীয় যুগের গদ্যকারগণ গদ্যের আরবীয় উৎস নির্বাচনে কুরআন হাদিসের লিখনশৈলীর সাথে যেমন তারা সুপরিচিত ছিল, তেমনি অনুবাদের মাধ্যমে ভারতীয় ও গ্রিকদর্শনের উৎস-গ্রন্থাবলির রচনারীতিও তাদের কাছে সুবিদিত। ফলে তাদের গদ্যশিল্প আরবীয় ও অনারবীয় রীতির সংমিশ্রণে এক অভিনব বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। নিম্নে আব্বাসীয় গদ্যের উল্লেখযোগ্য কতিপয় বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলে :[২০৯]

০১. গদ্যসাহিত্য রচনায় অতি অপরিচিত ও অতি নিম্নমানের শব্দ পরিহার করে মধ্যমানের শব্দ প্রয়োগ।

০২. একধরনের সংগীতানুগ রীতি আবিষ্কার, যা বাক্যকে ধ্বনিগত ঐক্য ও আলংকারিক সজ্জায় সুশোভিত করেছে।

---

207. ড. শাওকী দ্বায়ফ, *তারীখুল আদাবিল আরাবী: আল-আসরুল আব্বাসী আল-আউয়াল*, ৬ষ্ঠ সং, কায়রো: দারুল মা'আরিফ, তা. বি., পৃ ৪৪১।

208. আহমাদ আল-ইসকান্দারী ও অন্যান্য, *আল-মুফাস্সাল ফী তারীখিল আদাবিল আরবী*, ড. হাস্সান হাল্লাক সম্পা., বৈরুত : দারু ইহ্য়াইল উলূম, ১৯৯৪, পৃ. ৩১৯-৩২০।

209. ড. ত্বহা হোসাইন, প্রাগুক্ত, তা. বি., খ. ২ পৃ. ২৭-২৯।

০৩. বক্তব্যকে অতিরঞ্জন ও আড়ম্বরপূর্ণ করে উপস্থাপন।

০৪. অন্ত্যমিলযুক্ত বাক্যধারার ওপর অধিক নির্ভরশীলতা।

০৫. বক্তব্যকে অলংকরণ ও শিল্পরূপদানের প্রতি অত্যধিক মনোনিবেশ।

০৬. অনেক ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর চেয়েও বাকরীতি ও ভাষানৈপুণ্য প্রদর্শন করাই লেখকের মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ যুগে এসে আরবী সাহিত্যের অতি প্রয়োজনীয় যে কাজটি সাধিত হয়েছে তা হলো কবিতার সংকলন। জাহেলি এবং ইসলামি উমাইয়া যুগের অসংখ্য দূর্লভ দুষ্প্রাপ্য কবিতা এ যুগে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এটা না হলে জাহেলি যুগের অতি মূল্যবান কবিতা হারিয়ে যেত।[২১০]

এ যুগে আরবী ভাষার বেশ উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। স্মরণীয় ব্যক্তিদের দক্ষ হাতের পরশে আরবী ভাষার ব্যাকরণের উন্নতি সাধিত হয়েছে। ছন্দশাস্ত্রের চরম অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। সর্বোপরি আরবী শাস্ত্রের যে বৈপ্লবিক দিকটি সাধিত হয়েছে তা হলো অনুবাদ সাহিত্যের ব্যাপকতা। এ যুগে এসে অনেক বিদেশি ভাষার জ্ঞান-বিজ্ঞানকে আরবী ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। বিশেষ করে ফারসি, ইউনানি, এবং ইংরেজি সাহিত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে আরবী ভাষায় অনুবাদ করে আরবী সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের মর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে।[২১১]

---

210. ড. শাওকী দ্বায়ফ, প্রাগুক্ত, তা. বি., পৃ ৪৪০।

211. ড. শাওকী দ্বায়ফ, প্রাগুক্ত, তা. বি., পৃ ৪৪৩।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আল্-মুতানাব্বী এর জীবন পরিচিতি

১ম পরিচ্ছেদ : আল্-মুতানাব্বী এর জন্ম, বংশ পরিচয় ও নামকরণ
২য় পরিচ্ছেদ : আল্-মুতানাব্বী এর শিক্ষাজীবন
৩য় পরিচেছদ : আল্-মুতানাব্বী এর কর্মজীবন
৪র্থ পরিচেছদ : আল্-মুতানাব্বী এর চরিত্র, কাব্যপ্রতিভা ও মৃত্যু

১ম পরিচ্ছেদ
আল্-মুতানাব্বী এর জন্ম, বংশ পরিচয় ও নামকরণ

আব্বাসীয় খিলাফতকে (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) আরবী সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়। আব্বাসীয় খিলাফতের প্রথমার্ধে শিল্প, সাহিত্য, কাব্য, বিজ্ঞান ও ইতিহাস ইত্যাদি জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল।[১] বিশেষ করে হিজরি ১৩২ থেকে ৪৪৮ সাল পর্যন্ত সময়ে সেলজুক তুর্কিদের আবির্ভাবের পূর্বপর্যন্ত আব্বাসীয় যুগ জ্ঞান-বিজ্ঞানে চরম উন্নতির যুগ বলে স্বীকৃতি লাভ করে। যতজন কবি-সাহিত্যিক তৎকালীন সময়ে প্রতিভার নিদর্শন রেখেছিলেন, তাদের মধ্যে আরবী সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আরবী কাব্যজগতের নতুন দিগন্ত উন্মোচনকারী আবু তাইয়্যেব আল মুতানাব্বী অন্যতম।[২] নিম্নে তাঁর জীবন পরিচিতি তুলে ধরা হলো—

নাম ও পরিচয়

আব্বাসী যুগের অন্যতম প্রধান কবি আল-মুতানাব্বী। তার প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবু তাইয়্যেব এবং উপাধি আল মুতানাব্বী। ইয়াকূত আর-রূমী বলেন, তিনি ৩২৫ হিজরির পর 'আল-মুতানাব্বী' (নবিত্বের দাবিদার) নামে অধিক পরিচিতি অর্জন করেন।[৩] সাহিত্যের জগতে তিনি এ নামেই খ্যাতি অর্জন করেন। পিতার নাম হুসাইন, দাদার নাম মুর্‌রা, পরদাদার নাম আবদুল জাব্বার[৪] আর ঊর্ধ্বতন পুরুষের নাম আব্দুস সামাদ আল-জু'ফী আল-কুফী। তার নসবনামা হচ্ছে, আহমদ ইব্ন হুসাইন ইব্ন আবদুস সামাদ আল-জু'ফী আল-কুফী।

ইউসুফ ফার্‌রান বলেন, কবি আল-মুতানাব্বীর প্রকৃত নাম আহমাদ ইবনুল হুসাইন আল-জু'ফী আল-কিন্দী। উপনাম আবু তাইয়্যেব; ছদ্মনাম আল-মুতানাব্বী। নুবুওয়্যাতের মিথ্যা দাবিদার হওয়ার কারণে উক্ত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কবির পূর্বপুরুষ দক্ষিণ আরবের ইয়ামানি বংশোদ্ভূত, পিতা আল-জু'ফী গোত্রীয় আর মাতা হামদানি বংশোদ্ভূত।[৫] কুফার অন্তর্গত কিন্দা লোকালয়ে কবি জন্মগ্রহণ করেন;

---

[1] . ফিলিপ. কে. হিট্রি, আরব জাতির ইতিহাস, তম্ময় ভট্টাচার্য সম্পা., (কলকাতা ; দ্বিজেন্দ্র অফসেট, ১৯৭০ খ্রি.), দশম সংস্করণ, পৃ. ৩৪৮।

[2]. আবুল বাকা' আল-আকবারী, শারহু দীওয়ান আবিত্ ত্বায়্যিব আল-মুতানাব্বী, (বৈরুত : দারুল মা'রিফা), খ. ১, পৃ. ২২।

[3]. ইয়াকূত আর-রূমী, মুজামুল উদাবা, (বৈরুত : দারুল ফীক্‌র, বি.টি), খ. ৫, পৃ.২৩৯।

[4]. সুলায়মান ইবন আলী আল-মা'আররী, তাফসীরু আবইয়াতিল মায়ানী ফী শে'রে আবী তাইয়্যেব আল-মুতানাব্বী, (দামেস্ক : দারুল মামুন লিত্-তুরাছ, ১৯৭৭), পৃ. ১৭; আল-খাতীব আল-বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ, (আল-কাহেরা : মাকতাবাতুল খা'ন্‌জী, ১৯৩১), খ. ৪, পৃ. ১০২; ওমর ফর্‌রুখ, আল-মিনহায ফিল আদাবিল আরাবী ওয়া তারীখুহূ (বৈরুত : দারুল কুতুব, ১৯৫৯), পৃ. ১১৭।

[5]. মুহাম্মদ ইউসুফ ফার্‌রান, আবুত্ ত্বায়্যিব আল-মুতানাব্বী নাশীদুস সাহ্‌রা' আল-খালিদ, (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়া, ১৯৯০ খ্রি.), ১ম সং, পৃ. ২৪।

এজন্যই তাকে আল-কিন্দী নামের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়ে থাকে। প্রকৃত পক্ষে কবি কিন্দী গোষ্ঠীভুক্ত নয়।[৬]

কাজি জুরজানী (১০০৮-১০৮১ খ্রি.)[৭] বলেন, তাঁর নসবনামা হচ্ছে, আহমাদ ইব্ন হুসাইন ইবনুল হাসান ইব্ন আবদুস সামাদ।[৮]

কতিপয় ঐতিহাসিক বলেছেন, তার নসবনামা হচ্ছে, আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাসান ইব্ন আবদুস সামাদ।[৯]

জন্ম

তিনি ৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে (মোতাবেক ৩০৩ হি.) খলিফা মুকতাদির বিল্লাহর শাসনামালে[১০] কুফার (তৎকালীন আব্বাসীয় খিলাফতের অধীন, বর্তমান ইরাক)[১১] কিন্দা নামক পল্লির জুইফ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

আল্লামা সুয়ূতী রহ. (১৪৪৫-১৫০৫ খ্রি.)[১২] উল্লেখ করেন, কবি মুতানাব্বী ৩০৬ হিজরি সালে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন।[১৩]

তার পিতা দরিদ্র ভিস্তিওয়ালা ছিলেন। তিনি পিতার দিক থেকে জু'ফী এবং মাতার দিক থেকে হামদানি ছিলেন। তার ঊর্ধ্বতন দাদা জু'ফের দিকে নিসবত করে তাকে জু'ফী বলা হয়। তিনি হলেন জু'ফ ইব্ন

---

6. আবুল বাকা আল-আকবারী, শারহু দীওয়ান আবুত্ ত্বায়্যিব আল-মুতানাব্বী, মুস্তাফা আস্-সাক্কা ও অন্যান্য সম্পা., (বৈরুত : দারুল মা'রিফা,তা.বি.), খ. ১, ভূমিকা, পৃ. 'হা'।

7. তাঁর নাম আবু বকর আবদুল কাহির ইব্নে আবদুর রহমান ইব্নে মুহামমদ ইব্নে আল-জুরজানী। তিনি ১০০৮ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহন করেন এবং ১০৮১ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন আরবী ভাষার ইরানি প্রখ্যাত ব্যকরণবীদ। তিনি সংক্ষেপে আল-জুরজানী নামে অধিক পরিচিত।

8. কাযী আলী ইবন আবদুল আযীয আল-জুরজানী, আল-ওসাতাতু বাইনাল মুতানাব্বী ওয়া খুসুমিহী, (সুদান : মাকতাবাতুল ইরফান, ১৩৩৪ হি.), পৃ. ৪১১।

9. সাইয়্যেদ জলীলুর রহমান আ'যমী, আবুত তাইয়্যেব আল মুতানাব্বী, প্রথম খণ্ড, (পাকিস্থান : ওযারাহ মুআরেফ, বি.টি), পৃ. ২৯।

10. মুহাম্মদ ইবন জারীর ত্বারী, তা'রীখুল উমাম ওয়াল মুলূক, (বৈরুত : দারু সুয়াইদান, ১৩৩৫ হি.), খ. ১১, পৃ. ২৮/২৭২।

11. Al-Mutanabbi, Le Livre des Sabres, choix de poèmes, présentation et traduction de Hoa Hoï Vuong & Patrick Mégarbané, Actes Sud, Sindbad, novembre 2012.

12. তার নাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী। তিনি মিশরের কায়রোতে ১৪৪৫ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহন করেন এবং সেখানেই ১৫০৫ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন মুসলিম পণ্ডিত মনীষীদের মধ্যে একজন মহৎ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাকে হাফেজ ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী নামেও ডাকা হয়। তার পুরো নাম আবদুর রহমান ইব্নে কামালুদ্দিন আবি বকর ইব্নে মুহাম্মাদ সাবিকুদ্দিন খুদ্র আল-খুদায়রি আস-সুয়ূতী। তবে তিনি জালালুদ্দীন সুয়ূতী নামেই বিখ্যাত এবং সুপরিচিত। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার, বিখ্যাত তাফসিরকারক, মুহাদ্দিস, ফকিহ, সাহিত্যিক, কবি, ইতিহাসবিদ এবং তিনি হিজরি নবম শতকের সমসাময়িকের একজন মুজাদ্দিদ ছিলেন।

13. আল্লামা সুয়ূতী, হুসনুল মুহাদারা ফী আখবারে মিসর ওয়াল কা'হেরাহ, (মিশর : মাতবাআতু ইদারাতিল ওয়াতান, ১২৯৯ হি.), খ. ১, পৃ. ৩২২।

সা'দ আল-উশায়রা ইব্ন মাজহাজ। আর মাজহাজের নাম হলো মালেক ইব্ন আদাদ ইব্ন যায়েদ ইব্ন ইয়াসজাব ইব্ন আরব ইব্ন যায়েদ ইব্ন কাহলান।[১৪]

কেউ বলেছেন, তিনি পিতার দিক থেকে ইয়ামানের জু'ফ গোত্রের আর মাতার দিক থেকেও ইয়ামানের হামদানি গোত্রের ছিলেন। এ হিসেবে বলা যায় তিনি মাতা ও পিতা উভয় দিক থেকেই ইয়ামানি ছিলেন। এটি তার কবিতার একটি শ্লোক থেকে জানা যায়। যেমন :

أبت لك ذمى نخوة يمنية * ونفس بها فى مأزق أبدا ترمى

"ইয়ামেনি গর্ব আপনাকে প্রত্যাখ্যান করেছে,

এবং সমস্যা/সংকীর্ণতা তার সাথে একই; যা আপনাকে কখনই দূরে নিক্ষেপ করবে না।"[১৫]

ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, তার পিতা হুসাইন কুফাবাসীদেরকে পানি পান করাতেন বলে তাকে عيدان السقاء বলা হতো।[১৬] ফায়রুযাবাদী (১৩২৯-১৪১৫ খ্রি.) বলেন, মুতানাব্বীর পিতা عيدان السقاء (بالكسرة والياء) নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।[১৭]

আবুল হাসান মুহাম্মদ ইব্ন আলী আল-উ'লভী বলেন, মুতানাব্বী যখন বালক তখন তার পিতা عيدان السقاء নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি আমাদেরকে এবং মহল্লাবাসিদেরকে পানি পান করানোর কাজ করতেন।[১৮]

এ কারণে কবি মুতানাব্বীর মিশর থেকে বাগদাদে প্রত্যাবর্তনের সংবাদে ইব্ন লানকাক আল-বসরী তাকে ভর্ৎসনা করে কবিতা আবৃতি করেন—

لكن بغداد جاء الغيث ساكنها * نعالهم فى قفا السقاء تزدحم

"(এবার) কিন্তু বৃষ্টির বাসিন্দা বাগদাদ এসেছে,

তাদের জুতোগুলো যেন পানির মশকের কাঁধে ভিড় করে।"

---

14. ইবন খাল্লিকান, ওফয়া'তিল আড়ইয়ান ফী আনবা'য়ে আবনায়িয যামান, (মিসর, মাতবাআতুস সাআ'দাহ, ১৯৫০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৬।

15 . আবদুর রহমান আল-বারকূকী, শরহু দেওয়ানিল মুতানাব্বী, (বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৯৮০ খ্রি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৭৮।

16 . আবদুল্লাহ শারীত, শাখছিয়্যাতু আদাবিয়্যাহ মিনাল মাশরিকে ওয়াল মাগরিব, (বৈরুত : দারু মাকতাবাতিল হায়াত, ১৯৬৬ খ্রি.), পৃ. ২৫৭।

17 . মাজদুদ দীন আল-ফায়রুযাবাদী, আল-কামূসুল মুহীত, (আল-কা'হেরা, আল-মাকতাবাতুল হুসাইনিয়্যাহ আল-মিসরিয়্যাহ), খ. ১, পৃ.৩২।

18 . আবুল হাসান আলী ইব্নে আবদিল আযিয, আল-ওয়াসেতাতু বাইনাল মুতানাব্বী ওয়া খুসুমিহি, মাতবা'আতু ঈসা আল-বা'বী আল-হালাবী, কায়রো, ১৯৬৮ খ্রি., পৃ.৪১১।

অপর এক কবি বলেন—

أى فضل لشاعر يطلب الفضل * من الناس بكرة و عشيا

عاش حيناً يبيع فى الكوفة الماء * وحيناً يبيع ماء المحيا

“এ কবির কি মর্যাদা থাকতে পারে?

সে সকাল-সন্ধ্যায় মানুষের কাছে অর্থ-সম্পদ চেয়ে বেড়ায়,

কুফায় বসবাসকালীন সে কখনো পানি বিক্রি করে

এবং জীবনদানকারী পানি বিক্রি করেই (সে জীবিকা নির্বাহ করে)।”[১৯]

কবি মুতানাব্বীর বংশমর্যাদা উচ্চ ছিল না বিধায় তিনি তা গোপন করতেন। যেমন, খতীব আল-বাগদাদী আলী ইব্ন হুসাইন থেকে বর্ণনা করেন, তিনি স্বীয় পিতা হুসাইন থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি একবার মুতানাব্বীকে তার বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, কোনো ব্যক্তির বংশীয় গৌরব আসল গৌরবের বিষয় নয়; বরং স্বীয় গৌরবই আসল গৌরব। কোনো ব্যাক্তির জন্য নিজ বাপ-দাদা কিংবা বংশের গৌরব করা আদৌ উচিত নয়।[২০] এ কারণে কবি মুতানাব্বী স্বীয় বংশের গৌরব করে কখনো কবিতা রচনা করেননি; বরং সর্বদাই স্বীয় গৌরব নিয়েই কবিতা রচনা করেছেন। তিনি তার কবিতায় বলেছেন—

أرى الاجداد تغلبها كثيرة * على الاولاد أخلاق اللئام

ولست بقانع من كل فضل * بأن أعزى الى جد همام

“আমি দেখি বাপ-দাদাদের সন্তানদের ওপর (পরবর্তী বংশধরদের ওপর)

অজ্ঞ-মূর্খদের আখলাক ব্যাপকহারে প্রভাব বিস্তার করেছে।

আমি সব ধরনের সম্মান নিয়ে সন্তুষ্ট নই,

কেননা চেষ্টার বদৌলতে প্রাপ্ত কৃতিত্বই আমার নিকট অধিক সম্মানের।”[২১]

---

19 . আবদুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২২।

20 . আবু বকর আহমদ ইবন আলী ইবন সাবেত ইবন আহমাদ ইবন মাহদী আল-খাতীব আল-বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ, (দারুল গারাবিল ইসলামী, বৈরুত : ১৪২২ হি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ.১০৪।

21 . আবদুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৭৫।

অপর এক কবিতায় তিনি বলেছেন—

إذا لم تكن نفس النسيب كأصله * فماذا الذى تغنى كرام المناصب

وما قربت أشباه قوم أباعد * ولا بعدت أشباه قوم أقارب

"যদি একই আত্মীয় তার মূলের অনুরূপ না হয়

তবে এমন কী আছে যা সম্মানজনক অবস্থানকে সমৃদ্ধ করে।

আর আমি এমন কোন সম্প্রদায় সাদৃশ্য কারো কাছাকাছি যাইনি যারা দূরে ছিল

এবং আমি এমন কোনো সম্প্রদায় সাদৃশ্য কারো থেকেও দূরে যাইনি যারা আত্মীয় ছিল।"[২২]

কবি মুতানাব্বী কখনো বংশ নিয়ে গৌরব করতেন না; বরং তিনি নিজের পরিচয়েই নিজে গৌরববোধ করতেন। তিনি বলতেন আমি বংশ নিয়ে গৌরববোধ করি না বরং বংশই আমার কারণে গৌরবান্বিত। যেমন তিনি তার এক কবিতায় বলেছেন—

لا بقومى شرفت بل شرفوا بى * وبنفسى فخرت لا بجدودى

"আমি আমার গোষ্ঠী নিয়ে সম্মানিত হয়নি; বরং তারাই আমাকে নিয়ে সম্মানিত হয়েছে।

আমি নিজেকে নিয়েই গর্বিত, বাপ-দাদাকে নিয়ে নয়।"[২৩]

আল-মুতানাব্বী নামকরণের তাৎপর্য

মুতানাব্বী ৩২৫ হিজরি সনের পরে মুতানাব্বী নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। তার এ নামে প্রসিদ্ধ হওয়ার পেছনে বেশ কয়েকটি মত পরিলক্ষিত হয়। যেমন—[২৪]

১. অনেকে মনে করেন, তিনি 'বা'দিয়াতুস সামাওয়াহ' নামক স্থানে নবুওয়াত দাবি করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে ইব্ন খাল্লিকান (১২১১-১২৮২ খ্রি.) তার নবুওয়াত দাবিকে প্রাধান্য দিয়ে বলেন—

وانما قيل له المتنبى لانه ادعى النبوة فى بادية السماوة وتبعه خلق كثير من بنى كلب وغيرهم

"তাকে মুতানাব্বী বলা হয়; কারণ তিনি 'বা'দিয়াতুস সামাওয়াহ' নামক স্থানে নবুওয়াত দাবি করেছিল এবং বনী কাল্বসহ অপরাপর গোত্রের অসংখ্য লোক তার অনুসরণ করেছিল।"

---

22 . আবদুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৭৩।

23 . আবুল বাকা' আল-আকবারী, শারহু দীওয়ান আবিত্ ত্বায়্যিব আল-মুতানাব্বী, (বৈরুত : দারুল মা'রিফা), খ. ১, পৃ. ৩২২।

24 . শিহাবুদ্দিন আবু আবদুল্লাহ ইয়াকূত ইবন আবদুল্লাহ রূমী, ইরশাদুল আরীব ইলা মা'রিফাতিল আদীব, দারুল আরাবিল ইসলামী, (বৈরুত, ১৪১৪ হি.), পৃ.২৩৯।

২. ইউসূফ বাদীয়ী আদ্-দামেস্কী বলেন, মুতানাব্বী ৩২০ হিজরি সনে সিরিয়ার আল-লাযেকিয়াহ নামক স্থানে আগমন করলে তার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আবু আবদুল্লাহ মুয়ায ইব্ন ইসমাঈল লাযেকীর নিকট কথা প্রসঙ্গে বলেন—

انا نبى مرسل الى هذه الامة الضالة

"আমি এই ভ্রষ্ট জাতির নিকট প্রেরিত নবি।"

এরপর কুফার 'বা'দিয়াতুস সামাওয়াহ' নামক স্থানের ইসমাইলীয় আকীদায় বিশ্বাসী অধিবাসীদের নিকট তার ওপর অহী হিসেবে অবতীর্ণ কথিত আয়াত পাঠ করেন—

والنجم السيار- والفلك الدوار- والليل والنهار- ان الكافر لفى اخطار- امض على سنتك- واقف اثر من كان قبلكمن المرسلين- فان الله قامع بك زيغ من الحد فى الدين و ضل عن السبيل-

"চলমান তারকা, ঘূর্ণয়মান নৌকা এবং রাত্রি ও দিন (এর শপথ)! নিশ্চয়ই কাফিররা চরম ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত। আপনি আপনার তরিকা বা পদ্ধতির ওপর চলুন এবং রাসূলদের মধ্য থেকে আপনার পূর্বে যারা এসেছিল তাদের পথে থাকুন। নিশ্চয় আল্লাহ আপনার মাধ্যমে দ্বীনের সীমারেখার বক্রতাকে অপনোদন করেছেন এবং তার পথ থেকে বিচ্যুত হওয়াকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন।"[২৫]

এ উক্তির সমর্থনে *তাবাকাতুল উবাদায়* আরও একটি উক্তি পাওয়া যায়। মুতানাব্বীকে তার এ উপাধি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি তার জবাবে বলেন—

هذا شيئ كان فى الحداثة-

"এটি এমন একটি বিষয়, যা ছিল আবিষ্কৃত।"[২৬]

৩. কেউ বলেছেন, মূলত মুতানাব্বী চেয়েছিলেন উচ্চ মর্যাদা ও নেতৃত্ব। ফলে জনগণ থেকে কখনো আমির হিসেবে বায়াত গ্রহণ করেছেন। আবার কখনো নবি হিসেবে নেতৃত্বের দাবি করেছেন। তার সাহিত্যিক প্রসিদ্ধি ও অসাধারণ কাব্যপ্রতিভা তাকে এ পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করেছিল। ফলে কখনো নিজেকে হযরত সালেহ আ., আবার কখনো হযরত ঈসা আ.-এর মতো দাবি করেছেন। এ প্রসঙ্গে তার উক্তি—

انا فى امة تداركها الله غريب كصالح فى ثمود

ما مقام فى ارض نخلة الا كمقام المسيح بين اليهود-

---

25 . ইউসূফ বাদীয়ী আদ্-দামেস্কী, আস-সুবহুল মাবনী আন হাইসিয়াতিল মুতানাব্বী, (আল-মাতবায়াতুল আ'মেরাতুস শারকিয়্যাহ, ১৩০৮ হি.) পৃ. ৭৮। /জুরজী যায়দান, তারীখু আ'দাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ, (বৈরুত : দারু মাকতাবাতিল হায়াত, ১৯৭৩), খ. ২, পৃ. ৫৫৬।

26 . আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মদ ইবন উবায়দুল্লাহ আল-আনসারী, নুযহাতুল আলবা' ফী তাবকাতিল উদাবা, (মাকতাবাতুল মানার, জর্দান, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৫ হি.), পৃ. ৬৫।

"আমি এমন একটি জাতির মধ্যে অবস্থান করছি; যাদেরকে আল্লাহ অসহায় (পথহারা) বানিয়েছেন। (ফলে তাদের মাঝে আমাকে নবি হিসেবে পাঠিয়েছেন) যেভাবে সামুদ জাতির মধ্যে হযরত সালেহ আ.-কে পাঠিয়েছিলেন। নাখলার ভূমিতে আমার অবস্থান সেরূপ, যেরূপ ইয়াহুদিদের মধ্যে মসীহ ঈসার অবস্থান।"[২৭]

৪. আসলে তিনি নিজেকে নবি হিসেবে দাবি করেননি; বরং তার এ উপাধি তার শত্রুরা তাকে দিয়েছে। কারণ তার অসাধারণ কাব্যপ্রতিভার কারণে লোকসমাজে এত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন যে, তৎকালীন রাজা-বাদশারা পর্যন্ত রীতিমতো ভীত হয়ে পড়েন এবং তাকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বন্দি করেন। তিনি বলেন, মুতানাব্বী নামটি نبوة থেকে উৎসারিত; যার অর্থ المرتفع من الارض তথা উচ্চ ভূমি। কাব্যিক অনন্য প্রতিভার জন্য তাকে এ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। উপর্যুক্ত কবিতা প্রসঙ্গে মুতানাব্বী বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, সামুদ জাতির নিকট যেমন হযরত সালেহ আ. এবং ইয়াহুদি জাতির নিকট হযরত ঈসা আ. অপরিচিত। আমিও আমার জাতির নিকট তদরূপ অপরিচিত। সত্যিকার অর্থে তারা আমাকে মূল্যায়ন করেনি।[২৮] আবু আলী ইব্ন হামিদ সাইফুদ্দৌলার নিকট থাকাকালীন মুতানাব্বীকে তার ওপর অবতীর্ণ কথিত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তা কঠোরভাবে অস্বীকার করেন। তবে মুতানাব্বী ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন স্বভাবকবি। সেজন্য এদিক থেকে অনেকে এ ধরনের কবি ও নবিকে এক পর্যায়ের বলে মনে করতেন। যেমন, কোটি কোটি লোকের মধ্যে সবাই নবি হতে পারেন না, তদরূপ হাজারো কবির মধ্যে তার ন্যায় কেউ প্রতিভাসম্পন্ন স্বভাবকবি হতে পারেন না। নবির ওপর ওহি অবতীর্ণ হলে পরিবর্তন, পরিবর্ধন করার ক্ষমতা নবির থাকে না। তদরূপ তার অন্তরে যে বিষয়বস্তু উদিত হয়, তা তিনি তাৎক্ষণিকভাবে ভাষায় রূপদান করেন। তা আর পরিবর্তন করেন না। ফলে তার কিছু কিছু কবিতায় অসামঞ্জস্যও পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এজন্য তাকে এ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[২৯]

তিনি ছিলেন কবিতার ক্ষেত্রে নবি। আবু আলী আল-কালী বলেন, তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, على من تنبأت (আপনি কাদের ওপর নবুওয়াত দাবি করেন)? এর জবাবে তিনি বলেছিলেন— على الشعراء (আমি কবিদের ওপর নবুওয়াত দাবি করি।) পুনরায় জিজ্ঞেস করা হয়েছে—

---

27 . শিহাবুদ্দিন আবু আবদুল্লাহ ইয়াকূত ইবন আবদুল্লাহ রূমী, ইরশাদুল আরীব ইলা মা'রিফাতিল আদীব, দারুল আরাবিল ইসলামী, (বৈরুত, ১৪১৪ হি.), পৃ. ২৩৯।

28 . শিহাবুদ্দিন আবু আবদুল্লাহ ইয়াকূত ইবন আবদুল্লাহ রূমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০।

29 . শিহাবুদ্দিন আবু আবদুল্লাহ ইয়াকূত ইবন আবদুল্লাহ রূমী, ইরশাদুল আরীব ইলা মা'রিফাতিল আদীব, (দারুল আরাবিল ইসলামী, বৈরুত, ১৪১৪ হি.), পৃ. ২৪০।

لكل نبى معجزة- فما معجزتك ؟

“প্রত্যেক নবির মুজিজা রয়েছে; আপনার মুজিজা কী?”

قال هذا البيت :

“তিনি বললেন, এই শ্লোকটি—”

ومن نكد الدنيا على الحران يرى * عدوا له مامن صداقته بد-

এবং যে উত্তাপের ওপর দুনিয়ার কষ্ট সহ্য করেছে * সে অন্যকে তার শত্রু হিসেবে দেখবে, কখনো তার বন্ধুত্ব থাকবে না।

জনৈক পণ্ডিত কত সুন্দর করেই না বলেছেন—

هو فى شعره نبى ولكن * ظهرت معجزاته فى المعانى-

তিনি তাঁর কবিতার ক্ষেত্রে নবি * তবে তার অলৌকিকত্ব প্রকাশিত হয়েছে অর্থের ক্ষেত্রে।

৫. অনেকে বলেন, তিনি নবুওয়াতের দাবি করেননি; বরং তিনি দাম্ভিক ছিলেন বলে তার শত্রুরা তাকে এ নামে আখ্যায়িত করেন। যেমন, কাব্যক্ষেত্রে অন্যদেরকে তিনি বানরের সাথে তুলনা করেছেন। বানর মানুষের সব কথা অনুকরণ করতে পারে তবে কথা নকল বা অনুকরণ করতে পারে না।[৩০]

يرمون شأوى فى الكلام وانها * يحاكى الفتى فيما خلا المنطق القرد-

৬. আবার কেউ কেউ বলেন, তার কবিতায় সুফিবাদের স্পর্শ উজ্জীবিত। এজন্য তাকে ভবিষ্যতের নবি হওয়ার উপযুক্ত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[৩১]

আল-মুতানাব্বী নিঃস্ব পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও ব্যক্তিগতভাবে স্বীয় প্রতিভাগুণে তিনি আত্মম্ভরি স্বভাবের ছিলেন। নিজের দুর্বল পারিবারিক অবস্থানের ব্যাপারে সচেতন থাকলেও জনসমক্ষে নিজেকে নিয়ে বড়াই করতেন। তার অহংবোধ নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিতে ধরা পড়ে।

ما بقومى شرفت بل شرفوابى * وبنفسى فخرت لا بجدودى -

“ আমি আমার গোষ্ঠী নিয়ে সম্মানিত হয়নি; বরং তারাই আমাকে নিয়ে সম্মানিত হয়েছে।

আমি নিজেকে নিয়ে গর্বিত, বাপ-দাদাকে নিয়ে নয়।”[৩২]

---

30 . শিহাবুদ্দিন আবু আবদুল্লাহ ইয়াকূত ইবন আবদুল্লাহ রূমী, প্রাগুক্ত, ১৪১৪ হি. পৃ.২৪০।

31. শিহাবুদ্দিন আবু আবদুল্লাহ ইয়াকূত ইবন আবদুল্লাহ রূমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০।

32 . আবুল বাকা আল-আকবরী, শারহু দীওয়ান আবিত্ ত্বায়্যিব আল-মুতানাব্বী, (মুস্তফা আস-সাক্কা ও অন্যান্য সম্পা., বৈরুত : দারুল মা'রিফা, তা.বি.), খ. ১, ভূমিকা।

অহংকারী কবি জীবনের শুরু থেকেই মর্যাদাকাঙ্ক্ষী ও উচ্চাভিলাষী ছিলেন। সিরিয়ায় অবস্থানকালে একপর্যায়ে নবুওয়াতের দাবি করে বসেন। তার বাক্‌শক্তি ও কাব্যপ্রতিভায় বিমুগ্ধ হয়ে তথাকার একদল লোক তাকে সমর্থনও জোগায়। নবি করিম সা. শেষ নবি হওয়ার বিষয়টি তার কাছে উপস্থাপন করলে জবাবে তিনি বলেন—

إنه بشر بمجيئى وأخبربنبوتى فقال : لا نبى بعدى وأنا إسمى فى السماء " لا "

"তিনি মুহাম্মদ সা. আমার নুবুওয়াত ও শুভাগমনী বার্তা আগেই দিয়ে রেখেছেন। তিনি বলেছেন, "আমার পরে 'লা' নবি আসবে।" আর ঊর্ধ্বাকাশে আমার নাম হচ্ছে 'লা'।"[৩৩]

কবি আল-মুতানাব্বীর নবুওয়াতের মিথ্যা দাবির বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেলে আল-ইখশীদীগণের প্রতিনিধি হিম্‌সের গভর্নর লূ'লূ' কবিকে জেলে বন্ধি করেন। পরবর্তী সময়ে তাওবা করার শর্তে কবি মুক্তি পান। এখান থেকেই মূলত কবির সাথে "আল-মুতানাব্বী" (নবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদার) নামটি সম্পৃক্ত হয়ে যায়। যদিও কবি এটি অপছন্দ করতেন।[৩৪]

অবশ্য আল-মুতানাব্বীর নবুয়াতের দাবি প্রসঙ্গে ড. আবদুল মুন'ইম খাফাজী বলেন যে, এটি ধর্মীয় রিসালাতের নবুয়াত নয়; বরং সাহিত্যাঙ্গনের নবুয়াত। সাহিত্যক্ষেত্রে তার আগমন একজন নবির মহাআবির্ভাবের মতোই ঘটেছে। নয়তো মিথ্যা নবুয়াতের দাবি নিয়ে মুসলিম শাসিত খিলাফতে দেশ-বিদেশে কবি নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়াতে পারতেন না এবং এত সমাদরে বরেণ্য হওয়া কবির পক্ষে সম্ভব ছিল না।[৩৫]

কেউ বলেছেন, মুতানাব্বী নামে অভিহিত করার কারণ এই যে, যৌবনকালে তিনি নিজেকে সিরিয়ার বেদুইনদের মধ্যে রিসালাতের গুণ সমৃদ্ধ বলে দাবি করতেন। তিনি নিজেকে নবি বলে দাবি করার কারণে তাকে মুতানাব্বী বলা হতো। নিজেকে কখনো হযরত সালেহ, কখনো আ'দ, কখনো সামুদ, আবার কখনো হযরত ঈসা আ.-এর সাথে তুলনা করেছেন। যা তার কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।[৩৬] কবিতা নিম্নরূপ–

ما مقامى بأرض نخلة الا * كمقام المسيح بين اليهود -

ان اكن معجبا فعجب عجيب * لم يجد فوق نفسه من مزيد -

---

33 . আবদুল মালিক ইব্‌নে মুহাম্মদ ইব্‌নে ইসমাঈল আবু মানসুর আস্‌-সা'লাবী, আবু তাইয়্যিব আল-মুতানাব্বী ওমা লাহু ওয়া আলাইহি, (মাকতাবাতুল হুসাইন আত্‌-তিযারিয়্যাহ, মিশর, ১৯৬৬ খ্রি.), পৃ. ৯০।

34 . যয়্যাত, আহমদ হাসান, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, (বৈরুত, দারুল মা'আরিফ, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ ২১৭-২১৮।

35 . দীওয়ানু শায়খে শু'আরাইল আরাবিয়্যাহ আবিত ত্বায়্যিব আল-মুতানাব্বী, ড. আবদুল মুন'ইম আল-খাফাজী সম্পা., (মিশর: মাকতাবাতু মিশর, তা.বি., ভূমিকা), পৃ ১৪-১৫।

36 . শিহাবুদ্দিন আবু আবদুল্লাহ ইয়াকূত ইবন আবদুল্লাহ রূমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০।

انا ترب ورب القوافى * وسمام العدى وغيظ الحسود -

انا فى امة تدركها الله * غريب كصالح فى ثمود -

"ইহুদিদের মাঝে মসিহ ঈসার উত্থানের মতো খেজুরে ভূমিতে আমার উত্থান নয় কী; আমি যদি একজন ভক্ত হই তবে এটি একটি আশ্চর্যজনক বিষয়, যে নিজের চেয়ে এর বেশি কিছু খুঁজে পাবেন না; আমি মহান ব্যক্তি এবং ছন্দের প্রভু, আর আমি শত্রুর বিষ এবং হিংসুকের ক্রোধ; আমি এমন একটি জাতির মধ্যে অবস্থান করছি, যাদেরকে আল্লাহ অসহায় (পথহারা) বানিয়েছেন (ফলে তাদের মাঝে আমাকে নবি হিসেবে পাঠিয়েছেন; যেভাবে ছামুদ জাতির মধ্যে সালেহ আ.-কে পাঠিয়েছেন।"

আবু আবদুল্লাহ মুয়াজ ইবনে ইসমাঈল লাযেকের বর্ণনানুসারে মুতানাব্বী একবার লাযেকিয়্যাহ নামক স্থানে অবস্থান করলে তাকে বলা হলো, তুমি একজন মর্যাদাসম্পন্ন যুবক। তোমার উচিত কোনো বাদশাহ বা সম্রাটের সঙ্গী হওয়া। প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, তুমি কি বলছ : انا نبى مرسل 'আমি আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ।'[৩৭]

কিন্তু ইমাম ছা'লাবী (১৩৮৪-১৪৭৯ খ্রি.) এবং আবুল ফাতাহ ওসমান ইব্নে জানী (৯০৪-১০০২ খ্রি.) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ কবির সমকালীন লোক ছিলেন। তারা উল্লিখিত তথ্যটিকে মিথ্যা বলে উল্লেখ করেছেন। তাদের মতে, প্রকৃতপক্ষে ৩২৫ হিজরির পরে কবিকে মুতানাব্বী উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

حكى ابو الفتح عثمان بن جنى قال سمعت ابا الطيب يقول انما لقبت بالمتنبى لقولى :

انا فى امة تدركها الله * غريب كصالح فى ثمود -

অর্থাৎ, আবুল ফাতাহ ওসমান ইব্ন জানী বলেন যে, আমি মুতানাব্বীকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, আমাকে এ কবিতার শ্লোকটি রচনা করার কারণে মুতানাব্বী উপাধিতে ভূষিত করা হয়। শ্লোকটির অর্থ হচ্ছে-

"আমি এমন একটি জাতির মধ্যে অবস্থান করছি; যাদেরকে আল্লাহ অসহায় (পথহারা) বানিয়েছেন
(ফলে তাদের মাঝে আমাকে নবি হিসেবে পাঠিয়েছেন)
যেভাবে সামুদ জাতির মধ্যে হযরত সালেহ আ.-কে পাঠিয়েছিলেন।"

[37] . ইউসূফ বাদীয়ী আদ্-দামেস্কী, আস-সুবহুল মাবনী আন হাইসিয়াতিল মুতানাব্বীনী, (আল-মাতবায়াতুল আ'মেরাতুস শারকিয়্যাহ, ১৩০৮ হি.), পৃ. ২৩০।

মুতানাব্বী আরও বলেছেন যে, মুতানাব্বী শব্দটি نبوة ধাতু হতে নির্গত। এর অর্থ উঁচু টিলা। কাব্যজগতে আমি ছিলাম সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তাই আমি মুতানাব্বী নামে আখ্যায়িত হই। আমার কবিতার ভাষা ও ভাব উচ্চাঙ্গ হওয়ার কারণে জনসাধারণ বলত আমি এদিক থেকে নবি হওয়ার যোগ্য। আর এ কারণেই লোকেরা আমাকে মুতানাব্বী (متنبى) বলে ডাকত।[৩৮]

[38] . আবদুল মালিক ইব্নে মুহাম্মদ ইব্নে ইসমাঈল আবু মানসুর আস্-সা'লাবী, আবু তাইয়্যিব আল-মুতানাব্বী ওমা লাহু ওয়া আলাইহি, (মাকতাবাতুল হুসাইন আত্-তিযারিয়্যাহ, মিশর, ১৯৬৬ খ্রি.), পৃ. ২৩০।

২য় পরিচ্ছেদ
আল্-মুতানাব্বী এর শিক্ষাজীবন

কবি মুতানাব্বী এক হতদরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জনসাধারণের জন্য পানি সরবরাহের কাজ করতেন। বাল্যকালে কবি পিতাকে পানি সরবরাহের কাজে সাহায্য করতেন। পিতার অবস্থা অসচ্ছল থাকার কারণে কবি লেখাপড়া করার তেমন একটা বড় সুযোগ পাননি। তবে তিনি ছিলেন খুবই মেধাবী ও ধীশক্তিসম্পন্ন। ছেলের অসাধারণ ধীশক্তির পরিচয় পেয়ে কবির পিতা তাকে নিয়ে দামেস্কে চলে যান এবং সেখানে বিশুদ্ধ আরবী ভাষা শিক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্যে বনি কুলাইব গোত্রের মরুভূমিতে তাকে পাঠিয়ে দেন।[৩৯] কেননা, এই গোত্রের লোকেরা বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় কথা বলত। সেখানে অবস্থান করে অল্প সময়ের মধ্যেই বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন এবং সাথে সাথে অনেক আরবী কবিতা মুখস্থ করেন।[৪০] সেখানে বসে অধিকাংশ সময় তিনি বেদুইন গোত্রে কাটাতেন বলে জানা যায়। বেদুইনরা তার কবিতা মনযোগ সহকারে শুনতেন আর তিনিও তাদের কথোপোকথন শুনতেন।[৪১] অবসর পেলে তিনি সিরিয়ার বিভিন্ন শহর ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করতেন। কবির বাল্যকালের অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল বলে কোনো কোনো কবি তার কুৎসা রটনা করে বলেছেন–

أى فضل لشاعر يطلب الفضل * من الناس بكرة و عشيا

عاش حيناً يبيع فى الكوفة الماء * وحيناً يبيع ماء المحيا

“এ কবির কি মর্যাদা থাকতে পারে?

সে সকাল সন্ধ্যায় মানুষের কাছে অর্থ-সম্পদ চেয়ে বেড়ায়,

কুফায় বসবাসকালীন সে কখনো পানি বিক্রি করে

এবং জীবনদানকারী পানি বিক্রি করেই (সে জীবিকা নির্বাহ করে)।”[৪২]

তার অসাধারণ প্রতিভা তাকে কাব্যশাস্ত্রে নিপুণ দক্ষতার স্বাক্ষর বহন করার সুযোগ এনে দেয়। এ সীমাহীন দক্ষতা ও প্রতিভার কারণে তিনি নবি দাবি করারও দুঃসাহস দেখান। এতে তার অসংখ্য শিষ্য ছিল বলেও ধারণা করা হয়।[৪৩]

---

[39] . ড. মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী, প্রাচীন আরবী কবিতা: ইতিহাস ও সংকলন, (আহমাদিয়া প্রিন্টিং প্রেস, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, দ্বিতীয় সং. জানু. ২০১৯), পৃ ৬৫৪।

[40] . আবুল বাকা' আল-আকবারী, শারহু দীওয়ান আবিত্ ত্বায়্যিব আল-মুতানাব্বী, (বৈরুত : দারুল মা'রিফা), খ. ১, পৃ. ৩২২।

[41] . আবুল আলা আল-মুআর্‌রী, রিসালাতুল গুফরান, (হিন্দ : মাতবাআতু আমীন হিন্দিয়্যাহ), পৃ. ৩৫৮।

[42] . আবদুর রহমান আল-বারকূকী, *শারহু দীওয়ান আল-মুতানাব্বী*, (বৈরুত : দারুল কিতাব আল-আরবী, ২০০৭), খ. ১, পৃ. ২২।

কবি মুতানাব্বী অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি এতই মেধাবী ও স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন যে, তার জীবনের ছোট্ট একটি ঘটনা থেকে আমরা এর প্রমাণ খুঁজে পাই। তিনি একবার যা পড়তেন দ্বিতীয়বার তা পড়ার প্রয়োজন হতো না। কথিত আছে, একবার এক বই বিক্রেতা ইমাম আসমাঈ রচিত ত্রিশ পৃষ্ঠার একটি বই তাকে ঘাঁটাঘাঁটি করতে দেখে বলেছিলেন, যদি তুমি এই বইটি একবার পড়ে আমাকে মুখস্থ শুনাতে পার তাহলে তোমাকে বিনামূল্যে বইটি দিয়ে দেবো। যে কথা সে কাজ। তিনি বইটি হাতে নিয়ে একবারমাত্র আদ্যোপান্ত দেখে নেন এবং বিক্রেতাকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুখস্থ বলে শোনান। এতে বিক্রেতা আশ্চর্য হন এবং কথামতো তাকে বইটি উপহার হিসেবে দিয়ে দেন।[৪৪]

তিনি অল্প বয়সেই অনেক কবিতা মুখস্থ করেছিলেন। ফলে কাব্যের প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত হয়ে ছোটোবেলা থেকেই কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন।

কবি মুতানাব্বী দামেস্কে থাকাবস্থায়ই আরবী সাহিত্যসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বুৎপত্তি অর্জন করেন। আরবী সাহিত্যের জগদ্বিখ্যাত ইমাম হাজ্জাজ ইবন সিরাজ (মৃত্যু ৯২৯ খ্রি./৩১৬ হি.), আবুল হাসান আখফাস (মৃত্যু ৮৩০ খ্রি./২১৫ হি.) ও আবু আলী ফারসী (৯০১-৯৮৭ খ্রি.) প্রমুখের সাহচর্যে এসে ভাষা-সাহিত্য, অলংকারশাস্ত্র ও কাব্য রচনায় অনন্য যোগ্যতা অর্জন করেন। সমসাময়িক কবি-সাহিত্যিকদের মাঝে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়।[৪৫]

আরবী ব্যাকরণশাস্ত্রের বিখ্যাত ইমাম আবু আলী ফারসী (৯০১-৯৮৭ খ্রি.) একদিন মুতানাব্বীকে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করলেন, আরবীতে فعلى-এর ওযনে কয়টি ইসমে জমা'র সিগাহ ব্যবহার হয়? তিনি সাথে সাথে বলে দিলেন, দুটি সিগাহ ব্যবহার হয়। আর সিগাহ দুটি হচ্ছে, حجلى ও ظربى । আবু আলী বলেন, আমি আরবী অভিধানসমূহ তিন দিন ধরে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সত্যিই এর বেশি তৃতীয়টি বের করতে পারিনি।[৪৬]

কবি মুতানাব্বী ৩১৫ হিজরি / ৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে দামেস্ক থেকে কুফায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং তথায় কিছুদিন অবস্থান করেন। অতঃপর সেখানে তৎকালীন বিজ্ঞ পণ্ডিত আবুল ফযল আল-ক্বারমাতী আল-কুফীর সাথে মিলিত হন এবং তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এরপর সেখান থেকে তিনি বাগদাদে চলে আসেন এবং

---

43 . আবুল বাকা' আল-আকবারী, *শারহু দীওয়ান আবিত্ ত্বায়্যিব আল-মুতানাব্বী*, (বৈরুত : দারুল মা'রিফা), খ. ১, পৃ. ৩২৩।

44 . আবদুর রহমান আল-বারকূকী, *শারহু দীওয়ান আল-মুতানাব্বী*, (বৈরুত : দারুল কিতাব আল-আরবী, ২০০৭), খ. ১, পৃ. ২৩; আবুল হাসান আলী ইব্নে আবদিল আযিয, *আল-ওয়াসেতাতু বাইনাল মুতানাব্বী ওয়া খুসুমিহি*, (মাতবা'আতু ঈসা আল-বা'বী আল-হালাবী, কায়রো, ১৯৬৮ খ্রি.), পৃ. ৪১২।

45 . আবদুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৪।

46 . আবুল হাসান আলী ইব্নে আবদিল আযিয, *আল-ওয়াসেতাতু বাইনাল মুতানাব্বী ওয়া খুসুমিহি*, (মাতবা'আতু ঈসা আল-বা'বী আল-হালাবী, কায়রো, ১৯৬৮ খ্রি.), পৃ. ৪১১।

সেখানকার বিভিন্ন মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে লেখাপড়া করেন ও তৎকালীন নামকরা আলেমদের সাহচর্য লাভ করেন। তিনি সুকরী, নাফতাওয়াই, ইব্‌ন দাসতাওয়াই, আবু বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন দরিদ (৮৩৭-৯৩৩ খ্রি.) প্রমুখ বড়ো বড়ো আলেমদের নিকট লেখাপড়া করেন। এরপর তাঁদের সুযোগ্য শীষ্য আবুল কাসেম ওমর ইব্‌ন সাইফ আল-বাগদাদী (৪১০-৪৮৫ হি.) এবং আবু ইমরান মুসার (১১৩৮-১২০৪ খ্রি.) সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের সাথে জ্ঞানচর্চায় মতবিনিময় করেন। তিনি আরবী সাহিত্যে পান্ডিত্য অর্জন করেন এবং কাব্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। অল্প সময়ের ব্যবধানে তিনি সাহিত্য ও কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে সমসাময়িক সকলকে ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম হন এবং কাব্যজগতে একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন।[৪৭]

[47] . আবুল বাকা' আবদুল্লাহ ইব্‌নে হুসাইন ইব্‌নে আবদুল্লাহ আল-বাগদাদী, *শরহু দেওয়ানিল মুতানাব্বী*, খ. ১, পৃ. ২৪, দারুল মা'রেফাহ, (বৈরুত, ৫৯৮ হি.), পৃ. ৩৮।

৩য় পরিচ্ছেদ
আল্-মুতানাব্বী এর কর্মজীবন

আব্বাসীয় কবি আল-মুতানাব্বী যখন যৌবনে পদার্পণ করেন তখনই তার পিতা ইন্তেকাল করেন। কমবয়সে পিতাকে হারিয়ে বাধ্য হয়েই তাকে কর্মজীবন শুরু করতে হয়। এ পর্যায়ে কবি অর্থ উপার্জনের জন্য সাহিত্যিক প্রসিদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তার সাহিত্যিক প্রসিদ্ধি তাকে গর্বিত করে তোলে।[৪৮] বেশকিছু লোক তার দলে যোগদান করে। ক্রমাগতভাবে তার ভক্তদের সংখ্যা বাড়তে থাকে।[৪৯] ইত্যবসরে তিনি নিজেকে খলিফা বলে দাবি করেন। মুহূর্তের মধ্যে বিষয়টি ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন। খবর পেয়ে রাজ্যপাল তাকে বন্দি করেন। কিন্তু কবি বন্দিশালায় রাজ্যপালের প্রশংসা করে একটি অপূর্ব কবিতা রচনা করলেন। তার সেই কবিতা শুনে মুগ্ধ হয়ে রাজ্যপাল তাকে মুক্ত করে দিলেন। কবিতার দুটি চরণ নিম্নরূপ–

أمالك رقي و من شأنه * هبات اللجين و عتق العبيد

دعوتك عند انقطاع الرجاء * و الموت مني كحبل الوريد

"উন্নতি আপনার জন্যই; আর এর কারণ হলো

আপনি অসহায়দের দান করেন এবং দাসদের মুক্ত করেন।

আমি আপনাকে ডাক দিয়েছি যখন আশা ছিন্ন হয়ে গিয়েছে

আর মৃত্যু যখন আমার শাহরগের নিকটে চলে এসেছে।"[৫০]

উচ্চাভিলাষ

কবি মুতানাব্বীর উচ্চাভিলাষ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল আকাশছোঁয়া। কারাদশা থেকে মুক্তি পেয়ে কবি আরও ভয়াবহ পথে অগ্রসর হলেন।[৫১] জনসমর্থন ও সাহিত্যিক খ্যাতিতে গর্বিত হয়ে সিরিয়ায় বনি কাল্ব গোত্রে, অন্য বর্ণনানুসারে বাদিয়াতুস্ সামাওয়াহ নামক স্থানে ৩২৩ হিজরি সালে তিনি এবার নবি হওয়ার দাবি করেন।[৫২] এতে বনি কালব গোত্রের বেশ কিছু লোক তার অনুসারী হয়ে যায়।[৫৩] কাব্যালংকারে

---

48 . ড. মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী, *প্রাচীন আরবী কবিতা: ইতিহাস ও সংকলন*, আহমাদিয়া প্রিন্টিং প্রেস, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, দ্বিতীয় সং. জানু. ২০১৯, পৃ ৬৫৬।

49 . আবুল বাকা' আল-আকবারী, *শারহু দীওয়ান আবিত্ ত্বায়্যিব আল-মুতানাব্বী*, (বৈরুত : দারুল মা'রিফা), খ. ১, পৃ. ৩২৫।

50 . আবুল বাকা' আবদুল্লাহ ইব্নে হুসাইন ইব্নে আবদুল্লাহ আল-বাগদাদী, *শরহু দেওয়ানিল মুতানাব্বী*, (দারুল মা'রেফাহ, বৈরুত, ৫৯৮ হি.), খ. ২, পৃ. ৬৭।

51 . *দীওয়ানু আল-মুতানাব্বী*, ই'যায আলী সম্পা., (করাচি; মাকতাবাতুল বুশরা, ১ম সং, ২০১১), পৃ. ২৯৭।

52 . যয়্যাত, আহমদ হাসান, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, বৈরুত, দারুল মা'আরিফ, ১৯৯৩ খ্রি.।

সজ্জিত স্বরচিত কবিতাগুলিকে নিজের মু'জিযা (অলৌকিক বিষয়) ও ঐশীবাণী বলে অভিহিত করেন। আবু আলী বলেন, তার দাবিকৃত কিছু ঐশীবাণীর নমুনা আমার কাছে সংরক্ষিত আছে। যেমন :

النظم السيار والفلك الدوار والليل والنهار ان الكافر لفى أخطار - امض على سننك و اقف أثر من قبلك من المرسلين - فان الله قامع بك زيغ من الحد فى دينه و ضل عن سبيله -

"চলমান তারকা, ঘূর্ণয়মান নৌকা এবং রাত্রি ও দিন (এর শপথ!) নিশ্চয়ই কাফিররা চরম ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত। আপনি আপনার তরিকা বা পদ্ধতির ওপর চলুন এবং রাসূলদের মধ্য থেকে আপনার পূর্বে যারা এসেছিল, তাদের পথে থাকুন। নিশ্চয় আল্লাহ আপনার মাধ্যমে দ্বীনের সীমারেখার বক্রতাকে অপনোদন করেছেন এবং তার পথ থেকে বিচ্যুত হওয়াকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন।"[৫৪]

তিনি বলেন, নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও আমার আগমনের এবং নবিত্বের সুসংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, لا نبى بعدى (আমার পরে 'লা' নামের একজন নবি হবেন।) আর আকাশে আমার নাম হলো لا (লা)।[৫৫]

কবি মুতানাব্বীর কথার জাদুতে সম্বোহিত হয়ে সিরিয়ার বহু লোক তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে। সিরিয়ার হিম্‌স প্রদেশের অধিপতি লু'লু' এ বিষয়টি জানতে পেরে এবং অবস্থা বেগতিক দেখে কবিকে বন্দি করে জেলে পাঠিয়ে দেন। অতঃপর দীর্ঘদিন জেলে থাকার পর কবি নিজের ভুল বুঝতে পেরে তাওবা করেন এবং ইসলামে ফিরে আসেন।[৫৬] এতে আবু লু'লু' তাকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে দেন।[৫৭]

আত্মমর্যাদাবোধ ও আরব আভিজাত্য

আরবীয় পরিবার আল-হামদানী গোষ্ঠী বা ব্যক্তির প্রশংসাগীতি রচনার ক্ষেত্রে কবি আল-মুতানাব্বী কোনো বৈষয়িক বা আর্থিক চিন্তা করেননি। নিছক আরব গোষ্ঠীকে তাদের হারানো মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে এবং আরবদের ব্যাপারে কবির উচ্চাকাঙ্ক্ষার যে অভিব্যক্তি তার প্রতিফলন ঘটাতেই তিনি কাব্যসাধনায় মত্ত হন।[৫৮] সাইফুদ্দৌলাহ (৯১৬-৯৬৭ খ্রি.) কর্তৃক নিযুক্ত আনতাকিয়ার গভর্নর আবুল আশাইর আলী

---

53 . *সীওয়ানুল মুতাক্বাফফী শরহে দীওয়ানুল মুতানাব্বী*, অনুবাদ : মুফতী মুতীউর রহমান, ঢাকা : মাকতাবাতুল ফাতাহ বাংলাদেশ, ২০১৪, পৃ. ০৭।

54 . জুরজী যায়দান, *তারীখু আ'দাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : দারু মাকতাবাতিল হায়াত, ১৯৭৩, পৃ. ৫৫৬।

55 . যয়্যাত, আহমদ হাসান, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, বৈরুত, দারুল মা'আরিফ, ১৯৯৩ খ্রি.।

56 . আবুল বাকা' আবদুল্লাহ ইব্‌নে হুসাইন ইব্‌নে আবদুল্লাহ আল-বাগদাদী, *শরহু দেওয়ানিল মুতানাব্বী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭, দারুল মা'রেফাহ, বৈরুত, ৫৯৮ হি.।

57 . *সীওয়ানুল মুতাক্বাফফী শরহে দীওয়ানুল মুতানাব্বী*, অনুবাদ : মুফতী মুতীউর রহমান, ঢাকা : মাকতাবাতুল ফাতাহ বাংলাদেশ, ২০১৪, পৃ. ০৭।

58 . মাহমূদ মুহাম্মদ শাকির, *আল-মুতানাব্বী*, (কায়রো : মাতবা'আতু আল-মাদানী, তা. বি.), খ. ১, পৃ ১৯২।

ইবনুল হোসাইন আল-হামদানীর প্রশংসায় রচিত কবির নিম্নোক্ত পঙ্‌তিতে বিষয়টি ধরা পড়ে। কবি বলেন–

فسرت اليك فى طلب المعالى * وسار سواي فى طلب المعاش -

"মর্যাদার অন্বেষণে আমি আপনার দরবারে আগমন করলাম'

যেখানে অন্যদের আগমন ঘটে জীবিকার অন্বেষণে।"[৫৯]

আত্মমর্যদাবোধ সম্পন্ন কবি আল-মুতানাব্বী আরও বলেন–

انى اصاحب حلمى وهو بى كرم * ولا اصاحب حلمى وهو بى جبن -
ولا اقيم على مال اذل به * ولا الذ بما عرضى به درن -

"সহিষ্ণুতা যদি আমার জন্য মর্যাদাপূর্ণ হয় তখন আমি সহনশীল হই;

এটি যদি কাপুরুষতার শামিল হয় তখন আমি আর সহনশীলতাকে কাজে লাগাই না।

যে অর্থ অসম্মান বয়ে আনে আমি তা আহরণ করি না;

আমার আত্মসম্মানকে কলুষিত করে এমন কিছুকে আমি উপভোগ করি না।"[৬০]

পঙ্‌তিদ্বয়ে কবিকে শান্‌ফারা (মৃত্যু ৫১০ খ্রি.)[৬১] চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে হয়। আত্মম্ভরি কবি নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন–

الخليل والليل والبيداء تعرفنى * والسيف والرمح والقرطاس والقلم -

"অশ্ব, রজনি ও নির্জন মরু আমাকে ভালোভাবেই চেনে;

কাগজ-কলম, তরবারি-বর্শা সবার কাছেই আমি সুপরিচিত।"[৬২]

---

[59]. আবদুর রহমান আল-বারকূকী, *শারহু দীওয়ান আল-মুতানাব্বী*, (বৈরুত : দারুল কিতাব আল-আরবী, ২০০৭), খ. ১, পৃ. ৪৪৭।
[60] . আবদুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৭০।

[61]. শান্‌ফারা প্রাচীন আরবের বেদুইন কবিদের অন্যতম। তিনি দক্ষিণ আরবের ইয়ামেন প্রদেশের বিখ্যাত আয্‌দ গোত্রের বনু আওয়াস ইবনে হুজ্‌র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছাবেত ইব্‌নে আউস আল- আয্‌দী। কিন্তু তাঁর কৃষ্ণ চর্ম, পুরু ঠোঁট, আর ে বেশি বাচালতার জন্য তিনি শানফারা নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁর সেরা কাব্যকীর্তি তাঁর *লামিয়াতুল আরব*। এটি আরবী কবিতাবলির উৎকৃষ্ট নিদর্শন।
[62] . আবদুর রহমান আল-বারকূকী, *শারহু দীওয়ান আল-মুতানাব্বী*, (বৈরুত : দারুল কিতাব আল-আরবী, ২০০৭), খ. ২, পৃ. ২৯১।

সাইফুদ্দৌলাহর দরবারে কবি

হিজরি ৩৩৭ সালে দ্বিতীয়বার কারাগার হতে মুক্তিলাভের পর কবি খুবই অর্থ সংকটে পড়েন। তখন তার বয়স হয়েছিল ৩৪ বছর। তখন তিনি দিশেহারা হয়ে অর্থোপার্জনের নেশায় সিরিয়ার আমিরদের দুয়ারে দুয়ারে ধরনা দিতে থাকেন।[৬৩] সেসময়ে ইন্তাকিয়ার রাজ্যপাল আবুল আশাইরের সাথে কবির পরিচয় ঘটে। কবি মুতানাব্বী আবুল আশাইরের প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন। আবুল আশাইর কবিকে সম্মান করেন এবং হলবের আমির সাইফুদ্দৌলাহর দরবারে নিয়ে যান।[৬৪] দরবারের অন্য কবি-সাহিত্যিকদের সম্মুখে কবি মুতানাব্বীকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলে আমির সাইফুদ্দৌলাহ কবিকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেন।[৬৫] তাকে নিজ সভাসদদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। বহু রাজকীয় উপঢৌকনে তাকে ভূষিত করেন। বাৎসরিক তিন হাজার স্বর্ণমুদ্রা তার সম্মানিভাতা নির্ধারণ করেন।[৬৬] যুদ্ধ ও শান্তি সকল অবস্থায় তাকে সঙ্গী হিসেবে রাখার জন্য সামরিক বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এজন্য একমাত্র তার কবিতায় যুদ্ধের বর্ণনা পাওয়া যায়।

কবি আল-মুতানাব্বী সম্মানের সাথেই দীর্ঘ নয় বছর আমির সাইফুদ্দৌলাহর দরবারে রাজকীয়ভাবেই অতিবাহিত করেন। এই নয় বছর তিনি সাইফুদ্দৌলাহ ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি বা মনীষীর প্রশংসাগীতি রচনা করেননি। আল-মুতানাব্বীর এক তৃতীয়াংশ কবিতা সাইফুদ্দৌলাকে কেন্দ্র করেই বিরচিত এবং এগুলো তার জীবনের শ্রেষ্ঠ রচনা হিসেবে বিবেচিত।[৬৭] এ সময় কবি ৩৮টি কাসিদা (দীর্ঘ কবিতা) ও ৩১টি খণ্ড কবিতায় মোট ১৫১২ পঙ্‌তির কবিতা রচনা করেন।[৬৮] ৩৮টি কাসিদার মধ্যে ১৪টি রোমকদের সাথে সংঘটিত রণক্ষেত্রের বর্ণনায়, ৪টি বিভিন্ন আরব গোষ্ঠীর সাথে যুদ্ধের বর্ণনায় এবং ১৫টি প্রশংসাগীতি ও ৫টি শোকগীতি।[৬৯] সাহিত্যসমালোচক ড. ত্বাহা হোসাইন (১৮৮৯-১৯৭৩ খ্রি.) মনে করেন, সাইফুদ্দৌলাহর দরবারে উপস্থাপিত আল-মুতানাব্বীর কবিতাগুলো আরবি কাব্যজগতে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসেবে বিবেচিত এবং এগুলো কালোত্তীর্ণ হওয়ার দাবি রাখে।[৭০]

---

63 . যয়্যাত, আহমদ হাসান, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, (বৈরুত : দারুল মা'আরিফ, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৮৭।

64 . আবুল বাকা' আবদুল্লাহ ইব্‌নে হুসাইন ইব্‌নে আবদুল্লাহ আল-বাগদাদী, *শরহু দেওয়ানিল মুতানাব্বী*, (দারুল মা'রেফাহ, বৈরুত, ৫৯৮ হি.) খ. ৪, পৃ. ২৯০,

65 . আবুল বাকা' আল-আকবারী, *শারহু দীওয়ান আবিত্ ত্বায়্যিব আল-মুতানাব্বী*, (বৈরুত : দারুল মা'রিফা), খ. ১, পৃ. ৩২৯।

66. *সীওয়ানুল মুতাক্বাফফী শরহে দীওয়ানুল মুতানাব্বী*, অনুবাদ : মুফতী মুতীউর রহমান, (ঢাকা : মাকতাবাতুল ফাতাহ বাংলাদেশ, ২০১৪), পৃ. ০৮।

67 . আহমাদ আল-ইসকান্দারী ও অন্যান্য, *আল-মুফাস্‌সাল ফী তারীখিল আদাবিল আরবী*, ড. হাস্‌সান হাল্লাক সম্প., (বৈরুত : দারু ইহ্‌য়াইল উলূম, ১৯৯৪), পৃ. ২৭৯।

68 . আবদুর রহমান আল-বারকূকী, *শারহু দীওয়ান আল-মুতানাব্বী*, (বৈরুত : দারুল কিতাব আল-আরবী, ২০০৭), খ. ১, পৃ. ২৮।

69 . হান্না আল-ফাখূরী, *আল-জামি' ফিল আদাবিল আরাবী ওয়া তারীখিহী*, (২য় সং, বৈরুত : দারুল জীল, ১৯৯১), খ. ১, পাদটীকা, পৃ. ৭৯১।

70 . ড. ত্বহা হোসাইন, *হাদীসুল আরাবিয়্যাহ*, পৃ. ৭৭।

সাইফুদ্দৌলাহর (৯১৬-৯৬৭ খ্রি.) সাথে কবি আল-মুতানাব্বীর মিলন যেন মণিকাঞ্চনযোগ। একদিকে অনন্য আরব চেতনাবাহী বিপ্লবী কবি অপর দিকে অকুতোভয় দিগ্‌বিজয়ী আরব শাসক। এই মিলন একদিকে আল-মুতানাব্বীর অসাধারণ কাব্যপ্রতিভার সার্থক স্ফুরণ ঘটাল, অপরদিকে তার কবিতায় অনন্য সাধারণ সফল আরব প্রশাসক সাইফুদ্দৌলাহকে ইতিহাসের পাতায় চিরঞ্জীব করে রাখল।[৭১] তাইতো কবি এই সাক্ষাৎকে তাঁর জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ উল্লেখ করে বলেন–

سلكت صروف الدهر حتى لقيته * على ظهر عزم مؤيدات قوائمه

مهالك لم تصحب بها الذئب نفسه * ولا حملت فيها الغراب قوادمه

فأبصرت بدرا لا يرى البدر مثله * وخاطبت بحراً لا يرى العبر عائمه

غضبت له لما رأيت صفاته * بلا واصف والشعر تهذي طماطمه

"যুগের দুর্বিপাকে আমি দৃঢ়চিত্তের বাহনে আরোহণ করে বহু পথ অতিক্রম করেছি;

পরিশেষে তার (সাইফুদ্দৌলাহর) সন্ধান পেলাম;

দিগন্তবিস্তৃত এমন নির্জন মরু আমি অতিক্রম করেছি যেথায় (ক্ষুধায়) সিংহের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়

এবং কাকের ডানা (উড়তে) অক্ষম হয়ে পড়ে;

আমি (এই অমানিশার মাঝে) সাইফুদ্দৌলাহরূপ চন্দ্র দেখতে পেলাম; অথচ চন্দ্ররূপে এরূপ লোক (পৃথিবীতে) কখনো দেখিনি;

আমি তাঁর (জ্ঞানগরিমা ও উদারতার) ব্যাপারে সমুদ্রের কাছ থেকেও জানতে চাইলাম, কিন্তু এর সাতারু কূলের কোনো সন্ধান দিতে পারল না;

যখন তাঁর গুণাবলি আমি প্রত্যক্ষ করলাম তখন কোনো প্রশংসাকারী (কবি) না দেখে তাঁর জন্য আমার দুঃখ হলো;

অথচ কবিতা (অন্যান্য কবিগণ) প্রলাপ বকে যাচ্ছে।"[৭২]

---

[71] . মাহমূদ মুহাম্মদ শাকির, *আল-মুতানাব্বী*, (কায়রো : মাতবা'আতু আল-মাদানী, তা. বি.), খ. ১, পৃ ১৯৯।

[72] . আবদুর রহমান আল-বারকূকী, *শারহু দীওয়ান আল-মুতানাব্বী*, (বৈরুত : দারুল কিতাব আল-আরবী, ২০০৭), খ. ২, পৃ. ২৭৩-২৭৪।

কবি বলতে চাচ্ছেন, সুযোগ্য শাসক সাইফুদ্দৌলাহর জন্য যেন যোগ্যকবি একজনই আর তিনি হচ্ছেন কবি নিজেই। উল্লেখ্য যে, আত্মম্ভরি কবি তাঁর প্রশংসিত ব্যক্তির কাছেও নিজের ঔদ্ধত্য প্রকাশে সংকোচবোধ করতেন না। কবি আমির সাইফুদ্দৌলাহকে অনেক সময় অতিমানব হিসেবে উপস্থাপন করার প্রয়াস পান। একবার সাইফুদ্দৌলাহ শত্রু-অভিযানে বের হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এসময় তিনি তাঁর জন্য একটি তাঁবু তৈরির নির্দেশ দিলেন। তাঁবুটি তৈরি হওয়ার পর যখন তিনি এটি পরিদর্শনে বের হলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে প্রবল হাওয়ায় উক্ত তাঁবু ভেঙে গেল। সাইফুদ্দৌলাহ এই দৃশ্যকে অলক্ষুণে মনে করলেন এবং অভিযানে বের না হয়ে পুনরায় প্রাসাদ কুটিরে ফিরে এলেন। এসময় কবি আল-মুতানাব্বী তাঁর কাছে গিয়ে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃতি করেন :

يا سيف دولةِ دين الله دُم أبدا * وعش برغم الأعادي عيشةً رغدا

هل أذهَلَ الناسَ إلا خيمةٌ سقَطَت * من المكارِمِ حتى ألقت العمدا

خرَّت لوجهكَ نحو الأرض ساجدةً * كما يَخِرُّ لوجهِ الله مَن سجَدا

"ওহে আল্লাহর ধর্ম-রাষ্ট্রের তরবারি (সাইফুদ্দৌলাহ)। আপনি দীর্ঘায়ু হোন!

শত্রুদের অনীহা সত্ত্বেও আপনি স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন অতিবাহিত করেন;

তাঁবুর পতন মানুষকে হতভম্ব করে দিয়েছে।

অথচ এটি আপনার ভয়েই পতিত হয়েছে; ফলে এটি খুঁটিসহ পতিত হয়েছে;

আপনার সম্মানেই এটি মাটিতে শির নত করেছে;

যেমনটি সিজদাকারী মানুষ আল্লাহর উদ্দেশ্যেই শির নত করে।"[৭৩]

আমির সাইফুদ্দৌলাহর শৌর্যবীর্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি আল-মুতানাব্বী বলেন-

إن السلاح جميع الناس تحمله * وليس كل ذوات المخلب السبع

"সব লোকই তো অস্ত্র বহন করে (তবে সব সশস্ত্র লোক বিজয়ী হয় না);

জেনে রাখ, প্রত্যেক নখরধারী কিন্তু সিংহ-শার্দুল নয়।"

[73] . *দীওয়ানু আল-মুতানাব্বী*, ই'যায আলী সম্পা., (করাচি; মাকতাবাতুল বুশরা, ১ম সং, ২০১১), পৃ. ২৯৭।

এর দ্বারা কবি বোঝাতে চাচ্ছেন যে, সাইফুদ্দৌলাহই একমাত্র সিংহপুরুষ যার অস্ত্রের আঘাত প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করে দেয়। হামদানী রাজদরবারে বহুমুখী প্রতিভাগুণে গুণান্বিত কবি আল-মুতানাব্বীর একচ্ছত্র প্রভাব প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক হান্না আল-ফাখূরী বলেন–

ونحن نرى أن الشاعر المتنبى جال فى جميع الميادين تعجيزا للفلاسفة والحكماء والشعراء الذين كانوا فى زحمة البلاط الحمدانى والذين أخذ بعضهم يضائقه بالحسد والحقد ويفسد ما بينه و بين الامير -

"আমরা অবাক হয়ে দেখি, যেসব দার্শনিক, জ্ঞানী-গুণী ও কবিগোষ্ঠী হামদানী রাজদরবারে ভিড় জমাত এবং আমিরের সাথে সম্পর্ক নষ্টের জন্য মুতানাব্বীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াত, তাদের সকলকে পরাস্ত করে জ্ঞানের সকল শাখায় বিচরণ করে কবি আল-মুতানাব্বী কীভাবে মর্যাদাপূর্ণ স্থান দখল করে নিলেন।[৭৪]

আল-মুতানাব্বীর প্রতি অন্যান্যদের ঈর্ষা

আমির সাইফুদ্দৌলাহর দরবারে কবি আল-মুতানাব্বীর এরূপ মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান অনেকের ঈর্ষার কারণ হয়ে ওঠে। বিশেষত সাইফুদ্দৌলাহর ঘনিষ্ঠ অনুচর ও সমকালীন অপর কবি আবু ফিরাস আল-হামদানী (মৃ. ৯৬৮ খ্রি./৩৫৭ হি.) ও ইব্নে হালভিয়্যা আন-নাহভী আমিরের কান ভারী করতে থাকে। উল্লেখ্য যে, আমির সাইফুদ্দৌলাহ কবি আল-মুতানাব্বীর জন্য বাৎসরিক সম্মানি নির্ধারণ করে দেন। জমিদারি, নানা হাদিয়া-উপঢৌকন ছাড়াও প্রতি বছর তিন হাজার দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) কবিকে প্রদান করেন। এসবের কারণে একবার ঈর্ষান্বিত হয়ে আবু ফিরাস আল-হামদানী কবি আল-মুতানাব্বীর বিরুদ্ধে আমির সাইফুদ্দৌলাহর কাছে নিম্নোক্ত অভিযোগসহ নিবেদন করলেন–

إن هذا المتشدق كثير الإدلال عليك وأنت تعطيه كل سنة ثلاثة آلاف دينار على ثلاث قصائد - ويمكن أن تغذق مائتى دينار على عشرين شاعرا يأتون بما هو خير من شعره -

"এই বাগাড়ম্বর লোকটি আপনার দরবারে একেবারেই স্পর্ধাহীন; অথচ আপনি তাকে প্রতি বছর তিনটি কাসিদার জন্য তিন হাজার দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) দিয়ে যাচ্ছেন। আপনি চাইলে দুইশত দিনার দিয়ে বিশজন কবিকে (উপঢৌকন দিয়ে) ডুবিয়ে দিতে পারেন, যারা তার চেয়ে উত্তম কবিতা উপস্থাপন করবেন।"[৭৫]

---

74 . হান্না আল-ফাখূরী, *আল-জামি' ফিল আদাবিল আরাবী ওয়া তারীখিহী*, (২য় সং, বৈরুত : দারুল জীল, ১৯৯১), খ. ১, পৃ. ৮০২।

75 . হান্না আল-ফাখূরী, *আল-জামি' ফিল আদাবিল আরাবী ওয়া তারীখিহী*, (২য় সং, বৈরুত : দারুল জীল, ১৯৯১), খ. ১, পাদটীকা, পৃ. ৭৯১।

একদিনের ঘটনা, আমিরের দরবারে আগত আরবী ব্যাকরণবিদ ইব্নে হালভিয়্যা (মৃত্যু ১০৪৪ খ্রি.)-এর সাথে কবির বেশ তর্ক-বিতর্ক হয়। এতে ইব্নে হালভিয়্যাহ হাতের চাবি দিয়ে কবিকে আঘাত করলে কবির দেহ থেকে রক্ত ঝরে পড়ে। এ ঘটনা আমির সাইফুদ্দৌলাহর নিকট গেলেও তিনি কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। ফলে কবি খুবই ব্যথিত হন এবং তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ৩৪৬ হিজরি সালে তিনি মিশরে চলে যান।[৭৬]

বাদশাহ কাফুরের দরবারে কবি

আমির সাইফুদ্দৌলাহর দরবারে প্রাপ্ত দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কবি মিশরে পৌঁছে ইক্শীদ/ইখশাদী বংশীয় শাসক বাদশাহ কাফুর আল-ইখশীদী (৩৫৭-৩৯২ হি./৯০৫-৯৬৮ খ্রি.)-এর দরবারে গিয়ে তাঁর নিকট সাহায্যপ্রার্থনা করেন। কবি তাঁর প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন।[৭৭] বাদশাহ খুশি হয়ে তাকে মিশর কিংবা সিরিয়ার কোনো এক অঞ্চলের গভর্নর বানাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু তিনি কবির অহংকারী স্বভাব ও মিথ্যা নবুয়ত দাবির কথা জানতে পেরে তাকে গভর্নর নিযুক্ত করা থেকে বিরত থাকেন এবং বলেন, যে মিথ্যা নবুয়তের দাবি করতে পারে, সে আলাদা রাজত্বের দাবিও করতে পারে। এরই মধ্যে কবির জনসমর্থন দেখে বাদশাহ কাফুর রীতিমতো ভীত হয়ে পড়েন। ফলে কবিকে এড়িয়ে চলতে থাকেন এবং স্বীয় সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হটেন। তিনি ভাবলেন, আজকে তাকে প্রাদেশিক গভর্নর নিযুক্ত করলে পরে সে মিশরের শাসক হওয়ার দাবি করে বসবে। যারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য কাফুরকে ভর্ৎসনা করল তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন–

يا قومى من إدعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم أما يدعى المملكة بعد كافور

"হে জাতি! যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সা. এর পর নবুয়তের দাবি করতে পারে সে কি কাফুরের পর (গোটা মিশরের সাম্রাজ্যের দাবি করবে না?"[৭৮]

ক্ষমতা ও নেতৃত্ব লাভের চেষ্টায় নিরাশ হয়ে ব্যর্থ মনোরথে কবি আল-মুতানাব্বী বাদশাহ কাফুরের দরবার প্রস্থানপূর্বক মিশর পরিত্যাগ করেন এবং জন্মভূমি কুফায় ফিরে যান। এসময় কবি বাগদাদে

---

76 . যয়্যাত, আহমদ হাসান, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, (বৈরুত, দারুল মা'আরিফ, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ২১৮।

77 . যয়্যাত, আহমদ হাসান, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, (বৈরুত, দারুল মা'আরিফ, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ২১৮।

78 . আবুল বাকা' আল-আকবারী, *শারহু দীওয়ান আবিত্ ত্বায়্যিব আল-মুতানাব্বী*, (মুস্তফা আস্-সাক্কা ও অন্যান্য সম্পা., বৈরুত : দারুল মা'রিফা, তা.বি.), খ. ১, ভূমিকা, পৃ. ওয়া-হা।

যাতায়াত করতেন এবং তথাকার বিদদ্ধজনদের মধ্যে করো কারো সাথে সুসম্পর্ক যেমন গড়ে তোলেন, আবার কারো কারো সাথে তিক্ত সম্পর্কেরও সূচনা হয়।[৭৯]

একপর্যায়ে কবি বাদশাহ কাফুরের বিরুদ্ধে কুৎসা রচনা করেন। এরপর ৩৫০ হিজরি সালে কবি পারস্যাভিমুখে রওনা হয়ে পারস্য চলে যান।[৮০]

মুহাল্লিবীর দরবারে কবি

পারস্য হতে কবি বাগদাদ অভিমুখে রওনা হন এবং বাগদাদে পৌঁছে উজির মুহাল্লিবীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। মুহাল্লিবী মনে করেছিলেন কবি তাঁর প্রশংসায় কবিতা রচনা করবেন। কিন্তু রাজা-বাদশাহ ব্যতীত অন্য কারো প্রশংসা করার রীতি কবিদের ছিল না। তাই কবি মুহাল্লিবীর প্রশংসা করে কোনো কবিতা রচনা করেননি। ফলে মুহাল্লিবী অসন্তুষ্ট হয়ে মুতানাব্বীর বিরুদ্ধে অন্য কবিদের লেলিয়ে দেন।[৮১] কবির সাথে তখন পুত্র মুহসিন এবং দাস মুফলিহও ছিল। কবি স্বীয় পুত্র ও দাসকে সাথে নিয়ে সেখান থেকে কুফায় চলে যান। সেসময় সাইফুদ্দৌলাহ লোক পাঠিয়ে কবিকে আবারো তাঁর দরবারে আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু কবি তাঁর দরবারে যেতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।[৮২]

ইবনুল আমীদের দরবারে কবি

ফযল ইবনুল আমীদ[৮৩] একজন আরবী গদ্য লেখক এবং পাশাপাশি বনি বুয়াদের উজির ছিলেন। হিজরি ৩৫৪ সালে কবি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য 'আরজান' গমন করেন। সেখানে গিয়ে কবি তাঁর দরবারে তিন মাস যাবৎ অবস্থান করেন।[৮৪] সেসময় সাহিব ইব্নে উব্বাদ কবিকে 'আসবাহানে' আগমনের জন্য আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু কবি সেখানে না গিয়ে খোরাসানের বাদশাহ আযদুদ্দৌলাহর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য রওনা হন। ফলে ইব্নে উব্বাদ রাগান্বিত হয়ে কবির বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া আরম্ভ করেন।

---

79 . *যয়্যাত*, আহমদ হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ ২১৮-২১৯।

80 . আবুল বাকা' আবদুল্লাহ ইব্নে হুসাইন ইব্নে আবদুল্লাহ আল-বাগদাদী, *শরহু দেওয়ানিল মুতানাব্বী*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৯০, দারুল মা'রেফাহ, বৈরুত, ৫৯৮ হি.।

81 . আবুল বাকা' আবদুল্লাহ ইব্নে হুসাইন ইব্নে আবদুল্লাহ আল-বাগদাদী, *শরহু দেওয়ানিল মুতানাব্বী*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৯০, দারুল মা'রেফাহ, বৈরুত, ৫৯৮ হি.।

82 . ড. মুহাম্মদ নিজামুদ্দিন, আবু তাইয়্যিব আল-মুতানাব্বী; *হায়াতুহু ওয়া শা'য়েরিয়্যাতুহু*, মারকাযুল বুহুস আল-ইসলামিয়্যাহ, রাজশাহী, ২০০৮), পৃ. ।

83 .তার নাম আবুল-ফদল মুহাম্মদ ইব্নে আবি আবদিল্লাহ আল-হুসাইন ইব্নে মুহাম্মদ আল-কাতিব। তিনি ইব্নে আল-আমিদ নামে পরিচিত (মৃত্যু ৯৭০ খ্রি.)। তিনি ছিলেন একজন পারস্য রাষ্ট্রনায়ক যিনি বুয়িদ শাসক রুকনের উজির হিসেবে ৯৪০ সাল থেকে মৃত্যুসাল ৯৭০ পর্যন্ত মোট ৩০ বছর দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

84 . ড. মুহাম্মদ নিজামুদ্দিন, আবু তাইয়্যিব আল-মুতানাব্বী; *হায়াতুহু ওয়া শা'য়েরিয়্যাতুহু*, মারকাযুল বুহুস আল-ইসলামিয়্যাহ, রাজশাহী, ২০০৮), পৃ. ।

আযদুদ্দৌলাহর দরবারে কবি

কবি খোরাসনের বাদশাহ আযদুদ্দৌলাহর (৯৩৬-৮৯৩ খ্রি.) দরবারে আসলে বাদশাহ কবিকে খুবই সম্মান করেন। কবি বাদশার প্রশংসায় ছয়টি কবিতা রচনা করেন। ফলে বাদশাহ সন্তুষ্ট হয়ে কবিকে তিন হাজার স্বর্ণমুদ্রা, ঘোড়া ও অনেক মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী দ্বারা পুরস্কৃত করেন।[৮৫] আবু মানসুর ছা'লাবী (৯৬১-১০৩৮ খ্রি.) তাঁর রচিত 'ইয়াতিমাতুদ দাহর' গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, সব মিলিয়ে কবির পুরস্কারের পরিমাণ হবে প্রায় তিন লক্ষ দিরহাম। আযদুদ্দৌলাহর দরবারে কবি বেশ ভালোই চলছিলেন। এরই মধ্যে একদিন বাদশাহ আযদুদ্দৌলাহ কবিকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে উজিরের মাধ্যমে জানতে চাইলেন যে, সাইফুদ্দৌলাহ ও আযদুদ্দৌলাহর দানের মধ্যে কার দানের পরিমাণ বেশি? জবাবে স্পষ্টভাষী কবি অকপটে বলে ফেললেন–

هذا أجزل إلا أنه متكلف * وسيف الدولة كان يعطى طبعا

"বেশি বটে; তবে এই দান কৃত্রিম ও লৌকিকতাসর্বস্ব।

আর সাইফুদ্দৌলাহ দান করতেন অকৃত্রিম ও স্বভাবগতভাবে।"

আযদুদ্দৌলাহর দানের পরিমাণ বেশি; কিন্তু এটি গর্ব ও লৌকিকতার সাথে দেওয়া হয়েছে। আর সাইফুদ্দৌলাহর দান ছিল মুক্তহস্ত। এ ধরনের জবাব শুনে বাদশাহ আযদুদ্দৌলাহ দারুণভাবে অসন্তুষ্ট হন এবং তাৎক্ষণিক কবিকে রাজদরবার থেকে বিদায় করে দেন। ব্যর্থ হয়ে কবি সেখান থেকে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন।[৮৬]

---

[85] . যয়্যাত, আহমদ হাসান, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, (বৈরুত, দারুল মা'আরিফ, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ ২১৮-২১৯।

[86] . *দীওয়ানু আল-মুতানাব্বী*, ই'যায আলী সম্পা., (করাচি; মাকতাবাতুল বুশরা, ১ম সং, ২০১১), পৃ. ২৯৯।

৪র্থ পরিচ্ছেদ
আল্-মুতানাব্বী এর চরিত্র, কাব্যপ্রতিভা ও মৃত্যু

চরিত্র

কবি আল-মুতানাব্বী ছিলেন স্বাধীনচেতা, দুঃসাহসী ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী।[৮৭] আলী ইব্ন হামযা (মৃত্যু ৩৭৫ হি.) তার চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, আমি মুতানাব্বীকে পরীক্ষা করে তিনটি গুণ পেয়েছি। গুণ তিনটি হলো[৮৮]—

১. তিনি কখনো মিথ্যা বলেননি

২. তিনি কখনো ব্যভিচার করেননি

৩. তিনি কখনো পুং-মৈথুন করেননি।

আর আমি মুতানাব্বীর তিনটি দোষ পেয়েছি। দোষ তিনটি হচ্ছে[৮৯]—

১. তিনি রোজা রাখতেন না

২. তিনি নামাজ পড়তেন না

৩. তিনি কুরআন তিলাওয়াত করতেন না।

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে, তিনি কুরআন তিলাওয়াত না করলে কুরআনের অনুকরণে কবিতা লিখলেন কীভাবে? এর জবাবে বলা হয় যে, হয়তো তিনি ইবাদতের উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াত করতেন না। বরং কবিতা লেখার উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াত করতেন।[৯০]

কাব্যপ্রতিভা

কবি আল-মুতানাব্বীর উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হচ্ছে তার কাব্যপ্রতিভা। তার অসাধারণ কাব্যপ্রতিভা ও কাব্যশাস্ত্রে নিপুণ দক্ষতা থাকার কারণে তিনি একসময় নবি দাবি করেন। তার অসংখ্য শিষ্য ছিল বলে ধারণা করা হয়।[৯১] একটি ঘটনার মাধ্যমেই আমরা তার মেধার পরিচয় পাই। তিনি একবার যা পড়তেন তা আর দ্বিতীয়বার পড়তেন না। কথিত আছে, একবার এক বই বিক্রেতা তাকে বলেছিল, যদি তুমি

---

87 . আবুল বাকা' আল-আকবারী, *শারহু দীওয়ান আবিত্ ত্বায়্যিব আল-মুতানাব্বী*, (বৈরুত : দারুল মা'রিফা), খ. ১, পৃ. ৩২৮।

88 . আবু বকর আহমদ ইবন আলী ইবন সাবেত ইবন আহমাদ ইবন মাহদী আল-খাতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, (দারুল গারাবিল ইসলামী, বৈরুত : ১৪২২ হি.), পৃ. ৫৭২।

89 . আবু বকর আহমদ ইবন আলী ইবন সাবেত ইবন আহমাদ ইবন মাহদী আল-খাতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৩।

90 . আবুল বাকা' আল-আকবারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩২৯।

91 . *দীওয়ানু আল-মুতানাব্বী*, ই'যায আলী সম্পা., (করাচি; মাকতাবাতুল বুশরা, ১ম সং, ২০১১), পৃ. ৩০৫।

বইটি একবার পড়ে মুখস্থ শোনাতে পারো, তাহলে তোমাকে বইটি দিয়ে দেওয়া হবে। যে কথা সে কাজ। একবার পাঠ করেই তাকে মুখস্থ শুনিয়ে বইটি পুরস্কার হিসেবে গ্রহণ করেন।[৯২]

তিনি অল্প বয়সে অনেক কবিতা মুখস্থ করেছিলেন। ফলে কাব্যের প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত হয়ে কাব্য রচনায় তিনি আত্মনিয়োগ করেন।[৯৩]

আরব আভিজাত্য পুনরুদ্ধার : আরবীয় পরিবার আল-হামদানী গোষ্ঠী বা ব্যক্তির প্রশংসাগীতি রচনার ক্ষেত্রে কবি আল-মুতানাব্বী কোনো বৈষয়িক বা আর্থিক চিন্তা করেননি। নিছক আরব গোষ্ঠীর তাদের পূর্ব-আভিজাত্য পুনরুদ্ধারে এবং আরবদের ব্যাপারে কবির উচ্চাকাঙ্ক্ষার যে অভিব্যক্তি তার প্রতিফলন ঘটাতেই তিনি কাব্য সাধনায় মত্ত হন।[৯৪] সাইফুদ্দৌলা কর্তৃক নিযুক্ত আনতাকিয়ার গভর্নর আবুল আশাইর আলী ইবন হুসাইন আল-হামদানীর প্রশংসায় রচিত কবির নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিতে বিষয়টি ধরা পড়ে। কবি বলেন—

فسرت اليك فى طلب المعالى * وسار سواي فى طلب المعاش -

"মর্যাদার অন্বেষণে আমি আপনার দরবারে আগমন করলাম,

যেখানে অন্যদের আগমন ঘটে জীবিকার অন্বেষণে।"[৯৫]

আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন কবি আল-মুতানাব্বী আরও বলেন—

انى اصاحب حلمى وهو بى كرم * ولا اصاحب حلمى وهو بى جبن -

ولا اقيم على مال اذل به * ولا الذ بما عرضى به درن -

"সহিষ্ণুতা যদি আমার জন্য মর্যাদাপূর্ণ হয় তখন আমি সহনশীল হই; এটি যদি কাপুরুষতার শামিল হয় তখন আমি আর সহনশীলতাকে কাজে লাগাই না (বরং অসহিষ্ণু হয়ে উঠি)।

যে অর্থ অসম্মান বয়ে আনে আমি তা আহরণ করি না; এবং আমার আত্মসম্মানকে কলুষিত করে এমন কিছুকে আমি উপভোগ করি না।"[৯৬]

---

92 . মাহমূদ মুহাম্মদ শাকির, *আল-মুতানাব্বী*, (কায়রো : মাতবা'আতু আল-মাদানী, তা. বি.), খ. ১, পৃ ১৯২।

93 . *দীওয়ানু আল-মুতানাব্বী*, ই'যায আলী সম্পা., প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬।

94 . মাহমূদ মুহাম্মদ শাকির, *আল-মুতানাব্বী*, (কায়রো : মাতবা'আতু আল-মাদানী, তা. বি.), খ. ১, পৃ ১৯২।

95 . আবদুর রহমান আল-বারকূকী, *শারহু দীওয়ান আল-মুতানাব্বী*, (বৈরুত : দারুল কিতাব আল-আরবী, ২০০৭), খ. ১, পৃ. ৪৪৭।

96 . আবদুর রহমান আল-বারকূকী, *শারহু দীওয়ান আল-মুতানাব্বী*, (বৈরুত : দারুল কিতাব আল-আরবী, ২০০৭), খ. ২, পৃ. ৪৭০।

পঙ্‌ক্তিদ্বয়ে কবিকে শানফারা-চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে হয়। আত্মম্ভরি কবি নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন—

الخليل والليل والبيداء تعرفنى * والسيف والرمح والقرطاس والقلم -

"অশ্ব, রজনি ও নির্জন মরু আমাকে ভালোভাবেই চেনে;

কাগজ-কলম, তরবারি-বর্শা সবার কাছেই আমি সুপরিচিত।"[৯৭]

কবি আল-মুতানাব্বী ছিলেন খুবই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও আত্মমর্যাদাশীল। তিনি শর্তসাপেক্ষেই সাইফুদ্দৌলার সভাকবি হিসেবে যোগদান করেন। যোগদানের পূর্বে তার শর্ত ছিল, প্রথমত, তিনি দরবারে দাঁড়িয়ে কবিতা আবৃতি করবেন না; বরং উপবিষ্ট হয়েই কবিতা আবৃতি করবেন। দ্বিতীয়ত, দরবারে প্রবেশকালে তিনি ভূমি-চুম্বন তথা মস্তক ঝুঁকাতে পারবেন না। সাইফুদ্দৌলা গুণধর কবির সকল শর্ত মেনে নিয়েই তাকে দরবারে ঠাঁই দেন এবং কবির কাব্যপ্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে নিজেকেও ধন্য মনে করেন।[৯৮]

আল-মুতানাব্বী সম্পর্কে কবি-সাহিত্যিকদের অভিমত : আরবী সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র কবি আল-মুতানাব্বীর প্রতিভা সম্পর্কে সাহিত্যিকদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। তবে প্রাচ্যবিশারদ বিশেষত তার দেশবাসীগণ কাব্যিক প্রতিভা মূল্যায়ন করতে গিয়ে তাকে শ্রেষ্ঠতম আরব কবি বলে আখ্যায়িত করেছেন। এমনকি আবুল আলা আল-মা'আর্‌রী পর্যন্ত তার কাব্যিক প্রতিভার সম্মুখে মাথা নত করেছেন। ইব্‌ন খালকান তাই নিঃসন্দেহে বলেছেন–It is perfection.[99] কবি আল-মুতানাব্বীকে কেউ কেউ কবি সম্রাট ইমরুল কায়েসের[১০০] ওপর স্থান দিয়েছেন। কিছুসংখ্যকের মতানুসারে তিনি চূড়ান্তভাবে কাব্য সাহিত্যে প্রথম স্থানের অধিকারী। আবুল আলা আল-মা'আর্‌রী[১০১] কবিতার দু-একটি শব্দ পরিবর্তন

---

97 . আবদুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৯১।

98 . ড. মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৫৭।

99 . আবুল বাকা' আল-আকবারী, শারহু দীওয়ান আবিত্ ত্বায়্যিব আল-মুতানাব্বী, (বৈরুত : দারুল মা'রিফা), খ. ১, পৃ. ৩৩২।

100. আরবী কবিতার সম্রাট কবি ইমরুল কায়েস। আসল নাম আবু হারিস হুন্দুজ ইবনে হুযর আল-কিন্দী। ইয়ামনের সামন্ত রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইমরুল কায়েস নামে খ্যাত। তার দাদা ছিলেন হারিস ইবন আমর। ৫০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে হারিস বিশেষ শক্তির অধিকারী ছিলেন। হীরার অধিপতি তৃতীয় মুনযিরকে পরাজিত করে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে মুনযির কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। তার মৃত্যুর পর কিন্দীর রাজত্ব দুর্বল হয়ে পড়ে। তার সন্তানরা ক্ষমতার লড়াইয়ে বিভক্ত হয়ে পড়লে কবির পিতা হুযর বনু আস্‌দ গোত্রের নেতৃত্ব লাভ করেন। কিন্তু কিছুকাল পর বনু আস্‌দ বিদ্রোহ করে ও হুযরকে নিহত করে। কবির মাতা ছিলেন তঘলিব গোত্রের সুবিখ্যাত সরদার কুলয়বের বোন। কবিতা, গান আর সুরা এই নিয়ে ছিল তার জীবন। (জুরযী যায়দান, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, ১ম খ. পৃ. ১০৮।)

101. আবুল আ'লা আল-মা'আর্‌রি ছিলেন একজন অন্ধ আরব দার্শনিক, কবি ও লেখক। তিনি আরবের আল-তানুখি গোত্রের লোক। ধর্মীয় বিশ্বাসকে আক্রমণ এবং ইসলাম ও নবিদের বক্তব্য হিসেবে দাবিকৃত ও বিবেচিত সত্যের অধিকারী অন্যান্য ধর্মকে মিথ্যা ও 'সত্য হওয়া অসম্ভব' বলে প্রত্যাখ্যান করে তিনি তার সময়ে একজন বিতর্কিত বুদ্ধিবাদী দার্শনিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি মুসলমান, ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের প্রতি সমানভাবে বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। তিনি ৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০৫৮ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

করতে ইচ্ছা প্রকাশ করতেন। কিন্তু তার ওপরে ওঠার চিন্তা করতে সক্ষম হননি। সমালোচকদের ভেতর সর্বশ্রেষ্ঠ সমালোচক ছা'লাবী কবির সমালোচনা করলেও তার সম্পর্কে উঁচু ধারণা পোষণ করতেন।[১০২]

ছা'লাবী ছাড়াও জুরজানী (১০০৮-১০৭৮ খ্রি.) ও আবুল ফারাজ ইসফাহানীসহ (৮৯৭-৯৬৭ খ্রি.) প্রাচ্য পণ্ডিতগণ আল-মুতানাব্বীর কবিতার সীমিত দোষত্রুটি উল্লেখ করলেও তার কবিতার প্রশংসা করেছেন। মোটকথা, তার কবিতার মূল্যায়নে তৎকালীন এবং পরবর্তী পণ্ডিতগণ তাকে আরবী কবিতার শ্রেষ্ঠ কবি না বললেও শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম কবি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[১০৩]

কবি আল-মুতানাব্বীকে আরবী সাহিত্যাঙ্গনের শ্রেষ্ঠ রত্ন বলা যায়। এজন্য কেউ কেউ তাকে ইংরেজ কবি শেক্সপিয়ারের (১৫৬৪-১৬১৬ খ্রি.) সাথে তুলনা করেছেন। মূলত কবি আল-মুতানাব্বী ছিলেন আব্বাসীয় যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। তার রচিত 'দীওয়ান' (কাব্যগ্রন্থ)-এর অসংখ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ রয়েছে। এরূপ ব্যাখ্যাগ্রন্থের আধিক্যও তার শ্রেষ্ঠত্যের প্রমাণ বা নিদর্শন।[১০৪]

অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী : কবি আল-মুতানাব্বী অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। আরবী সাহিত্যাঙ্গনে কবিতার জগৎকে তিনি স্বীয় অবদানে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ভাষা বিষয়ে অসামান্য দক্ষতার অধিকারী ভাষাপণ্ডিত। তাকে চতুর্থ শতাব্দীর ইমামগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করা হয়।[১০৫] কবি বাশশার বিন বুরদের[১০৬] হাতে যে আধুনিক কাব্যের উৎপত্তি এবং আবু নুওয়াসের[১০৭] হাতে যার বিকাশ, তাকে কবি আল-মুতানাব্বীই পরিণতি দান করেছেন। তিনি আরবী সাহিত্যকে এমন নতুনত্ব দান করেন, যাকে অতিক্রম করা পরবর্তী সময়ে কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি।[১০৮] তার সবচেয়ে বড়ো অবদান হচ্ছে, কবিতার আঙ্গিক নির্মাণ ও প্রকাশ কৌশলের অভিনবত্ব। সে সময় তার সমকক্ষ কেউ ছিল না। তিনি ছিলেন স্বভাবকবি।[১০৯]

---

102 . বুতরুস আল-বুস্তানী, *উদাবা' উল আরব ফিল আসরিল আব্বাসী*, (দারল জীল, ১৯৮৯, বৈরুত, তা.বি.), খ. ২, পৃ. ৪৩-৪৪।

103 . আবুল বাকা' আল-আকবারী, *শারহু দীওয়ান আবিত্ ত্বায়্যিব আল-মুতানাব্বী*, (বৈরুত : দারুল মা'রিফা), খ. ১, পৃ. ৩২৮।

104 . আবুল বাকা' আল-আকবারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩২৯।

105 . আবুল বাকা' আল-আকবারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৩০।

106. তিনি আব্বাসী যুগের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তাঁর কবিতার ভাষা ছিল খুবই প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। প্রশংসামূলক কবিতা রচনায় তিনি খুবই দক্ষ ছিলেন। এ ছাড়া প্রেমের কবিতা, ব্যঙ্গ কবিতা, গৌরবগাথা ও শোকগাথা ইত্যাদিতেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। নাম বাশ্শার। উপনাম আবু মুয়াজ, উপাধি মুরাআ'স। পিতার নাম বুরদ, দাদার নাম ইয়ারজুখ। পিতার দিক থেকে তিনি পরসিক বংশোদ্ভূত এবং মাতার দিক থেকে হাবশীয় ছিলেন। কবির পিতৃপুরুষের আদি বাসস্থান ছিল পূর্ব ইরানের তুখারিস্তান। তিনি ৭১৪ খ্রিষ্টাব্দে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

107. আবু নুয়াস আল হাসান ইব্নে হানি আল-হাকামি। তিনি ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮১৪ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি আবু নুয়াস নামে পরিচিত। ধ্রুপদি আরবি কবিতার শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম। আরবি ছাড়াও তিনি ফারসি ভাষায়ও কবিতা রচনা করেছেন। বর্তমান ইরানের অন্তর্গত আহবাজ শহরে তার জন্ম হয়। তার বাবা ও মা যথাক্রমে আরব ও পারসিয়ান বংশোদ্ভূত ছিলেন।

108 . বুতরুস আল-বুস্তানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৫।

109 . আবুল বাকা' আল-আকবারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩২৯-৩৩০।

বহুমুখী কবিতা রচনা : কবি আল-মুতানাব্বী তার ভ্রমণ বিষয়ে বহুমুখী কবিতা রচনা করেন। তার কবিতার আঙ্গিক গঠনে, শব্দচয়ন ও ভাবের সমন্বয় সাধনের অপূর্ব শিল্পশৈলীর উপস্থাপনে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তার কবিতায় স্বীয় স্বকীয়তা, শব্দচয়নে জাদুকরি অলংকারত্ব এমনই সমৃদ্ধ যে, এর পরিবর্তন, সংযোজন কিংবা অপসারণ করা কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না। আবুল আলা আল-মা'আর্‌রী অনুরূপ কবিতা রচনার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন।[১১০] তার দৃঢ় ইচ্ছা, আত্মপ্রত্যয়, সৃষ্টি রহস্য ইত্যাদি বিষয় কবিতায় পরিস্ফুটিত হয়েছে; যা যুগ যুগ ধরে কবি ও সাহিত্যিকদেরকে অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে। তিনি কাব্য ও দর্শনের সমন্বয় সাধন করেছেন। স্তুতিবাদমূলক কাব্য রচনায় তিনি ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি।[১১১]

আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে বিস্ময়কর ব্যক্তি : বাস্তবেই আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে কবি আল-মুতানাব্বী এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব; যিনি বহুবিধ গুণের যেমন অধিকারী ছিলেন তেমনি বিচিত্র দুষ্টচক্রও তার জীবনচক্রে একাকার হয়েছিল। উচ্চমানের প্রতিভা ও উন্নত স্বভাব যেমন লালন করতেন, তেমনি বিদ্রোহী চরিত্র ও রূঢ় পন্থা অবলম্বনেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।[১১২] এতৎসত্ত্বেও আব্বাসীয় যুগের সবচেয়ে খ্যাতিমান কবি হলেন আল-মুতানাব্বী। সমকালীন আরব দুনিয়াতেই কবির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। কেননা, প্রাচ্যীয় রাজকুটিরেই কবির অধিকাংশ জীবন কাটে। হামদানী, ইখশিদী ও বুয়াইহী শাসকদের দরবার এবং তৎকালীন মুসলিম রাজধানী বাগদাদ, আলেপ্পো, কুফা ও সিরাজ নগরী ছিল কবির বিচরণক্ষেত্র। ফলে উক্ত স্থানের শাসককুল, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী সকলেই কবিকে যেমন ভালোভাবে চিনে নেন, তেমনি তাদের মাধ্যমে কবির পরিচয়ও জগৎবিস্তৃত হয়।[১১৩]

মৃত্যু

কবি আল মুতানাব্বী ক্ষমতা ও নেতৃত্বলাভের চেষ্টায় নিরাশ হয়ে ব্যর্থ মনোরথে বাদশাহ কাফুরের দরবার প্রস্থানপূর্বক মিশর পরিত্যাগ করেন এবং জন্মভূমি কুফায় ফিরে যান। এ সময় কবি বাগদাদে যাতায়াত করতেন এবং তথাকার বিদগ্ধজনদের মধ্যে কারও কারও সাথে সুসম্পর্ক যেমন গড়ে তোলেন, আবার কারো কারো সাথে তিক্ত সম্পর্কেরও সূচনা হয়। পরবর্তীতে তথা হতে সিরাজ নগরীর বুওয়ায়হী বাদশাহ 'আয্‌দুদ দৌলা'-এর দরবারে গমন করেন। কবির প্রশংসাগীতিতে মুগ্ধ হয়ে বাদশাহ 'আয্‌দুদ

---

[110] . আবদুর রহমান আল-বারকূকী, *শারহু দীওয়ান আল-মুতানাব্বী*, (বৈরুত : দারুল কিতাব আল-আরবী, ২০০৭), খ. ১, পৃ. ৪৪৭।

[111] . আবুল বাকা' আল-আকবারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৩১।

[112] . হান্না আল-ফাখূরী, *আল-জামি' ফিল আদাবিল আরাবী ওয়া তারীখিহী*, (বৈরুত : দারুল জীল, ২য় সং, ১৯৯১), খ. ১, পৃ.৭৮৬।

[113] . ড. মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৬৮।

দৌলা' কবিকে অশ্ব ও পোশাক-পরিচ্ছদসহ তিন হাজার দিনার মুদ্রা পারিতোষক হিসেবে প্রদান করেন।[১১৪] তবে ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এখানেও কবি হিংসুক ও ষড়যন্ত্রকারীদের শিকারে পরিণত হন। জৈনিক হিংসুক কবিকে একদা বললেন, সাইফুদ্দৌলার উপঢৌকনের তুলনায় বাদশাহ 'আয্‌দুদ-দৌলা'-এর উপঢৌকনের পরিমাণ কতই-না বেশি! জবাবে স্পষ্টভাষী কবি অকপটে বলে ফেলেন–

هذا أجزل إلا أنه متكلف وسيف الدولة كان يعطى طبعا -

"বেশি বটে; তবে এই দান কৃত্রিম ও লৌকিকতাসর্বস্ব।

আর সাইফুদ্দৌলা দান করতেন অকৃত্রিম ও স্বভাবগতভাবে।"[১১৫]

সাইফুদ্দৌলাহর তুলনায় বাদশাহ 'আয্‌দুদ-দৌলা'-এর অবস্থান ক্ষুদ্র প্রতিপন্ন করায় তিনি কবির ওপর রুষ্ট হন। এতে করে কবি আল-মুতানাব্বী নিজেকে 'আয্‌দুদ-দৌলা'-এর দরবারে আর নিরাপদ মনে করলেন না। ফলে সেখান থেকে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করেন। তবে বিপুল পরিমাণ সম্পদ নিয়ে প্রত্যাবর্তনকালে কবি যখন বাগদাদের কাছাকাছি পৌঁছেন, তখন একদল দস্যু বেদুইন কবির ওপর চড়াও হয় এবং সর্বস্ব ছিনিয়ে নিয়ে কবিকে তার প্রিয় সন্তান ও ভৃত্যসমেত হত্যা করে।

এক মতে, বাদশাহ 'আয্‌দুদ-দৌলা'-এর দরবার তথা মিশর হতে প্রত্যাবর্তনকালে কবি ঘাতক কর্তৃক আক্রান্ত হলে অবস্থা বেগতিক দেখে পলায়নের সিদ্ধান্ত নেন। এসময় কবির ভৃত্য কবিকে এ বলে সতর্ক করেন যে, আপনার পলায়ন সংবাদ লোকে বলাবলি করবে; অথচ আপনিই এই পঙ্‌ক্তির প্রবক্তা ছিলেন–

الخليل والليل والبيداء تعرفنى * والسيف والرمح والقرطاس والقلم -

"অশ্ব, রজনি ও নির্জন মরু আমাকে ভালোভাবেই চেনে;

কাগজ-কলম, তরবারি-বর্শা সবার কাছেই আমি সুপরিচিত।"[১১৬]

এই কথা শুনে কবি ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রতিরোধ আরম্ভ করেন এবং লড়াই করে ভৃত্য ও সন্তানসহ নিহত হন।[১১৭] এ হত্যাকাণ্ডে আরবি সাহিত্যাকাশের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র খসে পড়ল। এটি সংঘটিত হয়েছিল হিজরি ৩৫৪ সনের রমজান মাসে।[১১৮]

---

114 . আহমদ হাসান আয্-যয়্যাত, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, (বৈরুত, দারুল মা'আরিফ, ১৯৯৩ খ্রি.),পৃ ২১৮-২১৯।

115 . আহমদ হাসান আয্-যয়্যাত, প্রাগুক্ত, পৃ ২১৯।

116 . আবদুর রহমান আল-বারকূকী, *শারহু দীওয়ান আল-মুতানাব্বী*, (বৈরুত : দারুল কিতাব আল-আরবী, ২০০৭), খ. ২, পৃ. ২৯১।

মৃত্যু ঘটনায় মতভেদ : তার মৃত্যু ঘটনা নিয়ে কিছুটা মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যেমন :

১. কেউ কেউ বলেন, তাদের মাঝে পূর্ব থেকেই পারস্পরিক শত্রুতা ছিল। যার কারণে ফাতেক আস্‌দীসহ ৪০ জন শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতে হয়েছিল।

২. আহমাদ হাসান আয্-যয়্যাত বলেন, এই যুদ্ধ ও হত্যার পেছনে বাদশাহ 'আয্‌দুদ-দৌলা'-এর গোপন ইঙ্গিত ছিল।[১১৯]

৩. অনেকে বলেন, কবি মুতানাব্বী ফাতেক আস্‌দীর ভাতিজা 'দ্বাব্বা'-এর কুৎসা রটনা করেছিলেন। ফলে ফাতেক আস্‌দী সে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পথিমধ্যে আক্রমণ করেন।

৪. আবার কেউ বলেন, ডাকাতদের অযাচিত আক্রমণে কবি নিহত হন।

৫. কতিপয় সাহিত্যিক বলেন, ৯৬৫ খ্রি. ব্যবিলনের পথে ভ্রমণের সময় একদল ডাকাতের হাতে কবি আল-মুতানাব্বী নিহত হন।[১২০]

---

117 . আহমদ হাসান আয্-যয়্যাত, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, (বৈরুত : দারুল মা'আরিফাহ, ৬ষ্ঠ সং, ২০০০ খ্রি.),পৃ ২১৯।

118 . আবুল বাকা' আবদুল্লাহ ইব্‌নে হুসাইন ইব্‌নে আবদুল্লাহ আল-বাগদাদী, শরহু দীওয়ানিল মুতানাব্বী, দারুল মা'রেফাহ, (বৈরুত, ৫৯৮ হি.), ভূমিকা, পৃ ১ ।

119 . আহমদ হাসান আয্-যয়্যাত, প্রাগুক্ত,পৃ ২১৯-২২০।

120 . শিহাবুদ্দিন আবু আবদুল্লাহ ইয়াকূত ইবন আবদিল্লাহ আর-রুমী, ইরশাদুল আরীব ইলা মা'রেফাতিল আদীব, (দারুল আরাব আল-ইসলামী: বৈরুত, ১৪১৪ হি.), পৃ ২০৫।

তৃতীয় অধ্যায়

কাব্য পরিচিতি, প্রকারভেদ, সংগ্রহ ও সংরক্ষণরীতি এবং বিভিন্ন যুগে কাব্যের ধারা

১ম পরিচ্ছেদ : আরবী কাব্যের পরিচয় ও প্রকারভেদ
২য় পরিচ্ছেদ : আরবী কবিতা সংগ্রহ ও সংরক্ষণরীতি
৩য় পরিচ্ছেদ : যুগের আবর্তনে আরবী কাব্যের ধারাসমূহ
৪র্থ পরিচ্ছেদ : ইসলামে কাব্যচর্চা ও এর প্রতি মহানবি সা.-এর উৎসাহদান

১ম পরিচ্ছেদ
আরবী কাব্যের পরিচয় ও প্রকারভেদ

'কাব্য বা কবিতা'-এর পরিচয়

নিম্নে 'কাব্য বা কবিতা'-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ তুলে ধরা হলো–

আভিধানিক অর্থ :

কাব্য বা কবিতাকে আরবীতে বলা হয় الشعر; শব্দটি বাবে نصرينصر অথবা বাবে كرم يكرم থেকে ইসমে মাসদার। এটি একবচন, এর বহুবচন اشعار। এর শাব্দিক অর্থ হলো উপলব্ধি, অনুভূতি, জ্ঞান, বিবেক, চেতনাশক্তি ইত্যাদি।[১] এটা মূলগতভাবে আরবী শব্দ। কারো কারো মতে, الشعر মূলত হিব্রু শব্দ شير থেকে এসেছে। যেমন প্রখ্যাত সাহিত্যসমালোচক ড. আহমদ আমীন বলেন–

يرى بعض المشتشرقين أن كلمة الشعر مأخوذة من اللغة العربية والعبرانية فكان أصله فيها شير بمعنى الترتيل والتسبيح القدسية-

কতিপয় প্রাচ্য পণ্ডিত মনে করেন যে, الشعر শব্দটি হিব্রু শব্দ شير থেকে এসেছে। যার অর্থ হলো, আবৃতি করা ও পবিত্রতা বর্ণনা করা।[২]

الشعر-এর প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলায় কবিতা বা কাব্য এবং ইংরেজিতে Poetry শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

পারিভাষিক অর্থ :

الشعر বা কাব্যের পারিভাষিক সংজ্ঞায় একাধিক অভিমত লক্ষ করা যায়। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি সংজ্ঞা নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

১. আহমাদ হাসান আয-যাইয়্যাত (১৩০৩-১৩৮৮ হি.) বলেন,[৩]

الشعر هو الكلام الموزون المقفى المعبر عن الأخيلة البديعة والصور المؤثرة البليغة وقد يكون نثرا كما يكون نظما-

'কাব্য বা কবিতা সেই ছন্দবদ্ধ ও মিলযুক্ত বাক্যকে বলা হয়, যা বিরল চিন্তা, নতুন কল্পনা এবং অর্থপূর্ণ ছবি ফুটিয়ে তোলে। আর এটা কখনো কখনো গদ্যের মাধ্যমে হয়, আবার কখনো পদ্যের মাধ্যমে হয়।'

২. আধুনিক কালের প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক শায়খ নাসীফ আল-ইয়াযিজী (১৮০০-১৮৭১ খ্রি.) বলেন,[৪]

---

[1] . লুইস মা'লূফ, *আল-মুনজিদ ফিল লুগাতি ওয়াল আ'লাম* (বৈরুত : দারুল মাশরিক, ১৯৯৭),পৃ.৩৯০-৩৯১।

[2] . ড. আহমাদ আমীন, *ফাজরুল ইসলাম* (কায়রো : আল-মাক্তাবতুন নাহ্যাহ আল- মিসরিয়্যাহ, ১৯৭৫). পৃ. ৫৬।

[3] . আহমাদ হাসান আয-যাইয়্যাত, *তারীখুল আদাবিল আরাবী* (বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ, ১৯৯৬), পৃ.২৮।

[4] . শায়খ নাসীফ আল-ইয়াযিজী, *মাজমূ'উল আদাব ফী ফুনূনিল আ'রাব* (বৈরুত : ১৯৯৪),পৃ.১৫৬।

الشعر كلام يقصد به الوزن والتقفية-

'কবিতা এমন একটি অর্থবহ বাক্য, যার দ্বারা وزن ও قافية উদ্দেশ্য।'

৩. কুদামা ইব্নে জা'ফর (৮৭৩-৯৪৮ খ্রি.) বলেন,[৫]

الشعر قول موزون مقفى يدل على معنى-

'পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে এমন অন্ত্যমিল ও ছন্দবদ্ধ বক্তব্যকে কাব্য বা কবিতা বলা হয়।'

৪. আহমাদ আশ-শায়িব (জন্ম : ১৯৬৩ খ্রি.) বলেন,[৬]

الكلام الموزون المقفى الذى يصور العاطفة والعقل-

'জ্ঞান ও অনুভূতি যে অন্ত্যমিল ও ছন্দবদ্ধ বাক্যের রূপ দান করে তাকে কাব্য বা কবিতা বলে।'

৫. আল্লামা জুরজী যায়দান (১৮৬১-১৯১৪ খ্রি.) বলেন,[৭]

فهو لغة النفس اوصورظاهرة لحقائق غيرظاهرة-

'কাব্য বা কবিতা হলো মনের ভাষা অথবা তা হলো অপ্রকাশ্য বিষয়সমূহকে যথাযথভাবে প্রকাশ করে তোলা।'

৬. আহমদ আল-ইসকান্দারী (১৮৭৫-১৯৩৮ খ্রি.) বলেন,[৮]

انه الكلام الموزون المقفى المنبعث عن عاطفة-

'আবেগ-অনুভূতি থেকে উৎসারিত অন্ত্যমিলযুক্ত ছন্দবদ্ধ বাক্যকে কাব্য বা কবিতা বলে।'

৭. প্রফেসর জিয়াউল হক বলেন,[৯]

'It is an well-adjusted utterance having meaning rhyme and the speaker must have the intention of putting it into metre.'

৮. বাংলা সাহিত্য সমালোচক শ্রীশ চন্দ্র দাশ বলেন,[১০] 'মানব মনের ভাবনা ও কল্পনা যখন যথাবিহীত শব্দ সম্ভারে বাস্তব সুষমামণ্ডিত, চিত্তাকর্ষক ও ছন্দময় রূপ লাভ করে, তখনই তাকে কাব্য বা কবিতা বলে।'

মূলত কবিতা হলো অন্তরের কথা, যেটাকে কবি আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে ছন্দবদ্ধভাবে প্রকাশ করেন। তাইতো বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিতার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,[১১]

---

[5] . কুদামা ইব্নে জা'ফর, *নাকদুশ শি'র* (বাগদাদ : ১৯৬৩), পৃ.৩০৭।

[6] . আহমাদ আশ-শায়িব, *উসূলূন নাকদিল আদাবী* (কায়রো : আল-মাকতাবতুন নাহযাহ আল-মিসরিয়্যাহ, ১৯৯১). পৃ. ৩০৭।

[7] . জুরজী যায়দান, *তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড (বৈরুত : দারু মাকতাবাতিল হায়াত, ১৯৯২), পৃ.৫৯।

[8]. আহমদ আল-ইসকান্দারী, *আল-ওয়াসিত ফিল আদাবিল আরাবী ওয় তারীখিহি*, (মিশর : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ৭ম সংস্করণ, ১৯২৮), পৃ. ৪৫।

[9]. Ziaul Huq, The Principles of Arabic Rhetoric and Prosody (Calcutta : Islamia Art Press, 1st Edition, 1930), P-53.

[10]. শ্রীশ চন্দ্র দাস, *সাহিত্য সন্দর্শন* (ঢাকা : সূচয়নী পাবলিশার্স, ১৯৯৭), পৃ.৮৩।

[11]. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সোনার তরী' (ঢাকা : পাকিস্থান বুক করপোরেশন, ১৯৬৯), পৃ.২৩৪।

অন্তর হতে আহরী বচন

আনন্দলোক করি বিরচন

গীত রস ধারা করি সিঞ্চন

সংসার ধুলি জালে।

এ প্রসঙ্গে ইংরেজি সাহিত্যের প্রখ্যাত কবি ওয়ার্ডস ওয়ার্থের মন্তব্যটি স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেন,[১২]

'Poetry is the spontaneous overflow of powerful Feeling.'

'কবিতা হলো, শক্তিশালী অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ।'

মোটকথা, আবেগ, কল্পনা ও ভাবের সংমিশ্রণে অন্ত্যমিল ও ছন্দবদ্ধ বাক্য ব্যবহার করাকে কাব্য বা কবিতা বলে; যাকে আরবীতে বলা হয় الشعر।

কাব্যের প্রকারভেদ

কাব্য বা কবিতার প্রকারভেদ

আকৃতিগত দিক থেকে الشعر বা কাব্য তথা কবিতা দুই প্রকার। যথা :

১. খণ্ড কবিতা, যাকে আরবীতে قطعة বলা হয়। এর পরিমাপ হলো ১-৭ লাইন, মতান্তরে ১-২৪ লাইন।

২. দীর্ঘ কাব্য বা কবিতা, যাকে আরবীতে قصيدة বলা হয়। এর পরিমাপ হলো ২৪-১০০ লাইন বা তদূর্ধ্ব।

বিষয়বস্তুর দিক বিবেচনায় কাব্য বা কবিতাকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। আর তা হলো–

১. الشعر الذاتى বা subjective poetry, আর এ শ্রেণির কবিতাকে الشعر الغنائى বা গীতিকাব্য বলা হয়।

২. الشعرالموضوعى বা objective poetry, আর এ শ্রেণির কবিতাকেই তন্ময়মূলক কবিতা বলা হয়।

الشعر الغنائى বা الشعر الذاتى বা গীতিকাব্যের বিবরণ

গীতিকাব্যের সংজ্ঞায় একাধিক মত লক্ষণীয়। যেমন–

১. গীতিকাব্যের সংজ্ঞায় আহমাদ হাসান আয-যাইয়্যাত বলেন,[১৩]

هوان يستعد الشاعرمن طبعه و ينقل عن قلبه و يعبر عن شعوره-

---

[12]. Words Worth, *Preface to lyrical Ballads in Norton Anthology of English literature,* (Vol-11, New York : Norton, 1962), P-83.

[13]. আহমাদ হাসান আয-যাইয়্যাত, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০।

‘যে কবিতায় কবি তার স্বভাব, অন্তরের অনুভূতি ও উপলব্ধি প্রকাশ করে তাকে গীতিকাব্য বলে।’

২. ড. আহমাদ আশ-শায়িব বলেন,[১৪]

الشعر الذى يتحدث فيه الشاعر عن نفسه ووجدانه و نزعاته-

‘যে কবিতায় কবি তার আত্ম-অনুভূতি ও ঝোঁক প্রবণতা সম্পর্কে আলোচনা করেন তাকে গীতিকাব্য বলা হয়।’

৩. বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক শ্রীশচন্দ্র দাস এর সংজ্ঞায় বলেন,[১৫] ‘যে কবিতায় কবির আত্ম-অনুভূতি বা একান্ত ব্যক্তিগত বাসনা-কামনা ও আনন্দ-বেদনা তার প্রাণের অন্তঃস্থল থেকে আবেগকল্পিত সুরে অখণ্ড ভাবমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে তাকেই গীতিকাব্য বলে।

আরবী সাহিত্যের প্রায় সকল কবিতা এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

الشعر الغنائى বা গীতিকাব্যের প্রকারভেদ

বিষয়বস্তু বিবেচনায় الشعر الغنائى বা গীতিকাব্য কয়েক প্রকারে বিভক্ত। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকার হচ্ছে–

ক. فخر বা গৌরবগাথা কাব্য

নিজের, পরিবারের এবং নিজ বংশের গর্ব-অহংকার বর্ণনা করে রচিত হয়েছে যেসব কাব্য বা কবিতা, তা-ই فخر বা গৌরবগাথা কাব্য হিসেবে খ্যাত। যেমন, আমর ইব্নে কুলসূম[১৬] নিজ বংশ এবং গোত্র সম্পর্কে গর্ব করে বলেন,[১৭]

فهل حدثت فى جشم بن بكر * بنقص فى خطوب الأولينا

ورثنا مجد علقمة بن سيف * اباح لنا حصون المجد دينا

‘জশম বিন বকর গোত্রে তাদের পূর্ব পুরুষদের ব্যাপারে কোনো কলঙ্ক কি কখনো শুনতে পেয়েছ? তিনি আমাদের জন্য মর্যাদার দুর্গকে বৈধ করে দিয়ে গেছেন। আমরা আলকামা ইব্নে সাইফের মর্যাদা বংশসূত্রে লাভ করেছি।’

---

14. আহমাদ আশ-শায়িব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭।

15. শ্রীশ চন্দ্র দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

16 . তাঁর পূর্ণ নাম আমর ইবনে কুলসূম ইবনে মালিক ইবনে আত্তাব আবু আল-আসওয়াদ আল-তাঘলিবি। তিনি ছিলেন প্রাক-ইসলামী আরবে তাঘলিব গোত্রের একজন বিখ্যাত কবি এবং গোত্রপ্রধান। তার একটি কবিতা মুআল্লাকাতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি কবি আবু লায়লা আল-মুহালহেলের নাতি। তিনি ৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

17. আয-যাওযানী, *শারহুল মু'আল্লাকাতিস সাব'য়ি* (বৈরুত : দারু মাকতাবাতিল হায়াত, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ.২১৫।

খ. حماسة বা বীরত্বগাথা কাব্য

যুদ্ধক্ষেত্রে বা ডাকাতি বা লুটপাটের ক্ষেত্রে নিজের এবং স্বীয় বংশের যে বীরত্ব প্রকাশিত হতো তারই বর্ণনায় রচিত কাব্যগুলো حماسة বা বীরত্বগাথা কাব্য নামে খ্যাত। যেমন, জাহেলি কবি মালিক ইবনুর রাইব[১৮] বলেন,[১৯]

خذها وانى لضراب اذا اختلفت * أيدى الرجال بضرب يختلى البصلا

'লও এ আঘাত, (আর জেনে রেখো) সহযোদ্ধারা যখন পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করে তখন (সে রণোন্মাদনাময় মুহূর্তে) আমি এমন প্রচণ্ড আঘাতকারী, যে আঘাত লৌহ-শিরস্ত্রাণকে পর্যন্ত কেটে ফেলে।'

গ. مدح বা প্রশংসামূলক কাব্য

এটা হলো কোনো মর্যাদাবান ব্যক্তির উত্তম গুণ উল্লেখ করে কাব্য রচনা করা। যেমন কবিতার মাধ্যমে ব্যক্তির বুদ্ধি, পবিত্রতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং বীরত্বের উল্লেখ করা কিংবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে গঠন প্রকৃতির প্রশংসা করা। জাহেলি যুগে না'বিগা (৫৩৫-৬০৫ খ্রি.), আ'শা ও যুহাইর ইব্নে আবী সুলমা (৫২০-৬০৯ খ্রি.) এক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেছেন। যেমন, কবি যুহাইর বলেন,[২০]

وفيهم مقامات حسان ووجوههم * وأندية ينتابها القول و الفعل

وإن جئتهم الفيت حول بيوتهم * مجالس قد يشفى بأحلامها الجهل

'তাদের মধ্যে সুন্দর চেহারার সুদর্শন দল রয়েছে এবং এমন পরামর্শসভা রয়েছে, যেখানে কথা ও কাজ একটার পর একটা প্রকাশিত হতে থাকে। তুমি যখন তাদের কাছে যাবে তখন তাদের গৃহের চারপাশে এমন সভা অনুষ্ঠিত হতে দেখবে, যা স্বীয় জ্ঞান-বুদ্ধির দ্বারা মূর্খতার বিলোপ সাধন করে।'

---

18 . তিনি হলেন বনু মাজিন বিন আমর বিন তামিমের একজন কবি। তার ডাক নাম আবু উকবা। তিনি নজদে বড়ো হয়েছেন। তিনি ছিলেন একজন সাহসী এবং প্রাণঘাতী যুবক; যিনি তার তরবারি ছাড়া রাতে ঘুমাতেন না। তিনি হিজরি ২১ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং হিজরি ৫৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

19. আবূ তাম্মাম, *দীওয়ানুল হামাসাহ* (দেওবন্দ : ইউ, পি, তা.বি.) পৃ. ৪-৫; মুহাম্মদ আল-খাদারী, *মুহাযযাবুল আগানী*, ১ম খণ্ড (মিশর : মুসাহামা মিসরিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ১৬৫।

20. আহমাদ হাসান আয-যাইয়্যাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।

ঘ. هجاء বা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ও কুৎসামূলক কাব্য

এটা হলো কবিতার মাধ্যমে কোন লোকের বা কোনো বংশের দোষ বর্ণনা করা এবং তাদের সৎ ও উত্তম গুণাবলি অস্বীকার করা। যেমন, কবি যুহাইর ইব্নে আবী সুলমা[২১] হিন্স গোত্রের কুৎসা রটনা করে বলেন,[২২]

ومادرى ولست اخال أدرى * أقوم آل حنص أم نساء

'আমি জানি না এবং ধারণাও করতে পারি না যে, হিন্স বংশধররা কি একটি (পুরুষ জাতি), না তারা সব মহিলা।'

ঙ. عتاب বা ভৎসনামূলক কাব্য

هجاء বা ব্যঙ্গ জাতীয় কবিতাই হচ্ছে عتاب বা ভৎসনামূলক কাব্য। তবে আরও একটু কঠোর প্রকৃতির। অর্থাৎ এ জাতীয় কবিতায় কবিগণ তাদের বিপক্ষীয় লোকজন ও গোত্রের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করত এবং তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে ভৎসনা করত। যেমন, জাহেলি কবি যুল-ইসবা আদওয়ানী[২৩] তার চাচাতো ভাইকে লক্ষ্য করে বলেন,[২৪]

لاه ابن عمك لا أفضلت فى حسب * عنى ولا انت ديانى فتخزونى

ولاتقوت عيالى يوم مسغبة * ولا بنفسك فى العزاء تكفينى

'হে আমার প্রিতৃব্যপুত্র! (আল্লাহর ওয়াস্তে) একটু চিন্তা করো যে, এ বাড়াবাড়ি কেন? না তুমি বংশমর্যাদায় আমার থেকে ওপরে, আর না তুমি আমার প্রভু ও প্রতিপালক যে তুমি আমাকে অপদস্থ করবে। না তুমি আমার পরিবার-পরিজনকে ক্ষুধায় আহার্য দাও, আর না তুমি আমাকে ভীষণ কোনো বিপদাপদে সাহায্য করো।'

---

21 . তিনি একজন ইসলাম পূর্ব আরবকবি; যিনি ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। তিনি প্রাক-ইসলামি যুগে আরবী কবিতার জগতে একজন সেরা কবি হিসেবে বিবেচিত। তিনি বনু মুজাইনা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর পিতাও কবি ছিলেন এবং তার বড়ো ছেলে কাব ইব্নে জুহায়িরও কবি ছিলেন; যিনি মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুপ্রেরণায় কবিতা রচনা করতেন। যুহাইর ইব্নে আবি সুলমা ৫২০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬০৯ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

22. আহমাদ ইসকান্দারী, *আল-ওয়াসীত ফিল আদাবিল আরাবী ওয়া তারীখিহি*, (মিশর : মাতবা'তুল মা'আরিফ, ৭ম সংস্করণ, ১৯২৮), পৃ. ৪৮।

23 . তিনি হলেন প্রাক-ইসলামী যুগের একজন প্রখ্যাত কবি। তার প্রকৃত নাম হারসান ইব্নে মুহরিস। তাকে যুল-ইসবা বা আঙুল ওয়ালা বলা হতো। তার পায়ে একটি অতিরিক্ত আঙুল ছিল বলে তাকে এ নামে ডাকা হতো। তিনি শতাধিক বছর বেঁচে ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি চার কন্যাসন্তানের জনক ছিলেন। তার একজন কন্যা উমায়মা কবি ছিলেন। তিনি ৬০২ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

24. আহমাদ হাসান আয-যাইয়্যাত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০।

চ. رثاء বা শোকগাথা কাব্য

যে কবিতায় মৃত ব্যক্তির গুণাগুণ, তার ঘটনাবহুল জীবনের অংশবিশেষ নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকে رثاء বা শোকগাথা কাব্য বলা হয়। যেমন ভাইয়ের স্মরণে মহিলা কবি খানসা রা.[২৫] রচিত শোকগাথা কবিতার নমুনা হচ্ছে–[২৬]

أعينى جودا ولا تجمدا * ألا تبكيان لصخر الندا

ألا تبكيان الجريئ الجميل * ألا تبكيان الفتى السيدا

"হে আমার চক্ষুদ্বয়, বেশি করে অশ্রু ঝরাও, শুকিয়ে যেয়ো না। দান-দক্ষিণার মূর্তপ্রতীক সাখরের জন্য কি তোমার অশ্রু প্রবাহিত করবে না? তোমরা কি কাঁদবে না সুদর্শন বীরযোদ্ধার জন্য? কাঁদবে না যুবক নেতার জন্য?"

ছ. غزل বা প্রেমগাথা কাব্য

যে কবিতার মাধ্যমে কবি তার প্রিয়সীর স্মৃতিচারণ করে থাকেন, তাকে غزل বা প্রেমগাথা কাব্য বলে। যেমন, জাহেলি কবি ইমরুল কায়েস (৫০১-৫৪৪ খ্রি.) তার প্রিয়সীর স্মৃতিচারণ করে বলেন,[২৭]

قفا نبكى من ذكرى حبيب و منزل * بسقط اللوى بين الدخول فحومل

فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها * لما نسجتها من جنوب و شمال

"বন্ধুগণ! থামো, আমরা প্রিয়সী এবং তার বাসস্থানের কথা স্মরণ করে কেঁদে নিই। যা বালুস্তূপের শেষ প্রান্তে দাখুল ও হাওমালের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। আর তুযিহ ও মাকরাতের মাঝখানে আজো তা বিদ্যমান। যেগুলোর বা যে বাড়ির নিদর্শন আজো ধ্বংস হয়ে যায়নি। কারণ উত্তর ও দক্ষিণা বায়ু প্রবাহ তাকে জমিয়ে রেখেছে।"

জ. الوصف বা বর্ণনামূলক কাব্য

যে কবিতার মাধ্যমে বিভিন্ন জিনিষের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়, তাকে الوصف বা বর্ণনামূলক কাব্য বলা হয়। এ বিশ্লেষণ বাস্তবভিত্তিকও হতে পারে, আবার রূপকও হতে পারে। যেন কবি তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ

---

25. তার পূর্ণ নাম তুমাদির বিনতে আমর ইবনে হারিস ইবনে শারিদ আল-সুলামিয়া। তিনি ছিলেন ৭ম শতাব্দীর একজন প্রখ্যাত আরব মহিলা কবি। তিনি নজদ অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহানবি (সা.)-এর সমসাময়িক ছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তার সময়ে মহিলা কবিরা মূলত মৃতদের জন্য শোককবিতা লিখতেন এবং তা জনসম্মুখে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় আবৃত্তি করতেন। তিনি ৬৪৫ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

26. আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী, *মুহাযযাবুল আগানী*, ১ম খণ্ড (মিশর : মুসাহামা মিসরিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ১৫০।

27. মুখতার আলী ইব্নে মুহাম্মদ আলী, *আত-তাওহীদাত* (দেওবন্দ : কুতুবখানা এমদাদিয়া, তা.বি.) পৃ. ৫; *শারহু মু'আল্লাকাতিস সাব'য়ি*, পৃ. ২৯-৩০।

করছেন বা অনুভব করছেন। যেমন নৈস্বর্গিক বর্ণনা, প্রকৃতির বিশেষ মুহূর্ত বা দৃশ্যের বর্ণনা, প্রিয়সীর কাছে পৌঁছবার বাহনের বর্ণনা ইত্যাদি। যেমন জাহেলি কবি ইমরুল কায়েস তার বাহনের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,[২৮]

وقد اغتدى و الطير فى وكناتها * بمنجرد قيد الأوابد هيكل

مكر مفر مقبل مدبر معا * كجلمود صخر حطه السيل من عل

"আমি যখন প্রাতঃভ্রমণে বের হই, তখনো পাখিরা নীড় ছেড়ে বের হয়নি। আর এমন ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বের হই, যার গায়ের পশম অতি অল্প, দ্রুতগামী, সুঠাম, দীর্ঘদেহী অধিকন্তু তা বন্যপশুদের জন্য ফাঁদস্বরূপ। ঘোড়াটি অগ্রে-পশ্চাতে, ডানে-বাঁয়ে প্রচণ্ড আক্রমণ রচনাকারী, একই সঙ্গে অগ্র ও পশ্চাদ্‌গামী। আর এর গতি এত দ্রুত, যেন পানির স্রোত কোনো কঠিন শিলা পাথরকে ওপর থেকে ছুড়ে ফেলে।"

ঝ. حكمة বা জ্ঞানগর্ভ বা নীতিবাক্যমূলক কাব্য

যে সকল কাব্যে কবিরা নিজেদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রজ্ঞাময় অভিব্যক্তিমূলক কাব্য রচনা করেন, তাকেই حكمة বা জ্ঞানগর্ভ বা নীতিবাক্যমূলক কাব্য বলে। যেমন, কবি ওবায়েদ ইবনুল আবরাস[২৯] বলেন,[৩০]

عن المرء لا تسأل و سل عن قرينه * فكل قرين بالمقارن يقتدى

ولا ابتغى ود امرئ قل خيره * وما انا عن وصل صديق بأحيد

'কোনো লোক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না (সে কেমন); বরং তার সঙ্গী ও সহচর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো। কারণ, প্রত্যেক সঙ্গীই (কাজ-কর্ম, আচার-ব্যবহারে) তার সঙ্গীর অনুসরণ করে। আমি এমন লোকের ভালোবাসা চাই না, যার মধ্যে কল্যাণের মাত্রা কম, বন্ধুর মিলন থেকে আমি পৃথক নই।'

الشعر الموضوعى বা তন্ময়মূলক কাব্যের বিবরণ

الشعر الموضوعى-এর সংজ্ঞায় একাধিক মত পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

---

28. *শারহু মু'আল্লাকাতিস সাব'য়ি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩-৬৪।

29. তার পূর্ণ নাম ওবায়েদ ইব্‌নে আবরাস ইব্‌নে হানতাম ইব্‌নে আমের ইব্‌নে মালেক ইব্‌নে যুহাইর ইব্‌নে মালেক ইব্‌নে হারিস ইব্‌নে সা'দ। তিনি কবি সম্রাট ইমরুল কায়েসের সমসাময়িক কবি ছিলেন। ইমরুল কায়েসের সাথে তার দ্বন্দ্ব ও বিতর্ক ছিল। তিনি প্রাক-ইসলামী যুগের খ্যাতিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের অন্যতম। তিনি ছিলেন বনু আসাদ গোত্রের প্রধান কবি। তিনি ৫৯৮ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

30. সাইয়্যিদ আহমদ আল-হাশিমী, *জাওয়াহিরুল আদাব*, ২য় খণ্ড (বৈরুত : দারল কুতুব আল-ইসলামিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ৬৩৫।

১. ড. আহমাদ আমীন বলেন, 'যে কবিতায় কবি বাহ্যিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন তাকে الشعر الموضوعى বা তন্ময়মূলক কাব্য বলা হয়।'[৩১]

২. অধ্যাপক মিনতি কুমার রায় বলেন, 'জগৎ ও জীবনের বস্তুসত্তাকে প্রধান রেখে কবি তার প্রতিভার কিরণচ্ছটায় যে বাণীময় রূপের উন্মোচন করেন তাকেই তন্ময় বা বস্তুনিষ্ঠ কাব্য বা কবিতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।'[৩২]

الشعر الموضوعى বা তন্ময়মূলক কাব্যের প্রকারভেদ

الشعر الموضوعى বা তন্ময়মূলক কাব্য দুই প্রকার। যথা :

ক. الشعر القصصى বা মহাকাব্য (Epic poetry)

খ. الشعر التمثيلى বা নাট্যকাব্য (Dramatic poetry)

এদের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে পেশ করা হলো :

ক. الشعر القصصى বা মহাকাব্য (Epic poetry)

الشعر القصصى বা মহাকাব্য এর সংজ্ঞায় একাধিক মত লক্ষণীয়। যেমন–

১. ড. আহমাদ আমীন (১৮৮৬-১৯৫৪ খ্রি.) বলেন,[৩৩]

كل قصيدة تقص قصة يكون الفرض الظاهرمنها حكاية هذه القصة تسمى شعرا قصصيا-

'যে কাসিদা কোনো কাহিনিকে কেন্দ্র করে রচিত হয় তাকে الشعر القصصى বা মহাকাব্য বলা হয়।'

২. আহমাদ হাসান আয-যাইয়্যাত (১৩০৩-১৩৮৮ খ্রি.) বলেন,[৩৪]

هو نظم الوقائع الحربية والمفاخرالقومية وشكل قصة-

'গল্পের আকৃতিতে কোন জাতির কৃতিত্ব ও যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনাকে الشعر القصصى বা মহাকাব্য বলে।'

৩. ড. হাসান শাযলী ফারহূদ (১১৯৬-১২৫৮ খ্রি.) বলেন,[৩৫]

شعرقصصى لايعبر عن ذات صاحبه بل يدور حول أحداث عظيمة وبطولات وابطال فى فطرة معينة من تاريخ الأمة مع مزج الحقائق التاريخية بروح الأسطورة و الخيال-

---

31. ড. আহমাদ আমীন, আন-নাকদুল আদাবী (করাচি : মাকতাবাহ ইসহাকিয়্যাহ, ১৯৬৩), পৃ. ৭৯।

32. মিনতি কুমার রায়, সাহিত্য সমালোচনা তত্ত্ব, (ভূমিকা ও সম্পাদনা : মোস্তফা আহাদ তালুকদার, ঢাকা : ভাষা প্রকাশ, ১৯৭৮), পৃ. ১২।

33. ড. আহমাদ আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।

34. আহমাদ হাসান আয-যাইয়্যাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

35. ড. হাসান শাযলী ফারহূদ ও অন্যান্য, *আন-নাকদু ওয়াল বালাগাহ* (সৌদি আরব : ওযারাতুল মা'আরিফ, ১৯৮১), পৃ. ৭৭।

'মহাকাব্য এমন একধরনের কাব্য, যাতে কবির শুধু খেয়ালপ্রসূত কোনো বিষয়ের প্রকাশ ঘটবে না, বরং ইতিহাসের পাতা থেকে নেওয়া নির্দিষ্ট সময়ের কোনো বৃহৎ ঘটনাকে কেন্দ্র করে অসংখ্য চরিত্রের সমাহারে তা রচিত, যাতে থাকবে ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কল্পনার মিশ্রণ।'

৪. শ্রীশচন্দ্র দাশ বলেন,[৩৬] 'ঐশী প্রেরণা অনুপ্রাণিত নানা সর্গে বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত যে কাব্যে কোনো সুমহান বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে এক বা বহু বিরচিত চরিত্র অথবা অতিলৌকিক শক্তি সম্পাদিত কোনো নিয়তি নির্ধারিত ঘটনা তেজস্বী ভাষায় বর্ণিত হয় তাকে মহাকাব্য বলা হয়।'

৫. এক্ষেত্রে অ্যারিস্টটলের সংজ্ঞাটি উল্লেখযোগ্য–[৩৭]

As to that poetic imitation (Epic) which is narrative in from and employs a single metre the plat manifestly ought, as in a tragedy, to be contracted on a dramatic principle. It should have for its subject a single action whole and complete which a beginning, middle and end.

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায়, যে কাব্য কোনো কাহিনিকে অবলম্বন করে রচিত হয়, তাকে الشعر القصصى বা মহাকাব্য বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি মহাকাব্যের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। যথা : হোমারের ইলিয়াড, বাল্মীকির রামায়ণ, ব্যাসের মহাভারত, ফেরদৌসীর শাহনামা ইত্যাদি। আরবী সাহিত্যিক সুলায়মান আল-বুসতানী হোমারের ইলিয়াড মহাকাব্যটি সর্বপ্রথম আরবীতে কাব্যানুবাদ করে অমরত্ব লাভ করেন। তা ছাড়া কবি আহমাদ মুহাররম الإلياذة الاسلامية বা ইসলামি মহাকাব্য রচনা করেন।

খ. الشعر التمثيلى বা নাট্য কাব্য (Dramatic poetry)

الشعر التمثيلى বা নাট্য কাব্যের সংজ্ঞায় একাধিক অভিমত পাওয়া যায়। যেমন–

১. ড. হাসান শাযলী ফারহূদ (১১৯৬-১২৫৮ খ্রি.) বলেন,[৩৮]

الشعر التمثيلى هولا يصور عواطفه واحاسيسه بل عواطف الشخصيات التاريخية أو الخيالية التى يصورها واحاسيسها-

[36]. *সাহিত্য সন্দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।

[37]. Words Worth, Preface to lyrical Ballads in Norton Anthology of English literature, (Vol-11, New York : Norton, 1962), P-61.

[38]. *আন-নাকদু ওয়াল বালাগাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।

‘নাট্যকাব্য বলা হয় এমন শ্রেণির কবিতাকে, যা কবির আবেগ-অনুভূতিগুলোকে ফুটিয়ে না তুলে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক চরিত্রের আবেগ-অনুভূতিকে চিত্রায়িত করে।’

২. আহমাদ হাসান আয-যাইয়্যাত (১৩০৩-১৩৮৮ খ্রি.) বলেন,[৩৯]

الشعر التمثيلى هو أن يعتمد الشاعر الى واقعة فيتصور الأشخاص من الذين جرت على أيديهم و ينطق كلا منهم بما يناسبه من الاقوال وينسب إليهم يلائمه من الافعال-

তবে কতক কাব্যসমালোচক কবিতা বা কাব্যকে ছয় ভাগে ভাগ করেছেন।[৪০] যথা :

ক. الشعر القصصى বা মহাকাব্য

খ. الشعر التمثيلى বা নাট্যকাব্য

গ. الشعر الغنائى বা গীতি কাব্য

ঘ. شعر الطبيعة বা প্রকৃতিবিষয়ক কাব্য

ঙ. الشعر التعليمى বা শিক্ষা বা নীতিবিষয়ক কাব্য

চ. شعر الإنسانية বা মানবতাবাদী কাব্য।

উপরোক্ত ছয় প্রকারের মধ্যে প্রথম তিন প্রকারের বর্ণনা পূর্বে দেওয়া হয়েছে। নিম্নে বাকি তিন প্রকারের বর্ণনা পেশ করা হলো। যথা :

شعر الطبيعة বা প্রকৃতিবিষয়ক কাব্য

شعر الطبيعة বা প্রকৃতিবিষয়ক কাব্যের সংজ্ঞায় একাধিক অভিমত রয়েছে। যেমন–

১. ড. আহমাদ আমীন (১৮৮৬-১৯৫৪ খ্রি.)বলেন,[৪১]

نعنى به الشعر الذى موضوعه عالم الطبيعة

‘যে কবিতার বিষয়বস্তু হলো প্রাকৃতিক জগৎকে ঘিরে তাকে شعر الطبيعة বা প্রকৃতিবিষয়ক কাব্য বলা হয়।’

[39]. আহমাদ হাসান আয-যাইয়্যাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

[40]. ড. আহমাদ আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।

[41]. ড. আহমাদ আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫।

২. অধ্যাপক মিনতি কুমার রায় বলেন, 'বহিঃপ্রকৃতির রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ কবি যখন আত্মগত ভাব কল্পনায় গীতিমধুররূপে কবিতায় বা কাব্যে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন তাকে প্রকৃতিবিষয়ক কাব্যরূপে অভিহিত করা হয়।'[৪২]

অর্থাৎ প্রাকৃতিক দৃশ্য, গাছ-পালা, নদ-নদীবিষয়ক কাব্যকে شعر الطبيعة বা প্রকৃতিবিষয়ক কাব্য বলা হয়। যেমন, আরবী সাহিত্যে কবি আল-বুহতুরী (২০৪-২৮০ হি.), আবু নুওয়াস (৭৫৬-৮৪১ খ্রি.) প্রমুখ কবির প্রকৃতিবিষয়ক অনেক কবিতা বা কাব্য বিদ্যমান রয়েছে।

الشعر التعليمى বা শিক্ষা বা নীতিবিষয়ক কাব্য

الشعر التعليمى বা শিক্ষা বা নীতিবিষয়ক কাব্যের একাধিক সংজ্ঞা পাওয়া যায়। যেমন–

১. যে কাব্য বা কবিতায় জ্ঞান, নৈতিক আদর্শ, তত্ত্বকথা ইত্যাদি আলোচিত হয়, তাকে الشعر التعليمى বা শিক্ষা বা নীতিবিষয়ক কাব্য বলা হয়।[৪৩]

২. ড. হাসান শাযলী ফারহূদ (১১৯৬-১২৫৮ খ্রি.) বলেন,

الشعر التعليمى الذى يستند إلى أفكار علمية ولكن لا يخلو من متعة فنية

'শিক্ষাবিষয়ক কবিতা হলো যা জ্ঞানগর্ভ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, তবে তা সাহিত্যের শৈল্পিক রস থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।'[৪৪]

তবে এ ধরনের কবিতায় প্রায় আবেগ থাকে না বললেই চলে। যেমন, এ প্রসঙ্গে মুতানাব্বী (৯১৫-৯৬৫ খ্রি.), সালিহ ইব্নে আবদুল কুদ্দূস, বাশ্শার ইব্নে বুর্দ (৭১৪-৭৮৪ খ্রি.) প্রমুখ কবিদের নীতিমূলক কবিতা বা কাব্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে কোনো কোনো সমালোচক এ ধরনের কাব্যকে সাহিত্য বলতে রাজি নন।[৪৫]

৩. ড. আহমাদ আমীন (১৮৮৬-১৯৫৪ খ্রি.) বলেন,[৪৬]

الشعر التعليمى ليس شعرا مثاليا لأنه خلا تقريبا من قوة العاطفة

'শিক্ষাবিষয়ক কবিতা উপমাসূচক কবিতা নয়। তবে তা প্রায় আবেগপ্রবণতা থেকে বিচ্ছিন্ন।'

---

42. মিনতি কুমার রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।
43. *আন-নাকদু ওয়াল বালাগাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।
44. *আন-নাকদু ওয়াল বালাগাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।
45. *আন-নাকদু ওয়াল বালাগাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।
46. *আন-নাকদুল আদাবী*, ১ম খণ্ড (বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৯৬৭), পৃ. ১০১।

شعر الإنسانية বা মানবতাবাদী কাব্য

যে কাব্য বা কবিতা মানুষের কাজ-কর্মসহ মানবীয় বিষয় ইত্যাদি নিয়ে রচিত হয় তাকে شعر الإنسانية বা মানবতাবাদী কাব্য বলা হয়।[৪৭]

شعر الإنسانية বা মানবতাবাদী কাব্য আবার দু-প্রকার। যথা :

ক. الشعر الإنتخابى বা নির্বাচিত কাব্য

খ. الشعر العالمى বা বৈশ্বিক কাব্য

এদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নরূপ–

ক. الشعر الإنتخابى বা নির্বাচিত কাব্য

যে কবিতায় কোনো বিশেষ সম্প্রদায় ও তাদের কর্মকাণ্ড আলোচিত হয় তাকে الشعر الإنتخابى বা নির্বাচিত কাব্য বলা হয়। অতীত কালের সকল কবিতা এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।[৪৮]

খ. الشعر العالمى বা বৈশ্বিক কাব্য

যে কবিতায় প্রত্যেক সময় ও প্রত্যেক স্থানের সকল মানুষের স্বভাব চিত্রায়িত হয় তাকে الشعرالعالمى বা বৈশ্বিক কাব্য বলা হয়।[৪৯]

---

47. *আন-নাকদুল আদাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯।
48. তদেব, পৃ. ৮৯।
49. তদেব, পৃ. ৯০।

২য় পরিচ্ছেদ
আরবী কবিতা সংগ্রহ ও সংরক্ষণরীতি

প্রাচীন আরবী কবিতা সংগ্রহ ও সংরক্ষণরীতি

জাহেলি যুগে রচিত কাব্যের একটি পঙ্‌ক্তিও নেই, যেটির লিখিত রূপ জাহেলি যুগে ছিল বলে অকাট্য রূপে প্রমাণ করা যায়। প্রাথমিক যুগের রাবি ও কাব্য সংগ্রাহকগণও এ কথা কখনো দাবি করেননি যে, তারা জাহেলি লিপিতে লিখিত কোনো পুস্তিকা বা গ্রন্থ হতে বা অন্য কোনো লিখিত উৎস হতে কবিতা রিওয়ায়েত করেছেন।[৫০] তবে এমন নয় যে, জাহেলি যুগে লিখনশিল্পের কোনো চর্চা ছিল না; উক্ত যুগে কবি লাকীত ইব্‌নে য়া'মার, 'আদী ইব্‌নে যায়দ, আল-মুতালাম্মিসসহ আরও অনেকেই লিখতে জানতেন। মক্কা, মদিনা ও হীরা নগরে লিখনশিল্পের যথেষ্ট প্রসার ঘটেছিল। কিন্তু আরবরা এই লিখনীকে কাব্য সংরক্ষণের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেননি।[৫১] কেননা তখন লিখনশিল্পের চর্চা একদিকে যেমন ছিল কষ্টসাধ্য, অপর দিকে এর উপকরণ ছিল অপ্রতুল ও দুষ্প্রাপ্য। তাই বাণিজ্যিক চুক্তি, যুদ্ধের সন্ধিপত্র ও অঙ্গীকারনামার মতো পারস্পরিক ওয়াদানির্ভর কতিপয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে লিখনশিল্পের ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল।

কুরআনুল কারীম এত মর্যাদাপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর জীবদ্দশায় তথা ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে এটি সামষ্টিকভাবে গ্রন্থাকারে সংকলন করা হয়নি; বরং পরবর্তী সময়ে হযরত আবু বকর (রা.) ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় সাহাবিগণের পরামর্শক্রমে তা একত্রে গ্রন্থবদ্ধ করা হয়। একইভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর পবিত্র হাদিস হিজরি ১ম শতাব্দীর শেষপ্রান্তে এসে লিপিবদ্ধ করা হয়। তৎপূর্বে সাহাবিগণের মুখে মুখে ও বর্ণনা পরম্পরায় হাদিসের বিশাল ভান্ডার সুরক্ষিত হয়ে আসছিল। এতেই প্রমাণিত হয়, জাহেলি যুগে তো নয়ই, ইসলামের প্রারম্ভিক যুগেও প্রাচীন আরবী কবিতা লিখিতরূপে সংরক্ষণের চিন্তা আরবদের মাথায় আসেনি।[৫২] লিখনশিল্প আরবীয় সংস্কৃতির বাহন হয়েছে আরও অনেক পরে। সুতরাং জাহেলি যুগে রাবি ও সংগ্রাহকদের মুখে মুখেই কবিতা সংরক্ষিত হয়ে আসছিল। পরবর্তীতে ইসলামি যুগে এসেই লিখিতরূপে সংরক্ষণ বা সংকলনের সূচনা হয়। বিশিষ্ট গবেষক ড. নাসিরুদ্দীন আল আসাদ মনে করেন, জাহেলি যুগেই কাব্যের লিখিত রূপ বিদ্যমান ছিল এবং তা কিছু কিছু পুস্তিকা আকারে সংকলিত হয়ে ইসলামি যুগ পরবর্তী প্রজন্মের কাছে হস্তগত হয়েছিল। তবে পদ্ধতিগত কারণে ইসলামি যুগের সংগ্রাহকগণ ঐসব পুস্তিকাসমূহকে তথ্যসূত্র হিসেবে উল্লেখ করেননি। তখন জ্ঞানাহরণের নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি ছিল প্রবীণ

---

50 . ড. জাওয়াদ 'আলী, *আল-মুফাস্‌সাল ফী তারীখিল 'আরাব কাবলাল ইসলাম*, ২য় সং, ইরাক : মাকতাবাতু আন-নাহদা, ১৯৭৮, খ. ৯, পৃ.২৫০।

51 . ড. শাওকী দ্বায়ফ, *তারীখুল আদাবিল 'আরবী : আল-'আসরুল জাহেলি*, ২৪শ সং, কায়রো : দারুল মা'আরিফ , তা.বি.,পৃ. ১৩৯-১৪০।

52 . প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১।

জ্ঞানীদের মজলিসে বসে মুখে মুখে ও শোনার মাধ্যমে অজানা তথ্য ও তত্ত্ব আহরণ করা। লিখিতরূপ কোনো গ্রন্থ বা পুস্তিকা সেখানে আনুষাঙ্গিক উপকরণ রূপে কখনো কখনো ব্যবহার করা হতো। তবে সেটি অবশ্যই শায়খ বা গুরুকে পাঠ করে শোনানো হতো। গুরু এর প্রামাণিকতা যাচাইপূর্বক এর ভুল অংশ শুধরে দিতেন, দুর্বোধ্য বিষয় বিশ্লেষণ করতেন এবং পাঠসংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থাকলে তা বর্ণনা করতেন। কেবল লিখিত পুস্তিকার ওপর নির্ভর করে কাব্য রিওয়ায়েত করা তখনকার যুগে অগ্রহণযোগ্য ও নিন্দনীয় বলে বিবেচিত হতো। ওস্তাদ বা গুরু পরম্পরায় মুখে মুখে অর্জিত জ্ঞানই প্রামাণিক ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যা হিসেবে গণ্য হতো; আর লিখিত গ্রন্থ বা পুস্তিকার ভূমিকা সেখানে একান্তই গৌণ ছিল। আর এ কারণেই ইসলামি যুগের রাবিগণ তাদের পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত কোনো পুস্তিকার কথা উল্লেখ করেননি বলে ড. আল-আসাদ মন্তব্য করেন।'[৫৩]

রাবিপ্রথায় কাব্য সংরক্ষণ

জাহেলি যুগে লিখিত আকারে কাব্য সংরক্ষণের ব্যাপারে কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন তথ্য পাওয়া গেলেও সত্যিকার অর্থে সে সময় ব্যাপকহারে কাব্য সংরক্ষিত হয়েছিল স্মৃতিশক্তির সহায়তায় মুখে মুখে ও রাবিপ্রথার মাধ্যমে। কারণ, জাহেলি যুগ হতেই যদি এসব কাব্য লিখিত রূপে সংরক্ষিত হয়ে আসত তাহলে ইসলামি যুগের সংকলকদের হাতে একই কবির কবিতা ও শ্লোকের সংখ্যায় ভিন্ন ভিন্ন মত ও রূপ পরিলক্ষিত হতো না। দেখা যায় কাসিদার পঙ্‌ক্তি সংখ্যা, বিন্যাস পদ্ধতি, এমনকি মূল পাঠ এক এক সংকলকের হাতে এক এক রূপ পরিগ্রহ করেছে। এ থেকে বোঝা যায়, জাহেলি আরবে লিখনশিল্পের চর্চা সীমিত আকারে থাকলেও কাব্য সংরক্ষণে এর ব্যবহার হয়নি বললেই চলে। লিখিত আকারে সংরক্ষিত থাকলে সংকলকদের হাতে তা অভিন্নরূপেই পাওয়া যেত।[৫৪] কদাচিৎ লিখিত পুস্তক-পুস্তিকার সংবাদ পাওয়া গেলেও প্রাথমিক যুগে মূলত রাবিদের মাধ্যমেই প্রাচীন আরবী কবিতা সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হয়ে পরবর্তী প্রজন্মের দ্বারে পৌঁছেছিল। তাঁরা একজন বা বহুজন কবির কবিতা কণ্ঠস্থ করে স্মৃতি-নির্ভরশীল হয়ে আরবের চিরায়ত ঐতিহ্যানুযায়ী মুখে মুখে দীর্ঘকাল সুরক্ষা করে রেখেছিলেন। দেখা যাচ্ছে, রাবিদের মৌখিক বর্ণনাধারাই প্রাচীন আরবী কবিতা সংরক্ষণের প্রধানতম মাধ্যম ছিল। ঐ সময় কবিগণ তাঁদের রাবির সংখ্যাধিক্যের জন্য গর্ববোধ করতেন। আর তাই জনৈক কবি অপর কবিকে উদ্দেশ্য করে বলেন–

ألم تر أن شعري سارعني * وشعرك حول بيتك لا يسير

---

[53] . ড. নাসিরুদ্দীন আল-'আসাদ, *মাসাদিরুশ শি'রিল জাহেলি ওয়া কীমাতুহা আত্-তারীখিয়্যাহ*, ৮ম সং, বৈরুত : দারুল জীল, ১৯৮৮, পৃ. ১৭৯-১৮০।

[54] . ড. জাওয়াদ 'আলী, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২৭০।

"তুমি কি দেখো না আমার কাব্য প্রচার-প্রসার লাভ করে, আর

তোমার কাব্য তোমার গৃহের চৌহদ্দী হতে বের হয় না।"[৫৫]

প্রাচীন আরবী কবিতা সংরক্ষণে শুরু থেকেই রাবিপ্রথার ঐতিহ্য রয়েছে। একজন হবু কবি নিজ উদ্যোগেই অপর প্রবীণ কবির কবিতা রিওয়ায়েত করতেন; তাঁর সাহচর্য লাভ করে তিনি নিজেকে কবিতার রূপ কাঠামো তৈরিতে প্রশিক্ষিত করে তুলতেন।[৫৬] কাব্য রচনায় নৈপুণ্য অর্জনের জন্য রাবিপ্রথা তথা মৌখিক বর্ণনাধারার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বিশিষ্ট প্রাচীন আরবী কবিতাবিশারদ আল আসমা'ঈ বলেন–

" لا يصير الشاعر فى قريض الشعر فحلا حتى يروى أشعار العرب ويسمع الأخبار ويعرف المعانى وتدور فى مسامعه الألفاظ "

" আরবদের কাব্য বর্ণনা, ইতিহাস শ্রবণ, অর্থোপলব্ধি ও শব্দভান্ডার কর্ণগোচর হওয়া ব্যতিরেকে কোনো কবি কাব্য সৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারবে না।"[৫৭]

এরূপ রাবিপ্রথার মাধ্যমে কাব্য সংরক্ষণের বহু উদাহরণ আমরা জাহেলি কাব্যধারায় প্রত্যক্ষ করি। যেমন:

১. প্রবীণ কবি 'আউস ইব্নে হাজারের কাব্যের রাবি ছিলেন যুহায়র ইব্নে আবী সুলমা।

২. যুহায়রের রাবি ছিলেন আল-হুতায়'আ।

৩. আল-হুতায়'আর রাবি ছিলেন হুদবা ইব্নে খাশরাম।

৪. হুদবার রাবি ছিলেন জামীল বুছায়না।

৫. আর জামীল বুছায়নার রাবি ছিলেন কুছায়্যির 'আয্যা।[৫৮]

৬. একইভাবে জাহেলি কবি আল-মুসায়্যাব ইব্নে 'আলাসের রাবি ছিলেন কবি আল-আ'শা কায়েস।

৭. আর আ'শার রাবি ছিলেন 'উবায়দ।[৫৯]

---

55 . ওয়াদ্বিহ রশীদ আন-নাদভী, *তারিখুল আদাবিল 'আরবী* [আল-'আসরুল জাহেলি], ২য় সং, লক্ষ্ণৌ : মু'আস্সাসাতু আস্-সিহাফা ওয়ান্-নাশ্ও, ১৯৯৯, পৃ. ১৭৬।

56 . ড. তাহির আহমদ মাক্কী, *দিরাসাতুন ফী মাসাদিরিল আদাব*, ৭ম সং, কায়রো : দারুল মা'আরিফ, ১৯৯৩, পৃ. ১৩।

57 . ইব্নে রাশীক আল-কায়রাওয়ানী, *আল-'উমদা ফী মাহাসিনিশ শি'রি ওয়া আদাবিহী ওয়া নাকদিহী*, মুহাম্মদ মহিউদ্দিন সম্পা., স্থান অজ্ঞাত : দারু আর-রাশাদ আল-হাদীছা, তা. বি., খ ১, পৃ ১৯৭।

58 . আবুল ফারাজ আল-আসপাহানী, *আল-'আগানী*, অধ্যাপক সামীর জাবির সম্পা., ১ম সং, বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮৬, খ. ৮, পৃ. ৯১।

59 . ইব্নে কুতাইবা, *আশ-শি'রু ওয়াশ শু'অরা*, আহমদ মুহাম্মদ শাকির সম্পা., ২য় সং, মিশর : দারুল মা'অরিফ, ১৯৬৬, খ. ১, পৃ. ১৭৪, ২৬০।

৮. এমনকি জাহেলি যুগের কালজয়ী কবি ইমরুল কায়েসও অন্য একজন প্রবীণ কবির রাবি ছিলেন এবং তাঁর কাব্যে প্রভাবিত হন।

তৎকালীন রাবিপ্রথার গুরুত্ব প্রসঙ্গে সাহিত্য সমালোচক ইব্নে রাশীক আল-কায়রাওয়ানী বলেন–

"وكان امرؤ القيس واوية أبي داؤاد الإيادي مع فضل نحيزة وقوة غريزة ولابد بعد ذلك أن يلوذ به في شعره ويتوكأ عليه كثيرا"

"এত প্রতিভাবান ও শক্তিমান কবি হওয়া সত্ত্বেও ইমরুল কায়েস কবি আবু দুয়াদ আল-ইয়াদীর রাবি ছিলেন। তদুপরি স্বীয় কাব্য রচনায় তিনি আবু দুয়াদের দ্বারস্থ হতেন এবং অনেক ক্ষেত্রে তাঁর ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়তেন।"[৬০]

উল্লেখ্য যে, এই রাবিপ্রথা কেবল জাহেলি যুগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং এর ধারাবাহিকতা উমাইয়া যুগের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাবিপ্রথায় দুটি প্রকৃতি লক্ষ করা যায়। একটি হচ্ছে রাবি, যিনি কেবল একজন কবিরই শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, তাঁরই কবিতা রিওয়ায়েত করেন এবং তাঁরই ভাবাদর্শে উজ্জীবিত হন। যেমন ওপরের উদাহরণে আউস ইব্নে হাজার হতে কুছায়্যিও পর্যন্ত যে ধারাবাহিকতা বিদ্যমান, তাতে আমরা এ রূপটি প্রত্যক্ষ করি। রাবিপ্রথার দ্বিতীয় প্রকৃতিটি হচ্ছে, রাবি কেবল একজন গুরু-কবির কাব্য রিওয়ায়েত করেন না; বরং তিনি নিজস্ব শৈল্পিক রুচি অনুসারে বহুবিধ কবির বিচিত্র কবিতা রিওয়ায়েত ও সংগ্রহ করেন।[৬১] জাহেলি কাব্যের সংরক্ষণে এই দ্বিতীয় প্রকারের রাবিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কেননা, তাঁরা কেবল কবিতা বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হননি; উপরন্তু বর্ণিত কবিতার অনুপুঙ্খ যাচাই-বাছাই ও গঠনমূলক সমালোচনা করে এর মূল্যমান নির্ধারণ করেছেন। এরা প্রায় সকলেই হিজরি ১ম শতাব্দীর রাবি। হিজরি ২য় শতাব্দীর রাবি ও সংকলকগণ মূলত তাদের ওপরই নির্ভরশীল হয়ে জাহেলি কাব্যের সংকলনকর্মে হাত দিয়েছেন।[৬২] কাব্যের পেশাদার রাবি ছাড়াও নিছক সাহিত্য ও জ্ঞানের কৌতূহলী হয়েও কিছু কিছু ব্যক্তিত্ব কাব্য বর্ণনায় উদ্যোগী হন। তাদের মধ্যে প্রবীনতম হচ্ছেন কুরায়েশের ঐ চারজন ব্যক্তি, যারা সমসাময়িককালে কুলজিবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তারা হচ্ছেন মাখরামা ইব্নে নাওফাল (মৃ. ৬৬৪ খ্রি./৫৪হি.), আবু জাহম ইব্নে হুযায়ফা (মৃ. ৬৯০ খ্রি.), 'আকীল ইব্নে আবী তালিব (মৃ. ৬৮০ খ্রি.) ও

---

60 . ইব্নে রাশীক আল-কায়রাওয়ানী, *আল-'উমদা ফী মাহাসিনিশ শি'রি ওয়া আদাবিহী ওয়া নাকদিহী*, খ. ১, পৃ. ১৯৮।

61 . ড. নাসিরুদ্দীন আল-'আসাদ, *মাসাদিরুশ শি'রিল জাহেলি ওয়া কীমাতুহা আত্-তারীখিয়্যাহ*, পৃ. ২২২।

62 . প্রাগুক্ত,পৃ. ২২৫।

হুয়ায়তাব ইব্নে আবদুল উজ্জা (মৃ. ৬৭২ খ্রি.)।[৬৩] মাখরামা হিজরতের প্রায় ষাট বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন এবং মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। খলিফা উমর (রা.) তাকে আরবদের বংশধারা নির্ধারণের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। উসমান (রা.)-এর খিলাফতের সময় তিনি অন্ধ হয়ে যান এবং হিজরি ৫৪ সনে (৬৬৪ খ্রি.) মৃত্যুবরণ করেন।[৬৪]

রাবিগণ সরাসরি কবি হতে যেমন কাব্য সংগ্রহ করতেন, তেমনি কবির অবর্তমানে তাঁর ছেলেমেয়ে বা নিকটাত্মীয়দের কাছ থেকেও কাব্য সংগ্রহ করতেন। যেমন, জাহেলি কবি তামীম ইব্নে মুকবিলের বিপুলসংখ্যক কবিতা তাঁর কন্যা উম্মে শরীফ হতে এবং হাতিম আত্-তাঈয়ের কাব্যের বিরাট একটি অংশ তার সন্তান 'আদী ইব্নে হাতিম হতে সংগৃহীত হয়। আবার আনেক সময় রাবিগণ কবির সংশ্লিষ্ট গোত্রে গমন করে কাব্য সংরক্ষণে অত্যন্ত সচেষ্ট ও যত্নবান ছিল; যেহেতু গোত্রীয় কবিই হচ্ছে তাদের মর্যাদার প্রতীক ও অতীত ঐতিহ্যের ধারক বাহক। যেমনটি উমর ইব্নে কুলছূমের কবিতা নিয়ে তাগলিব গোত্রের লোকদের উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ করা যায়।[৬৫]

পেশাদার রাবিগণ কাব্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অনেক সময় সুদূর মরুভূমিতে গিয়ে বেদুইনদের কাছে ধরনা দিতেন। অথবা পণ্য বেচাকেনার উদ্দেশ্যে যেসব মরুবাসী মরু হতে নগরে আগমন করত তাদের কাছ থেকে পেশাদার রাবিগণ কাব্য আহরণ করে রাখতেন।[৬৬] ইবনুন নাদীম বিরচিত 'আল-ফিহরিস্ত' গ্রন্থের বরাতে এমন বেশ কয়েকজন মরুবাসী বেদুইনের নাম জানা যায় যারা প্রাচীন আরবী কবিতা, প্রাচীন কিংবদন্তি ও উপাখ্যান নগরবাসীর কাছে বিপণনের উদ্দেশ্যে মরু হতে নগরে গমন করত।[৬৭] বস্তুত রাবি হচ্ছে জাহেলি কাব্যের ২য় সংস্করণের মতো, আর এর ১ম সংস্করণ হচ্ছে কবি নিজেই। অনেক সময় একজন কবির জন্য বেশ কয়েকজন রাবি প্রস্তুত হয়ে যান। যে রাবি বিপুলসংখ্যক কাব্য রিওয়ায়েত ও সংরক্ষণ করেন তাকে সাধারণত 'আর-রাবিয়া' (الراوية) বলা হয়।[৬৮]

---

63 . জুরজী যায়দান, *তারীখু 'আদাবিল লুগাহ আল-'আরবীয়্যাহ*, ড. শাওকী দ্বায়ফ সম্পা. ডশশর : দারুল হিলাল, তা. ডব., খ. ১, পৃ. ৮৭; আহমদ আল-ইসকান্দী ও মোস্তফা 'আনানী, *আল ওয়াসীত ফিল আদাবিল 'আরাবি ওয়া তারীখিহী*, ১৮শ সং মিশর : দারুল মা'আরিফা, তা.বি., পৃ. ৯২।

64 . ফুয়াদ সিযগীন, *তারীখুত্ তুরাছিল 'আরাবী*, ড.মাহমূদ ফাহমীকর্তৃক আরবী অনূদিত, সৌদী আরব : আল-ইমাম মুহাম্মদ ইব্নে সা'ঊদ আল-ইসরামি বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩, খ. ১ (২য় অংশ), পৃ. ৩১।

65 . ড. জাওয়াদ 'আলী, *আল-মুফাস্সাল ফী তারীখিল'আরাব কাবলাল ইসলাম*, খ. ৯, পৃ. ৭৬।

66 . ড. মুহাম্মদ সালিহ আশ-শানতী, *ফিল 'আদবিল 'আরাবী আল-কাদীম*, ২য় সং সৌদী আরব : দারুল আনদালুস, ১৯৯৭, খ. ১, পৃ. ৬৪।

67 . মুহাম্মদ ইব্নে ইসহাক আন-নাদীম, *কিতাবুল ফিহইরস্ত*, ২য় সং, তেহরান : তা.বি., পৃ. ৬৫; ড. ইউসুফ খালীফ, *দিরাসাতুন ফিশ্-শি'রিল জাহেলি*, কায়রো : দারু গারীব, তা. বি., পৃ. ২৯।

68 . ড. জাওয়াদ আলী, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২৬৫।

যুগে যুগে প্রাচীন আরবী কবিতা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

কুরআনুল কারিম নাযিল হওয়ার সাথে সাথে কাব্যচর্চায় কিছুটা ভাটা পড়লেও রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবিগণ প্রাচীন আরবী কবিতা সংরক্ষণ ও সংগ্রহে একেবারে পিছপা ছিলেন না; বরং এ ব্যাপারে তারা উদ্যোগী হয়ে অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করতেন। হযরত জাবির ইব্নে সামুরা (রা.) বলেন, আমি শতবারের অধিক রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে একই মজলিসে বসেছি। আমি দেখেছি তাঁর সাহাবিগণ মজলিসে বসে কবিতা আবৃতি করছেন এবং জাহেলি যুগের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন, আর তা দেখে অনেক সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) হাসছেন।[৬৯] শুধু তাই নয়, রাসূলুল্লাহ (সা.) অনেক সময় সাহাবিদের কাছ থেকে অত্যন্ত আগ্রহ ভরে জাহেলি কবিদের কাব্য শুনতেন। একদা তিনি স্বীয় বাহনের পেছনে উপবিষ্ট শারিদ (রা.)-কে বললেন, "আমাকে তুমি উমাইয়া ইব্নে আবিস সালতের কিছু কবিতা শোনাও।" শারিদ (রা.) বললেন, তখন আমি উমাইয়ার কবিতা আবৃতি শুরু করলাম আর তিনি প্রতিটি পঙ্‌ক্তি শোনার পর বলতেন, 'হীহি' বা এগিয়ে চলো। এভাবে আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) -কে একশটি পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করে শোনালাম।"[৭০] সাহাবিগণের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে 'আব্বাস (রা.) প্রাচীন আরবী কবিতা নিয়ে সবচেয়ে বেশি কৌতূহলী ছিলেন। তিনি পবিত্র কুরআনের মর্মোদ্ধারের স্বার্থেই জাহেলি কাব্যের দ্বারস্থ হওয়ার জন্য জোর তাগিদ দিয়েছেন। তিনি বলেন-

"إذا سألتم عن شيئ من غريب القرأن فالتمسوه في الشعر فإن الشعر ديوان العرب"

"কুরআনের কোনো দুর্বোধ্য বিষয়ে তোমরা জিজ্ঞাসিত হলে তখন তোমরা তা কাব্যে অনুসন্ধান করো; কেননা কবিতাই আরবদের তথ্যদপ্তর।"[৭১]

প্রায় একই ভাষায় দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) বলেন–

" أيها الناس عليكم بديوانكم لا تضلوا قالوا وما ديواننا؟ قال : شعر الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم"

"হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের দীওয়ানকে মজবুত করে ধরো, এতে তোমরা বিভ্রান্তিতে পড়বে না। উপস্থিত লোকজন জিজ্ঞেস করল, "আমাদের দীওয়ান কী?" প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, "প্রাচীন আরবী

---

[69] . ইব্নে সা'দ, আত্-তাবাকাতুল কুবরা, লাইডেন : ১৩১২ হি., খ. ১(২য় অংশ), পৃ. ৯৫-৯৬।

[70] . মুসলিম ইব্নুল হাজ্জাজ আন-নীসাপুরী, সহীহ মুসলিম, জার্মানী : জাম'ইয়্যাতুল মাকনাযিল ইসলামী, ১৪১২ হি. খ. ২,পৃ. ৯৭৪-৯৭৫, হাদিস ৬০২২।

[71] . জালালুদ্দীন আস-সুয়ুতী, *আল-মুযাহির ফী 'উলূমিল লুগাহ ওয়া আনওয়া'ইহা*, বৈরুত : দারুল ফিক্‌র, তা.বি., খ. পৃ. ৩০২।

কবিতাই তোমাদের দীওয়ান; এতে তোমাদের গ্রন্থের (কুরআনের) তাফসীর এবং তোমাদের মুখের ভাষার অর্থসমূহ নিহিত রয়েছে।"[৭২]

উপর্যুক্ত উক্তিসমূহ হতে বোঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে প্রাচীন আরবী কবিতা বর্ণনা ও সংরক্ষণের ধারা অব্যাহত ছিল।

উমাইয়া যুগের শুরুতে গোত্রীয় অহমিকা নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। আর কবিতা ছিল এর গুরুত্বপূর্ণ ইন্ধন, তাই প্রত্যেক গোত্র তাদের অতীত ঐতিহ্যবাহী জাহেলি যুগের কাব্যের দিকে মনোনিবেশ করেছে যা তাদের গোত্রীয় কীর্তিসমূহকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরত।[৭৩] উমাইয়া খলিফাগণ এ ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নশীল ছিলেন। হযরত মুআবিয়া (রা.) প্রতিদিন সুনির্দিষ্ট কিছু সময় আরবদের অতীত ইতিহাস, ঘটনাবলি ও কাব্য শ্রবণে ব্যয় করতেন। খলিফা আবদুল মালিক ইব্নে মারওয়ান জাহেলি কাব্যে পারদর্শী ব্যক্তিবর্গকে সম্মান প্রদর্শন করতেন। এ সময় বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিদল রাজদরবারে আগমন করলে খলিফাগণ তাদের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট গোত্রের কবি ও কাব্যের ব্যাপারে নানা কিছু জানতে চাইতেন। যারা সন্তোষজনক উত্তরদানে সক্ষম হতো তাদেরকে নানা উপঢৌকনে পুরস্কৃত করতেন। এমনকি কোনো কাব্য-পঙ্‌ক্তি নিয়ে সিরিয়ায় বিতর্ক দেখা দিলে তা সমাধানের জন্য ডাকযোগে ইরাকে প্রেরণ করে দিতেন।[৭৪]

ইবনুন নাদীমের 'আল-ফিহরিস্ত' গ্রন্থের সুবাদে উমাইয়া যুগের ওয়াহাব ইব্নে মুনাব্বিহ (মৃ.৭৩২ খ্রি./১১৪ হি.)-সহ আরও কয়েকজন সংকলকের কথা জানা যায়। তবে তাদের সংকলনকর্মের কোনো নিদর্শন বর্তমানে পাওয়া যায় না।[৭৫] হিজরি ২য় শতাব্দী হচ্ছে প্রাচীন আরবী কবিতা সংরক্ষণ ও সংকলনের সোনালি যুগ। এ সময় এমন বেশ কয়েকজন রাবির আবির্ভাব ঘটে, যারা প্রাচীন আরবী কবিতা বর্ণনায় নিজেদেরকে নিবেদিত করেন এবং কাব্য বর্ণনা ও সংকলন কর্মকে তারা পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। তারা নগরে বসবাস করলেও বেদুইন জীবন ও সংস্কৃতি নিয়ে তাদের ব্যাপক ধারণা ছিল। মরুতে বেদুইনদের কাছে গমন করে বেদুইনী জীবনধারা, তাদের যাবতীয় তথ্য ও কিংবদন্তি জেনে নিতেন এবং নিজেদের সংগৃহীত ও সংকলিত কাব্য সমগ্রকে তাদের মুখে মুখে মিলিয়ে নিয়ে এর নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করতেন। এই প্রজন্মের প্রথম পর্যায়ে যারা রয়েছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ইবনুস সাইব আল-কালবী (মৃ. ৮১৯ খ্রি./২০৪হি.) ও 'আওয়ানা ইবনুল হাকাম।[৭৬]

---

[72] . ড. জাওয়াদ 'আলী, *আল-মুফাস্‌সাল ফী তারীখিল 'আরাব কাবলাল ইসলাম*, খ. ৯, পৃ. ৩৪১।
[73] . ড. শাওকী দ্বায়ফ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী : আল-'আসরুল জাহেলি*, পৃ. ১৪৫।
[74] . আবুল ফারাজ আল-আসপাহানী, *আল-'আগানী*, খ. ৩, পৃ. ৯১।
[75] . ড. উমর ফাররুখ, *তারীখুল আদাবিল'আরাবী*, খ. ১, পৃ. ১৭৯।
[76] . ড. তাহির আহমদ মাক্কী, *দিরাসাতুন ফী মাসাদিরিল আদাব*, পৃ. ১৬-১৭।

ইবনুস সাইব আল-কালবীর প্রকৃত নাম হচ্ছে হিশাম ইব্নে মুহাম্মদ ইব্নে আস-সাইব আল-কালবী। তিনি মূলত তার পিতার কাছ থেকেই প্রাচীন আরবের ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হন, যিনি এতদবিষয়ক ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ইবনুস সাইব আল-কালবীর বিখ্যাত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– (ক) কিতাবুল আসনাম (খ) কিতাবু নাসবিল খায়ল ফিল জাহেলিয়্যাহ ওয়াল ইসলাম, (গ) আখবারু বাক্র ওয়া তাগলিব এবং (ঘ) কিতাবু মাছালিবিল 'আরাব'।[৭৭]

আওয়ানা ইবনুল হাকাম ছিলেন অন্ধ। তিনি কাব্য ও কুলজিবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থের নাম হচ্ছে–(ক) কিতাবুত্-তারীখ (খ) কিতাবু সীরাতু মু'আভিয়া ওয়া বানূ উমাইয়া।[৭৮] তবে এসব গ্রন্থ বর্তমানে পাওয়া যায় না।[৭৯] সত্যি বলতে কি, আরবগণ জাহেলি যুগে কবিতার কোনো সংকলন প্রস্তুত করেননি; এমনকি ইসলামি যুগেও নয়। উমাইয়া যুগের শেষের দিকে ও আব্বাসীয় যুগের সূচনাপর্বে একদল বর্ণনাকারীর (রাবি) আবির্ভাব হয়, যারা জাহেলি তথা প্রাচীন আরবী কবিতা বর্ণনার ক্ষেত্রে সুখ্যাতি অর্জন করেন। আর তাদের অধিকাংশই ছিলেন বাসরা ও কুফার অধিবাসী।[৮০] পরবর্তী সময়ে মূলত তাদের হাত দিয়ে আরবী কবিতা সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সংকলনের কাজ সম্পাদিত হয়।

কবিতা সংগ্রহ ও সংরক্ষণে বাসরা ও কুফা স্কুলের রাবিগণের ভূমিকা

এ সময় কুফা ও বাসরা নগরীকে কেন্দ্র করে যে ভাষাতাত্ত্বিক দল গড়ে উঠে মূলত তারাই প্রাচীন আরবী কবিতাকে বিস্মৃতির অন্তরার হতে উদ্ধার করেন।[৮১] ভাষা গবেষকগণ তখন আরবী ব্যাকরণ রচনায় মনোযোগ দিয়েছিলেন। তারা আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ওপর গবেষণার প্রয়োজনে খাঁটি ও নিষ্কলুষ আরবীর সন্ধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন প্রচণ্ডরূপে। আর আরবী ভাষার সেই নির্ভেজাল রূপটি প্রাচীন আরবী কবিতায় ছিল অক্ষত ও সুরক্ষিত। তাই এসব কবিতার অনুসন্ধান ও সংরক্ষণ পণ্ডিতদের কাছে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে।[৮২] কুফা ও বসরার ভাষাতাত্ত্বিকগণের মধ্যে নানা বৈয়াকরণিক বিষয় নিয়ে মতদ্বৈততা দেখা দেয় এবং তারা দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রত্যেক শিবিরের নিজস্ব কিছু স্বকীয়তা লক্ষ্য করা যায়। বসরা স্কুলের লক্ষ্য ছিল, ভাষার জন্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও দৃঢ়ভাবে একটি সর্বজনীন ও সামগ্রিক সূত্র প্রস্তুত করা। এক্ষেত্রে কোনো আরবের উক্তি বা বক্তব্য নির্ধারিত সূত্রের ব্যতিক্রম হলে তা অচল ও অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। অপরদিকে কুফা স্কুলের ভাষাতাত্ত্বিকগণ প্রাচীন আরবরা যাই বলেছে তাকেই সম্মানজনক

---

77 . ফুয়াদ সিযগীন, *তারীখুত্ তুরাছিল 'আরবী*, খ. ১ (২য় অংশ), পৃ. ৫১-৫৫।
78 . মুহাম্মদ ইব্নে ইসহাক আন-নাদীম, *কিতাবুল ফিহরিস্ত*, পৃ. ১০৩।
79 . ড. তাহির আহমদ মাক্কী, *দিরাসাতুন ফী মাসাদিরিল আদাব*, পৃ. ১৭।
80 . ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, *আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, কলকাতা : বাণী বুক স্টল, ১৩৮৩ বাং, খ. ১, পৃ. ১৮২-১৮৩।
81 . Reynold A. Nicholson, *A Literary History of the Arabs*, P.127.
82 . আ.ত.ম. মুছলেহউদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, ১ম সং, ঢাকা : ই.ফা.বা., ১৯৮৬, পৃ. ৩৯।

দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং তা ব্যবহার ও প্রয়োগের জন্য সর্বসাধারণ্যে অনুমতি প্রদান করেছেন, এমনকি তা সর্বজনীন সূত্রের (قائدة كلية) আওতায় না পড়লেও। বৈচিত্র্য বা ব্যতিক্রমের প্রতি তাঁদের নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি ছিল।[৮৩] একইভাবে প্রাচীন আরবী কবিতা সংরক্ষণ ও বর্ণনার ক্ষেত্রেও উভয় শিবির ভিন্ন ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতে দেখা যায়। বসরার রাবিগণ কাব্য সংগ্রহে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। অপর দিকে কুফার রাবিগণ কাব্য সংগ্রহে উদার নীতি অবলম্বন করেন এবং যাচাই-বাছাই না করে যা হস্তগত হয়েছে তাই নির্বিচারে গ্রহণ করে নিয়েছেন। এজন্য তাদের সংগৃহীত ও সংরক্ষিত কাব্যভান্ডার বৃহৎ হলেও তা কৃত্রিম ও জাল কবিতায় ভরপুর। সম্ভবত এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিস বর্ণনায় কুফায় অধিকহারে জাল হাদিস অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। যার ফলে মালিক ইব্নে আনাস (রা.) কুফাকে 'দারুদ দ্বারব (دار الضرب) বা নকল গৃহ' নামে আখ্যায়িত করেছেন।[৮৪] তাই সামগ্রিকভাবে দেখা যায়, কূফী রিওয়ায়েতের চেয়ে বাসরী রিওয়ায়েত অধিক প্রামাণিক ও নির্ভরযোগ্য। এ প্রসঙ্গে ইবনুন নাদীম বলেন, "শুরু থেকেই আমরা বাস্রীগণকে প্রাধান্য দিয়ে আসছি, কেননা তাদের কাছ থেকেই আরবীয় জ্ঞান গ্রহণ করা হয়েছে, উপরন্তু বসরা নগরীর প্রতিষ্ঠা কুফার চেয়ে প্রাচীনতম।"[৮৫] তবে এর অর্থ এই নয় যে , কুফার সকল রাবি অভিযুক্ত ও সংশয়যুক্ত আর বসরার সকলেই সত্যনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য। অবশ্য বসরা স্কুলের অগ্রগণ্য হওয়ার শক্তিশালী নেপথ্য কারণ হচ্ছে, এর রাবিদের শিরোমণিতে রয়েছেন আবু 'আমর ইবনুল 'আলা, যিনি বিশ্বস্ত রাবি হিসেবে সর্বমহলে সমাদৃত ও গ্রহণযোগ্য। আর কুফার রাবিদের সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছেন হাম্মাদ আর-রাবিয়া, যার রিওয়ায়েত অনির্ভরযোগ্য এবং জাল বর্ণনার জন্য যিনি অভিযুক্ত।[৮৬] উভয় নগরীর ভাষাতাত্ত্বিক ও রাবিদের মাঝে বিচিত্র দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও প্রাচীন আরবী কবিতাকে সংরক্ষণ ও চিরঞ্জীব করে রাখার নেপথ্যে উক্ত নগরদ্বয়ের মতো আর কোনো নগরী তদনুরূপ অবদান রাখতে পারেনি। মক্কা, মদিনা ছাড়াও জাহেলি কাব্যের প্রতি যাদের চরম ঔৎসুক্য সেই উমাইয়াদের রাজধানী দামেস্ক নগরীর বসরা বা কুফার মতো ভূমিকা রাখতে পারেনি। প্রাচীন আরবী কবিতা বা সাহিত্যের যে গ্রন্থই আমাদের হস্তগত হোক না কেনো তা উল্লিখিত নগরদ্বয়ের মনীষীদের রেখে যাওয়া উত্তরাধিকার পরম্পরায় প্রাপ্ত সম্পদই বলতে হবে।[৮৭]

---

83 . ড. তাহির আহমদ মাক্কী, *দিরাসাতুন ফী মাসাদিরিল আদব*, পৃ. ১৭।

84 . ড. শাওকী দ্বায়ফ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী* : আল-আসরুল জাহেলি, পৃ. ১৪৯।

85 . মুহাম্মদ ইব্নে ইসহাক আন-নাদীম, *কিতাবুল ফিহরিস্ত*, পৃ. ৭১।

86 . ড. শাওকী দ্বায়ফ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী* : আল-'আসরুল জাহেলি, পৃ. ১৪৯।

87 . ড. জাওয়াদ 'আলী, *আল-মুফাস্সাল ফী তারীখিল 'আরাব কাবলাল ইসলাম*, খ. ৯, পৃ. ২৯০-২৯১।

৩য় পরিচ্ছেদ
যুগের আবর্তনে আরবী কাব্যের ধারাসমূহ

কাব্যের ধারাবাহিক সীমানায় মাঝেমধ্যে গতানুগতিকতার পরিবর্তে আবহাওয়ার রদবদল হয়। একজন কবি তার যুগে যে শিল্প-সৌন্দর্যের বাহক, অন্য কবি তার যুগে অনুরূপ নাও হতে পারে। তাই কবিতা একযুগ থেকে আরেক যুগে রূপান্তরিত হয় নতুন আঙ্গিকে নতুন রূপে। যুগের আবর্তনে আরবী কাব্যও বিভিন্ন ধারায় রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন–

জাহেলি যুগে (৫০০-৬১০ খ্রি.) কবিতার উপজীব্য ছিল প্রধানত রমণীর রূপ-সৌন্দর্য, প্রেম-প্রীতি, উপত্যকার চিত্র, বাহনের প্রশংসা, বংশ-গৌরব, যুদ্ধ, মদ, স্তুতি ও শোক ইত্যাদি।

উমাইয়া যুগে (৬৬১-৭৫০ খ্রি.) কবি আখ্তালের (মৃ. ৭১৩ খ্রি.) হিজা, (বিদ্রুপাত্মক কবিতা), কবি জারীর (মৃ. ১১০ হি. মতান্তরে ১১১ হি.) ও ফারয্দক্বের (মৃ. ৭২৮ খ্রি.) নাক্বা'ইদ বা ব্যঙ্গ কবিতা এবং উমর ইবনে আবী রাবীআ'র (মৃ. ৭১২ খ্রি./ ৮২ হি.) গজল বা প্রেমকবিতা[৮৮] কাব্য জগতে নতুন আমেজ নিয়ে আসে।[৮৯]

আব্বাসীয় যুগে (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) শিক্ষা-সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে মুসলিম রাষ্ট্রের সর্বাধিক উন্নতি সাধিত হয়। এ যুগে গ্রিক, ল্যাটিন, ইরান ও ভারতবর্ষের সাহিত্য থেকে বহু বইপুস্তক আরবীতে অনূদিত হয়। ফলত এ যুগের বহুমুখী সংস্কৃতির প্রভাব আরবী কাব্যেও পরিলক্ষিত হয়। এ সময় কবিতার ভাষায় যে বিবর্তন দেখা দিয়েছিল তার উৎকৃষ্টতম নিদর্শন রয়েছে আবু নুওয়াসের (৭৫৬-৮১৪ খ্রি.) কাব্যে। তার 'আল-খামরিয়্যাত' বা মদবিষয়ক কবিতার অন্তর্গত 'ক্বিচ্ছাতু নদমান ও সাক্বি ওয়া খামর' কবিতায় কবি কবিতার প্রারম্ভে প্রেমিকার পরিত্যক্ত বাস্তুভিটা দর্শনে ক্রন্দন করার জাহেলি রীতি পরিহার করার জন্য কবিদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।[৯০] আবু নুওয়াসের (৭৫৬-৮১৪ খ্রি.) মাদকাসক্তি, আবুল আতাহিয়্যার (৭৪৮-৮২৬ খ্রি.) মরমী জীবনবোধ, আল-মুতানাব্বীর (৯১৫-৯৬৫ খ্রি.) স্তুতিগাথা ও আল-মাআররীর (৯৭৩-১০৫৮ খ্রি.) দর্শনে রূপান্তিত হয়ে আরবী কবিতা লাভ করে নবযৌবন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে

---

৪৪ . গজল শব্দটি আরবী। এর অর্থ হলো প্রেমকবিতা। গজলকে প্রণয়-সংগীত বলেও চিহ্নিত করা হয়। গজল আবার কাব্য-সংগীত নামেও পরিচিত। গজলে যেমন মিলনের কথা রয়েছে আবার বিরহের কথাও রয়েছে। তেমনি আবার ভক্তির কথাও রয়েছে। এই ধরনের কবিতার সূচনা হয় জাহেলি যুগে। গজল রচনায় যে বাণীর প্রয়োগ করা হয় তাতে সব ধরনের রসের সমাবেশ দেখা যায়। ফলে গজল কাব্যেও গুণে সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। তাই গজল রসাকি গান হলেও এক ধরনের কাব্য-সংগীত। গজল আরব থেকে উৎপত্তি হলেও ফার্সি ভাষায় এটি বিশেষ বিকাশ লাভ করে। পরবর্তীতে উর্দু ভাষায় এটি সমধিক জনপ্রিয়তা পায়।

89. ড. শাওকী দ্বায়ফ, *তারীখুল আদাবিল আরাবী : আল-আসরুল আব্বাসী আল-আউয়াল*, (৬ষ্ঠ সং, কায়রো : দারুল মা'আরিফ), তা. বি., পৃ ১৯০-১৯১।

90. আবু নুওয়াস, *দীওয়ান*, (বৈরুত : দার আল-কিতাব আল-আরাবী, ১৯৮২), পৃ. ১০।

মোঙ্গলদের আক্রমণে সংস্কৃতির নগরী বাগদাদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলে আরবী কাব্যের অঙ্গন থেকে কবিতার রূপ-লাবণ্য আস্তে আস্তে খসে পড়ে।[৯১]

১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদের পতনের পর থেকে ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে (১২১৩ হি.) নেপোলিয়ন বোনাপার্টের মিশর বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৫৪০ বছরের এ পরিসরে কবি সফিউদ্দিন আল-হিল্লী (জন্ম ১২৭৮ খ্রি.), জালাল উদ্দীন আস-সুয়ূতী (মৃ. ১৫০৫ খ্রি.), আয়েশা আল-বা'উনিয়া (মৃ. ১৫৬৫ খ্রি.) প্রমুখ ব্যতিক্রমধর্মী কয়েকজন কবি-সাহিত্যিকের সীমিত অবদান ছাড়া আরবী ভাষাসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি সাধিত হয়নি। এ সময় কবিতায় নতুন কিছু সৃষ্টি হয়নি। তা ছাড়া মননশীল কাব্যচর্চা এ সময় আদৌ ব্যাপকতা লাভ করেনি আর সমালোচনা এ সময়কে পতনের যুগ (আছর আল-ইনহিতাত) হিসেবে চিহ্নিত করেছে। [৯২]

নেপোলিয়ন বোনাপার্টের মিশর বিজয়ে রাজনৈতিক অবস্থা যাই হোক না কেন এর ফলে আরবী ভাষাসাহিত্যের ক্ষেত্রে নানা সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। ইউরোপের সঙ্গে নতুনভাবে আরব জগতের পরিচয় ঘটে। ফরাসিরা এখানে দুটি শিক্ষা নিকেতন স্থাপন করে। প্রকাশ করে 'আল-আশুর আল-মিশরী ও আত-তানবিয়্যাহ নামে দুটি পত্রিকা, আর নাটক মঞ্চায়নের জন্য প্রতিষ্ঠা করে নাট্যশালা, জ্ঞানর্চচার জন্য অ্যাকাডেমি ও গ্রন্থাগার। পুস্তকাদি মুদ্রণের জন্য স্থাপন করে প্রেস।[৯৩] এ সবের প্রভাবে মিশরের সাহিত্য-সংস্কৃতির নিদ্রিত অঙ্গন জেগে ওঠে। আরবী কাব্য নতুন জীবন লাভ করে।

আরবী কাব্যের আধুনিক ধারার বিকাশ

সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে নতুন চিন্তাধারা ও জাগরণ সৃষ্টি হয়। নতুন সময়ে নতুন চিন্তাধারার প্রেক্ষিতে যেকোনো গতানুগতিক রীতিরই পরিবর্তন সাধিত হয়। ফলে নতুন তাৎপর্যে তা কখনো বহমান থাকতে পারে না। এ ছাড়া মানুষ সব সময় তার স্বভাব অনুসারে এবং সাময়িক অবস্থার শাসনে একটি বিশিষ্ট প্রকাশরীতি আবিষ্কারের জন্য উৎকণ্ঠিত থাকে। পূর্বতন রীতি মানুষের বর্তমান অবস্থার পরিচয়কে প্রকাশ করতে সাধারণত সক্ষম হয় না। তাই দেখা যায়, কবিতা বা চিত্রকলার ভাব বৈলক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প পদ্ধতির পরির্বতন ঘটেছে।[৯৪] আরবী কাব্যও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রাচীন রচনাশৈলীর নিয়ম ভেঙে আরবী

---

91. ড. শাওকী দ্বায়ফ, প্রাগুক্ত, তা. বি., পৃ ১৯১-১৯২।

92. Nicholson, Reynold A, *A literary history of the Arabs*, (London : Cambridge University Press, 1968), P. 448.

93. আয্-যাইয়্যাত, আহমদ হাসান, *তারীখ আল-আদব আল-আরবী*, (কায়রো : দারুন নাহ্দাহ মিশর লিত্তাবাআহ ওয়া আল-নশর, ১৯৩৫), পৃ. ৪১৬।

94. আলী আহসান সৈয়দ, আধুনিক বাংলা কবিতা শব্দের অনুষঙ্গ, (ঢাকা : ১৯৭০), পৃ. ৪১৬।

কবিতা বৈচিত্র্যময় নতুন ধারার দিকে ক্রমশ ধাবিত হয়েছে। আরবী কবিতায় আধুনিক ধারার বিকাশকে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। যথা :

প্রথম পর্যায় : প্রাচীন রীতির অনুসরণ ও নবজাগরণ

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আরবী কাব্যে ওসমানী যুগের তুর্কি কবিতার রচনারীতি থেকে মুক্ত না হলেও দ্বিতীয়ার্ধে কবিতার উপস্থাপন পদ্ধতিতে কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হয়। আরবরা ইউরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে এসে এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে আরবী সাহিত্যে নতুনত্ব আনয়নে সচেষ্ট হন। এ সময় জাহেলি ও আব্বাসী যুগের প্রসিদ্ধ দীওয়ানসমূহ পুনঃমুদ্রিত হয়। এ সময়ের কবিরা প্রাচীন রীতিকে সামনে রেখে নতুন রূপে নতুন সাজে কবিতা লিখতে শুরু করেন। রচনাশৈলীর ক্ষেত্রে পুরাতন ধারা দৃশ্যমান হলেও রাজনৈতিক পট পরিবর্তন, আন্তর্জাতিক অনুভব ও ইউরোপীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রভাবে স্বাভাবিকভাবে কবিতায় নতুনত্বের ছোঁয়া লাগে।[৯৫]

অন্যদিকে ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজদের হামলা ও প্রভুত্বের কারণে আরবী কবিতায় বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হয়। বিখ্যাত সংস্কারক জামালুদ্দীন আফগানী ১৮৭১ খ্রি. থেকে ১৮৭৯ খ্রি. পর্যন্ত মিশরে অবস্থান করেন। তিনি ইসলামি মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য সংস্কার আন্দোলনে বিশাল ভূমিকা রাখেন। তার প্রভাবে আরবী কবিদের মন-মগজে ব্যক্তিসত্তা, জাতীয় অনুভূতি ও সমাজ সচেতনতা স্থান পায়।[৯৬] তার সংস্কার আন্দোলনে মিশরের যেসকল কবি অংশ নেন তাদের মধ্যে মাহমুদ সামী পাশা আল-বারুদী (১৮৩৯-১৯০৪ খ্রি.) অন্যতম। কবিতায় নতুন ধারা নির্মাণের ক্ষেত্রে তার অবদান অনস্বীকার্য। তাকে কাব্যের জগতে আধুনিকতার পতাকা উত্তোলনকারী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। আহমদ হাসান আয-যায়্যাতের মতে, 'কাসিদা' রীতিতে যদি ইমরুল কায়েস অনন্য হয় আর কবিতার উন্নতি ও সৌন্দর্য বিধানে যদি বাশ্শার একক কৃতিত্বের অধিকারী হয়ে থাকে, তাহলে কবিতায় জাগরণ ও নবায়নের ক্ষেত্রে আল-বারুদীর কৃতিত্ব একক ও অনন্য।[৯৭] কাব্যশিল্পের ক্ষেত্রে আল-বারুদীর দুই ধরনের ভূমিকা লক্ষ করা যায়। যথা :

১. প্রাচীন রীতির পুনর্জাগরণ

২. স্তুতিগাথা ও রোজগার করার উপায় থেকে কবিতাকে মুক্তি দান।

---

95. দৈয়াব, আব্দুল হাই, *আল-তুরাছ আল-নকত্বদী ক্বলা মাদরাসাত আল-জাইল আল-জাদীদ*, (কায়রো : দার আল-কাতিব আল-আরবী লিত ত্বাআহ ওয়া আল-নাশার, ১৯৬৮), পৃ. ১৩।

96.(য়ায়দান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪২)।

97. আয্-যাইয়্যাত, আহমদ হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৩।

আল-বারুদী রেনেসাঁ যুগের প্রথম পর্যায়ের কবি। কবিতার আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে পুরাতন বোতলে নতুন পানীয় প্রবিষ্ট করার চেষ্টা করেছেন তিনি। এজন্য কবিতার বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে তিনি আধুনিক আর ভাষা ও রচনারীতির দিক দিয়ে প্রাচীন।[৯৮] তিনি পুরাতন রীতির অনুসারী হলেও একেবারে অন্ধ আনুগত্য করেননি। তিনি জীবন ও জগৎকে নিজস্ব দৃষ্টিতে দেখলেও একেবারে অন্ধ আনুগত্য করেননি। তিনি জীবন ও জগৎকে নিজস্ব দৃষ্টিতে দেখেছেন। তার কাব্যমালায় তার সমকালের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের চিত্র ফুটে উঠেছে। মূলত বারুদীই প্রথম ও প্রধান আরবকবি, যার কবিতার আরশীতে আধুনিকতা ঝলমল করে ওঠে।[৯৯] আল-বারুদীর কাব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি আরবী ভাষা-সাহিত্যের মূল ঐতিহ্য ধরে রাখার জন্য রচনারীতির প্রাচীন কাঠামো ভেঙে দেননি, বরং তিনি পুরাতন রীতির পুনর্জাগরণ করে তাতে নতুন কলা-কৌশল ও সৌন্দর্যের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন।[১০০]

প্রকৃত পরিবেশের চিত্রায়ন আল-বারুদীর কাব্যের একটি দিক। তিনি মিশরীয় রেনেসাঁর প্রতিমূর্তি আবুল হাওলকে[১০১] অবলম্বন করে কবিতা লিখেছেন। এ ছাড়া রাত্রি, আকাশ, সূর্য-তারকা ও বিদ্যুৎ ইত্যাদির যে নিখুঁত চিত্র তুলে ধরেছেন তা নিঃসন্দেহে আরবী কাব্যের নতুন সংযোজন। আব্বাসীয় যুগের পর আল-বারুদীই প্রথম সার্থক কবি যিনি আরবী কাব্যে নতুন চেহারা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন।[১০২]

এ পর্যায়ের আরও একজন উল্লেখযোগ্য কবি হলেন মিশরের আহমদ শাওক্বী (১৮৬৯-১৯৩২ খ্রি.)। তিনি একজন শক্তিশালী নাট্যকারও। তিনি একাধারে রাজনীতি, সমাজব্যবস্থা, ধর্ম, প্রেম, প্রশংসা, শোক, জাতীয়তাবাদী দেশাত্ববোধ, প্রকৃতি ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদির ওপর কাব্য রচনা করেছেন। চার খণ্ডে সমাপ্ত তাঁর 'দীওয়ান' আরবী কাব্যের এক উল্লেখযোগ্য সম্পদ। শাওক্বী অনেকটা আল-বারুদীর মতোই পুরাতন রীতিতে নতুন ভাব ও বিষয়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। কবিতা রচনায় তিনি আব্বাসীয় যুগের আল-মুতানাব্বীর দ্বারা প্রভাবিত হলেও ভাষা ও ভাবের ক্ষেত্রে তার মৌলিকত্ব অনস্বীকার্য।[১০৩]

---

98. Haywood, Jhon, A, Modern Arabic Literature (1800-1970), (London Land Humphries, 1971), P. 97.

99. দ্বাইফ, শাওক্বী, আল-বারুদী, *রায়িদ আশ-শি'র আল-হাদিস*, (মিশর : দার আল-মাআরিফ, ১৯৮৮), পৃ. ৯১।

100. দ্বাইফ, শাওক্বী, আল-বারুদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩।

101. এটি মিশরের একটি বৃহৎ এবং ঐতিহাসিক স্থাপনা। বিশাল মরুভূমির মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা এই পাথুরে নিদর্শন শুধুই পিরামিডগুলোর সঙ্গী নয়, বরং একে ঘিরে রয়েছে নানা প্রশ্ন। এর আকার-আকৃতি এবং নকশার সাথে এর আশেপাশে থাকা কাঠামোগুলোর বেশ অমিল দেখতে পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, এর মাথা এবং শরীরের বিসদৃশ আকৃতি থেকেও অনেক খটকা লাগতে পারে। অনেক গবেষকের বদ্ধমূল ধারণা, মিশরীয়দের আগে অন্য কোনো উন্নত জাতি বসবাস করত সেই অঞ্চলে এবং তারাই তৈরি করেছিলো এটি। এই সভ্যতা পরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অনেকের মতে, অবশ্য এই তত্ত্ব ভিত্তিহীন।

102. আল-দাসুক্বী উমর, ফিল-আদব আল-হাদিস, (মিশর : দার আল-মাআরিফ বি মিশর, ১৯৭৩), খণ্ড ২য়, পৃ. ৯৮।

103. ফারহুদ, ড. হাসান শাজিলী ও অন্যান্য, আল-আদব ওয়া আল-নুছছ, (সউদী আরব : ওযারাত আল-মা'আরিফ, ১৯৮১),পৃ. ৮৩।

কবি আহমদ শাওক্বী রচিত কাব্যনাট্য (আল-শি'র আত-তামছীলি) এ যুগের উল্লেখযোগ্য সংযোজন। প্যারিসের আধুনিক নাট্যশালায় তাঁর প্রচুর নাটক দেখার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি আরবীতেও সুন্দর রচনায় মনোনিবেশ করে সাতটি কাব্যনাট্য লিখেছেন।[১০৪] এগুলো হলো–

১. মাসরা'উ কালিউবাতরা। মিশরীয় ইতিহাসের প্রভাবশালী রাজকণ্যা ক্লিওপেট্রাকে উপলক্ষ্য করে তিনি এই নাট্যকাব্যটি রচনা করেন।
২. কামবীয। পারস্যের সম্রাট কামবীয-এর কাহিনি অবলম্বনে এই কাব্যনাট্যটি তিনি রচনা করেন।
৩. আলী বেক আল-কাবীর। এই নাট্যকাব্যটি মিশরের ঐতিহাসিক বিষয়কে কেন্দ্র করে তিনি রচনা করেন।
৪. মাজনূন লায়লা। খাঁটি আরবীয় উপাখ্যানকে অবলম্বন করে এই কাব্যনাট্যটি তিনি রচনা করেন।
৫. আনতারা। প্রাচীন আরবের ঐতিহাসিক চরিত্রকে কেন্দ্র করে তিনি এউ কাব্যনাট্যটি রচনা করেন।
৬. আস-সিত্তু হুদা। এটি হচ্ছে তাঁর একমাত্র কমেডিমূলক নাট্যকাব্য।
৭. আমির আল-আন্দালুস। এটি স্পেনে নির্বাসনের সময় থেকে শুরু করে দেশে ফিরে আসার পর জীবনের শেষ দিনগুলোতে সমাপ্ত করেন। এটি ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম প্রকাশ পায়।

আহমদ শাওক্বী একজন শক্তিশালী কবি সন্দেহ নেই, তাই বলে এ কথা বলা যাবে না যে, আহমদ শাওক্বী রচনারীতির দিক দিয়ে নতুন কিছু সৃষ্টি করে কবিতার ধারা পরিবর্তন করে দিয়েছেন। বরং একথা বলা যাবে যে, তিনি আঙ্গিক বা রূপের দিক দিয়ে প্রাচীন কবি আর ভাববিষয়ক বস্তুর দিক দিয়ে আধুনিক কবি।

এ সময়ের আরেকজন কবি যার কাব্যে দেশপ্রেম ও নব জাগরণের সূর ধ্বনিত হয়েছিল, তিনি হলেন মিশরের হাফিয ইব্রাহিম (১৮৭০-১৯৩২ খ্রি.)। তার কাব্যে প্রচুর বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবহুল বিষয়বস্তু তার কবিতার প্রধান উপজীব্য।[১০৫] হাফিয তার কবিতার চরম উন্নতি লগ্নে শাওক্বীর চেয়েও অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে মিশরীয় জনগণের অনুভূতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করেন। তবে তিনি ছিলেন মিশরের পল্লী অঞ্চলের এক দরিদ্র পরিবারের সন্তান। যার জন্য বহির্বিশ্ব সম্পর্কে তার জ্ঞান ছিল সীমিত।[১০৬] তার কবিতায় দেশপ্রেম, স্বজাত্যবোধ ও বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হওয়ায় তিনি 'শা'য়ির আল-নীল' (شاعر النيل) বা "নীল নদের কবি" হিসেবে সমাদৃত হন। "আল-লুগাতুল

---

104. বুতরুস আল-বুস্তানী, উদাবা'উল আরব ফিল আসরিল আব্বাসী, (বৈরুত, দারল জীল, ১৯৮৯, তা.বি.), খ. ৩, পৃ. ৩১৬।
105. দিরাসাত ফী আল-শি'র আল-আরবী, (মিশর : দার আল-মাআরিফ বি মিশর, ১৯৭৬), পৃ.১৮।
106. Haywood, Jhon, A, Modern Arabic Literature (1800-1970), (London Land Humphries, 1971), P. 92.

আরাবীয়্যাহ, তান্'আ হায্যাহা বাইনা আহলিহা" কবিতায় মাতৃভাষা আরবীর প্রতি তার প্রগাঢ় অনুরাগের যথার্থ চিত্রায়ন ঘটেছে। যেমন কবিতাটিতে আরবী ভাষা নিজেই কথা বলছে–[১০৭]

أنا البحر فى احشائه الدركا بن * فهل سألوا الغواص عن صدفاتى

فيا ويحكم أبلى و تبلى محاسنى * و منكم و أن عز الدواء أساتى

فلا تكلو فى للزمان فأننى * أخاف عليكم أن نحين و ماتى

"আমি এমন এক সাগর যার তলদেশে রয়েছে লুকানো মুক্তা,

কিন্তু ডুবুরিয়া আমার ঝিনুক সম্পর্কে জানতে চেয়েছে কি?

হায়! তোমাদের জন্য আক্ষেপ, আমার সৌন্দর্য ক্রমে ম্লান হতে চলছে,

ঔষুধ যদিও কঠিন হয় তবু তোমাদের মাঝেই রয়েছে আমার চিকিৎসক।

কালের করালগ্রাসে নিক্ষেপ করো না আমাকে,

আমি সত্যিই ভয় পাচ্ছি, তোমাদের হাতে ঘণিয়ে আসছে আমার মৃত্যু।"

এ পর্যায়ের আরেকজন উল্লেখযোগ্য কবি হলেন ইরাকের মারুফ আল-রুসাফী (১৮৭৩-১৯৪৫ খ্রি.)। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তার ছিল অবাধ বিচরণ। সমাজের বঞ্চিত শ্রেণির শোচনীয় জীবনচিত্র তার কবিতার মূল প্রাণ। উম্মুল-ইয়াতীম (অনাথ-জননী), আল-ইয়াতীম ফিল-ঈদ (ঈদের দিনে অনাথ), আল-ইয়াতিমূল-মাখদুউ (প্রতারিত অনাথ), আস-সিজনু ফী বাগদাদ (বাগদাদের কারাগার), আল-মুতাল্লাকা (তালাকপ্রাপ্তা) ইত্যাদি শিরোনামে রচিত কবিতাগুলো এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

আর-রুসাফী স্তুতি, ব্যঙ্গ, কৌতুক, প্রেম, শোকগাথা, গৌরব গাথা, রাজনীতি ও সমাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে কবিতা লিখেছেন। তবে লক্ষণীয় যে, রাজনীতি ও সামাজিক কবিতার ক্ষেত্রে রুসাফীর স্বকীয়তা সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। অন্যক্ষেত্রে তিনি গতানুগতিক রীতিতে বিচরণ করেছেন। ইরাকে জামীল ছিদকী আয্-যাহাবী (১৮৬৩-১৯৩৬ খ্রী.) আর-রুসাফীর চেয়ে আরও বেশি আধুনিক। সমাজ, দর্শন ও বিজ্ঞান তার কবিতার প্রধান উপাজীব্য। সহজবোধ্য শব্দ প্রয়োগ ও স্পষ্ট অর্থবোধক উপস্থাপনা তার কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। আবেগ ও অনুভূতি বিবেক শাসিত হওয়ার কারণে তার কবিতা অনেকটা গদ্যধর্মী হয়েছে। এ

[107]. ইব্রাহীম হাফিয, দীওয়ান, (বৈরুত, ১৯৬৭, খণ্ড ১ম), পৃ. ২৫৪।

প্রসঙ্গে আল-আনজুম ওয়া আল-আছীর ওয়া আল-ফাদা (তারকারাজি, আশাশ ও শূন্যলোক) শীর্ষক কবিতার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

এভাবে আল-বারুদী, আহমদ শাওক্বী ও তাদের অনুসরণকারী সমকালীন অন্যান্য কবিদের প্রচেষ্টায় আরবী কবিতা গতানুগতিক নিয়ম ভেঙে যেসব শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে তা হলো–[১০৮]

১. দেশাত্মবোধক কবিতা
২. জাতীয়তাবাদমূলক কবিতা
৩. জাগরণমূলক কবিতা
৪. সামাজিক কবিতা
৫. ধর্মীয়বিষয়ক কবিতা
৬. প্রকৃতিবিষয়ক কবিতা
৭. স্তুতিমূলক কবিতা
৮. শোকগাথামূলক কবিতা।

দ্বিতীয় পর্যায় : নবায়ন

বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নেই এমন একদল কবির আবির্ভাব ঘটল, যারা কবিতার অবয়ব থেকে প্রাচীন আবরণ খুলে নতুন আবরণে সুসজ্জিত করার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করলেন। ১৯০০ সালে প্রকাশিত 'আল মাজাল্লাহ আল-মিশরীয়্যাহ' নামক পত্রিকার মাধ্যমে খলীল মুতরান (১৮৭২-১৯৪৯ খ্রি.) আপামর আরবী কবিদের উদাত্ত আহ্বান জানান, যেন কবিতাকে প্রাচীন রীতির বন্ধ প্রকোষ্ঠ থেকে মুক্ত করা হয়। ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর দীওয়ানে এ আহ্বান আরও স্পষ্ট করে জানান দেন। তাঁকে অনুসরণ করে কবিতা লিখেন আবদুর রহমান শুকরী (১৮৮৬-১৯৫৮ খ্রি.), ইব্রাহীম আল-মাযেনী (১৮৯০-১৯৪৯ খ্রি.) ও আব্বাস মাহমুদ আল-আক্বাদ (১৮৮৯-১৯৬৪ খ্রি.) প্রমুখ কবিরা। বস্তুত আরবী কবিতা নবায়নের ক্ষেত্রে এ চার কবির কাব্যআন্দোলন যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে। তাদের প্রচেষ্টাগত এই অধ্যায়কে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। যথা–

---

108. আল-জুনদী, আনওয়ার, *আদ্দওয়াউন্ আলা আল-আদব আল-আরবী আল-মুআছির*, (কায়রো : দার আল-কাবিত আল-আরবী লিত ত্বাবাআহ ওয়া আল-নাশার, ১৯৬৯), পৃ. ১৪১।

এক. খলীল মুতরানের (১৮৭২-১৯৪৯ খ্রি.) অবদান

কবি খলীল মুতরান (১৮৭২-১৯৪৯ খ্রি.) আরবী কবিতা নবায়নের জন্য সমকালীন কবিদেরকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। প্রথম জীবনে তিনি জাহেলি ও আব্বাসী কবিতা অধ্যয়ন করেন এবং পুরাতন রীতি অনুযায়ী কবিতা লিখেন। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পর তিনি পুনরায় রীতি বর্জন করে নতুন ধারায় কবিতা লেখা শুরু করেন। তাঁর কবিতায় সাধারণভাবে ইউরোপীয় শিক্ষার প্রভাব এবং বিশেষভাবে ফ্রান্সীয় শিক্ষার প্রভাব রয়েছে। আহমদ শাওক্বী প্রাচীন রীতিতে কাব্য লেখা বন্ধ করেন আর মাতরান প্রাচীন রীতির দরজায় তালা লাগিয়ে আধুনিক রীতির ঘোষণা দেন।[১০৯] কাব্য সম্পর্কে মাতরান স্বীয় অভিব্যক্তি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, আমি কবিতা লিখি আত্মতৃপ্তির জন্য কিংবা দুর্দশাগ্রস্ত জাতিকে জাগ্রত করার জন্য। মাতরান কাব্যের আঙ্গিক নির্মানে নতুনত্বে বিশ্বাসী। এতৎসত্ত্বেও তিনি তাঁর চিন্তাধারায় পুরোপুরি অটল থাকতে পারেননি। কারণ, তিনি জনপ্রিয় হওয়ার লোভে কখনো রক্ষণশীল কবিদের আবার কখনো আধুনিকতায় বিশ্বাসী কবিদের অনুসরণ করেছেন। এ জন্য তাঁকে প্রাচীন রীতির অনুসারী ও নতুন ধারা নির্মাণকারী এই দু'দলের মাঝখানে অবস্থানারী কবি হিসেবে অভিহিত করা যায়।[১১০]

দুই. আরবী কবিতা নবায়নে কবিত্রয়

আরবী কবিতাকে প্রাচীন রীতির খোলস থেকে মুক্ত করার জন্য যে তিনজন কবি স্বীয় কাব্যসাধনা নিয়োগ করেন তাঁরা হলেন, আবদুর রহমান শুকরী (১৮৮৬-১৯৫৮ খ্রি), ইব্রাহীম আল-মাযেনী (১৮৮৯-১৯৪৯ খ্রি.), আববাস মাহমুদ (১৮৮৬-১৯৫৮ খ্রি.)। এ তিনজন কবিই ইংরেজ সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে তাদের অধ্যয়ন ছিল ব্যাপক। তাই তাদের ইংরেজি সাহিত্যে প্রভাব বিদ্যমান। এ তিন কবির কাব্যান্দোলন শুরু হয়েছে মূলত ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে আবদুর রহমান শুকরীর প্রথম দীওয়ান 'দাউ-উল ফজর' (ভোরের আলো) প্রকাশিত হবার পর।[১১১]

কবি শুকরী (১৮৮৬-১৯৫৮ খ্রি) একজন স্বভাবকবি হিসেবেই পরিচিত। তার সমগ্র সৃষ্টি পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রকাশ ও আরবী জাতীয়তাবাদ এ দুটি ধারায় প্রবাহিত। শুকরীর আগেকার কবিরা প্রায়ই ফরাসি প্রভাবে প্রভাবিত ছিলেন। কিন্তু তিনি ইংরেজি ভাবধারার সাথে সংশ্লিষ্ট। ট্রেনিং কলেজে অধ্যয়নকালেও তিনি গভীর মনে সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। নির্বাচিত গীতিকাব্য অধ্যয়নের মাধ্যমে তিনি এক নতুন জগতে আবির্ভূত

---

109. Haywood, Jhon, A, *Modern Arabic Literature* (1800-1970), (London Land Humphries, 1971), P. 97.

110. আল-জুনদী, আনওয়ার, *আদ্দওয়াউন্ আলা আল-আদব আল-আরবী আল-মুআছির*, (কায়রো : দার আল- কাবিত আল-আরবী লিত-ত্বাবাআহ ওয়া আল-নাশার, ১৯৬৯), পৃ. ১৪৬।

111. দ্বাইফ, প্রাগুক্ত, ১৯৭৫, পৃ. ১৩৮-৪০।

হলেন, যা আরবী কবিতার প্রাচীন রীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থি। গীতিকাব্যে কোনো প্রশংসা নেই, কোনো কুৎসা নেই বরং সেখানে চিত্রিত হয়েছে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের আনন্দ-বেদনার মনোজ্ঞ ছবি। কবিতার এ নতুন ধারা কবি শুকরীর হৃদয়গভীরে মুদ্রিত হয়ে যায়। তার কবিতায় প্রতিভাত হয় বঞ্চিত জনতার দুঃখ-দুর্দশার চিত্র। তার কাব্যগন্থের শেষ ভাগে রয়েছে মুক্ত ছন্দে রচিত দীর্ঘ কবিতা; এখানে শুকরী যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।[১১২]

কবি ইব্রাহীম আল-মাযেনীর (১৮৮৯-১৯৪৯ খ্রি.) প্রথম দীওয়ানের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে, দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি ছিলেন একাধারে কবি ও সমালোচক। তার মতে, কবিতা এমন কল্পনা যদ্বারা হৃদয় তরঙ্গায়িত হয় এবং বন্যার আকারে বেরিয়ে আসে। তিনি কাব্য চর্চার ক্ষেত্রে ইংরেজি দ্বারা প্রভাবিত। ইংরেজি কবিতার ছায়া অবলম্বনে তিনি বেশ কিছু কবিতা রচনা করেন যা আরবী কাব্যভুবনে এনেছে নতুনত্ব। কবি মাযেনী পুরাতন রীতির অনুসারীদের বিদ্রুপ করতেন। এমনকি তিনি মিশরের বিখ্যাত কবি 'শা'য়িরুন নীল' নামে খ্যাত হাফিজ ইব্রাহীমের সমালোচনা করে ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে 'ওকায' নামক পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখেন।[১১৩]

প্রাচীন রীতি সম্পূর্ণ পরিহার করে ফরাসি ও ইংরেজি ঢঙে কবিতা লেখার ক্ষেত্রে শুকরী ও মাযেনীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন মিশরের আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ (১৮৮৬-১৯৫৮ খ্রি.)। তার প্রথম দীওয়ান প্রকাশিত হয় ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে, 'হাদিয়াতুল কারওয়ান' (ডাহুকের উপহার), আ'বিরু সাবিলিন (পথ অতিক্রমকারী), আ'য়াছীর মাগিরিবীন (সন্ধ্যাকালের দমকা হাওয়া), বা'দ আল-আছছীর (দমকা হাওয়ার পর) ইত্যাদি। আল-আক্কাদের কবিতার উপাদান বহুমূখী। তিনি একজন মিশরীয় লোক তাই তার কবিতায় মিশরের মাটি ও মানুষের কথা উঠে এসেছে। অন্যদিক দিয়ে তিনি আরবীয়। তাই আরব ঐতিহ্যকেও তিনি ভুলে যাননি। আরব চিন্তার দিক দিয়ে তিনি ইউরোপীয়। কারণ ইউরোপীয় শিক্ষা-দীক্ষায় তিনি একজন বিজ্ঞ লোক। এ সকল কারনে তার সাহিত্য কর্মও বহুমুখী। কবিতার ক্ষেত্রে তার অবদান ছিল–[১১৪]

ক. কল্পনার চিত্রায়ণ

খ. গদ্য স্টাইলে কবিতা রচনা

গ. একই অক্ষরের অন্ত্যমিল থেকে কবিতাকে মুক্তিদান করা।

---

112. দ্বাইফ, প্রাগুক্ত, ১৯৭৫, পৃ. ১৩৯-৪১।
113. দ্বাইফ, প্রাগুক্ত, ১৯৭৫, পৃ. ১৪০-১৪২।
114. দ্বাইফ, প্রাগুক্ত, ১৯৭৫, পৃ. ১৪০-৪৪।

নব্যপন্থি কবিত্রয়ের মধ্যে মাযেনী যেমন হাফিজ ইব্রাহীমের সমালোচনা করেন তেমনি আল আক্কাদও তিরস্কারের বান ছুড়েছেন আহমদ শাওক্বীর প্রতি। বিশেষত শাওক্বীর স্তুতিমূলক কবিতা; যা তিনি তৎকালীন শাসকদের প্রশংসা করে রচনা করেছেন, আল-আক্কাদ সে ধরনের কবিতার ঘোরবিরোধী। তার মতে এটা আব্বাসীয় স্টাইল। আব্বসীয় যুগের খ্যাতিমান কবি আল-মুতানাব্বী (৯১৫-৯৬৫ খ্রি.) অনুরূপ রীতিতে কবিতা লিখেছেন। শাওক্বী একজন স্বভাবকবি হলেও বিষয়বস্তু নির্মাণ ও বর্ণনা পরম্পরায় কবি আল-মুতানাব্বীর প্রভাব এড়াতে পারেননি। তাই আল-আক্কাদ তার যথার্থ সমালোচনা করেছেন।[১১৫]

আব্বাসীয় যুগে আল-মুতানাব্বীর (৯১৫-৯৬৫ খ্রি.) সময় যেমন কবিতা রাজা-বাদশাদের সম্মান ও মর্যাদাকে ঘিরে রচিত হয়েছিল তেমনি আধুনিক যুগেও শাওক্বীর হাতে অনুরূপভাবে আরবীকাব্য রচিত হতে চাইলে নব্যপন্থি এ কবিত্রয় (শুকরী, আল-মাযেনী ও আল-আক্কাদ) তা থেকে আরবী কবিতাকে মুক্ত করে আনার চেষ্টায় ব্রতী হন। ইউরোপীয় সাহিত্য থেকে এরা শিক্ষা লাভ করেছেন যে, কবিতা নিছক রাজা বাদশার সুনাম প্রকাশ কিংবা তোষামোদের জন্য নয়, বরং কবিতা গণমানুষের জন্য। শুকরীর কবিতায় যেমন গণমানুষের দুঃখ ও হতাশার ছবি ফুটে উঠেছে, তেমনি আল আক্কাদের কবিতায়ও বঞ্চিত জনতার প্রতি তাঁর আন্তরিক দরদের চিত্র ফুটে উঠেছে। এ পর্যায়ে মিশরের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে রয়েছেন আহমদ জাবী আবু শাদী (১৮৯২-১৯৫৫ খ্রি.), ইব্রাহীম নাজী (১৮৯৮-১৯৫৩ খ্রি.) ও আলী মাহমুদ ত্বাহা (১৯০২-১৯৪৮ খ্রি.)।[১১৬]

আহমদ জাকী আবু শাদী পেশাগতভাবে একজন ডাক্তার। অন্যদিকে তিনি একজন শক্তিশালী কবি। স্বদেশ প্রেম, জাতীয় জাগরণ, জীবনের সুখ-দুঃখ, প্রেম-প্রকৃতি ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ে তিনি কবিতা লিখেছেন। তার কাব্যিক কল্পনা এতই প্রখর ছিল যে, তিনি যেকোন বিষয়ে যখন ইচ্ছা লিখতে পারতেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে তার কাব্যে নতুনত্ব এসেছে। তার উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত জয়নাব, ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত আনীন ওয়া রানীন (বিলাপ ও ক্রন্দন), ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত আশিয়্যাতুন ওয়া যিলালুন (আলো ও ছায়া), ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রাকাশিত আল-শু'লা (অগ্নি শিখা), ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত আল-যনবু (ঝরণা) ইত্যাদি। [১১৭]

মিশরের ইব্রাহিম নাজীও (১৮৯৮-১৯৫৩ খ্রি.) পেশাগত জীবনে একজন ডাক্তার। প্রথম দিকে তার কাব্যে মাতরানের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। ইংরেজি

---

115. হান্না আল-ফাখূরী, *আল-জামি' ফিল আদাবিল আরাবী ওয়া তারীখিহী*, (২য় সং, বৈরুত : দারুল জীল, ১৯৯১), খ. ১, পৃ. ৮০৫।

116. হান্না আল-ফাখূরী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮০৫।

117. বুতরুস আল-বুস্তানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬৪-৬৫।

ও ফরাসি সাহিত্যের ওপর তার ব্যাপক পড়াশোনা রয়েছে। বিশেষতঃ পাশ্চাত্যের রোমান্টিক কাব্য তার খুবই প্রিয় ছিল। ইংরেজি ও ফরাসি সাহিত্যের প্রভাবে তার কবিতায় নতুন চিন্তাধারা প্রতিভাত হয়েছে। তার কাব্যগ্রন্থ 'ওয়ারা আল-গামাম' (মেঘের আড়ালে) প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে। ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'লায়ালী আল-কাহেরা' (কায়রোর রাত্রি)। তার মৃত্যুর পর বৈরুতের দারুল মা'আরিফ এর উদ্যোগে প্রকাশিত হয় 'আল-ত্বায়ের আল-জারীহ' (আহত পাখি) শীর্ষক কাব্যগন্থ।[১১৮]

১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে আলী মাহমুদ ত্বাহা (১৯০১-১৯৪৯ খ্রি.) আরবী কাব্যের শৈল্পিক রীতির উৎকর্ষ সাধনে নিমগ্ন কবিদের দলে এসে ভিড়েন। এ দলের কবিরাও তাকে স্বাগত জানান। ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় তার কাব্যগন্থ 'যাহর ওয়া খামর' (বিষ ও মদ), ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'আল–শাওক্ব আল আ'য়েদ' (প্রত্যাবর্তনকারী সাধ)। [১১৯]

আরবী কবিতায় আধুনিক ধারা নির্মাণে দু'দল বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। একদল হলো প্রাচীনপন্থি, অন্যদল হল নব্যপন্থি। প্রাচীনপন্থিদের অন্তর্ভুক্ত শীর্ষস্থানীয় কবিরা হলেন–আল-রারূদী, হাফিজ ইব্রাহীম, আহমদ শাওক্বী ও আল-রুসাফী। আর নব্যপন্থিদের অন্তর্ভুক্ত শীর্ষস্থানীয় কবিরা হলেন–মুতরান, শুকরী, মাযেনী ও আর-আক্কাদ। প্রাচীনপন্থিদের লক্ষ্য ছিল আরবী কাব্যের গঠনগত ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রেখে নতুন বিষয় ও ভাবের অনুপ্রবেশ ঘটানো। অন্যদিকে নব্যপন্থিদের লক্ষ্য ছিল প্রাচীন রচনাশৈলী সম্পূর্ণ বর্জন করে ফরাসি ও ইংরেজি কাব্যের ধাঁচে আধুনিক কবিতা রচনা করা। নব্যপন্থিদের এ স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গি প্রাচীনপন্থিদের চিন্তার দেওয়ালে আঘাত করে। নদীর স্রোত যেমন সামনে চলমান তেমনি সাহিত্যের গতিও ঝরনাধারার মতো সম্মুখে প্রবহমান। কাজেই কবিতার গঠনগত দ্বন্ধে নব্যপন্থিদের জয় হলো। এভাবে নব্যপন্থি কবিরা আরবী কবিতাকে তার শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপাভিব্যক্তি থেকে মুক্ত করে একটি উদ্যমতার মধ্যে নিয়ে আসতে সক্ষম হলেন।[১২০]

তিন. মাহ্জার (প্রবাসী) কবিদের অবদান

আরবী কবিতায় আধুনিক ধারা নির্মাণের ক্ষেত্রে মাহ্জার (প্রবাসী) কবিদের অবদান অনস্বীকার্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই একদল লোক উত্তর আমেরিকায় ও দক্ষিণ আমেরিকায় হিজরত করেন। তাদের অনেকেই লেবানন ও সিরিয়ার বংশধর। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক শক্তিমান কবি-সাহিত্যিকও ছিলেন। এরা বিদেশে অবস্থান করলেও আরবী ভাষায় কাব্যচর্চা করেন। এমনকি বিদেশে অবস্থান করেও

---

118. আবুল বাকা' আল-আকবারী, *শারহু দীওয়ান আবিত্ ত্বায়্যিব আল-মুতানাব্বী*, (বৈরুত : দারুল মা'রিফা), খ. ১, পৃ. ৩৩৭-৩৪০।

119. আবুল বাকা' আল-আকবারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৩৮-৩৪০।

120. হান্না আল-ফাখূরী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৯৬।

আরবী কাব্যে নব জাগরণ সৃষ্টির চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। এ দলটি দুভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে রয়েছেন জিবরান খলীল জিবরান (১৮৮৩-১৯৩১ খ্রি.), মিখাইল নুআ'য়মাহ (জন্ম ১৮৮৯ খ্রি.), ইলীয়া আবু মাদী (১৮৮৯-১৯৫৮ খ্রি.) প্রমুখ। এরা প্রত্যেকেই নিউইয়র্কে অবস্থান করতেন। তারা 'রাবেতাতুল কলমীয়্যাহ' নামে একটি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এরাই আবার ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে 'মাদ্রাসাতুল আসাবীয়্যাহ আন্দালুসীয়্যাহ' নামে অপর একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এ দু-দলের মধ্যে প্রধানত যে পার্থক্য ছিল তা হলো, প্রথম দল কবিতার তুলনায় গদ্যের দিকে বেশি ঝুঁকে ছিল। তারা ছিল আরবী ভাষায় নতুনত্ব সৃষ্টি এবং নির্ভেজাল কবিতা রচনায় প্রয়াসী। একই সাথে প্রাচীনপন্থিদের প্রতি তাদের আক্রমণও ছিল প্রকট। দ্বিতীয় দল গদ্যের তুলনায় কবিতার দিকে ঝুঁকে ছিল বেশি। তাদের আহ্বান ছিল আরব জাতীয়তাবাদ ও আরবীয়দের মর্যাদা উন্নত করার প্রতি। তাদের লক্ষ্য ছিল শব্দের দুর্বোধ্যতা থেকে কবিতাকে মুক্ত করা।[১২১]

উল্লিখিত কবিগণ আরবী কবিতায় নতুন স্টাইলে নতুন সুর প্রয়োগ করেছেন; যা আরবী কবিতায় নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছে। সে স্টাইলের উদ্যোক্তা হলো মাহ্জার কবিরা। মাহ্জার কবিদের মধ্যে জিবরান খলীল জিবরান প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর। এতদিন আরবী কবিতা যে বলয়ে ঘূর্ণায়মান ছিল জিবরান সে বলয় থেকে কবিতাকে মুক্ত করেন। সম্পূর্ণ মুক্ত ছন্দে কবিতা লিখে তিনি দুঃসাহসিকতার পরিচয় দেন। তিনি একাধারে দার্শনিক, কবি ও প্রবন্ধকার। তার কবিতায় শিল্পদর্শন আশ্চর্য দীপ্তিতে উজ্জ্বল। নিম্নে তার 'আল-বিলাদ আল-মাহজুবা' (লুক্কায়িত দেশ) থেকে কিছু অংশ তুলে ধরা হল। কবি বলেন–

يا بلادا حجبت منذ الأزل * كيف نرجوك و من أي سبيل

أى قفر دونها أى جبل * سورها العالى و كمن منا الدليل؟

أسراب انت ام انت الامل * فى نفوس تتمنا المستحيل؟

أمنا ثم يتهادى فى القلوب * فإذا ما اشبقظت ولى المنام؟

"হে দেশ! সৃষ্টিলগ্ন থেকেই তুমি লুক্কায়িত রয়েছ,

আমরা কীভাবে তোমার আশা করব এবং কোন পথে গেলে তোমাকে পাব?

কোন বিরানভূমির পশ্চাতে কিংবা কোন উঁচু পাহাড়ের দেওয়ালের আড়ালে রয়েছ তুমি?

আমাদের মাঝে কে আছে এমন যে তোমার হদীস দেবে?

---

121. হান্না আল-ফাখূরী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৮৮-৮৯৬।

তুমি কি মরীচিকা না তুমি হৃদয়ের এমন আশা,

যা অন্তরে বাস্তবায়িত হবার নয়।

তুমি কি হৃদয়ে আসার এমন স্বপ্ন,

যে স্বপ্ন জাগ্রত হবার পর ছুটে যায়।"[১২২]

মিখাইল নুআয়মাহ (জন্ম ১৮৮৯ খ্রি.) জন্মসূত্রে লেবাননী। কিন্তু তার দীর্ঘ জীবন কেটেছে আমেরিকা ও রাশিয়ায়। তিনি লেখাপড়া করেছেন সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে। সুতরাং তার মন-মগজে পাশ্চাত্যের যে হাওয়া লেগেছিল তারই যথার্থ পরিস্ফুটন ঘটেছে তার কাব্যমালায়। আল-মারাহিল (পরিভ্রমণ) ও হামস আল-জুফুন (চোখের পাতার অস্পষ্ট কথা) এ দুটি তার উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। নুআয়মার কবিতা শাওক্বী ও হাফিজের কবিতার স্টাইল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তার কবিতা আল-আক্কাদের কবিতার সাথে সাদৃশ্য রাখে। অতিমাত্রায় পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবিত এ কবির কাছে বিংশ শতাব্দীতে রচিত শাওক্বী ও হাফিজের কবিতা নিতান্তই গতানুগতিক মনে হয়েছিল। তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল–

১. কবি তার যুগের জন্য সীমাবদ্ধ নয়। নিছক জাতির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশই তার একমাত্র কাম্য নয়।

২. কবিতায় সুরের প্রবাহ প্রয়োজন হতে পারে কিন্তু অন্ত্যমিলের প্রয়োজন নেই।

৩. যেকোনো ছোটো বিষয় অবলম্বনেও কবিতা রচনা করা যেতে পারে।

৪. কবিতা সৃষ্টি হয় কল্পনা ও অনুভূতির রস নিংড়ানো বিষয়বস্তু থেকে।

মিখাইল নুআয়মাহ কবিতার গতানুগতিক ছন্দে আঘাত করেন। তিনি বলেন: 'কবিতার জন্য ছন্দ কিংবা অন্ত্যমিলের কোনো প্রয়োজন নেই।[১২৩] নুআয়মার সমগ্র শিল্পকর্মে রয়েছে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ছাপ। তার কবিতা অন্ত্যমিলে প্রাচীনরীতি বর্জিত এবং জটিল ও দুর্বোধ্য শব্দ থেকে মুক্ত। তার লেখা 'আখি' (আমার ভাই) কবিতার কিছু অংশ হচ্ছে–

---

122. আল-খাইয়্যাত, ড. জালাল আল তা'মাহ ও ড. সালিহ জাও'ওয়াদ, *তারীখ আল-আদব আল-আরবী আল-হাদিস*, (বাগদাদ : দার আল-হুররিয়্যাহ লি আল-তম'আহ, ১৯৭৬), পৃ. ১৫৫।

123. আল-জুনদী, আনওয়ার, *আদ্দওয়াউন্ আলা আল-আদব আল-আরবী আল-মুআছির*, (কায়রো : দার আল-কাবিত আল-আরবী লিত ত্বাবাআহ ওয়া আল-নাশার, ১৯৬৯), পৃ. ১৫৫।

أخى من نحن؟ لا وطن و لا اهل و لا جار

إذا نمتا ، إذا قمنا، ردانا الخزى و العار

لقد خمت بنا الدنيا ، كما خمت بموتانا

فهات الرفش واتبعنى لخفر خندقا اخر

نوارى فيه أحيانا

"আমার ভাই! আমরা কারা? দেশ নেই, নেই পরিবার, প্রতিবেশী,

যখনই ঘুমাই কিংবা জেগে উঠি দেখি সর্বাঙ্গ জুড়ে লজ্জার পোশাক।

আমাদের মৃতদেহের গলিত রক্ত-পুঁজে এ পৃথিবী নষ্ট আজ,

এসো নতুন কোদাল হাতে নতুন কবর খুড়তে এসো আমার সাথে।

সে কবরে লুকাবে একে এক জীবন্ত আত্মা আমাদের।"[১২৪]

ইলীয়া আবু মাদীও জীবরান এবং নুআয়মার সমগ্রোত্রীয় কবি। ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে আলেক জান্দ্রিয়ায় তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তির্যকার আল-মাদী' (অতীতের স্মৃতি) প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থের সুখপাঠ্য কবিতাগুলোর মধ্যে রয়েছে-'আনা হুয়া' (আমি সে), 'আল-তিফলাতু ওয়া আল-ক্বামারু' (বালিকা ও চাঁদ), 'লেক্বাওন ওয়া ফেরাকুন' (মিলন ও বিচ্ছেদ), 'আল হুররীয়্যাতু' (স্বাধীনতা), 'আয়া নীলু' (ওহে নীল নদী)। ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে নিউইয়র্ক হতে তার বিখ্যাত কাব্যগন্থ আল-জাদাওল (দিনপঞ্জী) প্রকাশিত হবার পর কবিসমাজে তিনি বিশেষভাবে সমাদৃত হন। উক্ত গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'আল-তীন' (মাটি) ও 'আল-তালাসীম' কবিতা দুটির আবদেন বড়োই হৃদয়গ্রাহী। আল-তালাসিম কবিতায় কবি প্রতি চার লাইনের শেষে একটি ছোট্ট লাইন, 'লাসতু আদরী' (আমি জানিনা) যোগ করে কবিতার আঙ্গিকে নতুন ধাঁচের সৃষ্টি করেন। কবিতাটির কিছু অংশ নিম্নরূপ–

أين ضحكى وبكائي وأنا طفل صفير

اين جهلى ومراحى و انا عض عزير

اين أحلامى و كانت كيفما سرت تمير

[124]. *আল-খাইয়্যাত*, ড. জালাল আল তা'মাহ ও ড. সালিহ জাও'ওয়াদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮।

لست ادرى

قد بعير الشوك أكليلا لملك أونبى

وبصير الورد فى عروة لص أوبغى

أيغار الشوك فى الحفل من الزهر الجنى

أم ترى يحسبه احقر منمه؟

لست ادرى

أ أنا افصح من عصفورة الوادى و أعزب؟

و من الزهرة أتشهى و شذا الزهرة اطيب

و من الحية ادهى؟ و من النملة اغرب

ام انا اوضع من هذى و انى ؟

لست اديى

أنا لا أذكر سيأ من حياتى الماضية

أنا لا أعرف شيأ من حياتى الا نية

لى ذات غيرانى لست ادرى ما هية

فمتى تعرف ذاتى كنه ذاتى؟

لست أدرى

“কোথায় আমর সেই ছেলেবেলার হাসিকান্না

কোথায় আমর সুখ-দুঃখ ছিলাম তাজা ফুল

কোথায় আমার স্বপ্ন যার রথে চড়ে ঘুরেছি দিক-বিদিক

সবকিছু ধ্বংস হয়েছে কিন্তু কেন ধ্বংস হলো?

আমি জানি না।

কখনো রাজমুকুট হয় কাটার মতো

কখনো গোলাম চুমে চোর কিংবা মিথ্যাবাদীর হাত

কাটা কি করে অহংকার বাগানের সদ্য ফোটা ফুলের ওপর

তুমি কি মনে কর কণ্টক উত্তম ফুলের চেয়ে নাকি অধম?

আমি জানি না।

উপত্যকার পাখির চেয়েও সুমিষ্ট আর বিশুদ্ধ কি আমার স্বর

ফুলের চেয়ে কি সুন্দর আর পরাগের চেয়ে মোহনীয় কি আমি

সরিসৃপের চেয়ে বিষাক্ত আর পিঁপড়ার চেয়ে কি ভয়ংকর আমি

আমি কি অনেক ভালো এ সবকিছুর চেয়ে নাকি অনেক অধম?

আমি জানি না।

অতীত জীবনের কোন কিছু আর মনে নেই আমার

অনাগত জীবনের কি হবে জানি না কিছু

যে অস্তিত্ব আছে আমার সে অস্তিত্ব কেমন জানি না তা

তবে কখন চিনায়ে রেখেছো কি ঢেকে সত্তা আমার?

আমি জানি না।" [১২৫]

কাব্য রচনায় পুরাতন রীতি ছিন্ন করে তিনি যে নতুন রীতি প্রণয়ন করতে সচেষ্ট ছিলেন তার স্বাক্ষর রয়েছে উপরোল্লেখিত কাব্যাংশে। উত্তর আমেরিকায় অবস্থানরত মাহ্জার কবিদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন: 'যদি তুমি মনে করো ছন্দোবদ্ধ শব্দসমষ্টিই কবিতা তাহলে তুমি আমাদের দলের নও। তোমার চিন্তাধারা আমার মতামতের বিপরীত। অথচ আমাদের মতামতই হলো সঠিক।' [১২৬]

আরবী কবিতায় আধুনিক ধারা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে লেবাননের বিশারা আল-খুরী (জন্ম ১৮৯০ খ্রি.), সিরিয়ার ওমর আবু রীশা (জন্ম ১৯১০ খ্রি.) ও সোলাইমান আল-ইশা (জন্ম ১৯২১ খ্রি.), তিউনিসের আবুল কাসেম

125. আল-খাইয়্যাত, ড. জালাল আল তা'মাহ ও ড. সালিহ জাও'ওয়াদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩-১৬৪।
126. আল-জুনদী, *আনওয়ার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫।

আল-শাবী (জন্ম ১৯০৯ খ্রি.), সুদানের মুহাম্মদ মিফতাহ আল-ফায়তুরী (১৯৩৬-২০১৫ খ্রি.) এবং ফিলিস্তিনের ইব্রাহীম আবদ আল-ফাত্তাহ ত্বাওকান (১৯০৫-১৯৪২ খ্রি.) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশারা আল–খুরী লেবাননের একজন প্রসিদ্ধ কবি। তার উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'আল-হাওয়া ওয়া আশ-শাবাব' (কামনা ও যৌবন)। এতে যৌবন বয়সে জাগ্রত মানুষের মনের আকাঙ্ক্ষা চিত্রিত হয়েছে।[১২৭]

ওমর আবু রীশা বৈরুতস্থ আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। তিনি কবিতা রচনার পাশাপাশি কাব্যনাট্যও লিখেছেন। রচনারীতির ক্ষেত্রে আধুনিক রূপের ধারক এ কবি শব্দ প্রয়োগের দিক দিয়ে প্রাচীন কাব্যের প্রভাব এড়াতে পারেননি।[১২৮]

সোলাইমান আল-ইশা (জন্ম ১৯২১ খ্রি.) একজন কবি ও শিক্ষাবিদ। নিরেট গদ্য কবিতায় তার দক্ষতা লক্ষণীয়। তার উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'শা'য়িরুন বাইনা আল-জিদরাইন' (দুই দেওয়ালের মাঝখানে কবি) ও 'আমওয়াজুন বেলা শা'তিয়িন' (সৈকত বিহীন তরঙ্গ) ইত্যাদি।[১২৯]

আবুল কাসেম আল-শাবী (জন্ম ১৯০৯ খ্রি.) তিউনিসের প্রসিদ্ধ কবিদের অন্যতম। তিনি মাত্র ২৫ বছর জীবিত ছিলেন। এ অল্প সময়ে তিনি অনেক সুখপাঠ্য কবিতা রচনা করেছেন।[১৩০]

সুদানের কবি মুহাম্মদ মিফতাহ আল-ফায়তুরী (১৯৩৬-২০১৫ খ্রি.) তার কাব্যের মাধ্যমে বিদেশি শক্তির আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যোষণা করেছেন। 'আগানী আফরীকীয়্যাহ' (আফ্রিকাবাসীর গান) তার একটি উল্লেখযোগ্য দীওয়ান বা কাব্য।[১৩১]

ইব্রাহীম আবদ আল-ফাত্তাহ ত্বাওকান (১৯০৫-১৯৪২ খ্রি.) ফিলিস্তিনের একজন উল্লেখযোগ্য কবি। তিনি বৈরুতস্থ আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন। বৈরুতে অবস্থানকালে তিনি ফিলিস্তিনের স্মৃতি নিয়ে বেশির ভাগ কবিতা রচনা করেন। ফিলিস্তিনে ফিরে আসার পর তিনি ফিলিস্তিনের যুদ্ধ-বিগ্রহ অবলম্বন করে কবিতা রচনা করেন।[১৩২]

১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে আব্বাসীয় যুগের পতনের পর ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৫৪০ বছর আরবী কাব্যে যে অমানিশার অন্ধকার নেমে এসেছিল তা আধুনিক যুগের কবিদের অনবদ্য প্রচেষ্টায় দূর হয়ে গেল। নব্যপন্থি ও প্রাচীনপন্থি উভয় দলের মধ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব যাই থাকুক না কেন মূলত দু-দলের লক্ষ্য ছিল একটাই;

---

127. হান্না আল-ফাখূরী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৯০-৮৯৭।
128. হান্না আল-ফাখূরী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৯০-৮৯৭।
129. আল-জুনদী, আনওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫-১৫৬।
130. হান্না আল-ফাখূরী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৯১-৮৯৮।
131. হান্না আল-ফাখূরী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৯১-৮৯৮।
132. আল-জুনদী, *আনওয়ার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬-১৫৮।

তা হলো আরবী কবিতাকে প্রাচীন বা গতানুগতিক রীতি থেকে মুক্ত করে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় কাব্যের মর্যাদায় উন্নীত করা। উভয় দলের শৈল্পিক চেতনায় ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টায় আরবী কবিতা আস্তে আস্তে প্রাচীন রীতির খোলস ছেড়ে নতুনরূপে সজ্জিত হয় এবং নতুন ভাবধারায় অলংকৃত হয়ে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষমতা লাভ করে।[১৩৩]

[133]. ড. মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী, *প্রাচীন আরবী কবিতা : ইতিহাস ও সংকলন*, (আহমাদিয়া প্রিন্টিং প্রেস, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, দ্বিতীয় সং. জানু. ২০১৯), পৃ ১০৬-১০৭।

৪র্থ পরিচ্ছেদ
ইসলামে কাব্যচর্চা ও এর প্রতি মহানবি সা.-এর উৎসাহদান

ইবাদতের ক্ষেত্রে ইসলামি শরিয়াতের মূলনীতি হচ্ছে, যদি তা কুরআন বা হাদিসে বলা থাকে তাহলে তা করা যাবে অন্যথা নয়। আর দুনিয়াবি কাজের ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে, যদি কুরআন বা হাদিসে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা থাকে তাহলে কোনো অবস্থায়ই তা করা যাবে না। আর যদি নিষেধাজ্ঞা না থাকে তাহলে তা করতে কোনো অসুবিধা নেই। কবিতা লেখা ও কাব্যচর্চা করা একটি দুনিয়াবি কাজ। কাজেই এতে হারাম উপাদান না থাকলে তা লেখা ও চর্চা করাতে কোনো অসুবিধা নেই। বরং শিক্ষণীয় কাব্য, ভালো কর্মের প্রেরণাদানকারী কবিতা, সচ্চরিত্র গঠনে অনুপ্রেরণাদায়ক কাব্য রচনা সাওয়াবের কাজ।[১৩৪]

কবিতার ব্যাপারে কুরআন ও হাদিসে বেশ কিছু দিকনির্দেশনা রয়েছে; যদ্বারা বোঝা যায় যে, কবিতা চর্চা করা ইসলামে বৈধ কি অবৈধ। কেউ না বুঝে অপ্রাসঙ্গিকভাবে একটি আয়াত কিংবা হাদিস উল্লেখ করে কবিতার ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান বলে দেওয়াটা মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এ বিষয়ে ইসলামের অবস্থান জানার জন্য নিম্নে আমি কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবি ও আলেমদের বিস্তারিত অভিমত উল্লেখ করব, যদ্বারা বিষয়টি একেবারে স্পষ্ট হয়ে যাবে। যেমন–

আল-কুরআনে কবিতা ও কাব্যচর্চা বিষয়ে দিকনির্দেশনা

কুরআনের একটি সুরার নামকরণ করা হয়েছে কবিদের নামে।[১৩৫] এ সূরাতে কবিদের নিন্দা করে একটি আয়াত আছে। এ আয়াতটি দেখিয়ে অনেকে বলতে চায় যে, ইসলামে সব ধরনের কবি ও কবিতা নিন্দিত। আয়াতটি হচ্ছে–

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ

'আর বিভ্রান্তরাই কবিদের অনুসরণ করে।[১৩৬] তাফসির ইব্নে কাসিরে আয়াতটি নাজিলের প্রেক্ষাপট উল্লেখ করা হয়েছে। ইব্নে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, 'রাসূল (সা.)-এর যুগে একজন আনসারি ও একজন অন্য সম্প্রদায়ের লোক কবিতার মাধ্যমে একে অপরের নিন্দা করছিল। তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কিছু মূর্খ লোক এই কাজে তাদেরকে সমর্থন দিচ্ছিল। এর ভিত্তিতে আয়াতটি নাজিল হয়।'[১৩৭] অর্থাৎ কিছু কবির অনিষ্টকর কাজ ও এর অনুসরণ করা কিছু লোকের ব্যাপারে আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়েছে। এতে

---

134. আহমাদ আল-ইসকান্দারী ও অন্যান্য, *আল-মুফাস্সাল ফী তারীখিল আদাবিল আরবী*, (ড. হাস্সান হাল্লাক সম্পা., বৈরুত : দারু ইহ্য়াইল উলূম, ১৯৯৪), পৃ. ২৯।
135. সূরা ন. ২৬, সূরা শুআরা (কবিগণ)।
136. আল কুরআন, সূরা শুআরা, আ. ২২৪।
137. আবুল ফিদা হাফেয ইমাদুদ্দীন ইব্নে কাসীর, তাফসির ইব্নে কাসীর, ৮ম খণ্ড (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), পৃ. ৩৪৪।

মোটেও সকল প্রকারের কবি ও কবিতার কথা বলা হয়নি। যে আয়াতে একে অন্যের নিন্দাকারী ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের কথা বলা হলো, সেই আয়াত দেখিয়ে বিরুদ্ধবাদীরা বলতে চায় যে, ইসলামে সব কবিতাই হারাম। মূলত এটা তাদের সীমাহীন অজ্ঞতারই পরিচায়ক।

আয়াতটির শেষে বলা হয়েছে, "আর বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে। তুমি কি দেখো না যে, তারা প্রতিটি ময়দানে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং এমন কথা বলে যা তারা করে না"[১৩৮] এই আয়াত প্রসঙ্গে ইব্‌নে আব্বাস (রা.) থেকে আরও বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, উপরোক্ত অংশটি আল্লাহ তায়ালা মানসুখ বা রহিত করেছেন। এরপর ২২৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ব্যতিক্রম বক্তব্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "তবে তারা স্বতন্ত্র, যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, আল্লাহকে পর্যাপ্ত স্মরণ করে এবং নির্যাতিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। নির্যাতনকারীরা অচিরেই জানতে পারবে তাদের গন্তব্য কীরূপ" [১৩৯] এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের ভালো ও কল্যাণমূলক কবিতার অনুমোদন দিয়েছেন।[১৪০]

কাব্যচর্চা ও কবিতার বিষয়ে হাদিস :

কাব্যচর্চা ও কবিতার বিষয়ে অনেকগুলো হাদিস রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতিপয় হাদিস হচ্ছে–

১. আবদুল্লাহ ইব্‌নে আমরের হাদিসে এসেছে–

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الشِّعْرُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلاَمِ، حَسَنُهُ كَحَسَنِ الْكَلاَمِ، وَقَبِيحُهُ كَقَبِيحِ الْكَلاَمِ.

"আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কবিতাও কথারই মতো (কথার সমষ্টি)। রুচিসম্মত কবিতা উত্তম কথাতুল্য এবং কুরুচিপূর্ণ কবিতা মন্দ কথাতুল্য।"[১৪১]

২. অপর হাদিসে এসেছে–

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: الشِّعْرُ مِنْهُ حَسَنٌ وَمِنْهُ قَبِيحٌ، خُذْ بِالْحَسَنِ وَدَعِ الْقَبِيحَ، وَلَقَدْ رَوَيْتُ مِنْ شِعْرِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَشْعَارًا، مِنْهَا الْقَصِيدَةُ فِيهَا أَرْبَعُونَ بَيْتًا، وَدُونَ ذَلِكَ.

138. সুরা শুআরা, আ. ২২৪-২২৫।
139. সূরা শুআরা, আ. ২২৭।
140. আবু দাউদ, *আদাবুল মুফরাদ*, হাদিস নং : ৮৭৯ (সহীহ)।
141. দারাকুতনী, *আদাবুল মুফরাদ*, হাদিস নং : ৮৭৩ (সহীহ)।

"আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, কবিতার মধ্যে কতক ভালো এবং কতক নিকৃষ্ট। তুমি তার ভালোটা গ্রহণ করো এবং নিকৃষ্টটা পরিহার করো। আমার কাছে কা'ব ইবনে মালেক (রা.)-এর এমন কবিতাও বর্ণনা করা হয়েছে, যার মধ্যকার একটি কাসিদায় চল্লিশ বা তার কিছু কমসংখ্যক চরণ ছিল।"[১৪২]

৩. অপর হাদিসে এসেছে–

عَنْ خَالِدٍ هُوَ ابْنُ كَيْسَانَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ إِيَاسُ بْنُ خَيْثَمَةَ قَالَ: أَلاَ أُنْشِدُكَ مِنْ شِعْرِي يَا ابْنَ الْفَارُوقِ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ لاَ تُنْشِدْنِي إِلاَّ حَسَنًا. فَأَنْشَدَهُ...

'খালিদ ইব্ন কায়সান (রহ.) বলেন, আমি ইব্নে উমর (রা.)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন ইয়াস ইবনে খায়ছামা (রহ.) তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, হে ফারুকের পুত্র! আমার কিছু কবিতা কি আপনাকে আবৃত্তি করে শোনাব? তিনি বলেন, হ্যাঁ, তবে কেবল উত্তম কবিতাই শোনাবে। তিনি তাঁকে তার কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে থাকেন।'[১৪৩] এর দ্বারা বোঝা যায় যে, কবিতার হুকুম সাধারণ কথার মতোই। উত্তম কথার মতো উত্তম কবিতাও ইসলামে উত্তম বলে গণ্য হয়। আর মন্দ ও অশ্লীলতায় ভরপুর কবিতা ইসলামে মন্দ বলে গণ্য হয়।[১৪৪]

৪. রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বয়ং কিছু কবিতার ও কবির প্রশংসা করেছেন। যদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামে কবিতা আবৃতি কিংবা কাব্য চর্চার বৈধতা রয়েছে। যেমন হাদিসে এসেছে– রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন–

ان من الشعر لحكمة

"নিশ্চয়ই কোনো কোনো কবিতায় প্রজ্ঞা রয়েছে।"[১৪৫]

৫. অপর হাদিসে এসেছে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً، أَوْ أَعْرَابِيًّا، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَتَكَلَّمَ بِكَلاَمٍ بَيِّنٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا، وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً.

---

142. দারাকুতনী, *আদাবুল মুফরাদ*, হাদিস নং : ৮৭৪ (সহীহ)
143. দারাকুতনী, *আদাবুল মুফরাদ*, হাদিস নং : ৮৬৪ (দুর্বল)
144. Margolioth, D. S, *The Origins of Arabic Poetry*, Journal of the Royl Asiatic Society, July 1925, P. 12.
145. সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ৬১৪৫, (সহীহ)।

“ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি নবি (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় কথাবার্তা বলল। নবি (সা.) বললেন, কথায়ও জাদুকরী প্রভাব থাকে এবং কবিতাও প্রজ্ঞাপূর্ণ হতে পারে।”[১৪৬]

৬. অপর হাদিসে এসেছে–

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَدِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَقَالَ " هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْئًا " . قُلْتُ نَعَمْ قَالَ " هِيهِ " . فَأَنْشَدْتُهُ بَيْتًا فَقَالَ " هِيهِ " . ثُمَّ أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا فَقَالَ " هِيهِ " . حَتَّى أَنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ

“আমর ইব্ন শারিদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা শারিদ (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে একই বাহনে আরোহণ করলাম। তিনি বললেন, তোমার স্মৃতিতে (কবি) উমাইয়া ইবনু আবুস সাল্‌তের কোনো কবিতা আছে কি না? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আবৃত্তি করো। আমি তখন তাঁকে একটি লাইন আবৃত্তি করে শোনালাম। তিনি বললেন, বলতে থাকো, তখন আমি তাঁকে আরও একটি শ্লোক পাঠ করে শোনালাম। তিনি আবার বললেন, বলতে থাকো। শেষ পর্যন্ত আমি তাঁকে ১০০টি ছন্দ আবৃত্তি করে শোনালাম।”[১৪৭]

উল্লেখ্য যে, উমাইয়া ইব্নু আবুস সাল্‌ত ছিলেন জাহেলি যুগের একজন কবি। কিন্তু কবিতায় উত্তম উপাদান থাকায় এবং অনিষ্টকর উপাদান না থাকায় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর কবিতা বেশ সময় নিয়ে শুনেছেন। সুতরাং যেখানে স্বয়ং নবি (সা.) থেকে এভাবে আগ্রহভরে কবিতা শোনার বিবরণ পাওয়া যায়। সেখানে এ কথা বলার আর কোনো সুযোগ নেই যে, ইসলামে কবিতা আবৃত্তি করা বা কাব্যচর্চা করা হারাম বা অবৈধ।

৭. অপর একটি হাদিসে এসেছে–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَشْعَرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَتْ بِهَا الْعَرَبُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ أَلاَ كُلُّ شَىْءٍ مَا خَلاَ اللَّهَ بَاطِلٌ

“আবু হুরাইরা (রা.) নবি (সা.) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আরবদের কবিতামালার মধ্যে সবচেয়ে বেশি কাব্যময় বাণী হচ্ছে লাবীদের এ উক্তিটি– أَلاَ كُلُّ شَىْءٍ مَا خَلاَ اللَّهَ بَاطِلٌ “জেনে রেখো, আল্লাহ ছাড়া যা কিছু রয়েছে সবই বাতিল।”[১৪৮]

---

146. আবু দাউদ, তিরমিযী, ইব্নে মাজাহ, মুসনাদ আহমাদ, ইব্নে হিব্বান, আদাবুল মুফরাদ : হাদিস নং : ৮৮০ (সহীহ)।
147. সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ৫৭৭৮, (সহীহ)।
148. সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ৫৭৮১ (সহীহ)।

৮. নবি করিম (সা.) নিজে কবি ছিলেন না। কিন্তু তিনিও মাঝে মাঝে কবিতা আবৃত্তি করতেন। সে কবিতাগুলো ছিল হয়তো সাধারণ কবিতা অথবা আল্লাহর স্মরণপূর্ণ কবিতা। যেমন হাদিসে এসেছে–

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَمَثَّلُ بِشَيْءٍ مِنَ الشِّعْرِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يَتَمَثَّلُ بِشَيْءٍ مِنْ شِعْرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ: وَيَأْتِيكَ بِالأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ

"মিকদাম ইব্ন শুরায়হ (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতার থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি আয়শা (রা.)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ (সা.) কি উপমা দেওয়ার জন্য কখনে কবিতা পাঠ করতেন? তিনি বলেন, তিনি আবদুল্লাহ ইব্নে রাওয়াহার এ কবিতা আবৃত্তি করে উপমা দিতেন, "যাকে তুমি দাওনি পাথেয়, খবর নিয়ে আসবে সে তোমায়।"[১৪৯]

৯. সহীহ বুখারীতে বারা' ইব্ন আযিব (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে খন্দকের মাটি বহনরত অবস্থায় দেখেছি। এ মাটি বহন করার কারণে তাঁর দেহ মুবারক ধুলায় ধূসরিত হয়ে উঠেছিল। এ অবস্থায় তাঁকে আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহার কবিতার নিম্নোক্ত চরণগুলো আবৃত্তি করতে শুনেছিলাম :

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ** ولا تصدقنا ولا صلينا

فأنزلن سكينة علينا ** وثبت الأقدام إن لاقينا

إن الأولى قد بغوا علينا ** وإن أرادوا فتنة أبينا

"হে আল্লাহ! যদি তোমার অনুগ্রহ না হতো তাহলে আমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হতাম না,

আমরা দান-খয়রাত করতাম না এবং সালাত আদায় করতাম না।

অতএব, আমাদের প্রতি তুমি শান্তি বর্ষণ করো,

এবং কাফিরদের সঙ্গে আমাদের মোকাবিলায় আমাদেরকে দৃঢ়কদম রেখো।

তারা আমাদের বিরুদ্ধে লোকদের প্ররোচিত করেছে,

149. তিরমিযী, নাসাঈ, মুসনাদ আহমাদ, ত্বহাবী, আদাবুল মুফরাদ : হাদিস নং ৮৬৭ (সহীহ)।

যদি তারা ফেতনা সৃষ্টি করতে চায় তাহলে আমরা অস্বীকার করব।" [১৫০]

বারা' ইব্ন আযিব বলেছেন, 'শেষের শব্দগুলো রাসূলুল্লাহ (সা.) অধিক টান দিয়ে উচ্চারণ করছিলেন। অন্য একটি বর্ণনায় কবিতাটির শেষাংশ ছিল নিম্নরূপ–

إن الأولى قد بغوا علينا ** وإن أرادوا فتنة أبينا

"তারা আমাদের বিরুদ্ধে লোকদের প্ররোচিত করেছে,

যদি তারা ফেতনা সৃষ্টি করতে চায় তাহলে আমরা অস্বীকার করব।" [১৫১]

সাহাবিদের কাব্যচর্চা

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবিদের অনেকেই কবিতা চর্চা করতেন। ইমাম শা'বী (রহ.) বলেন–

كان ابو بكر شاعرا وكان عمر شاعرا وكان على شاعرا رضى الله عنهم

"আবু বকর (রা.) কবি ছিলেন, উমর (রা.) কবি ছিলেন এবং আলী (রা.)ও কবি ছিলেন।"[১৫২] তাঁদের মধ্যে বিশেষত হযরত আলী (রা.)-এর কাব্যচর্চায় সুখ্যাতি রয়েছে। তিনি ছিলেন একজন সুবক্তা ও ভালো কবি। তাঁর কবিতার একটি 'দীওয়ান' পাওয়া যায়, যাতে অনেকগুলো কবিতায় মোট ১৪০০ শ্লোক রয়েছে।[১৫৩]

সাহাবি-তাবেয়িদের যুগে কাব্য চর্চাকে শিক্ষার একটি উপাদান হিসেবে গণ্য করা হতো। যেমন হাদিসে এসেছে–

عَنِ عُمَرُ بْنُ سَلاَّمٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ دَفَعَ وَلَدَهُ إِلَى الشَّعْبِيِّ يُؤَدِّبُهُمْ، فَقَالَ: عَلِّمْهُمُ الشِّعْرَ يَمْجُدُوا وَيُنْجِدُوا

উমর ইব্ন সালাম (রহ.) থেকে বর্ণিত। আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান তার সন্তানদের আদব-কায়দা শিক্ষা দেওয়ার জন্য শা'বী (রহ.)-এর নিকট সোপর্দ করেন। তিনি বলেন, এদের কবিতা শিক্ষা দিন, তাতে তারা উচ্চাভিলাসী ও নির্ভীক হবে।'[১৫৪]

---

150. সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৮৯।

151. সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৮৯; শফিউর রহমান মুবারকপুরী, *আর-রাহিকুল মাখতুম*, (তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ঢাকা), পৃ. ৩৪৬-৩৪৭।

152. ইব্নে আবী শায়বাহ, *আল-আদাব*, হাদিস নং : ৩৬৬; আল-মুসান্নাফ, খণ্ড ৬, পৃ. ১৭৩।

153. কিতাবুল উম্দাহ, ইব্নে রশীক, খণ্ড ১, পৃ. ২১; মুহাম্মাদ আব্দুল মাবুদ, *আসহাবে রাসুলের জীবনকথা*, খণ্ড ১, পৃ. ৫৫।

154. আবু হাতিম, তারীখুল কাবীর; ইব্নে হিব্বান; *আদাবুল মুফরাদ* : হাদিস ন. ৮৮১।

ইমামদের কাব্যচর্চা ও মতামত

ইমাম শাফিঈ (রহ.) কাব্যচর্চার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর একটি সুবিখ্যাত কবিতার সংকলন রয়েছে।[১৫৫] ইসলামের মুবারক যুগে ইসলামি কবিতা ব্যতীতও দুনিয়াবি নানা বৈধ বিষয়ে কাব্য চর্চার বিপুল পরিমাণে উদাহরণ পাওয়া যায়। সবগুলোর রেফারেন্স স্বল্প পরিসরে তুলে ধরা অনেকটাই অসম্ভব। লেখার কলেবর বিশাল হয়ে যেতে পারে। তাই কলেবর বৃদ্ধি না করে এবং বেশি উল্লেখ না করে বলব, এ বিষয়ে আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থের ৭ম খণ্ডে বিস্তরিত আলোচনা রয়েছে।[১৫৬]

হারাম বিষয় ছাড়া অন্য সকল বিষয় নিয়ে কবিতা রচনা করা যায় এমনকি সে ধরনের কবিতা রচনাকে পেশা হিসেবেও গ্রহণ করা যায়। ইমাম ইবনু কুদামা মাকদিসি (রহ.) বলেছেন, "কবিতার বিষয়বস্তু যদি ভালো হয় তাহলে সে কবিতা চর্চা করা বৈধ। এ নিয়ে ভিন্ন কোনো অভিমত নেই। এটাই সাহাবি ও আলেমদের অভিমত।"[১৫৭]

ইব্নে হাজার আসকালানী (রহ.) [১৫৮]-এর মতে, যদি অতিমাত্রায় আবৃত্তি না করা হয়, মসজিদের ভেতর আবৃত্তি না করা হয়, যদি অন্যায়ভাবে কারো মানহানি না করা হয়, কারো মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা না করা হয়, কবিতায় মিথ্যাচার না থাকে এবং অশ্লীল প্রেমকাহিনি না থাকে তাহলে সে কবিতা বৈধ। আবার ইব্নে আবদুল বার (রহ.) কবিতা বৈধ হবার ব্যাপারে আলেমদের ইজমা উল্লেখ করেছেন।[১৫৯] কাজেই কবি নজরুলের আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর স্তুতিমূলক কবিতাগুলো (যাতে শির্ক বা বিদআত নেই) ইসলামে উত্তম কাজ বলে বিবেচিত হতে পারে। একইভাবে বৈধতার সীমার মধ্যে থেকে শিক্ষামূলক, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমূলক এবং জীবনের নানা দিক নিয়ে কবিতা রচনা করা কিংবা পাঠ করা যেতেই পারে। ইসলাম কখনোই তা নিষেধ করে না।

155."Poetic Jewels from Imam Al-Shafi'i-The Imam of Imams" *AUSTRALIAN ISLAMIC LIBRARY,1976,* P. 322.

156. আবুল ফিদা হাফিয ইব্নে কাসির আদ-দামেস্কী, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, (দারু ইহইয়ায়িত তুরাছ আল-আরাবী, ১৯৮৮ খ্রি.) খণ্ড ৭, পৃ. ২৩৫।

157. ইব্নে কুদামাহ আল-মাকদিসী, আল মুগনী, খ. ১০, পৃ. ১৭৬; আল-মাওসু'আহ আল ফিকহিয়্যাহ, ওযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুয়ূন আল-ইসলামিয়া, খ. ২৬, পৃ. ১১৩-১১৭।

158. তাঁর নাম আহমদ ইব্নে আলী ইব্নে মুহাম্মদ ইবনে হাজার আসক্বালানী। তাঁর জন্ম ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৩৭২ খ্রি. এবং মৃত্যু ২ ফেব্রুয়ারি ১৪৪৯ খ্রিষ্টাব্দ। তিনি ইবনে হাজার আসক্বালানী নামেই পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। তিনি একজন বিখ্যাত হাদিসবিশারদ, শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহ এবং মুসলিম ব্যক্তিত্ব। তার রচিত 'ফাতহুল বারী' বুখারী শরীফের প্রসিদ্ধতম ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলোর অন্যতম।

159. আল-মাওসু'আহ আল ফিকহিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, খ. ২৬, পৃ. ১১৩-১১৭।

যেসব কাব্যচর্চা অবৈধ

রাসূল (সা.)-এর যুগে অন্ধ গোত্রবিদ্বেষ, অশ্লীল প্রেম এবং নানা রকমের অনিষ্টকর জিনিস নিয়ে কবিতাচর্চা আরবদের মাঝে খুবই প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন হাদিসে এরূপ অনিষ্টকর কবি ও কবিতার ব্যাপারে নিন্দাসূচক কথা বলা হয়েছে। ইসলামে কেবল সেসব কবিতাই নিষিদ্ধ যেগুলোতে অশ্লীলতা, হারাম ও অনিষ্টকর উপাদান রয়েছে। যেমন হাদিসে এসেছে–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ إِلاَّ أَنَّ حَفْصًا لَمْ يَقُلْ " يَرِيهِ " .

"আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কোনো লোকের পেট পুঁজ দিয়ে ভর্তি হয়ে যাওয়া তার পেট অশ্লীল কবিতা দিয়ে পূর্ণ হওয়ার চাইতে উত্তম। বর্ণনাকারী আবু বাকর (রহ.) বলেন, তবে (আমার ঊর্ধ্বতন বর্ণনাকারী) হাফ্স (রহ.) তাঁর বর্ণনাতে (يَرِيهِ) তথা 'পঁচিয়ে বিনষ্ট করে দেয়' কথাটি বলেননি।"[১৬০]

অপর হাদিসে এসেছে–

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ جُرْمًا إِنْسَانٌ شَاعِرٌ يَهْجُو الْقَبِيلَةَ مِنْ أَسْرِهَا، وَرَجُلٌ انْتَفَى مِنْ أَبِيهِ

'আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবি (সা.) বলেন, মানুষের মধ্যে মারাত্মক অপরাধী হলো সেই কবি, যে সমগ্র গোত্রের নিন্দা করে এবং যে ব্যক্তি নিজ পিতাকে অস্বীকার করে।'[১৬১]

এর দ্বারা বোঝা যায় যে, কানো গোত্র বা সম্প্রদায়ের নিন্দাবাদ করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা একটি অনিষ্টকর কাজ। হাদিসে এই জাতীয় কবিতা লেখা বা চর্চা করাকে অপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছে। আবার এমন নারী বা পুরুষকে উপলক্ষ্য করে প্রেমের কবিতা রচনা করা বৈধ নয়, যে নারী বা পুরুষ ঐ কবির জন্য বৈধ নয়। কিন্তু নিজ স্বামী বা স্ত্রীকে নিয়ে ভালোবাসার কবিতা রচনা করা বৈধ তো বটেই বরং সওয়াবের কাজ।[১৬২]

এমনকি নামহীন বা অচেনা (anonymous) কোনো নারীর কিছু সৌন্দর্যের দিকও কবিতায় প্রকাশ করা বৈধ বলে কতিপয় আলেম অভিমত প্রকাশ করেছেন; যদি না এতে অশ্লীলতা বা আপত্তিকর কোনো কিছু

---

160. সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ৫৬৯৬।
161. ইব্নে মাজাহ, হাদিস ন. ৩৭৬১; *আদাবুল মুফরাদ*, হাদিস ন. ৮৮২ (সহীহ)।
162. কিতাবুল উমদাহ, ইব্নে রশীক, খণ্ড ১, পৃ. ২৫।

না থাকে। কেননা, কা'ব ইব্ন জুহাইর (রা.) এবং হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা.) প্রমুখ সাহাবি কবিগণ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উপস্থিতিতে এমন কবিতা আবৃত্তি করেছেন।[১৬৩]

সিদ্ধান্ত

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে এটি স্পষ্ট হলো যে, ইসলামে সব ধরনের কবিতা নিষিদ্ধ নয়। ইসলামে ঢালাওভাবে সকল কবিতা বা সাহিত্যকর্ম নিষিদ্ধ—এটা একটা চরম মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছুই নয়। বরং যে সকল কবিতা বা সাহিত্যকর্মের মধ্যে অকল্যাণ রয়েছে, অশ্লীলতা রয়েছে, যেসব দ্বারা অনিষ্ট হতে পারে, ইসলাম কেবলমাত্র সেগুলোকেই নিষিদ্ধ করেছে। মানুষের প্রতিভাকে বিনষ্ট করা মোটেও ইসলামের উদ্যেশ্য নয়। বরং মানবজাতির কল্যাণের জন্যই ইসলাম। তাই সকল সুন্দর ও কল্যাণকে ইসলাম সানন্দে গ্রহণ করে আর যাবতীয় অসুন্দর ও অকল্যাণকে প্রত্যাখ্যান করে।

কাব্যচর্চার প্রতি মহানবি (সা.)-এর উৎসাহদান

জাহেলি যুগে রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন পৃথিবীতে আগমন করেন, তখন আরবে ছিল কাব্যচর্চার জয়জয়কার। আরবের অন্যতম কবিদের কবিতা কা'বার দেওয়ালে টানিয়ে রাখা হতো। কবিতার মাধ্যমে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা হতো। রাসূলুল্লাহ (সা.) কবি ও কবিতা ভালোবাসতেন। কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। কবিতার উপযুক্ত সমালোচনা করতেন। অবিশ্বাসী কবিদের মোকাবিলায় কবিতা রচনা করতে বিশ্বাসী সাহাবি কবিদের উৎসাহিত করতেন। তারাও অনুপ্রাণিত হয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর প্রশংসামূলক, ইসলাম ও মুসলমানদের কীর্তি ও বীরত্বগাথা, জিহাদি উদ্দীপনামূলক কবিতাসহ বিভিন্ন বিষয়ে কবিতা রচনা করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)ও কখনো কখনো মুখে মুখে কবিতা আওড়াতেন।

মহানবি (সা.) কর্তৃক কবিতার মূল্যায়ন : কবিতার পরিচয়ে রাসূল (সা.) বলেন–

الشعرُ بمنزلةِ الكلام ، فحسنُهُ كحَسنِ الكلامِ ، وقبيحُهُ كقبيحِ الكلامِ

'নিশ্চয়ই কবিতা হচ্ছে সুসংবদ্ধ কথামালা। যে কবিতা সত্য আশ্রিত তা সুন্দর। আর যে কবিতা সত্য বিবর্জিত তাতে কোনো মঙ্গল নেই।'[১৬৪] তিনি কবিতার ছন্দ ও গঠনের চেয়ে কবিতার প্রকৃতি ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে বেশি মন্তব্য করতেন। কুরআনের সূরা শুআরার (কবিদের) ভাষ্য ছিল তার কাব্যদর্শন, কাব্যচিন্তন ও কাব্য-সমালোচনার আদর্শ। তিনি আরব-কবিদের কবিতা আগ্রহভরে শুনতেন এবং সে

163. কিতাবুল উমদাহ, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ২৬।

164. ইব্নে হাজার আল-আসকালানী, *ফাতহুল বা'রী*, খ. ১০, পৃ. ৫৫৫।

সম্পর্কে অত্যন্ত চমৎকার সমালোচনা করতেন। সাহাবি হযরত শারিদ (রা.)-এর কণ্ঠে জাহেলি যুগের কবি উমাইয়া ইব্ন আবু সাল্তের কবিতা শুনে মন্তব্য করেছিলেন–

آمنَ شعرُ أميةَ بنِ أبي الصلتِ، وكفرَ قلبُهُ

'উমাইয়ার কবিতা ঈমান এনেছে, অথচ তার মন এখনও কুফরির অন্ধকারে।'[১৬৫] তৎকালে যারা অশ্লীল কবিতা লিখত ইমরুল কায়েস ছিল তাদের অন্যতম। রাসূল (সা.) তার কবিতাকে অশ্লীল বললেও কবিতার সঠিক মূল্যায়ন করে বলেন, 'নিশ্চয়ই তার ভাষায় আছে সম্মোহনী শক্তি এবং কাব্যকর্মে রয়েছে বর্ণনার পরিপাট্য। পৃথিবীতে সে খ্যাতনামা হলেও আখিরাতে তার নাম নেওয়ার কেউ থাকবে না। কবিদের যে দল জাহান্নামে যাবে সে থাকবে তাদের পতাকাবাহী।'[১৬৬]

কবিদের মর্যাদা দান : রাসূল (সা.) কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাদের সম্মান ও মর্যাদা দিতেন। কবি হাসসান ইব্ন সাবিত (রা.)-এর জন্য তিনি মসজিদে নববিতে আলাদা একটি মিম্বর (মঞ্চ) তৈরি করেছিলেন।[১৬৭] মসজিদেই বসে যেত কবিতার আসর। কবি হাসসান কবিতা আবৃত্তি শুরু করলে স্বয়ং রাসূল (সা.) তার জন্য এ বলে দোয়া করতেন, 'হে আল্লাহ! রুহুল কুদুসকে (জিবরাঈল আ.) দিয়ে তুমি তাকে সাহায্য করো।'[১৬৮] যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করলেও তিনি কবিদের গনিমতের মালের অংশ দিতেন। কারণ, তাদের কবিতা ছিল উন্মুক্ত এবং উত্তোলিত তরবারির মতো।

রাসূল (সা.) কবি আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা.)-কে অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান এবং যুদ্ধের সেনাপতির দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিনি কবিদের অপরাধ ক্ষমা করে দিতেন এবং বিশ্বাসীদের কাফেলায় শামিল হওয়ার জন্য অনেক পুরস্কারে ভূষিত করতেন। ইমাম শরফুদ্দিন বুসিরি (রহ.)[১৬৯]-এর কবিতায় আকৃষ্ট হয়ে স্বপ্নে রাসূল (সা.) নিজের গায়ের চাদর তাকে উপহার দিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে ঐ ঐতিহাসিক কাব্যগ্রন্থের নাম হয় 'কাসিদায়ে বুরদাহ' বা 'চাদরের কবিতা'। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ কবিদের বিভিন্ন বর্ণনা সমৃদ্ধ 'আশ-শুআরা' নামের একটি সূরা নাজিল করেছেন। সে সূরায় অবিশ্বাসী কবিদের নিন্দার পাশাপাশি বিশ্বাসী কবিদের প্রশংসা করেছেন। যেমন–

---

165. জালালুদ্দিন সুয়ূতী, *আল-জামে আস-সাগীর*, পৃ. ১৯।

166. আবু আবদুল্লাহ আহমদ ইব্নে মুহাম্মদ ইব্নে হাম্বল, আল-মুসনাদ, (তাহকীক : আহমদ শাকের, দারুল হাদীস, ১৯৯৫), খ. ১২, পৃ. ৯৫।

167. আবু দাউদ সুলাইমান ইব্নে আশআছ ইব্নে ইসহাক ইব্নে বাশির, সুনানু আবি দাউদ, হা : ৫০১৫।

168. আবু দাউদ সুলাইমান ইব্নে আশআছ ইব্নে ইসহাক ইব্নে বাশির, প্রাগুক্ত, হা : ৫০১৫।

169. "কাসিদায়ে বুরদা"-এর রচয়িতা শেখ আবু আবদুল্লাহ শরফউদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে সাইদ ইবনে হাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ বুসিরী (রহ.)। বুসিরী নামেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। বুসির হচ্ছে বর্তমান মিশরের একটি জনপদ। তিনি ৬০৮ হিজরি সালের ১লা শওয়াল/ ১২১৩ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মার্চ জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১২৯০ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ –أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ – وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ – إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ –

"এবং কবিদের যারা অনুসরণ করে তারা বিভ্রান্ত। আপনি কি দেখেন না যে, তারা প্রতিটি উপত্যকায়ই উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং এমন কথা বলে যা তারা করে না। তবে তাদের কথা ভিন্ন যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে এবং অত্যাচারিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। অত্যাচারীরা অচিরেই জানবে কোন স্থানে তারা ফিরে আসবে।"[১৭০]

রাসূল (সা.) কবিতাকে সমাজ বিপ্লবের উত্তম হাতিয়ার মনে করতেন। তিনি সাহাবি কবিদের উদ্দেশে বলেন, 'যাও, তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে কবিতার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হও। কারণ, মুমিন লড়াই করে জানমাল দিয়ে। মুহাম্মদের প্রাণ যাঁর হাতে তাঁর কসম! তোমাদের কবিতা তিরের ফলা হয়ে তাদের কলিজা ঝাঁঝরা করে দেবে।'[১৭১] রাসূল (সা.)-এর কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে হাসসান ইবনে সাবিত, কা'ব ইবনে জুহাইর, আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, কা'ব ইবনে মালিক, আব্বাস ইবনে মিরদাস, কবি লবিদ, মহিলা কবি খানসা, নাবী খাজাদি প্রমুখ সাহাবি কবি যুদ্ধ সম্পর্কে এবং যুদ্ধের আগে-পরে অনেক রণোদ্দীপক কবিতা রচনা করে আবৃত্তি করতেন।

রাসূল (সা).-এর কবিতা আবৃতি : রাসূল (সা.) নবি ছিলেন বলে কবি ছিলেন না। তার জন্য তা শোভনীয় ছিল না। তিনি যদি কবিতা রচনা করতেন, তাহলে অহী এবং কবিতা পৃথক করা কঠিন হয়ে যেত। এমনিই তো অহী লাভ করার পর যখন অহী প্রচার শুরু করলেন, তখন মক্কার কাফের নেতারা উপহাস করে তাকে কবি বলে আখ্যায়িত করতে লাগল। আল্লাহ তায়ালা তাদের ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণ করতে পবিত্র কুরআন মাজিদে বলে দেন, 'আমি রাসূল (সা.)-কে কবিতা শিক্ষা দিইনি এবং তা তাঁর পক্ষে শোভনীয়ও নয়।'[১৭২] যদি তাঁর কবিতা রচনার সুযোগ থাকত, তবে তিনি সারা বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবির আসন অলংকৃত করতে সক্ষম হতেন। মাঝে মাঝে তাঁর মুখনিঃসৃত কবিতা থেকে এর প্রমাণ মেলে। তবে তিনি যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ছিলেন সে কথা তিনি নিজেই বলেছেন। সময়টি কাব্য-সাহিত্যের হওয়ায় তিনি মাঝে মাঝে মুখে মুখে কবিতা রচনা করে আবৃত্তি করতেন। যেমন ওহুদ যুদ্ধে পাথরের আঘাতে তাঁর আঙুল মোবারক থেকে রক্ত বের হলে তিনি তৎক্ষণাৎ আবৃতি করেন–

---

170. সূরা-আশ-শুআরা, আয়াত ২২৪-২২৭।
171. সহীহ ইব্‌নে হিব্বান : ৫৭৮৬।
172. সূরা ইয়াসিন, আয়াত ৬৯।

هلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيت
وفي سَبيلِ اللهِ ما لَقِيتِ

"হে আঙুল, তুমি তো একটি আঙুল বৈ কিছুই নও। সুতরাং যা কিছু হয়েছে তা তো আল্লাহর রাহে হয়েছে। দুঃখ ও অনুশোচনা কীসের?"[১৭৩]

অন্য প্রসঙ্গে তিনি আরও রচনা করেন–

أنا النبيُّ لا كذِبْ
أنا ابنُ عبدِ المطلِبْ

"আমি নবি, মিথ্যাবাদী নই। আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর।"[১৭৪]

কবিতার প্রতি উৎসাহদান : রাসূল (সা.) নিজে কবি ছিলেন না। তবে তিনি কবিতা শুনেছেন, আবৃত্তি করেছেন, কবিদেরকে উৎসাহ এবং মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি একটি সুন্দর কবিতার আবৃত্তি শুনে মন্তব্য করেন–

إنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً

"নিশ্চয় কোনো কোনো কবিতায় রয়েছে জ্ঞান বা হিকমাতের কথা।"[১৭৫]

'একদা শারিদ ছাকাফী রাসূল (সা.)-এর বাহনের পেছনে আরোহী ছিলেন। রাসূল (সা.) তাঁর কাছে উমাইয়্যার কবিতা শুনতে চাইলেন। তিনি আবৃত্তি করছিলেন, আর রাসূল (সা.) তাকে আরও শোনাতে বলছিলেন। তিনি সেদিন মোট ১০০টি শ্লোক শুনেছিলেন।'[১৭৬]

এ কথা সকলের জানা, কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর নির্দেশে রাসূল (সা.) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন। এরপরই এ শহরের অধিবাসীদের মধ্যে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। একদিকে ছিল মক্কার কুরাইশ ও তাদের সহযোগী অন্যান্য আরবগোত্র। আর অপরদিকে ছিলেন নির্যাতিত রাসূল (সা.) ও মদিনার আনসার ও মুহাজিরগণ। এ যুদ্ধে অস্ত্রধারী যোদ্ধাদের পাশাপাশি উভয় পক্ষের কবিরা কবিতার

---

173. সহীহ বুখারী : ২৮০২; সহীহ মুসলিম : ১৭৯৬।
174. হায়সামী, *মাজমাউয যাওয়ায়েদ*, খ. ৮, পৃ. ২২১।
175. সহীহ বুখারী : ৬১৪৫।
176. সহীহ মুসলিম : ২২৫৫।

যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ইসলামপূর্ব যুগে কুরাইশ গোত্রের উল্লেখযোগ্য কোনো কবি না থাকলেও ইসলামের সাথে সংঘর্ষের যুগে তাদের মধ্যে আবু সুফিয়ান, আবদুল্লাহ ইব্ন আয-যিবা'রী, দারার ইব্ন খাত্তাব আল্-ফিহরী, আবু ইজ্জাহ আল-জাম্হী, হুবায়রাহ মাখযুমী প্রমুখ কবিপ্রতিভার প্রকাশ ঘটে। তারা সবাই ইসলামবিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তারা তাদের কবিতার দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আনসার ও মুহাজিরদের গোত্র, ব্যক্তি চরিত্র ও ইসলামের নিন্দা ও কুৎসা বর্ণনা করতে থাকে। এটা মদিনাবাসীদের জন্যে কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তারা মুসলমানদের কুৎসা রটনা করত যে শুধু তাই নয়; তারা তাদের রচিত কবিতা দ্বারা ইসলামের প্রচারকার্যেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করত। এতে অতিষ্ঠ হয়ে রাসূল (সা.) মদিনার আনসারদেরকে লক্ষ্য করে বললেন–

'যারা হাতিয়ার দ্বারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করছে, জিহ্বা দ্বারা সাহায্য করতে কে তাদেরকে বারণ করেছে?' এ কথা শুনে হাসসান ইবনে ছাবিত (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আমি এর জন্যে প্রস্তুত। রাসূল (সা.) বলেন, আমিও তো কুরাইশবংশের। তুমি কীভাবে তাদের নিন্দা করবে? উত্তরে তিনি বলেন, মথিত আটা থেকে চুল যেভাবে বের করে আনা হয় আমিও তদ্রূপ আপনাকে বের করে আনব।'[১৭৭]

রাসূল (সা.)-এর নির্দেশে হাস্সান ইবনে সাবিত এর জন্যে মসজিদে নববীতে একটি মিম্বর স্থাপন করা হয়। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে স্বরচিত কবিতা আবৃতি করতেন।[১৭৮] রাসূল (সা.) তার কবিতা শুনে বলতেন, 'আমার পক্ষ থেকে জবাব দাও। হে আল্লাহ! রুহুল কুদ্দুসকে দিয়ে তার সাহায্য করো।'[১৭৯] আর রাসূল (সা.) তাকে এ কথাও বলেন যে, তুমি আবু বকরের নিকট গিয়ে কুরাইশদের দোষত্রুটি ও দুর্বল দিকগুলো জেনে নাও। এ সম্পর্কে আবু বকরই অধিক জ্ঞানী।'[১৮০] সত্যিই সেদিন হাস্সান এ কাজের উপযুক্ত ছিলেন এবং অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে এক্ষেত্রে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছিলেন। তাই রাসূল (সা.) বলেছিলেন, 'তার এ কবিতা তাদের জন্যে তিরের আঘাতের চেয়েও তীব্রতর।'[১৮১] এসব কারণেই তিনি সংগতভাবেই 'শা'ইরূর রাসূল' বা রাসূলের কবি নামে খ্যাতি লাভ করেছেন। এ 'কবিতার ময়দানে অপর যে দুজন কবি

177. সহীহ মুসলিম, হাদিস : ২৪৯০, সহীহ।
178. আবু দাউদ সুলাইমান ইব্নে আশআছ ইব্নে ইসহাক ইব্নে বাশির, প্রাগুক্ত, হা : ৫০১৫।
179. আবু দাউদ সুলাইমান ইব্নে আশআছ ইব্নে ইসহাক ইব্নে বাশির, প্রাগুক্ত, হা : ৫০১৫।
180. সহীহ মুসলিম, হাদিস : ২৪৯০, সহীহ।
181. সহীহ ইব্নে হিব্বান, হাদিস : ৫৭৮৬।

তাকে সাহায্য করেন, তারা হলেন কাব ইব্ন মালিক [১৮২] ও আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা।[১৮৩] কাব্যের জগতে তাঁদের অবদানও কম নয়।[১৮৪]

ইসলাম সাহিত্য চর্চার প্রতি যে কত উদার কবি কা'ব ইব্ন যুহাইরের ঘটনা তার জ্বলন্ত প্রমাণ। জাহেলি ও ইসলামি যুগের বিশিষ্ট কবি কাব ইব্ন যুহাইর।[১৮৫] তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ইসলাম ও ইসলামের নবির নিন্দামূলক কবিতা রচনা করে রাসূলের বিরাগবাজন হন। ফলে রাসূল (সা.) তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। সে ব্যক্তিই যখন ইসলাম গ্রহণ করে মদিনায় এলেন এবং তার বিখ্যাত কাসিদা 'বা'নাত সূ'আদ' আবৃত্তি করে রাসূল (সা.)-কে শোনালেন, তখন রাসূল (সা.) তাকে শুধু ক্ষমাই করেননি; বরং খুশির আতিশয্যে তার সৃষ্টিকর্মের প্রতিদানস্বরূপ নিজ দেহের চাদরটি তাকে উপহার হিসেবে দিয়ে দেন।

ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কবিতা রচনার অপরাধে রাসূল (সা.)-এর নির্দেশে নাদর ইব্ন হারিজকে হত্যা করা হয়। এরপর তার কন্যা রাসূল (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে একটি মর্মস্পর্শী কবিতা আবৃত্তি করে। তা শুনে তিনি বলেন, 'যদি এ কবিতা নাদরের হত্যার পূর্বে শুনতাম তাহলে তাকে হত্যা করতাম না।' রাসূল সা.-এর বিরুদ্ধে কবিতা রচনার অপরাধে হত্যার দণ্ডপ্রাপ্ত আরেক কবি তুফায়ল ইব্ন আমর আদ-দাওসী রাসূল (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন এবং বলেন, আমি একজন কবি, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আপনি আমার কিছু কবিতা শুনুন। রাসূল (সা.) তাকে তার কবিতা আবৃত্তি করতে বলেন। অতঃপর তিনি একটি দীর্ঘ কবিতা পাঠ করেন এবং রাসূল (সা.) ধৈর্য সহকারে তা শোনেন ও তাকে ক্ষমা করে দেন।[১৮৬] কবিতার জ্ঞানে রাসূল (সা.) ছিলেন পারদর্শী। তাই তিনি অনেক কবির অনেক কবিতা সংশোধন করে দিয়েছেন।

খোলাফায়ে রাশেদার কাব্যচর্চা : রাসূল (সা.)-এর ইন্তিকালের পর তাঁর সুযোগ্য খলিফাগণ ইসলামি রাষ্ট্রের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। এ যুগেও কবিতা চর্চায় তেমন ভাটা পড়েনি। খোলাফায়ে রাশিদীন

---

182. তিনি ৫৯৫ খ্রিষ্টাব্দে মদিনার খাজরাজ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয় আকাবায় ৭০ জন মদিনাবাসীর সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল (সা.) মদিনায় তাঁর সাথে হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহর সম্পর্ক স্থাপন করে দেন। তাঁর উপনাম আবু আবদুল্লাহ। ইসলামপূর্ব নাম আবু বশীর। তিনি বদর ও তাবুক ব্যতীত সকল যুদ্ধে রাসূল (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। উহুদ যুদ্ধে তিনি ১১টি আঘাতপ্রাপ্ত হন। তাবুক যুদ্ধে অংশ নিতে না পারায় তিনি সামাজিক বয়কটের মুখোমুখি হন। প্রায় ৫০ দিন এ অবস্থা চলার পর আল্লাহ তায়ালা তাঁর তওবা কবুল করে পবিত্র কুরআনের আয়াত নাজিল করেন।

183. আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা আরব গোত্র বনু খাজরাজে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিজরতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারী আনসার সাহাবিদের অন্যতম। পরবর্তী সময়ে তিনি মদিনায় ইসলাম প্রচার করেন। আকাবার দ্বিতীয় শপথেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। মুতার যুদ্ধে তিনি তৃতীয় সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এই যুদ্ধে ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি নিহত হন।

184. আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্নে হিশাম, সীরাতে ইবনে হিশাম, খ. ১, পৃ. ২৫৫-২৮০।

185. কা'ব বিন যুহাইর ছিলেন সপ্তম শতাব্দীর একজন আরব কবি। তিনি ছিলেন মহানবি (সা.)-এর সমকালীন একজন প্রখ্যাত কবি। তিনি মহানবি (সা.)-এর প্রশংসায় 'বা'নাত সু'আাদ' নামক বিখ্যাত কাসিদা রচনা করেছেন; যা ছিল প্রথম আরবী না'তে রাসূল।

186. আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্নে হিশাম, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৬০-২৮০।

সর্বদাই কবিতা আবৃত্তি করতেন। সাহাবিরা তো মসজিদে নববিতে কবিতা আবৃত্তির আসর বসাতেন।[১৮৭] ইসলামি যুগে যে সকল যুদ্ধ-বিগ্রহ হয় তাতে উভয় পক্ষে অসংখ্য কবি অংশগ্রহণ করেন এবং নিজ নিজ পক্ষের শৌর্য-বীর্যের বর্ণনা ও শত্রুর উদ্দেশ্যে নিন্দামূলক কবিতা রচনা করেন। খোলাফায়ে রাশিদীনের প্রত্যেকে কবি ছিলেন। সা'ঈদ ইব্ন আল-মুসায়্যিব বলেন :[১৮৮] আবু বকর (রা.) কবি ছিলেন, উমর (রা.) কবি ছিলেন, আর আলী (রা.) ছিলেন তিনজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি।' সে যুগের সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করলে হযরত আবু বকর (রা.)-কে একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সমালোচক রূপে দেখতে পাওয়া যায়। তিনি কবি নাবিগা আয-যুব্ইয়ানীকে জাহেলি যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মনে করতেন এবং বলতেন, তার কবিতা শিল্পকুশলতা ও ছন্দ মাধুর্যে সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বাপেক্ষা বেশি সাবলীল।[১৮৯] দ্বিতীয় খলিফা উমর (রা.) সম্পর্কে তো প্রসিদ্ধি আছে, কোনো প্রতিনিধিদল তার কাছে এলে তিনি তাদের কবিদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। তারা তাদের কবিদের কিছু কবিতা আবৃত্তি করে শোনাত এবং তিনি নিজেও কোনো কোনো সময় সেসব কবিতার কিছু অংশ আবৃত্তি করতেন। তিনি বসরার শানকর্তা আবু মুসা আল-আশ'আরীকে (রা.) নির্দেশ দেন :

'তুমি তোমার সেখানকার লোকদেরকে কবিতা শেখার নির্দেশ দাও। কারণ, কবিতার মাধ্যমে উন্নত নৈতিকতা, সঠিক সিদ্ধান্ত এবং বংশ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়।'[১৯০] তিনি আরও বলতেন, 'তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সাঁতার ও তির চালনা শেখাও। তাদেরকে ঘোড়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দাও। আর তাদেরকে সুন্দর কবিতা বলে শোনাও।'[১৯১] ইব্ন সাল্লাম আল-জুমাহী (মৃত্যু ২৩২ হিজরি) বলেন, 'তিনি যে কোনো ধরনের ঘটনা বা ব্যাপারের সম্মুখীন হলেই সে সম্পর্কে কবিতার দু-একটি পঙ্‌ক্তির উদ্ধৃতি দিতেন।'[১৯২] আরবী সাহিত্য সমালোচনার ইতিহাসে তাকে সে যুগের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য-সমালোচক গণ্য করা হয়েছে। তিনি প্রথম ব্যক্তি যিনি রুচির ভিত্তিতে নয়, বরং যুক্তির ভিত্তিতে সমালোচনা করেছেন। কবি যুহাইরকে তিনি সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মনে করতেন। শুধু এ সিদ্ধান্ত দিয়েই ক্ষান্ত হননি, সঙ্গে তার কারণও বলে দিয়েছেন। যুহাইর সম্পর্কে তিনি বলতেন, তিনি এককথার মধ্যে আরেক কথা গুলিয়ে ফেলতেন না। জংলি ও আশোভন কথাও এড়িয়ে চলতেন। কোনো ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান গুণেরই তিনি প্রশংসা করেছেন। তার কবিতায় কোনো অতিরঞ্জন নেই। তাই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।'[১৯৩] তিনি এবং

---

187. ড. শাওকী দায়ফ, *তারীখ আল-আদাব আল-আরাবী* , খ. ২, পৃ. ৪৫।
188. ইব্নে 'আবদি রাব্বিহি, *আল-'ইকদ আল-ফারীদ*, খ. ৫, পৃ. ২৮৩।
189. ড. আবদুল মুনইম খাফাজী, *মুকদ্দিমা : নাকদ আশ-শি'র*, পৃ. ২৩।
190. হুস্ন আস-সাহাব, খ. ১০, পৃ. ২২।
191. ইব্নে রাশীক আল-কিরওয়ানী, আ-'উমদা, খ. ১, পৃ. ১০; হুস্ন আস-সাহাব, খ. ১০, পৃ. ২২।
192. ইব্নে আব্দে রাব্বিহি, *আল-'ইকদ আল-ফারীদ*, খ. ৫, পৃ. ২৮১।
193. ইব্নে সাল্লাম আল-জুমাহী, তাবাকাত আশ-শূ'আরা' পৃ. ২৯; আল-বাকিল্লানী, ই'জাস আল কুরআন, পৃ. ১৩৪।

তার সঙ্গী-সাথিরা সমবেত হয়ে কবিতা ও কবিদের সম্পর্কে আলোচনা করতেন এবং কার কোন কবিতা সর্বোৎকৃষ্ট সে সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করতেন।[১৯৪] তিনি বলতেন, কবিতা হলো কোনো জাতির এমনই এক জ্ঞান যার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কোনো জ্ঞান নেই।[১৯৫]

খলিফা হযরত উমর (রা.) কুরআনের আয়াতের অর্থ বুঝতে কবিতার শরণাপন্ন হতেন। একবার তিনি মিম্বরে ওপর দাঁড়িয়ে একটি আয়াত পাঠ করেন। আয়াতটি হলো–

أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

"কিংবা ভীতিপ্রদর্শনের পর তাদেরকে পাকড়াও করবেন? নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু অত্যন্ত নম্র ও দয়াবান।"[১৯৬]

তারপর উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামের নিকট আয়াতে উল্লিখিত 'তাখাউয়ুফিন' শব্দটির অর্থ জানতে চান। সাহাবায়ে কিরাম সকলে চুপ থাকলেন। তখন হুযায়ন গোত্রের এক বৃদ্ধ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, হে আমিরুল মুমিনিন! এটা আমাদের উপভাষা। এর অর্থ অল্প অল্প নেওয়া। উমর (রা.) বৃদ্ধের নিকট জানতে চাইলেন, আরবরা কি তাদের কবিতা থেকে অর্থ জানতে পারে? অর্থাৎ আরব কবিরা তাদের কবিতায় এ অর্থে শব্দটি প্রয়োগ করেছেন? বৃদ্ধ বললেন, হ্যাঁ! আমাদের কবি আবু কাবীর আল-হুযালী তার উষ্ট্রীর বর্ণনা দিতে গিয়ে একটি শ্লোকে এ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তারপর বৃদ্ধ শ্লোকটি আবৃত্তি করে শোনান। উমর (রা.) তখন বলেন, 'তোমরা তোমাদের দীওয়ান সংরক্ষণ করে রাখো, তাহলে তোমরা আর গোমরাহ হবে না।[১৯৭]

ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.) ছিলেন জ্ঞানের ভান্ডার। সে যুগের আরব কবিদের মধ্যে তিনিও একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। 'দিওয়ানে আলী' নামক কাব্য সংকলন প্রন্থটি আজও তার কাব্য প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধনে তার অবদান এ ভাষা যতদিন বেঁচে থাকবে, মানুষের নিকট ততদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি ছিলেন আরবী সাহিত্যের একজন সমঝদার সমালোচক। কেবল সাহিত্যিক-সৌন্দর্য ও ভাষার অভিনবত্বের কারণে তিনি জাহেলি যুগের ভোগবাদী কবি ইমরুল কায়েসকে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলে মনে করতেন।[১৯৮]

---

194. *মুকদ্দিমা : নাকদ আশ-শি'র*, পৃ. ২৩।
195. ইব্নে রাশীক আল-কিরওয়ানী, আল উমদা : খ. ১, পৃ. ৯।
196. সূরা আন-নাহল, আয়াত : ৪৭।
197. ইব্নে মানসুর, *লিসান আল-'আরাব*, খ. ২, পৃ. ১৯৯২; তাজ আল-'আরূস, খ. ৬, পৃ. ১০৬।
198. মুকাদ্দিমা, *নাকদ আশ-শি'র* , পৃ. ২৩।

একবার যিয়াদ তার এক ছেলেকে আমির মুআবিয়া (রা.)-এর নিকট পাঠালেন। মুআবিয়া তার জ্ঞান-গরীমা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তাকে অনেকগুলো প্রশ্ন করলেন। দেখলেন, ছেলেটির সব বিষয়ে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি রয়েছে। সবশেষে তিনি তাকে কিছু কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে বললেন। এবার ছেলেটি অক্ষমতা প্রকাশ করল। তখন মুআবিয়া (রা.) যিয়াদকে লিখলেন, তুমি তোমার ছেলেকে কবিতা শেখাওনি কেন? কবিতা শিখলে সে অবাধ্য থাকলে বাধ্য হবে, কৃপণ থাকলে দাতা হবে এবং ভীরু থাকলে সাহসী হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে।[১৯৯]

অন্যান্য সাহাবিদের কাব্যচর্চা : খলিফাগণ ছাড়াও অন্যান্য সাহাবিরাও কাব্যচর্চা করতেন। নিজেরা কবিতা শিখতেন এবং অন্যদেরকে শেখার নির্দেশ দিতেন। হযরত আয়শা (রা.) বলেন, 'তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে কবিতা শিক্ষা দেবে। এতে তাদের ভাষার জড়তা দূর হয়ে সহজ ও সাবলীল হবে।'[২০০] তার অসংখ্য কবিতা মুখস্থ ছিল এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি কবিতা আবৃত্তি করতেন। এমনকি রাসূল (সা.)-এর সাহাবিদের এমন অনেকেই রয়েছেন যারা কবিতা রচনা করেছেন কিংবা কবিতা আবৃত্তি করেছেন।'[২০১] হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) বলতেন, 'পবিত্র কুরআন পাঠ করে যদি কোথাও বুঝতে না পারো তাহলে তার অর্থ আরবদের কবিতার মাঝে সন্ধান করো।'[২০২] এভাবে যদি সে যুগের আরবী সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করা হয় তাহলে দেখা যাবে সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন। মূলত সাহাবায়ে কিরামের অনুকরণীয় আদর্শ ছিল দুইটি। একটি হলো আল-কুরআন আর অপরটি হলো রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ। এ দুটির ভিত্তিতে যেমন তারা জীবন পরিচালনা করেছেন, তেমনিভাবে এ দুটির আলোকে তারা সাহিত্যচর্চাও করেছেন। তাদের সার্বিক কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করলে সাহিত্যচর্চার ব্যাপারে কোথাও তাদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করা যায় না। বরং ব্যাপকভাবে তারা এ কাজে অংশগ্রহণ করেছেন।[২০৩]

সাহিত্য সকল দেশ, জাতি ও ভাষার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর সাহিত্যের বিরাট একটি অংশজুড়ে আছে কবিতার পদচারণা। পৃথিবীর শুরু থেকে আজ অবধি সকল বিবর্তনের সাথে কবিতাও বিবর্তিত হচ্ছে নানা রূপে নানা রঙে। পৃথিবীর সকল দেশে, জাতিতে ও ভাষায়। এই ধারা মহাপ্রলয় তথা কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষুণ্ন থাকবে।

---

199. ইব্নে আব্দে রাব্বিহি, *আল-ইকদ আল-ফারীদ*, খ. ৫, পৃ. ২৭৪।
200. ইব্নে আব্দে রাব্বিহি, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৭৪।
201. জুরজী যায়দান, *তারীখু আ'দাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ*, ২য় খণ্ড, (বৈরুত : দারু মাকতাবাতিল হায়াত, ১৯৭৩), খ. ১, পৃ. ১৯২।
202. জুরজী যায়দান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৯২।
203. আলী ফাহমী মু'সতারী, *হুস্নুস সাহাবা ফি শরহে আশআ'র আস-সাহাবা*, খ. ১০, পৃ. ২৫।

রাসূলের হাদিসে কবি ও কবিতা : কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূল (সা.)-এর অনেক হাদিস রয়েছে। তিনি কবিতাকে ভালোবাসতেন। কাজেই রাসূলের উম্মত হিসেবে আমাদেরও উচিত ভালো কবিতার প্রতি ভালোবাসা ও আগ্রহ থাকা। বর্তমানে ইসলামবিদ্বেষীরা কবিতার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে কটাক্ষ করছে। আল্লাহ, রাসূল ও কুরআনকে অবমাননা করছে। তাদের জবাব দিতে এ বিষয়ে প্রতিভাবানদের কাব্যচর্চায় আত্মনিবেশ করা উচিত।

জাহেলি যুগে যখন রাসূল (সা.) পৃথিবীতে আগমন করেন, তখন আরববিশ্ব ছিল কবিতার আলোকিত পটভূমি। চারিদিকে ছিল কাব্যচর্চার জয়জয়াকার। আরবের অন্যতম কবিদের কবিতা তখন প্রাচীরে প্রাচীরে টানিয়ে রাখা হতো। কবিতার মাধ্যমে তারা নিজেদের শৌর্য-বীর্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও বীরত্বগাথা ঐতিহ্য তুলে ধরত। নিজেদেরকে প্রমাণ করত শ্রেষ্ঠ জাতিতে। রাসূল (সা.)ও কবিতা পছন্দ করতেন। কবিদের ভালোবাসতেন। অবিশ্বাসী কবিদের মোকাবিলায় বিশ্বাসী সাহাবি কবিদেরকে তিনি কবিতা রচনা করতে উৎসাহিত করতেন। তিনি ছিলেন কবিদের উপদেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষক। কবিতার যোগ্য সমালোচক। তিনি সাহাবি কবিদের কবিতার উপযুক্ত সমালোচনা ও প্রশংসা করতেন। সাহাবিরাও রাসূলের কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সত্যতা ও প্রশংসামূলক, ইসলাম ও মুসলমানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশক কবিতা রচনা করতেন। রচনা করতেন বীরত্বগাথা মহাপ্রেরণার কবিতা। স্বয়ং রাসূলও মাঝেমধ্যে মুখে মুখে কবিতা আওড়াতেন। [২০৪]

কুরআনে উল্লিখিত সূরা শুআরার ভাষা ছিল রাসূল (সা.)-এর কাব্যদর্শন, কাব্যচিন্তন, কাব্য-চেতনা ও কাব্য-সমালোচনার প্রধান উপকরণ। তিনি কবিতার ছন্দ ব্যঞ্জন, রূপ, লহর ও গঠনপ্রণালির চেয়ে কবিতার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, বিধেয় ও বিষয়বস্তুর প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন বেশি। যার কারণে তিনি বলেছেন, 'কবিতা দিয়ে পেট পূর্ণ হওয়ার চেয়ে বমিতে ভরে থাকাই ভালো।'[২০৫] আর তাইতো তিনি জাহেলি যুগের আরবী সাহিত্যের বিশ্বসেরা কবি ইমরুল কায়েস সম্পর্কে বলেছিলেন, 'নিশ্চয়ই তার ভাষায় আছে সম্মোহনী শক্তি এবং কাব্যকর্মে আছে বর্ণনার পরিপাট্য। পৃথিবীতে সে খ্যাতনামা হলেও আখিরাতে তার নাম নেওয়ার কেউ থাকবে না। কবিদের যে দল জাহান্নামে যাবে, সে হবে তাদের নিশান-বর্দার।'[২০৬] জাহেলি যুগে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যারা কবিতা লিখত, ইমরুল কায়েস ছিল তাদের অন্যতম। তার কবিতা ছিল অশ্লীলতায় ভরপুর। তবুও রাসূল (সা.) তাঁর কবিতার প্রশংসা করেছিলেন তার ভাষা সাহিত্যের সুসংবদ্ধ শৈল্পিকতার কারণে।

---

204. জুরজী যায়দান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৯০-১৯৫।

205. মুহাম্মদ ইব্নে আহমদ ইব্নে উসমান ইব্নে কাইয়ূম আবু আবদুল্লাহ শামছুদ্দীন আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'*, খ. ১৪, পৃ. ৪৩২।

206. আবু আবদুল্লাহ আহমদ ইব্নে মুহাম্মদ ইব্নে হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, (তাহকীক : আহমদ শাকের, দারুল হাদীস, ১৯৯৫), খ. ১২, পৃ. ৯৫।

রাসূল (সা.) কবিদেরকে সীমাহীন মর্যাদা দান করেছেন। সেসময় হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত, কা'ব ইব্‌ন মালিক, কা'ব ইব্‌ন জুহাইর, আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা, আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস,কবি লাবিদ, মহিলা কবি খানসা প্রমুখ সাহাবি কবিতা লিখতেন। আজ তাদের নাম পৃথিবীর ইতিহাসে চির অম্লান হয়ে আছে।[২০৭]

রাসূল (সা.) কবিদেরকে ভালোবাসতেন। ইসলাম ও মুসলমানদের শৌর্যবীর্য ছড়াতে ও অবিশ্বাসী কবিদের আক্রমণ প্রতিহত করতে তিনি সাহাবি কবিদেরকে নানাভাবে কবিতা রচনায় উদ্বুদ্ধ করতেন। নামাজের আগে-পরে মসজিদেই বসত কবিতা পাঠের আসর। মিম্বারে দাঁড়িয়ে দারাজকণ্ঠে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত আবৃত্তি করতেন বীরত্বমাখা সব কবিতা। রাসূল (সা.) শুনতেন এবং বাহবাহ দিতেন। দুআ করতেন, 'হে আল্লাহ! তুমি রুহুল কুদ্দুস তথা জিব্রাঈল আ. এর মাধ্যমে হাস্‌সান ইবনে সাবিতকে সাহায্য করো।'[২০৮]

আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা রাসূলের সাথে কাজা উমরা আদায় করার জন্য মক্কায় গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন হযরত উমর (রা.)ও। আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা রাসূলের সামনেই হঠাৎ আবৃত্তি করে গেয়ে উঠলেন–

خَلُّوا بَنِي الكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ ** اليَوْمَ نَضْرِبْكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ
ضَرْبًا يُزِيلُ الهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ ** وَيُذْهِلُ الخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ

'হে কাফিরের বংশধর! ছেড়ে দে তাঁর চলার পথ;

আজ মারবো তোদের কুরআনের ভাষায় মারার মতো।

কল্লা উড়ে যাবে তোদের গর্দান হতে,

বন্ধু হতে বন্ধু হবে পৃথক তাতে।' [২০৯]

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا ابْنَ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَرَمِ اللهِ تَقُولُ الشِّعْرَ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَلِّ عَنْهُ يَا عُمَرُ، فَلَهِيَ أَسْرَعُ فِيهِمْ مِنْ نَضْحِ النَّبْلِ.

উমর (রা.) তৎক্ষণাৎ বললেন, 'তুমি রাসূলের সামনে হারামের ভেতরে কবিতা পড়ছ? রাসূল (সা.) তখন বাধা দিয়ে বললেন, 'হে উমর! তাকে বলতে দাও। বাধা দিয়ো না। কেননা, তার এই কবিতা তিরের চেয়েও দ্রুতগতিতে তাদেরকে (কাফিরদেরকে) আহতকারী।' [২১০]

---

207. আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্‌নে হিশাম, *সীরাতে ইবনে হিশাম*, খ. ১, পৃ. ২৬০-২৬২।
208. আবু দাউদ সুলাইমান ইব্‌নে আশআছ ইব্‌নে ইসহাক ইব্‌নে বাশির, প্রাগুক্ত, হা : ৫০১৫।
209. সুনানুত তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ ৪, পৃ ৪৩৬, হা : ২৮৪৭।
210. সুনানুত তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ ৪, পৃ ৪৩৬, হা : ২৮৪৭।

" أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ:أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللَّهَ بَاطِلُ "

কবি লাবিদের কবিতা সম্পর্কে রাসূল (সা.) মন্তব্য করে বলেছিলেন, 'আরব কবিদের মধ্যে সর্বোত্তম ও সত্য কবিতা বলেছে কবি লাবিদই। আর তা হলো, 'শুনে রেখো! এক আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই বাতিল।'[২১১] এ ছাড়াও সাহাবি কবিদেরকে রাসূল (সা.) বিভিন্নভাবে পুরস্কৃত করেছেন, সম্মান দিয়েছেন। কবিরা যুদ্ধে শরিক না হলেও তাদেরকে গনিমতের ভাগীদার করেছেন। ইমাম শরফুদ্দিন বুসিরি (রহ.) এর কবিতায় রাসূল (সা.) খুশি হয়ে স্বপ্নে কবি বুসিরিকে তাঁর গায়ের চাদর দিয়ে পুরস্কৃত করেছিলেন। পরবর্তীকালে সেই ঐতিহাসিক কাব্যগ্রন্থটিই 'কাসিদায়ে বুরদা' (চাদরের কবিতা)[২১২] নামে প্রকাশিত হয়; যা আমরা এখনও পড়ে রাসূল প্রেমে মগ্ন হই। তা ছাড়া বিখ্যাত পারস্য কবি শেখ সাদীকেও স্বপ্নে রাসূল (সা.) দেখা দিয়েছেন।

রাসূল (সা.) নবি ছিলেন, ছিলেন রাসূল। তাই তিনি কবি ছিলেন না। কবিতা রাসূলের জন্য শোভনীয়ও নয়। জাগতিক কোনো শিক্ষক ও শিক্ষা তাঁকে ছুঁতে পারেনি। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা হযরত জিব্রাইলের মাধ্যমে তাঁকে শিখিয়েছেন সবকিছু। যদি তিনি কবিতা লিখতেন তাহলে অহী ও কবিতার মাঝে পার্থক্যসাধন করা কষ্টকর হতো। লোকরা দ্বিধা-দ্বন্ধে পড়তো। এমনিতেই তো তিনি যখন অহী প্রাপ্ত হন, আর তা প্রচার করতে থাকেন, তখন আরবের নেতারা তাঁকে কবি বলে উপহাস করতে থাকে, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে থাকে। তাদের ভুল ধারণা প্রতিহত করতেই আল্লাহ তায়ালা আয়াত নাযিল করে ঘোষণা দেন-

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ

'আমি রাসূলকে কবিতা শিক্ষা দিইনি। আর কবিতা তাঁর জন্য শোভনীয়ও নয়।'[২১৩]

যদিও রাসূল (সা.) কবি ছিলেন না। তবু তিনি ছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো সাহিত্যিক। তার প্রমাণ বহন করছে তাঁর অগণিত সাহিত্য মন্ডিত হাদিসসমূহ। তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেন–

أنا أفصح العرب بيد أني من قريش

'আমি আরবদের মধ্যে সবচেয়ে বাগ্মী, কিন্তু আমি কুরাইশ বংশের লোক।' [২১৪]

211. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্নে ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহ বুখারী, হা : ৬১৪৭, সহীহ।
212. মহানবি হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রশংসায় আরবীতে রচিত সুদীর্ঘ কবিতা 'আল-কাওয়াকিবুদ দুররিয়্যাহ ফি মাদহে খায়রিল বারিয়্যাহ' ই হলো কাসিদায়ে বুরদা নামে পরিচিত।
213. সূরা ইয়াসিন, আয়াত : ৬৯।
214. মোল্লা আলী ক্বারী, *আল-আসরারুল মারফুআ'*, হা. ১৩৭, মুহাদ্দিসদের মতে হাদিসটি সহীহ নয়।

মোটকথা, রাসূল (সা.) কবিতা ভালোবাসতেন। তাই মুসলিম হিসেবে আমাদেরও উচিত কবিতাকে ভালোবাসা। অযৌক্তিক উদ্ভট কবিতা নয়; বরং যে কবিতা ন্যায়ের কথা বলে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ে, সেসব কবিতাকেই আমাদের ভালোবাসা উচিত।

চতুর্থ অধ্যায়

আল্-মুতানাব্বী এর কাব্যশৈলী

১ম পরিচ্ছেদ : প্রশংসামূলক কবিতার বর্ণনা
২য় পরিচ্ছেদ : নিন্দামূলক কবিতার বর্ণনা
৩য় পরিচ্ছেদ : বীরত্বপূর্ণ কবিতার বর্ণনা
৪র্থ পরিচ্ছেদ : যুদ্ধের বর্ণনামূলক কবিতা
৫ম পরিচ্ছেদ : শোকগাথা কবিতার বর্ণনা

১ম পরিচ্ছেদ
প্রশংসামূলক কবিতার বর্ণনা

কবি আল-মুতানাব্বী (৯১৫-৯৬৫ খ্রি.) ছিলেন আব্বাসীয় যুগের (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর কবিতায় তিনি কাব্য ও দর্শনের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। কবিতা রচনায় তিনি আরবদের গতানুগতিক রীতিনীতি হতে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁকে আরবী কবিতায় সংস্কার আন্দোলনের প্রবর্তক বলা যায়। তাঁর কবিতায় প্রশংসা, নিন্দা, শোক, বীরত্বের বর্ণনা, যুদ্ধের বর্ণনাসহ চমৎকার উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও রূপকের অসাধারণ প্রয়োগ পাওয়া যায়।[১] নিম্নে তাঁর প্রশংসামূলক কবিতা (المدحية) বর্ণনার দু-একটি প্রেক্ষাপটসহ কতিপয় কবিতাগুচ্ছ তুলে ধরা হলো।

আব্বাসীয় যুগে আবু আলী হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ 'আল-কাতিব' পদধারী একজন দানবীর ব্যক্তি ছিলেন। যিনি সিরিয়ায় রোমানদের সাথে যুদ্ধ করে বিজয়ী হয়েছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে লেবাননে গিয়ে অবসর জীবনযাপন করেন। কবি আল-মুতানাব্বী তথায় গমন করে তাঁর প্রশংসায় নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন। প্রাচীন আরব কবিদের রীতি অনুসরণ করে প্রথমে তিনি প্রণয়গীতি দিয়ে কবিতাটি শুরু করেন। কবির প্রেয়সী এতই রূপবতী যে, তার রাত্রকালীন আগমনে চতুর্দিকে আলোকছটা ও সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ে। তার প্রেম প্রেমিক কবির ওপর এতই প্রভাব বিস্তার করেছে যে, কবির মানসিক দুঃখ-যন্ত্রণা এবং শারীরিক অসুস্থতা সবই দূর হয়ে গিয়েছে। এরপর কবি তাঁর উদ্দীষ্ট বিষয়ের অবতারণা করেন। লেবাননে অবস্থানকারী আবু আলী হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ এর কাছে যাত্রাকালে কবি বহু দুর্গম ও বিপদসংকুল পথ অতিক্রম করার কথা ব্যক্ত করেন। কবি প্রশংসিত আবু আলীর দানশীলতা, বদান্যতা ও সাহসিকতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁর দানশীলতার বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি নানা উপমা ও রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করেন।[২] তাঁর কবিতামালা হলো–[৩]

أمن ازديارك في الدجى الرقباء ** إذ حيث كنت من الظلام ضياء

قلق المليحة وهي مسك هتكها ** ز ومسيرها في الليل وهي ذكاء

أسفي على أسفي الذي دلهتني ** عن علمه فبه علي خفاء

---

[1] . আয্-যয়্যাত, আহমদ হাসান, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, বৈরুত, দারুল মা'আরিফ, ১৯৯৩ খ্রি.,পৃ ২১৯।

[2] . ড. মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী, *প্রাচীন আরবী কবিতা : ইতিহাস ও সংকলন*, আহমাদিয়া প্রিন্টিং প্রেস, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, দ্বিতীয় সং. জানু. ২০১৯, পৃ ৬৬৮-৬৬৯।

[3] . আবুল আলা' আহমাদ ইব্নে আবদিল্লাহ আল-মাআর্‌রী, *আল-লামেউল আযিযী শরহু দেওয়ানিল মুতানাব্বী*, মারকাযুল মালিক ফয়সাল লিল বুহুসে ওয়াদ দিরাসাতিল ইসলামিয়া; সৌদি আরব, ১৪২৯ হি., পৃ ৪-১৪।

وشكيتى فقد السقام لانه ** قد كان لما كان لى اعضاء

مثلت عينك في حشاي جراحةً ** فتشابها كلتاهما نجلاء

نفذت علي السابري وربما ** تندق فيه الصعدة السمراء

أنا صخرة الوادي إذا ما زوحمت ** فإذا نطقت فإنني الجوزاء

واذا خفيت على الغبى فعاذر ** ان لا ترانى مقلة عمياء

شيم الليالي أن تشكك ناقتي ** صدري بها أفضى أم البيداء

فتبيت تسئد مسئدًا في نيهّا ** إسآدها في المهمه الإنضاء

أنساعها ممغوطة وخفافها ** منكوحة وطريقها عذراء

يتلون الخريت من خوف التوى ** فيها كما يتلون الحرباء

بينى وبين ابى على مثله ** شم الجبال و مثلهن رجاء

و عقاب لبنان و كيف بقطعها ** وهو الشتاء و صيفهن شتاء

لبس الثلوج بها علي مسالكي ** فكأنها ببياضها سوداء

وكذا الكريم إذا أقام ببلدةٍ ** سال النضار بها وقام الماء

جمد القطار ولو رأته كما رأى ** بهتت فلم تتبجس الأنواء

فى خطة من كل قلب شهوة ** حتى كان مداده الاهواء

ولكل عين قرة فى قربه ** حتى كان مغيبه الاقذاء

من يهتدي في الفعل مالا يهتدي ** في القول حتى يفعل الشعراء

في كل يوم للقوافي جولة ** في قلبه ولأذنه إصغاء

وأغاره فيما احتواه كأنما ** في كل بيتٍ فيلق شهباء

من يظلم اللؤماء فى تكليفهم ** أن يصبحوا و هم له أكفاء

ونذيمهم و بهم عرفنا فضله ** وبضدها تتبين الاشياء

من نفعه فى ان يهاج و ضره ** فى تركه لو تفطن الاعداء

فالسلم يكسر من جناحي ماله ** بنواله ما تجبر الهيجاء

يعطي فتعطى من لهى يده اللهى ** وترى برؤية رأيه الآراء

متفرق الطعمين مجتمع القوى ** فكانه السراء و الضراء

وكانه ما لا تشاء عداته ** متمثلا لوفوده ما شاؤوا

يا ايها المجدى عليه روحه ** إذ ليس يأتيه لها استجداء

إحمد عفاتك لا فجعت بفقدهم ** فلترك ما لم يأخذوا إعطاء

لا تكثر الأموات كثرة قلةٍ ** إلا إذا اشقيت بك الأحياء

والقلب لا ينشق عما تحته ** حتى تحل به لك الشحناء

لم تسم يا هارون إلا بعدما اق ** ترعت ونازعت اسمك الأسماء

فغدوت واسمك فيك غير مشارك ** والناس فى ما فى يديك سواء

لعممت حتى المدن منك ملاء ** ولفت حتى ذا الثناء لفاء

ولجدت حتى كدت تبخل حائلا ** للمنتهى و من السرور بكاء

ابدأت شيئا ليس يعرف بدؤه ** وأعدت حتى انكر الإبداء

فالفخر عن تقصيره بك ناكب ** والمجد من أن يستزاد براء

فإذا سئلت فلا لأنك محوج ** وإذا كتمت وشت بك الآلاء

وإذا مدحت فلا لتكسب رفعة ** للشاكرين على الإله ثناء

وإذا مطرت فلا لأنك مجدب ** يسقى الخصيب ويمطر الدأماء

لم تحك نانلك السحاب وإنما ** حمت به فصبيبها الرحضاء

لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا ** إلا بوجه ليس فيه حياء

فبأيما قدمٍ سعيت إلى العلا ** أدم الهلال لأخمصيك حذاء

ولك الزمان من الزمان وقاية ** ولك الحمام من الحمام فداء

لو لم تكن من ذا الورى اللذ منك هو ** عقمت بمولد نسلها حواء

অর্থ :

১. রাতের অন্ধকারে তোমার আগমন প্রহরীদলকে নিরাপদ করেছে; কেননা অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে তুমি জ্যোতিস্বরূপ।

২. (তুমি) লাবণ্যময়ী নারী কস্তুরিস্বরূপ, যার চলন ও বলন চতুর্দিকে সুগন্ধি ছড়ায়। আর রাতের বেলা তার বিচরণ সূর্যালোকের ন্যায় আলো বিকিরণ করে।

৩. আমার ওপর উপর্যুপরি দুঃখ আর দুঃখ, যেটি অনুধাবন করা থেকে তুমি (তোমার ভালোবাসা) আমাকে ভুলায়ে রেখেছে। যার ফলে এটি আমার কাছে অধরাই থেকে গেছে।

৪. রোগশূন্য হওয়াটাই আমার অনুযোগ; কেননা যখন আমার দেহাঙ্গ ছিল তখন আমি রোগবোধ করতাম (এখন আমি তোমার প্রেমে দেহাতীত হয়ে গেছি)।[৪]

৫. তোমার দৃষ্টি আমার অন্তরে ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। ফলে উভয়টি (তোমার চোখ ও আমার ক্ষত চিহ্ন) ব্যাপকতায় একাকার হয়ে গেছে।

৬. এটি (চক্ষুদৃষ্টি) আমাকে আঘাত হানতে পারস্য নির্মিত বর্মকে বিদ্ধ করেছে। অথচ এই বর্ম অনেক সময় গৌরবর্ণের বর্শাকে গুঁড়িয়ে দেয় (বর্শার আঘাত প্রতিহত করা গেলেও তোমার নয়নবানের আঘাত প্রতিহত করা সম্ভব হয় না)।

৭. যখন (আমাকে) ধাক্কা দেওয়া হয় তখন (কঠোরতায়) আমি উপত্যকার জগদ্দল পাথরের ন্যায় দৃঢ়ভাবে অবস্থান করি (আমাকে কেউ টলাতে পারে না)। আর যখন আমি বক্তব্য পেশ করি তখন মিথুন রাশির ন্যায় সুস্পষ্ট ও সমুন্নত বক্তব্য পেশ করি।

[৪] . আলোচ্য কবিতাটিতে কবি আল-মুতানাব্বী এমন এক ব্যক্তিকে নিবেদন করছেন, যে সুফিতত্ত্বের অনুসারী। তাই কবির কবিতায় আধ্যাত্মিক ও রূপকময় ভাষার ব্যবহার লক্ষণীয়।

৮. আমি যদি নির্বোধ লোকের কাছে অজ্ঞাত হই (সে যদি আমার মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে না জানে) তবে সেটা মার্জনীয়; কেননা, দৃষ্টিহীন (অজ্ঞ) লোক আমাকে দেখতে পাবে না।

৯. নৈশ পরিবেশ আমার উষ্ট্রীকে এ মর্মে সন্দেহের ঘোরে ফেলে দেয় যে, মরুবক্ষ অধিক প্রশস্ত নাকি আমার বক্ষ!

১০. সে (উষ্ট্রী) তার মেদবহুল দেহ নিয়ে সারারাত অবিরাম যাত্রা করে, যেমনটি মরুপ্রান্তরে ক্ষীণকায় উষ্ট্রী নিরবচ্ছিন্ন যাত্রা করে।

১১. তার হাওদা বাঁধার রশি (বিশাল দেহাবয়বের কারণে) সুপ্রলম্বিত এবং তার পদক্ষুরা (পায়ের ক্ষুরা) ক্ষতবিক্ষত। চলার পথটিও সম্পূর্ণ নতুন (সাধারণ চলাচলের পথ নয়, বরং দুর্গম পথ)।

১২. জীবন নাশের ভয়ে উক্ত পথে অভিক্ষ পথপ্রদর্শক নানা রূপ ধারণ করে, যেমনটি গিরগিটি[৫] বহুরূপ ধারণ করে।

১৩. আমি এবং আবু আলীর[৬] (হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ) মাঝে পাহাড়চূড়া সমতফাত; এবং তাঁর ব্যাপারে প্রত্যাশাও পাহাড় পরিমাণ।

১৪. এবং লুবনান পর্বতের গিরিপথ। এই শীত মৌসুমে আমি এটি কীভাবে অতিক্রম করব? অথচ এর গ্রীষ্মকালটা শীতকালের মতো (দুর্গম)।

১৫. এর বরফখণ্ড আমার চলার পথকে আচ্ছাদিত করে ফেলেছে; ফলে এ যেন শুভ্রতার কারণে (অন্ধকারে পথচলার ন্যায়) কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করল।

১৬. (বরফের শুভ্রতা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করা যেমন রীতিবিরুদ্ধ ঠিক) তেমনি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও যখন কোনো নগরীতে অবস্থান করে তখন স্বর্ণমুদ্রা প্রবাহিত হয় এবং পানি প্রবাহবিহীন হয়ে যায়।[৭] (উক্ত ব্যক্তির বদান্যতা দেখে সবাই হতভম্ব হয়ে যায়)।

---

[5] . গিরগিটির বৈজ্ঞানিক নাম Calotes versicolor, যা রক্তচোষা নামে অতি পরিচিত একপ্রকার নিরীহ সরীসৃপ। এগুলো গড়ে ৪৪ সেন্টিমিটার লম্বা হয়। লেজটিই প্রায় ৩২ সেন্টিমিটার। আর দেহ মাত্র ১২ সেন্টিমিটার। দেহের ওপরের অংশ বাদামি থেকে ধূসর। এগুলো প্রয়োজনের সময় দেহের রং পরিবর্তন করতে পারে। বর্তমানে প্রতিনিয়ত বন-বাগান ও ঝোপঝাড় ধ্বংস হওয়ার কারণে দিনে দিনে এই সরীসৃপগুলো হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ছে।

[6] . আব্বাসীয় যুগে সাচিবিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে 'আল-কাতিব' একটি গুরুত্বপূর্ণ পদের নাম ছিল। সুসাহিত্যিক, সংস্কৃতিবান, সুলিপিকার ও সাহসী ব্যক্তিত্বের অধিকারীগণই উক্ত পদের যোগ্য বলে বিবেচিত হতেন। এই পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তি প্রচুর অর্থোপার্জনের সুযোগ পেত। আবু আলী হারুন ইব্নে আবদুল্লাহ ছিলেন 'আল-কাতিব' পদধারী একজন দানবীর ব্যক্তি। যিনি সিরিয়ার রোমানদের সাথে যুদ্ধ করে বিজয়ী হয়েছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে লেবাননে অবসর জীবনযাপন করেন।

[7] . উল্লেখ্য যে, কবি আল-মুতানাব্বী তোষামোদিত ব্যক্তি আবু আলী হারুন ইব্নে আবদুল্লাহ এর কাছে শীতকালীন মৌসুমে গমন করেছিলেন, যখন পানি ঠান্ডায় জমাট বেঁধে যায়। (*শারহু দীওয়ান আল-মুতানাব্বী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬)

১৭. (তাঁর বদান্যতা দেখে) বৃষ্টিবিন্দু জমাটবদ্ধ হয়ে যায়। বৃষ্টির অস্তগামী তারকা যদি তাঁকে দেখে তাহলে হতভম্ব হয়ে যায় এবং আর বৃষ্টি ঝরায় না।[৮] (বৃষ্টির তারকা তাঁর বদান্যতা দেখে লজ্জিত হয়ে যায়, ফলে তাঁর সম্মানার্থে আর বারি বর্ষণ করে না)।

১৮. তাঁর হস্তলিপিতে প্রত্যেক মানবমনের আসক্তি রয়েছে; যেন মানুষের মনস্কামনাই এর কালি (তাঁর লেখায় জনসাধারণের চিন্তাচেতনার প্রতিফলন রয়েছে)।

১৯. তাঁর নৈকট্য প্রতিটি চোখের জন্য শীতলতা (তাঁর সান্নিধ্য সবার কাছে আকাঙ্ক্ষিত ও প্রীতিকর)। যার ফলে তাঁর অনুপস্থিতি পীড়াদায়কের মতো।

২০. তিনি (আবু আলী হারুন) এমন ব্যক্তিত্ব, যিনি স্বীয় কীর্তি দিয়ে সুপথপ্রদর্শন করে; সুতরাং তিনি সুকর্ম সম্পাদন না করা পর্যন্ত কবিরা স্বীয় বক্তব্যে (প্রশংসাগীতিতে) সঠিকভাবে পরিচালিত হয় না।

২১. প্রতিদিনই তাঁর অন্তরে ও শ্রবণে কবিতার ছড়াছড়ি (কবিগণ প্রশংসায় তাঁর মজলিশ মুখরিত রাখে)।

২২. কবিতা তাঁর সঞ্চিত সম্পদকে প্রতিদিনই লুট করে নিচ্ছে (প্রশংসাগীতিকাররা উপঢৌকন নিয়ে যাচ্ছে); যার ফলে কবিতার প্রতিটি পঙ্‌ক্তি যেন একজন দক্ষ সেনা সদস্য (যারা তাঁর সম্পদ উপঢৌকনস্বরূপ হরণ করে নিচ্ছে)।

২৩. যিনি হীন ব্যক্তিদের অবিচার করে যারা (বিদ্বেষবশত) তাঁর সমকক্ষ হওয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত।

২৪. আমরা হীন ব্যক্তিদের নিন্দা করি বটে, তবে তাদের দিয়েই (তুলনা করে) তাঁর (আবু আলীর) পরিচয় পাই। বস্তুত বৈসাদৃশ্য দিয়েই বস্তুর প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পায়।

২৫. তাঁকে ক্ষেপিয়ে তোলাটা লোকের জন্য লাভজনক (কেননা, তখন ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি প্রতিপক্ষের মাল লুটে নেবেন)। আর তাঁকে না ক্ষেপিয়ে এমনিতেই ছেড়ে দেওয়া জনসাধারণের জন্য অলাভজনক। বিষয়টি যদি তাঁর শত্রুরা উপলব্ধি করত!

২৬. শান্তিকালীন অবস্থা তঁর সম্পদের ক্ষতিসাধন করে, যা যুদ্ধকালে (গনিমতের মালের মাধ্যমে) তিনি অর্জন করেন।

২৭. তিনি এত বেশি দান করেন যে, তাঁর হস্তপ্রদত্ত দান হতে অন্যরা দান করে (তাঁর উপকারভোগকারীরাও দাতা হয়ে যায়); এবং তাঁর প্রদত্ত রায় হতে অন্যরা দিকনির্দেশনা লাভ করে।

২৮. তিনি স্বাদের দিক থেকে দুই স্বাদে বিভক্ত (মিত্রদের জন্য মিষ্টি ও শত্রুদের জন্য তিক্ত), ফলে তিনি যেন একই সাথে আনন্দ ও বেদনা; তবে ক্ষমতায় অবিভক্ত।

২৯. তিনি যেন তাঁর শত্রুদের নিরাকাঙ্ক্ষা এবং তাঁর শরণাগতদের আকাঙ্ক্ষার প্রতিকৃতি।

---

[৪]. আরবদের ধারণা, উক্ত তারকার কারণেই বৃষ্টিপাত হয়। (*শারহু দীওয়ান আল-মুতানাব্বী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬)

৩০. ওহে ঐ ব্যক্তি! যার আত্মা বদান্যতার ওপর স্থাপিত; কেননা কোনো দানপ্রার্থী তাঁর কাছে আসতে হয় না।

৩১. আপনার কল্যাণপ্রার্থীদের প্রশংসা করুন। তাদের হারানোতে আপনি যেন ব্যথিত না হোন; কেননা তারা যা গ্রহণ করে নাই তা রেখে যাওয়া আপনার পক্ষ থেকে উপহারস্বরূপ।

৩২. স্বল্পসংখ্যকের অধিক হওয়াতে মৃত্যু বিপুলসংখ্যক হয় না; তবে হ্যাঁ, জীবিতরা যদি আপনার ক্রোধের কারণে হতভাগ্য হয়।

৩৩. কারো অন্তর্ভেদ ভয়ে চুরমার হয় না; তবে হ্যাঁ, যদি সে আপনার প্রতি শত্রুতা পোষণ করে (তখন সে আপনার রোষানলে পড়ে প্রাণঘাতী মৃত্যুকে ডেকে আনে)।

৩৪. ওহে হারুন![৯] লটারি দেওয়ার পরই কেবল আপনার নামকরণ সম্ভব; কেননা আপনার (মহৎগুণসম্পন্ন) নামকরনের ব্যাপারে বহু নাম বিবাদে লিপ্ত হয়েছে (যেহেতু আপনি বহু গুণে গুণান্বিত)।

৩৫. সুতরাং আপনি যে নাম ধারণ করেছেন তাতে অন্য কারো অংশীদারিত্ব নেই; আর আপনার উদারহস্তের দানে সকল মানুষ সমান অংশীদার।

৩৬. আপনি সর্বজনীন, ফলে আপনার বদান্যতা শহর নগর সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। আপনি প্রশংসাকারীদের প্রশংসা অতিক্রম করেছেন (আপনি প্রশংসার চেয়েও অধিক যোগ্য), ফলে এই প্রশংসা তুচ্ছ বলে বিবেচিত।

৩৭. আপনি এত বেশি বদান্যশীল হলেন যে, শেষ পর্যন্ত আপনি কৃপণ হওয়ার উপক্রম হলেন। যেমনটি আনন্দের আতিশয্যে অনেক সময় কাঁদন (কান্না) নিয়ে আসে।

৩৮. কোনো বিষয়ের উদ্ধোধন আপনিই করলেন, যেটির প্রারম্ভটা কেবল আপনারই সুবিদিত (অন্যরা জানে না)। আর এটার পুনরাবৃত্তিও আপনিই করলেন; যার ফলে আপনার নবাবিষ্কার অস্বীকৃতই থেকে গেল (যেহেতু প্রথমটা আপনার স্মৃতি হতে বিস্মৃত হয়ে গেছে)।

৩৯. সুতরাং গৌরব আপনাকে পেয়ে তার অক্ষমতা হতে সরে দাঁড়াল (অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হলো); এবং মর্যাদা আপনাকে আরও অধিক মর্যাদাবান করার ব্যাপারে দায়মুক্ত হলো (কেননা, আপনি মর্যাদার শীর্ষ চূড়ায় পৌঁছে গেছেন)।

৪০. যদি আপনার কাছে চাওয়ার আবেদন করা হয় তবে এটি এজন্য নয় যে, আপনি মানুষকে অভাবে রেখেছেন (বরং আপনার কাছে আবেদনকারী হয়ে তারা নিজেকে ধন্য করল)। আর যদি আপনি নিজেকে

[9] . আব্বাসীয় যুগে সাচিবিক দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে 'আল-কাতিব' একটি গুরুত্বপূর্ণ পদের নাম ছিল। সুসাহিত্যিক, সংস্কৃতিবান, সুলিপিকার ও সাহসী ব্যক্তিত্যের অধিকারীগণই উক্ত পদের যোগ্য বলে বিবেচিত হতেন। এই পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তি প্রচুর অর্থোপার্জনের সুযোগ পেত। আবু আলী হারুন ইব্নে আবদুল্লাহ ছিলেন 'আল-কাতিব' পদধারী একজন দানবীর ব্যক্তি। যিনি সিরিয়ার রোমানদের সাথে যুদ্ধ করে বিজয়ী হয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে লেবাননে অবসর জীবনযাপন করেন।

আত্মগোপন করেন তবে আপনার অনুকম্পাসমূহই আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে (আপনার কীর্তিই আপনাকে জনসমক্ষে পরিচয় করিয়ে দিবে, আত্মগোপন করার সুযোগ থাকবে না)।

৪১. আপনার যদি প্রশংসা করা হয়, তবে এই প্রশংসা আপনার সম্মান অর্জনের জন্য নয় (বরং কৃতজ্ঞভাজনদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ মাত্র); যেমনটি শুকরগুজার বান্দাদের প্রভুর স্তুতিজ্ঞাপন।

৪২. খরার কারণে আপনার ওপর বারি বর্ষিত হয় তাই নয়, বরং যেমনটি সতেজ শ্যামল ভূমি পানিসিক্ত হয় এবং সমুদ্র বৃষ্টিস্নাত হয় (অথচ উভয়টির পানির কোনো প্রয়োজন নেই)।

৪৩. মেঘমালা আপনার অনুদানের সমকক্ষ হতে পারেনি; বরং এরই কারণে (হিংসাবশত) ওটি (মেঘমালা) জ্বরাক্রান্ত হয়েছে; সুতরাং এর বর্ষণ জ্বরোত্তর ঘর্মাক্ত হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

৪৪. দিবালোকের সূর্য তার নির্লজ্জ চেহারা নিয়েই কেবল এই চেহারার (আবু আলীর) সাথে মিলতে পারে। অর্থাৎ তাঁর উজ্জ্বলতার সামনে সূর্যমুখ নিষ্প্রভ।

৪৫. আসলে (জানতে ইচ্ছে করে) কোন পদক্ষেপে আপনি মর্যাদার শীর্ষে ওঠার চেষ্টা করেছেন? চন্দ্রমুখ আপনার দু-পায়ের পাদুকা হোক।

৪৬. যুগ যুগের পক্ষ হতেই আপনার জন্য রক্ষক হোক এবং মৃত্যু নিজেরই পক্ষ হতে আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক।

৪৭. আপনি যদি এই সৃষ্টিকুলের মধ্যে না হতেন (যার গৌরব আপনি বৃদ্ধি করেছেন) তবে হাওয়া (আ.) (আদি মাতা) স্বীয় প্রজন্ম হতে নিঃসন্তান থেকে যেতেন।

উল্লেখিত পঙ্‌ক্তিগুলোতে কবি আল-মুতানাব্বী প্রথমে স্বীয় প্রিয়তমার প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, তার প্রিয়তমা এতই রূপবতী যে, তার রাত্রকালীন আগমনে চতুর্দিকে আলো ও সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ে। তার প্রেম প্রেমিক কবির ওপর এতই প্রভাব বিস্তার করে যে, কবির মানসিক দুঃখ-যন্ত্রণা এবং শারীরিক অসুস্থতা সবই দূর হয়ে যায়। এরপর তিনি আবু আলী হারুন ইব্‌ন আবদুল্লাহর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, আবু আলী একজন বড়ো মনের মানুষ ও বড়োমাপের দানশীল। তিনি এতই দান করতেন যে, তা এককথায় বর্ণনাতীত। তার বদান্যতা ও সাহসিকতা অপরকে হার মানায়।

প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করতে গিয়ে আব্বাসীয় যুগের শ্রেষ্ঠ কবি আল-মুতানাব্বী (৯১৫-৯৬৫ খ্রি.) তৎকালীন দানবীর (৩৩০ হি.) আবু আইয়্যুব আহমাদ ইব্‌নে ইমরানের প্রশংসায় নিম্নোক্ত কবিতাগুলো রচনা করেন। কবিতার শুরুতে কবি প্রাচীন কাসিদার ধারানুসারে প্রণয়গীতি দিয়ে কবিতা উদ্বোধন করেন। প্রশংসিত ব্যক্তির প্রতি নিষ্কলুষ প্রেমের বর্ণনা দিতে গিয়ে নিজের মহানুভবতা, মানবতাবোধ ও আত্মমর্যাদাবোধের কথা কবি ব্যক্ত করেন এবং চারিত্রিক গুণাবলিই যে কবিকে দেহসর্বস্ব প্রেম হতে নিবৃত

রেখে নিষ্কলুষ প্রেমের দিকে তাড়িত করেছে, তা তুলে ধরার প্রয়াস পান। এরপর কবির প্রশংসিত ব্যক্তির গোষ্ঠী বানু ইমরানের মান-মর্যাদা ও বংশীয় আভিজাত্য উপস্থাপন করেন। কবির ভাষায় উক্ত বংশের উজ্জ্বল তারকা হচ্ছে আবু আইয়্যুব আহমাদ ইব্ন ইমরান। যিনি এতই দানবীর যে, কীরূপে সম্পদ সঞ্চয় করতে হয় তা তিনি জানেন না। বরং যখন যা অর্জন করেন তা তাৎক্ষণিকভাবে উদারহস্তে মানুষের মাঝে বিলিয়ে দেন। দানশীলতার জন্য তিনি জগৎকুলে এতই মহীয়ান ও খ্যাতিমান হয়ে আছেন যে, মহাকাশের তারকারাজি, বনজঙ্গলের হিংস্রপ্রাণী, অরণ্যে বিচরণকারী পাখ-পাখালি এমনকি দানব-দানবীও তাঁর সাক্ষাৎ দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে।[১০] তাঁর কবিতামালা হলো–[১১]

سرب محاسنه حرمت ذواتها ** داني الصفات بعيد موصوفاتها

أوفى فكنت إذا رميت بمقلتي ** بشرًا رأيت أرق من عبراتها

يستاق عيسهم أنيني خلفها ** تتوهم الزفرات زجر حداتها

وكأنها شجر لكنها ** شجر جنيت الموت من ثمراتها

لا سرت من إبلٍ لو اني فوقها ** لحت حرارة مدمعي سماتها

وحملت ما حملت من هذي المها ** وحملت ما حملت من حسراتها

إني على شعفي بما في خمرها ** لأعف عما في سراويلاتها

وترى المروة والفتوة والأبو ** ة في كل مليحةٍ ضراتها

هن الثلاث المانعاتى لذتى ** فى خلوتى لا الخوف من تبعاتها

ومطالبٍ فيها الهلاك أتيتها ** ثبت الجنان كأنني لم آتها

ومقانبٍ بمقانبٍ غادرتها ** أقوات وحشٍ كن من أقواتها

اقبلتها غرر الجياد كانما ** أيدى بنى عمران فى جبهاتها

الثابتين فروسةً كجلودها ** في ظهرها والطعن في لباتها

---

[10] . ড. মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৬৮-৬৬৯।

[11] . আবুল আলা' আহমাদ ইব্নে আবদিল্লাহ আল-মাআর্‌রী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩৪-২৫৩।

العارفين بها كما عرفتهم ** والراكبين جدودهم أماتها

فكأنها نتجت قيامًا تحتهم ** وكأنهم ولدوا على صهواتها

إن الكرام بلا كرام منهم ** مثل القلوب بلا سويداواتها

تلك النفوس الغالبات على العلى ** والمجد يغلبها على شهواتها

سقيت منابتها التى سقت الورى ** بندى أبى أيوب خير نباتها

ليس التعجب من مواهب ماله ** بل من سلامتها إلى أوقاتها

عجبا له حفظ العنان بأنمل ** ما حفظها الأشياء من عاداتها

لو مر يركض في سطور كتابة ** أحصى بحافر مهره ميماتها

يضع السنان بحيث شاء مجاولًا ** حتى من الآذان في أخراتها

تكبو وارءك يابن أحمد قرح ** ليست قوائمهن من آلاتها

رعد الفوارس منك في أبدانها ** أجرى من العسلان في قنواتها

لا خلق أسمح منك إلا عارف ** بك رآء نفسك لم يقل لك هاتها

غلت الذي حسب العشور بآيةٍ ** ترتيلك السورات من آياتها

كرم تبين في كلامك ماثلًا ** ويبين عتق الخيل في أصواتها

أعيا زوالك عن محل نلته ** لا تخرج الأقمار عن هلاتها

لا نعذل المرض الذى بك شائق ** أنت الرجال و شائق علاتها

فإذا نوت سفرًا إليك سبقتها ** فأضفت قبل مضافها حالاتها

ومنازل الحمى الجسوم فقل لنا ** ما عذرها فى تركها خيراتها

أعجبتها شرفا فطال وقوفها ** لتأمل الأعضاء لا لأذاتها

و بذلت ما عشقته نفسك كله ** حتى بذلت لهذه صحاتها

حق الكواكب أن تعودك من علو ** وتعودك الآساد من غاباتها

والجن من ستراتها والوحش من ** فلواتها والطير من وكناتها

ذكر الأنام لنا فكان قصيدة ** كنت البديع الفرد من أبياتها

فى الناس أمثلة تدور حياتها ** كمماتها و مماتها كحياتها

هبت النكاح حذار نسل مثلها ** حتى وفرت على النساء بناتها

فاليوم صرت إلى الذى لو أنه ** ملك البرية لا ستقل هباتها

مسترخص نظر إليه بما به ** نظرت و عثرة رجله بدياتها

<u>অর্থ :</u>

১. আমার কৌতূহল গুণধর রমণীদলে, যারা আমার অধরাই রয়ে গেছে। অবশ্য তাদের গুণাবলি আমার নাগালে (যার বর্ণনা আমি দিতে পারব); তবে গুণধর সত্তারা সুদূরে (ফলে মিলন সম্ভবপর হচ্ছে না)।

২. (হাওদায় উঠে) উঁচু ভূমিতে তারা যখন যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখন তাদের দেহ-ত্বকে আমার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল; আর তা (দহ-ত্বক) আমার কাছে তাদের অশ্রুমালার চেয়েও অধিক কোমল-মসৃণ মনে হলো।

৩. রমণীদলের পেছনে আমার (বিরহ-বেদনার) কান্নার রোল তাদের উটপালকে হাঁকায়ে নিয়ে যায়। কেননা উটগুলো আমার বিলাপধ্বনিকেই উট-চালকদের ধমক-তাড়না মনে করছে।

৪. (হাওদায় উপবিষ্ট রমণীসমেত) উষ্ট্রী যেন বৃক্ষরূপে উদ্ভাসিত হলো; তবে সেই বৃক্ষ হতে আমি মৃত্যু-ফলই আহরণ করলাম (কেননা, আমার প্রেমপাত্র রমণীদলকে এই উটগুলোই বহন করে আমার কাছ থেকে সুদূরে বহন করে নিয়ে গেল)।

৫. ওহে উষ্ট্রী! তোমার যাত্রাপথ সুগম না হোক! আমি যদি উক্ত উষ্ট্রীর ওপর আরোহী হতাম, তবে আমার উষ্ণ অশ্রু তার (ভ্রমণজনিত) দাগগুলো মুছে দিত।

৬. এই রমণীকুল পিঠে নিয়ে তুমি যে বোঝা বহন করেছ, তা যদি আমি বহন করতাম এবং বিরহ-যন্ত্রণার যে বোঝা আমি বহন করে চলেছি তা যদি তুমি বহন করতে! (তাহলে বুঝতে কোনটি অধিক পীড়াদায়ক)।

৭. তাদের ঘোমটার আড়ালে যা রয়েছে (চেহারা), তাতে আমার অনুরক্তি সত্ত্বেও তাদের পোশাকের অভ্যন্তরে যা রয়েছে (দেহ) তা হতে আমি সংযত থাকি (আমার প্রেম দেহাতীত ও নিষ্কলুষ; আমি কেবল তাদের সৌন্দর্যে মোহাবিষ্ট)।

৮. আমার মধ্যে যে মহানুভবতা, মানবতাবোধ ও আত্মমর্যাদাবোধ রয়েছে, তাকে প্রত্যেক লাবণ্যময়ী নারী স্বীয় সতীন মনে করে (এই গুণগুলোই আমাকে দেহসর্বস্ব প্রেম হতে নিবৃত রাখে; ফলে সুন্দরী রমণীরা এগুলোকে আমার সাথে অবাধ মিলনের অন্তরায় মনে করে)।

৯. উপর্যুক্ত তিনটি গুণই আমাকে তাদের সাথে নিভৃতে মিলন উপভোগে অন্তরায় হয়; গোপন মিলনের অশুভ পরিণতির ভয় নয়।

১০. বহু বিপদসংকুল লক্ষ্য আমি দৃঢ়চিত্তে হাসিল করেছি। ব্যাপারটি এমন, যেন আমি কোনো উদ্যোগই নিইনি।

১১. বহু অশ্বারোহী বীর বাহিনী রয়েছে, যাদেরকে তদানুরূপ (আমার) বাহিনী দিয়ে আমি হিংস্র বন্যপশুর খোরাকে পরিণত করেছি; যেই বন্যপশু তাদেরই আহার্য ছিল।

১২. আমি তাদের মুখোমুখি হয়েছি শুভ্র ললাটবিশিষ্ট উন্নত জাতের এমন ঘোড়া নিয়ে, যার ললাটে যেন বানু ইমরান গোত্রের (কবির প্রশংসিত ব্যক্তির গোষ্ঠী) সম্পদ দেদীপ্যমান।

১৩. তারা (বানু ইমরান গোষ্ঠী) অশ্বারোহণে সুদক্ষ হেতু অশ্বপৃষ্ঠে তার চামড়ার মতো অটল থাকে, অথচ তার বক্ষে তখন বর্শা অনবরত আঘাত হানতে থাকে।

১৪. তারা যেমন এই ঘোড়াগুলোকে চেনে তেমনি এই ঘোড়াগুলোও তাদের পরিচয় জানে; কেননা তাদের দাদারা এদের মায়েদের আরোহী ছিল।

১৫. সুতরাং ঘোড়াগুলো যেন বানু ইমরান গোষ্ঠীর লোকদের নিচেই (তাদের আরোহী অবস্থায়) জন্মলাভ করেছে; আর তারাও যেন অশ্বপৃষ্ঠের জিনে জন্মগ্রহণ করেছে।

১৬. বানু ইমরানের মতো সম্ভ্রান্ত লোকবিহীন উন্নত জাতের ঘোড়াগুলো যেন হৃৎপিণ্ডহীন অন্তর (এসব উন্নত জাতের ঘোড়ার আরোহী হিসেবে সম্ভ্রান্ত বানু ইমরান গোষ্ঠীর লোককেই কেবল মানায়)।

১৭. মর্যাদার লড়াইয়ে তারা (বানু ইমরান) মানুষের ওপর বিজয়ী হয়, আবার এই মর্যাদাই কুপ্রবৃত্তির ক্ষেত্রে তাদের ওপর বিজয়ী হয় (এই মর্যাদাই তাদেরকে অন্যায় কাজে বাধা প্রদান করে)।

১৮. তাদের উৎপাদনভূমি (পূর্বপুরুষ) পরিতৃপ্ত হোক; যার শ্রেষ্ঠ উৎপাদন (সন্তান) আবু আইয়্যুব আহমাদ ইব্ন ইমরান এর দানশীলতা সৃষ্টিকুলকে পরিতৃপ্ত করেছে।

১৯. তাঁর (আবু আইয়্যুব আহমাদ ইব্ন ইমরান) সম্পদ অকাতরে দানের মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই; বরং বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে তা ব্যয়ক্ষণ পর্যন্ত নিরাপদে থাকা (কেননা, পাওয়ার সাথে সাথেই ব্যয় করে ফেলেন, সঞ্চয় করে রাখেন না)।

২০. তাঁর ব্যাপারে বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, তিনি কীভাবে আঙুলি দিয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরে রাখেন; কেননা কোনো বস্তু কুক্ষিগত করে ধরে রাখা তাঁর স্বভাবজাত নয়।

২১. যদি তিনি কোনো লিপি-ছত্রের ওপর অশ্ব নিয়ে ছুটে চলেন তখন স্বীয় অশ্ব-শাবকের ক্ষুরা নিয়ে উক্ত ছত্রের মীম বর্ণমালার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন (অর্থাৎ অশ্বারোহণে তিনি অত্যন্ত দক্ষ; তিনি যেভাবে চান ঘোড়া সেভাবে পরিচালিত হয়)।

২২. ঘুরপাক দিয়ে বর্শাকে যেখানে ইচ্ছে সেখানে তিনি স্থাপন করেন। এমনকি কর্ণকুহরেও টার্গেট করতে পারেন।

২৩. ওহে আহমদ তনয় (দৌড়ের ক্ষেত্রে) পঞ্চবর্ষীয় পরিপক্ব ঘোড়াগুলো আপনার পশ্চাতে উপুড় হয়ে পড়ে থাকে (আপনার নাগাল পায় না)। তাদের পাগুলো যেন দেহাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয়।

২৪. তোমার ভয়ে অশ্বারোহী বীরদের দেহকম্পন তাদের বর্শার কম্পনের চেয়ে অধিক প্রবহমান ও দৃশ্যমান।

২৫. আপনার চেয়ে অধিক দানবীর সৃষ্টিজগতে কেউ নেই; তবে যে আপনার পরিচয় লাভ করেছে এবং আপনাকে প্রত্যক্ষ অবলোকন করেছে। অবশ্য সে আপনার প্রাণটা দেওয়ার কথা বলেনি।

২৬. যে ব্যক্তি কুরআনের সূরা সমষ্টিকে (দশটি আয়াত সমষ্টিকে) অলৌকিক নিদর্শন হিসেবে গণ্য করেছে সে ভুল করেছে। কেননা ,আপনার সুললিত কণ্ঠে সূরাগুলোর তেলাওয়াতও অলৌকিক নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত (কুরআন ও তিলাওয়াত উভয়টিই মুজিজা)।

২৭. আপনার বক্তব্য সজ্জনের লক্ষণ দৃশ্যমান হয়, যেমনটি উন্নত ঘোড়া তার হ্রেসা রবে প্রকাশ পায়।

২৮. আপনি যে মর্যাদাপূর্ণ স্থানে সমাসীন হয়েছেন তা হতে অবনমন অসম্ভব যেমনটি চন্দ্র নিজ বেষ্টনী (কক্ষপথ) হতে বেরিয়ে আসা অসম্ভব।

২৯. আপনি যে রোগে আক্রান্ত তাকে আমরা তিরষ্কার করি না। আপনি মানুষকে আসক্তকারী; আর এই আসক্তিই তাদের ব্যাধি।

৩০. সুতরাং তারা যখন আপনার অভিমুখে যাত্রা করার মনস্থ করে, আপনি তাদের আপ্যায়ন ব্যবস্থাপনার আগেই তাদের অবস্থার (আসক্তির ব্যাধির) আপ্যায়ন করেন। (কারণ, আপনার সাক্ষাৎই তাদের জন্য বড়ো আপ্যায়ন ও চিকিৎসা)।

৩১. জ্বর-ব্যাধির ক্ষেত্র হচ্ছে মানবদেহ। সুতরাং আপনি আমাদেরকে বলুন, উত্তম দেহ পরিত্যাগ করে নিকৃষ্ট দেহে সংক্রমিত হতে তার কী ওজর (যৌক্তিকতা) থাকতে পারে?

৩২. আপনি আভিজাত্যে তাকে (জ্বরকে) মুগ্ধ করেছেন; ফলে সে (আপনার দেহে) তার অবস্থান দীর্ঘায়িত করেছে (এমন গুণাবলি সংবলিত) দেহাঙ্গসমূহকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য, একে (জ্বরভোগে) পীড়া দেওয়ার জন্য নয়।

৩৩. আপনার যা মন চায় তার সবটুকু দান করে দিলেন; নির্বিশেষে এই জ্বরের জন্য নিজের সুস্থতাকেও দান করলেন।

৩৪. তারকারাজির উচিত ঊর্ধ্বাকাশ হতে আপনার সাক্ষাতে নেমে আসা (কেননা, উচ্চ মর্যাদায় আপনি যেন আকাশচুম্বী তারকা, সুতরাং তারকা আপনার সতীর্থ); আর বন-জঙ্গলের সিংহদের উচিত আপনার শুশ্রূষা করা (কেননা, বীরত্বে আপনি সিংহকুলের সাদৃশ্যপূর্ণ)।

৩৫. জিন তার অন্তরাল হতে, বন্যপশু তার বিরাণ মরু হতে, পাখি আপন নীড় হতে (আপনার দর্শন ও শুশ্রূষায়) বের হয়ে আসা উচিত (কেননা, প্রত্যেকেই আপনার বদান্যতায় উপকৃত; ফলে তারা আপনার ব্যথায় ব্যথিত এবং যদি পারে তো আপনার সেবা করতে চলে আসে)।

৩৬. আমাদের কাছে সমগ্র সৃষ্টিজগতের আলোচনা যেন এক আখ্যানকাব্য; আপনি (আপনার আলোচনা) সেই কাব্যস্থিত এক অনবদ্য পঙ্‌ক্তি।

৩৭. তারা (আপনি ভিন্ন উপর্যুক্ত সৃষ্টিকুল) মানবের মতো (প্রকৃত মানব নয়; কেননা, তারা কারো উপকারে আসে না), তাদের জীবন-মরণ চক্র রয়েছে। তবে তাদের জীবন-মরণ উভয়টি সমান।

৩৮. তদনুরূপ প্রজন্মের শঙ্কায় আমি বিবাহ করা ভয় করছি (নিবৃত রয়েছি); ফলে মায়েদের সাথে তাদের কন্যাসন্তান (অবিবাহিত অবস্থায়) বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩৯. সুতরাং আজ আমি মনোনিবেশ করছি এমন এক ব্যক্তির দিকে, যদি তিনি সৃষ্টিকুলের মালিকও হন (এবং তা দান করেন) তবে স্বীয় দানকে তিনি নগণ্য মনে করবেন।

৪০. সৃষ্টিকুল যা দিয়ে দেখে (চক্ষু) তার বিনিময়ে যদি তাঁর (আবু আইয়্যুবের) দর্শনকে ক্রয় করে নিত তবে তা সুলভ হতো, একইভাবে তার (সৃষ্টিকুলের) রক্তমূল্যের বিনিময়ে তাঁর (আবু আইয়্যুবের) পদধূলিও সুলভ গণ্য হবে।

উল্লেখিত পঙ্‌ক্তিগুলোতে কবি আল-মুতানাব্বী (৯১৫-৯৬৫ খ্রি.) দানবীর আবু আইয়্যুব আহমাদ ইব্‌ন ইমরানের প্রশংসা তুলে ধরেছেন। প্রশংসা করতে গিয়ে কবি তার প্রতি নিষ্কলুষ প্রেমের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তার চারিত্রিক গুণাবলিই কবিকে দেহসর্বস্ব প্রেম হতে নিবৃত রেখে নিষ্কলুষ প্রেমের দিকে তাড়িত করেছে। এরপর কবি প্রশংসিত ব্যক্তির গোষ্ঠী 'বানু ইমরানের' মান-মর্যাদা ও বংশীয় আভিজাত্য তুলে ধরতে গিয়ে বলেছেন, উক্ত বংশের উজ্জ্বল তারকা হচ্ছে আবু আইয়্যুব আহমাদ ইব্‌ন ইমরান। যিনি এতই দানবীর যে, কীরূপে সম্পদ সঞ্চয় করতে হয় তা তিনি জানেন না। বরং যখন যা অর্জন করেন তা তাৎক্ষণিকভাবে উদারহস্তে মানুষের মাঝে বিলিয়ে দেন। দানশীলতার জন্য তিনি জগতে এতই খ্যাতিমান হয়ে আছেন যে, মহাকাশের তারকারাজি, বনজঙ্গলের হিংস্রপ্রাণী, অরণ্যে বিচরণকারী পাখ-পাখালি এমনকি দানব-দানবীও তাঁর সাক্ষাৎলাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

উল্লেখ্য যে, আব্বাসীয় যুগের বহু কবি আলেপ্পোর শাসক সাইফুদ্দৌলা আল হামদানী (মৃত. ৬৯৭ খ্রি./৩৫৬ হি.)-এর প্রশংসা করে কাব্য রচনা করেন। যার মধ্যে আল-মুতানাব্বী অন্যতম।[১২] একপর্যায়ে আল-মুতানাব্বীর খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে কতিপয় কবি ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁর ও সাইফুদ্দৌলার মাঝে সুসম্পর্কে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করেন। এসব হিংসুটে কবিদের কথায় কর্ণপাত না করার জন্য আল-মুতানাব্বী সাইফুদ্দৌলাকে সতর্ককরণপূর্বক তাঁর প্রশংসা করে আলোচ্য কবিতাগুচ্ছ রচনা করেন।[১৩] সাইফুদ্দৌলাকে উদ্দেশ্য করে কবি বলেন, যেসব কবি আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ তারা হীন পর্যায়ের লোক আর তাদের মধ্যে আরবের বিশুদ্ধতার লেশমাত্র নেই। অতএব, আপনার বরাবর আমি এই কাব্যিক ও ছন্দময় অনুযোগপত্রটি নিবেদন করলাম।[১৪]

واحر قلباه ممن قلبه شبم ** ومن بجسمي وحالي عنده سقم

مالي أكتم حبًا قد برى جسدي ** وتدعي حب سيف الدولة الأمم

إن كان يجمعنا حب لغرته ** فليت أنا بقدر الحب نقتسم

قد زرته وسيوف الهند مغمدة ** وقد نظرت إليه والسيوف دم

فكان أحسن خلق الله كلهم ** وكان أحسن ما فى الأحسن الشيم

فوت العدو الذى يممته ظفر ** فى طيه أسف فى طيه نعم

قد ناب عنك شديد الخوف واصطنعت ** لك المهابة ما لا تصنع البهم

ألزمت نفسك شيئًا ليس يلزمها ** ألا يواريهم أرض ولا علم

أكلما رمت جيشا فانثنى هربا ** تصرفت بك فى آثارها الهمم

عليك هزمهم فى كل معترك ** وما عليك بهم عار إذا إنهزموا

أما ترى ظفرًا حلوًا سوى ظفرٍ ** تصافحت فيه بيض الهند واللمم

---

12. আহমাদ আল-ইসকান্দারী ও অন্যান্য, *আল-মুফাস্সাল ফী তারীখিল আদাবিল আরবী*, (ড. হাস্সান হাল্লাক সম্প., বৈরুত: দারু ইহ্য়াইল উলূম, ১৯৯৪), পৃ. ২৭৯।

13. ড. মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ ৭১৮-৭১৯।

14. আবুল আলা' আহমাদ ইব্নে আবদিল্লাহ আল-মাআর্‌রী, প্রাগুক্ত, পৃ ১১৫৫-১১৫৯।

অর্থ :

১. হায়! আমার প্রাণ জ্বলছে এমন ব্যক্তির (সাইফুদ্দৌলার) জন্য, যার হৃদয় সুশীতল (আমার জন্য কোনো ব্যাকুলতা নেই); এবং যার জন্য আমার দেহ ও অবস্থা প্রপীড়িত।

২. আমি কীরূপে (সাইফুদ্দৌলার প্রতি) ভালোবাসা গোপন রাখব, যে ভালোবাসা আমার দেহকে জীর্ণশীর্ণ করেছে; অথচ জনসাধারণ সাইফুদ্দৌলার প্রতি (মিথ্যা) ভালোবাসার দাবি করছে।

৩. যদি তাঁর ঔজ্জ্বল্যের (বদান্যতার) কারণে তাঁর প্রতি ভালোবাসা আমাদেরকে (আমাকে এবং জনগণকে) একত্র করে, তবে ভলোবাসার পরিমাপানুসারে আমরা তা (অনুদান) ভাগ করে নিলে কতই-না ভালো হতো।

৪. ভারতীয় ধারালো তরবারি কোষবদ্ধ অবস্থায় যেমন আমি তার সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়েছি, তেমনি তরবারি রক্তরঞ্জিত অবস্থায়ও আমি তার প্রতি দৃষ্টি দিয়েছি (শান্ত ও অশান্ত পরিস্থিতি সর্বাবস্থায় আমি তাঁর অনুগ্রহ লাভ করেছি)।

৫. তিনি ছিলেন আল্লাহর সকল সৃষ্টির সেরা; এবং চারিত্রিকভাবেও শ্রেষ্ঠ।

৬. আপনার উদ্দীষ্ট শত্রুদল হাতছাড়া হয়ে যাওয়া সেটাও একটা সাফল্য। শত্রু পলায়নে অনুশোচনা যেমন আছে, তেমনি ঐশ্বর্যও রয়েছে তাতে (কেননা, তাদের পলায়নে রেখে যাওয়া সম্পদ যেমন লাভজনক তেমনি ক্ষয়ক্ষতি না হওয়া সেটাও একটি নিয়ামত বটে)।

৭. আপনার ভয়ানক ব্যক্তিত্ব আপনার (উপস্থিতির) প্রতিনিধিত্ব করে। আপনার এই ভয় ও শ্রদ্ধা মিশ্রিত সম্মানবোধ (শত্রু দমনে) এত বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখে, যা সাহসী সৈনিকরা রাখতে পারে না।

৮. যা আপনার ওপর অত্যাবশ্যকীয় নয়, আপনি তা-ই আপনার ওপর অত্যাবশ্যক করে নিয়েছেন। ফলে কোনো ভূমি, কোনো পাহাড় তাদেরকে (শত্রুদলকে) আড়াল করতে পারে না (আপনার হাতে ধৃত হয়)।

৯. তবে কি আপনি যখনই কোনো বাহিনীকে (আক্রমণের) ইচ্ছে করেন তখনই তারা পালিয়ে পিছু হটে? বস্তুত আপনার দৃঢ় উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাদের পশ্চাদ্ধাবন (পিছু হটতে) করতে ভূমিকা রাখে।

১০. প্রত্যেক রণক্ষেত্রে তাদের (শত্রুদের) পরাজিত করা আপনার কর্তব্য; তবে তারা যদি পরাজয় মেনে নিয়ে পলায়ন করে, এতে আপনার কোনো লজ্জা নেই।

১১. আপনি বিজয়ের মিষ্টিস্বাদ ততক্ষণ পাবেন না, যতক্ষণ না ভারতীয় শ্বেতশুভ্র উজ্জ্বল তরবারি আকাশ লম্বিত চুলের সাথে করমর্দন করে (তাদের হত্যা করার পরই বিজয় অর্জিত হয়)।

উল্লিখিত পঙ্‌ক্তিগুলোতে কবি আল-মুতানাব্বী সাইফুদ্দৌলা আল-হামদানীর প্রশংসা ও তার প্রতি নিখুঁত ভালোবাসার বিবরণ তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, সাইফুদ্দৌলার প্রতি ভালবাসা আমার দেহকে জীর্ণশীর্ণ

করে দিয়েছে; যা গোপন রাখার মতো নয়। সার্বিক দিক বিবেচনায় তিনি আল্লাহর সৃষ্টিজগতের মধ্যে সেরা ব্যক্তি এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারী। তার জন্য আমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অবিরাম।

২য় পরিচ্ছেদ
নিন্দামূলক কবিতার বর্ণনা

কবি আল-মুতানাব্বীর ওপর অন্য কবিকে প্রাধান্য দেওয়ায় আলেপ্পোর শাসক সাইফুদ্দৌলা আল-হামদানীকে ভর্ৎসনা করে কবি আল-মুতানাব্বী আলোচ্য কবিতা রচনা করেন। কবি বলেন, আমার হৃদয় সাইফুদ্দৌলার ভালোবাসায় অস্থির হলেও আমার জন্য তাঁর অন্তরে কোনো উপলব্ধি নেই। যদি ভালোবাসা অনুপাতে উপঢৌকন বণ্টিত হতো তবে আমি বিশাল একটি অংশ লাভ করতাম; কিন্তু তিনি আমার ভালোবাসার অবমূল্যায়ন করেছেন। তাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও বিচক্ষণতা প্রশংসার দাবি রাখলেও তিনি আলো ও অন্ধকারের মাঝে তথা ভালো ও মন্দের মাঝে পার্থক্য সূচনা করতে পারেননি। তার দু-চোখ থেকেও কোনো লাভ নেই।[১৫]

কবি বলেন, অন্ধ, বধির সকলেই আমার সাহিত্যের সাথে সুপরিচিত। সুতরাং যারা আমাকে হিংসা ও অবমূল্যায়ন করে তারা হালে পানি পাবে না। সিংহ যখন হা করে তাকিয়ে থাকে তখন সে মুচকি হাসছে এ ধারণা ঠিক নয়। আমার হাতে যে তরবারি (কলম ও কবিতা) রয়েছে তা আমার যোগ্যতার সাক্ষ্য বহন করে।[১৬] এরপর সাইফুদ্দৌলাকে উদ্দেশ্য করে কবি নিম্নোক্ত নিন্দামূলক কবিতাগুলো রচনা করেন।[১৭]

يا أعدل الناس إلا في معاملتي ** فيك الخصام وأنت الخصم والحكم

أعيذها نظراتٍ منك صادقةً ** أن تحسب اشحم فيمن شحمه ورم

ومن انتفاع أخي الدنيا بناظره ** إذا استوت عنده الأنوار والظلم

سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا ** بأنني خير من تسعى به قدم

أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي ** وأسمعت كلماتي من به صمم

أنام ملء جفوني عن شواردها ** ويسهر الخلق جراها ويختصم

وجاهلٍ مده في جهله ضحكي ** حتى أتته يد فراسة وفم

إذا رأيت نيوب الليث بارزةً ** فلا تظنن أن الليث مبتسم

---

15 . হান্না আল-ফাখূরী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮০২।

16 . ড. মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ ৭১৮-৭১৯।

17 . আবুল আলা' আহমাদ ইব্নে আবদিল্লাহ আল-মাআর্‌রী, প্রাগুক্ত, পৃ ১১৫৯-১১৬৯।

ومهجةٍ مهجتي من هم صاحبها ** أدركتها بجوادٍ ظهره حرم

رجلاه في الركض رجل واليدان يد ** وفعله ما تريد الكف والقدم

ومرهفٍ سرت بين الموجتين به ** حتى ضربت وموج البحر يلتطم

فالخيل والليل والبيداء تعرفني ** والحرب والضرب والقرطاس والقلم

صحبت في الفلوات الوحش منفردًا ** حتى تعجب مني القور والأكم

يا من يعز علينا أن نفارقهم ** وجداننا كل شيئ بعدكم عدم

ما كان أخلقنا منكم بتكرمةٍ ** لو أن أمركم من أمرنا أمم

إن كان سركم ما قال حاسدنا ** فما لجرح إذا أرضاكم ألم

وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة ** إن المعارف فى اهل النهى ذمم

كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم ** ويكره الله ما تأتون والكرم

ما أبعد العيب والنقصان من شرفي ** أنا الثريا وذان الشيب والهرم

ليت الغمام الذي عندي صواعقه ** يزيلهن إلى من عنده الديم

أرى النوم تقتضيني كل مرحلةٍ ** لا تستقل بها الوخادة الرسم

لئن تركن ضميرًا عن ميامننا ** ليحدثن لمن ودعتهم ندم

إذا ترحلت عن قومٍ وقد قدروا ** ألا تفارقهم فالراحلون هم

شر البلاد مكان لا صديق به ** وشر ما يكسب الإنسان ما يصم

وشر ما قنصته راحتي قنص ** شهب البزاة سواء فيه والرخم

بأي لفظٍ تقول الشعر زعنفة ** تجوز عندك لا عرب ولا عجم

هذا عتابك إلا أنه مقة ** قد ضمن الدر إلا أنه كلم

অর্থ :

১. ওহে মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক; তবে আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা, আপনার মধ্যে (আমার জন্য) ঝগড়া মনোবৃত্তি রয়েছে। যেহেতু আপনি আমার বিবাদী এবং আপনিই বিচারক (সেহেতু আপনার কাছ থেকে আমি সুবিচার আশা করতে পারি না)।

২. আপনার (মন্দ) দৃষ্টি থেকে আমি আশ্রয় চাই, যে দৃষ্টি যথার্থ; তবে ফুলিয়ে যাওয়া মাংসকে চর্বি ভাবার কোনো অবকাশ নেই।

৩. দুনিয়ায় ঐ মানবদৃষ্টির কী উপকার রয়েছে যে দৃষ্টি আলো এবং অন্ধকার উভয়টিকে একাকার করে দেখে?

৪. আমাদের মজলিশে যারা সমবেত হয়েছে, তারা অচিরেই জানবে যে, সচেষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে আমি সর্বোত্তম।

৫. (কবি নিজের প্রশংসায় বলেন) আমি এমন ব্যক্তি, যার সুকীর্তি অন্ধ ব্যক্তিও অবলোকন করে এবং যার বাক্যমালা (কবিতা) বধির ব্যক্তিও শ্রবণ করে।

৬. আমি ঐ বাক্যমালার (কবিতার) জন্য চোখভরে নিদ্রা যাপন করি; অথচ অন্য লোকদের এর নিমিত্ত অনিদ্রা ও আয়াস স্বীকার করতে হয়।

৭. বহু এমন অজ্ঞলোক রয়েছে, আমার হাসি যাদের অজ্ঞতাকে আরও প্রশ্রয় দেয়। পরিশেষে হিংস্র থাবা ও আগ্রাসী মুখ তাকে হঠাৎ আক্রমণ করে বসে।

৮. যখন তুমি সিংহের দন্তরাজিকে প্রকাশমান দেখবে (সিংহকে দাঁত বের করে হা করতে দেখবে) তখন এ মনে করো না যে, সিংহটি হাসছে (বরং এটি আক্রমণোদ্যত হয়েছে)।

৯. এমন বহু আত্মা রয়েছে, যাদের পরিকল্পনা হচ্ছে আমার আত্মা (আমাকে হত্যা করা)। আমি এদের ওপর চড়াও হয়েছি এমন এক উত্তম জাতের ঘোড়ায় চড়ে, যার পিঠ অলঙ্ঘ্য ও নিরাপদ।

১০. ধাবমান দৌড়ে তার (ঘোড়ার) দুই পা যেন এক পা এবং দুই হস্ত যেন এক হস্ত। এই হাত ও পা তার উদ্দেশ্য সাধন করেছে (তাকে হাঁকানোর প্রয়োজন পড়ে না)।

১১. বহু দু-ধারী তরবারি নিয়ে আমি দুই বৃহৎ বাহিনীর মাঝে পথ চলেছি। পরিশেষে আমি যখন আঘাত করলাম তখন মৃত্যু তরঙ্গ ঢেউ খেলছে (তরবারির আঘাতে প্রতিপক্ষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে)।

১২. (নিজের বীরত্ব প্রকাশে কবি বলেন) আমাকে ঘোড়া, রজনি, মরুভূমি যেমন চিনে তেমনি তরবারি, বর্শা এবং কাগজ-কলমও আমাকে চেনে।

১৩. নির্জন মরুপ্রান্তরে আমি একাকী হিংস্র পশুর সাথি হয়েছি, এমনকি পাথুরে পর্বতমালা ও বালিময় টিলাসমূহ আমাকে নিয়ে হতবাক হয়েছে।

১৪. ওহে ঐ ব্যক্তি, যার বিচ্ছেদ আমার জন্য বেদনাদায়ক। আপনার পর (অবর্তমানে) আমাদের সকল অর্জন সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেছে।

১৫. আপনার পক্ষ হতে অনুগ্রহ পাওয়ার আমরাই অধিক যোগ্য, যদি আপনার বিশ্বাস আমাদের বিশ্বাসের কাছাকাছি হয়।

১৬. যদি আমাদের হিংসুকদের বক্তব্য (রটনা) আপনাকে আনন্দ দেয় (এতে আমাদের কোনো অনুশোচনা নেই), তবে যে আঘাত আপনার সন্তোষ বিধান করে তাতে আমরা আহত হই না (কেননা, আপনার আনন্দে আমরা আনন্দিত এবং আপনার সন্তোষে আমরা সন্তুষ্ট)।

১৭. আমাদের (আপনার এবং আমার) মাঝে হৃদ্যতা না থাকলেও চেনা-জানা তো রয়েছে, যদি একে আপনি বিচার্য (মাপকাঠি) ধরেন। আর জ্ঞানী ব্যক্তির মাঝে পরিচয়ের বিষয়টিও দায়দায়িত্ব পালন পর্যন্ত বর্তায় (জ্ঞানী ব্যক্তি পরিচয়ের সূত্র ধরেই উপকার করার দায়িত্ব পালন করে)।

১৮. আমাকে অভিযুক্ত করার জন্য আপনি আর কত ছিদ্রান্বেষণ করবেন (দোষ খুঁজবেন)? তবে আপনি ব্যর্থ হচ্ছেন। আপনি যা করছেন তা আল্লাহ অপছন্দ করেন এবং এটি মহত্ত্বেরও পরিপন্থি।

১৯. আমার মর্যাদাগত অবস্থান দোষত্রুটি ও বিচ্যুতি হতে অনেক দূরে (আমার অবস্থান দোষত্রুটির ঊর্ধ্বে)। আমি সপ্তর্ষিমণ্ডল, আর ঐ দুটি শুভ্র চুল ও বার্ধক্য (উভয়ের মাঝে বহু ব্যবধান)।

২০. হায় মেঘমালার (সাইফুদ্দৌলা) বজ্রপাত (ক্রোধ) আমার ওপর, আর এর বৃষ্টিপাত (অনুগ্রহ) এমন ব্যক্তির ওপর যে মুষলধারায় সিক্ত।

২১. আমি লক্ষ্য করছি, আপনার কাছ থেকে দূরত্ব গোছাতে আমার জন্য অনেক কষ্টদায়ক (আমার ও আপনার মাঝে দূরত্ব দূর করা আমার পক্ষে খুবই কঠিন)। এর প্রতিটি স্তর অতিক্রমণে ধীরগতি কিংবা দ্রুতগতির উট অক্ষম হয়ে পড়ে।

২২. যদি তারা (আমার উটগুলো) ডান পার্শ্বস্থ 'দুমাইর' পর্বত[১৮] অতিক্রম করে, তবে আমি যাদেরকে বিদায় জানাব, এটি তাদের জন্য (সাইফুদ্দৌলার জন্য) লজ্জার কারণ হবে।

২৩. যখন তুমি এমন সম্প্রদায় হতে গ্রহণ কর যারা তোমাকে বিদায় না জানাতে সক্ষম, তবে সেক্ষেত্রে তারাই হবে প্রস্থানকারী (তোমার প্রস্থানে তারা অনুশোচিত হবে)।

২৪. সহচরহীন স্থান সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান। আর যা (মানুষকে) অসম্মান করে তা মানুষের জন্য নিকৃষ্ট অর্জন।

২৫. আর আমার হস্তার্জিত সবচেয়ে নিকৃষ্ট শিকার হচ্ছে, যেটিতে বাজপাখির সাথে শকুনও সমান অংশগ্রহণ করেছে (কবির প্রস্থানের পর হীন কবিরা সাইফুদ্দৌলার অনুদানের অংশীদার হলো)।

---

18. 'জাবালে দুমাইর' বা দুমাইর পর্বত সিরিয়ায় অবস্থিত একটি পাহাড়ের নাম।

২৬. ঐসব হীন ব্যক্তিরা যারা আপনার কাছে জড়ো হয়েছে, তারা কোন ভাষায় কাব্য রচনা করবে? যেহেতু তারা আরবও নয় আবার অনারবও নয়।

২৭. এটি আপনার বিরুদ্ধে আমার নিন্দাকাব্য; তবে তা মুক্তাখচিত ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ। ব্যতিক্রম এটুকু যে, এই মুক্তা (আসল মুক্তা নয়) এটি হলো শব্দমালার তথা কবিতার (মুক্তা)।

উল্লিখিত কবিতামালায় কবি আল-মুতানাব্বী তার ওপর অন্য কবিকে প্রাধান্য দেওয়ায় আলেপ্পোর শাসক সাইফুদ্দৌলা আল-হামদানীকে তিনি ভর্ৎসনা করেছেন। ভর্ৎসনা করতে গিয়ে কবি বলেন, আমার হৃদয় সাইফুদ্দৌলার ভালোবাসায় অস্থির হলেও আমার জন্য তাঁর অন্তরে কোনো উপলব্ধি নেই। তিনি আমার ভালোবাসার অবমূল্যায়ন করেছেন। তাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও বিচক্ষণতা প্রশংসার দাবি রাখলেও তিনি ভালো-মন্দের মাঝে পার্থক্য করতে অক্ষম হয়েছেন। তার দু-চোখ থেকেও তিনি অন্ধ।

৩য় পরিচ্ছেদ
বীরত্বপূর্ণ কবিতার বর্ণনা

কবি আল-মুতানাব্বী (৯১৫-৯৬৫ খ্রি.) আব্বাসীয় শাসক সাইফুদ্দৌলা আল-হামদানীর (৯১৫-৯৬৭ খ্রি.) একান্ত ভক্ত এবং নিত্য সহচর ছিলেন। রোমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত বহু যুদ্ধে কবি তাঁর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। রোমানদের সাথে সাইফুদ্দৌলার সাহসিকতা ও রণ-নৈপুণ্যের ভূয়সী প্রশংসা করে কবি আলোচ্য কবিতামালা রচনা করেন। ভিন্নমতে, ৩৪২ হিজরি সনে কবি আল-মুতানাব্বী ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে সাইফুদ্দৌলাকে অভিবাদন ও প্রশংসাসূচক নিম্নোক্ত কবিতা নিবেদন করেন। উল্লেখ্য, উভয়ে তখন আলেপ্পোর রাজকীয় ময়দানে স্ব স্ব ঘোড়ায় আরোহী ছিলেন।[১৯]

আলেপ্পোর আমির সাইফুদ্দৌলার স্বভাব হচ্ছ শত্রুদের আঘাত করা। কেউ তার ক্ষতিসাধন করতে চাইলে, তাকে আঘাত করতে চাইলে তিনি দ্রুত পাল্টা আঘাতের ব্যবস্থা নেন। তাঁর কারণে (তার গৃহীত কৌশলের কারণে) বহু আত্মম্ভরি লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে। কবি বলেন, সাইফুদ্দৌলা সমুদ্রের ন্যায়, যা শান্ত থাকলে প্রভূত উপকৃত হওয়া যায় আর অশান্ত হলে সমূহ বিপদের কারণ হয়। তিনি কারো প্রতি রুষ্ট হলে তার ক্ষতি অনিবার্য। পৃথিবীর কোনো বাদশাহ তাঁর সাথে মতবিরোধ করে টিকে থাকতে পারেনি; বরং তাঁর কাছে নতজানু হয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। এরপর কবি ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে সাইফুদ্দৌলাকে অভিবাদন জানান এবং উক্ত দিবসের সাথে তুলনা করে তাঁকে অনন্য ব্যক্তি হিসেবে আখ্যা দেন। এ প্রেক্ষিতে তিনি নিম্নোক্ত কবিতাগুলো রচনা করেন।[২০]

لكل امرئٍ من دهره ما تعودا ** وعادات سيف الدولة الطعن في العدى

وأن يكذب الإرجاف عنه بضده ** ويمسي بما تنوي أعاديه أسعدا

ورب مريد ضره ضر نفسه ** وهاد إليه الجيش أهدى وما هدى

ومستكبر لم يعرف الله ساعة ** رأى سيفه في كفه فتشهدا

هو البحر غص فيه إذا كان ساكنا ** على الدر واحذره إذا كان مزبدا

---

[19] . আবদুর রহমান আল-বারকূকী, *শারহু দীওয়ান আল-মুতানাব্বী*, বৈরুত : দারুল কিতাব আল-আরবী, ২০০৭, খ. ১, পৃ. ২৫১।

[20]. আবুল আলা' আহমাদ ইব্নে আবদিল্লাহ আল-মাআর্‌রী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১২-৩১৮।

فإني رأيت البحر يعثر بالفتى ** وهذا الذي يأتي الفتى متعمدًا

تظل ملوك الارض خاشعة له ** تفارقه هلكى وتلقاه سجدا

وتحيى له المال الصوارم والقنا ** ويقتل ما يحيى التبسم والجدا

هنيئا لك العيد الذى أنت عيده ** وعيد لمن سمى وضحى و عيدا

فذا اليوم فى الأيام مثلك فى الورى ** كما كنت فيهم أوحدا كان أوحدا

تركت السرى خلفى لمن قل ماله ** وأنعلت أفراسى بنعماك عسجدا

وقيدت نفسى فى ذراك محبة ** ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا

إذا سأل الانسان أيامه الغنى ** وكنت على بعد جعلنكم موعدا

অর্থ :

১. প্রত্যেক ব্যক্তির সমসাময়িক যুগের স্ব স্ব কিছু রীতি রয়েছে যাতে সে অভ্যস্ত। আর সাইফুদ্দৌলার রীতি ও স্বভাব হচ্ছে শত্রুদেরকে বর্শা দ্বারা আঘাত করা।

২. এবং (তাঁর রীতি হচ্ছে) নিজের বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনাকে প্রতিহত করা; আর তাঁর শত্রুরা যা ষড়যন্ত্র করে তাতে তিনিই (ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়ে) সফল হন।

৩. তাঁর কতক কল্যাণকামী রয়েছে, যারা নিজেরই অকল্যাণ সাধন করে। আর তাঁর বিরুদ্ধে কতক সেনা-প্রেরণকারী তাঁর জন্য (বন্দি হয়ে) উপঢৌকনে পরিণত হয় এবং তারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

৪. বহু উদ্ধত ব্যক্তি (কাফির) রয়েছে, যারা ক্ষণিকের তরেও আল্লাহকে চেনে না; তাঁর হাতে তরবারি দেখে তারা কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করল।

৫. তিনি (সাইফুদ্দৌলা) সমুদ্র সমতুল্য; সুতরাং এটি যখন শান্ত সমাহিত থাকে তখন মুক্তা আহরণের লক্ষ্যে এতে ডুব দাও। তবে এটি যখন উত্তাল থাকে তখন সতর্কতা অবলম্বন করো।

৬. কেননা, আমি সমুদ্রকে দেখেছি (তার উত্তাল সময়ে) যুবককে অনিচ্ছাকৃতভাবে ধরাশায়ী করতে (ডুবিয়ে দিতে); আর এই ব্যক্তি (সাইফুদ্দৌলা) তো ইচ্ছাকৃতভাবে যুবককে ধ্বংস করে।

৭. পৃথিবীর সকল বাদশাহ তাঁর অনুগত হয়ে থাকে। যারা তাঁর সাথে মতবিরোধ করে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, আর যারা তাঁর সাথে একত্ম হয়ে যায় তারা নতজানু হয়ে থাকে।

৮. ধারালো তরবারি ও বর্শা তাঁর জন্য সম্পদ নিয়ে আসে (গনিমত অর্জিত হয়) এবং তাঁর হর্ষোচ্ছ্বাস ও দানশীলতা উক্ত সম্পদ নিঃশেষ করে দেয় (তিনি যেমন অনেক সম্পদ আহরণ করেন আবার নিজের কাছে জমা না রেখে অকাতরে তা বিলিয়েও দেন)।

৯. ঈদের দিনে আপনাকে অভিবাদন, যার জন্য আপনি ঈদ। যারা আল্লাহর নাম নেয় এবং কুরবানি করে তাদের (সকল মুসলমানের) জন্য আপনি (খুশির) ঈদস্বরূপ।

১০. অন্যান্য দিবসের মাঝে দিবসটি তেমন (খুশির) যেমনটি আপনি অন্যান্য মানুষের মাঝে। আপনি যেমন তাদের মাঝে অনন্য, তেমনি দিবসটিও।

১১. অন্য কোনো অভাবী লোক আমার পেছনে আপনার পথে যাত্রা করুক তা আমি চাইনি। আপনার উপঢৌকনে আমি আমার ঘোড়াকে পর্যন্ত স্বর্ণের পাদুকা পরাতে সক্ষম হয়েছি।

১২. ভালোবাসায় আমি নিজেকে আপনার শৃঙ্খলে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে ফেলেছি। যে ব্যক্তি অনুগ্রহকে শৃঙ্খল হিসেবে পাবে সে তো শৃঙ্খলাবদ্ধ হবেই (হতে চাইবে)।

১৩. মানুষ যদি তার যুগ হতে অভাবমুক্ত হওয়ার প্রার্থনা করে, আর তখন আপনি দূরে অবস্থান করেন, তবে ঐ যুগ আপনাকেই প্রতিশ্রুতিস্থল (ভরসাস্থল) হিসেবে নির্ধারণ করবে।

উল্লিখিত কবিতায় কবি আল-মুতানাব্বী রোমানদের সাথে সাইফুদ্দৌলার সাহসিকতা, রণ-নৈপুণ্য ও বীরত্বের কথা তুলে ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, আলেপ্পোর আমির সাইফুদ্দৌলার স্বভাব হচ্ছ শত্রুদের আঘাত করা। কেউ তার ক্ষতিসাধন কিংবা তাকে আঘাত করতে চাইলে তিনি দ্রুত পাল্টা আঘাতের ব্যবস্থা নেন। তার গৃহীত কৌশলের কারণে বহু আত্মম্ভরি লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে। সাইফুদ্দৌলা সমুদ্রের ন্যায়, যা শান্ত থাকলে বহু উপকার লাভ করা যায় আর অশান্ত হলে সমূহ বিপদের কারণ হয়। তিনি কারো প্রতি রুষ্ট হলে তার ক্ষতি অনিবার্য। পৃথিবীর কোনো রাজা-বাদশাহ তাঁর সাথে মতবিরোধ করে টিকে থাকতে পারেনি; বরং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে।

আল-হাদাছ লালকিল্লা জয়ে বীরত্ব

সিরিয়ার সীমান্ত পাদদেশে 'আল-আহমার' নামক পাহাড়ি টিলায় 'আল-হাদাছ' দুর্গের অবস্থান। 'আল-আহমার' (লাল) স্থানের নামানুসারে উক্ত দুর্গকে 'কিল'আ আল-হাদাছ আল-হামরা' বা 'আল-হাদাছ লালদুর্গ' নামকরণ করা হয়। রোমক বাহিনী আক্রমণ করে দুর্গটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। আলেপ্পোর আমির সাইফুদ্দৌলা আল-হামদানী ৩৪৩ হি. (৯৫৪ খ্রি.) সনে বাইজান্টাইন অধিকৃত উক্ত লালকিল্লার সীমান্ত পোস্টে অভিযান চালিয়ে দুর্গটি পুনর্দখল করে মুসলমানদের অধিকারে নিয়ে আসেন। কয়েক দিন যেতে না যেতেই রোমক খ্রিষ্টান সেনাপতি বুর্ডাস ফুকাস মিত্রজোট গঠন করে ৫০ হাজার অশ্বারোহী ও

পদাতিক বাহিনী নিয়ে প্রতিরোধে এগিয়ে আসে। পক্ষদ্বয়ের মাঝে তুমুল যুদ্ধে বাইজান্টাইন বাহিনী পরাজয় বরণ করে। সাইফুদ্দৌলার হাতে তিন হাজার শত্রুসৈন্য নিহত এবং বিপুলসংখ্যক বন্দি হয়। যুদ্ধবন্দিদের মধ্যে রোমক সেনাপতির সন্তানসহ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনও রয়েছে। 'আল-হাদাছ' দুর্গে কয়েক দিন অবস্থান করে সাইফুদ্দৌলা একে সংস্কার ও পুনর্নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, বুর্ডাস ফুকাস ৩৩৭ হি. (৯৪৮ খ্রি.) সনে এতে আগুন ধরিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিল। 'আল-হাদাছ' দুর্গের অভিযানে সাইফুদ্দৌলার সফরসঙ্গী কবি আল-মুতানাব্বি তাঁর স্বচক্ষে দেখা আমির সাইফুদ্দৌলার রণকৌশল ও মানসিক দৃঢ়তায় অভিভূত হয়ে নিম্নলিখিত কাসিদা রচনা করেন।[২১]

সিরিয়ার অন্তর্গত আলেপ্পো অঞ্চলটি আব্বাসীয় যুগের তৃতীয় শতকে আল-হামদানী গোষ্ঠী কর্তৃক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হিসেবে শাসিত হতো। উক্ত গোষ্ঠীর একজন প্রভাবশালী শাসক হচ্ছেন সাইফুদ্দৌলা আল-হামদানী; যিনি 'আল-হাদাছ' নামক দুর্গটি জয় করেন। 'আল-হাদাছ' লালদুর্গ জয়ের সমরেতিহাস ইতিহাসের উৎসগ্রন্থগুলোতে খুঁজে পাওয়া যায় না বললেই চলে। তাই কবি আল-মুতানাব্বী উপস্থাপিত উক্ত যুদ্ধের ঘটনা সংবলিত বর্তমান কবিতাটি ইতিহাসের কোনো রূপকথা বা কল্পকাহিনি বলেই মনে হতে পারে। অথচ উক্ত দুর্গ-জয়ের ঘটনাটি ছিল আব্বাসীয় সমকালীন একটি খণ্ডরাজ্যের (আলেপ্পোর) একজন সফল শাসকের যুদ্ধজয়ের বীরত্বগাথা ইতিহাস। যা ছিল সমকালীন বিশ্ব পরাশক্তি বাইজাইন্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মুসলিম রণশক্তির এক কঠিন শক্তি পরীক্ষা। আলেপ্পোর শাসক সাইফুদ্দৌলা আল-হামদানীর কাছে বাইজাইন্টাইন বাহিনীর পর্যুদস্ত হওয়ার কাহিনি এবং তাদের সেনাপতি বুর্ডাস ফুকাসের পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে পলায়নের চিত্র প্রত্যক্ষদর্শী কবি আল-মুতানাব্বী অত্যন্ত মনোজ্ঞ ভাষায় উপস্থাপন করেন। যেহেতু কবি নিজেই উক্ত অভিযান চলাকালে সাইফুদ্দৌলার সফরসঙ্গী ছিলেন, সেহেতু আলোচ্য কবিতায় কবির মনোজ্ঞ বর্ণনা সচিত্র প্রতিবেদনের মতো উপস্থাপিত হয়েছে।

'আল-হাদাছ' দুর্গটি মুসলমানদের জন্য তৎকালীন বিশ্ব পরাশক্তি রোমক তথা বাইজাইন্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা। কেননা, এটি খ্রিষ্টান অধিকৃত রোমক রাজধানী কন্সটানটিনোপোল যাত্রাপথের প্রবেশমুখে অবস্থিত।[২২] কবি আল-মুতানাব্বী বক্ষ্যমাণ কবিতায় সাইফুদ্দৌলা কর্তৃক 'আল-হাদাছ' লালকিল্লার দখল ও বিজয়োল্লাসের কাহিনি ব্যক্ত করেন। শুরুতে কবি একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তব্য দিয়ে কাসিদা আরম্ভ করেন। একজন বৃহৎ স্বপ্নদ্রষ্টা ও মহাপরিকল্পকের পক্ষেই বৃহৎ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব বলে কবি স্বীয় চিন্তাদর্শন ব্যক্ত করেন। 'আল-হাদাছ' জয়ের মতো চ্যালেঞ্জিং কাজ উচ্চাভিলাষী স্বপ্নদ্রষ্টা, দৃঢ় পরিকল্পক, দুঃসাহসী ও অকুতোভয় সাইফুদ্দৌলার জন্যই কেবল শোভা পায়। অন্য কোনো

---

21 . আল-আকবারী, *দীওয়ানুল মুতানাব্বী*, খ. ৩, পৃ. ৩৭৮-৩৭৯।

22 . হান্না আল-ফাখূরী, *আল-জামি ফী তারীখিল আদাব*, খ. ১, পাদটীকা, পৃ. ৮১০।

নেতা এই দুঃসাহসিক অভিযানে অগ্রসর হতে সাহস করেনি। সেদিন সাইফুদ্দৌলার মুসলিম বাহিনী বাইজান্টাইন সৈনিকদের ওপর যে ভয়াবহ আক্রমণ পরিচালনা করেছে তাতে শত-সহস্র লাশ পড়েছিল, যা মৃতভোজী শকুনের উপাদেয় খোরাকে পরিণত হয়েছিল। 'আল-হাদাছ' দুর্গটি কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শত্রু-সৈনিকদের রক্তমাখা দাগ ও তাদের লাশের মেঝে ও দেয়ালে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে এটি মুসলমানদের দখলে ফিরে আসে। বাইজান্টাইন শাসকগোষ্ঠী নানা জাতি ও নানা ভাষীদের নিয়ে মিত্রজোট গঠন করেও সাইফুদ্দৌলাকে পরাস্ত করতে পারেনি; উপরন্তু বাইজান্টাইন সেনাপতি নিজ সৈন্য-রসদ সর্বস্ব হারিয়ে জান নিয়ে পালিয়ে রক্ষা পেয়ে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেছেন। আলোচ্য কবিতায় সাইফুদ্দৌলাকে কবি আল-মুতানাব্বী একজন মহাকাব্যিক বীর নায়ক হিসেবে উপস্থাপন করেন। কেননা, তাঁর এই জয় নিছক একটি ভূখণ্ডের জয় নয়; বরং একটি খ্রিষ্টান ধর্মের ওপর আরবের বিজয়। বস্তুত উক্ত যুদ্ধে পক্ষ-প্রতিপক্ষের আক্রমণ-প্রত্যাক্রমণের যে ওজস্বী বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাতে পুরো কাসিদা জুড়ে মহাকাব্যিক সুরই অনুরণিত হয়। কাব্যে গুরুগম্ভীর ও ওজস্বী বর্ণনা এবং শত্রুকে পর্যুদস্ত করার মারমূর্তি ধারাভাষ্য অনুপম ভঙ্গিমায় উপস্থাপন করা হয়েছে।[২৩]

على قدر أهل العزم تأتي العزائم ** وتأتي على قدر الكرام المكارم

وتعظم في عين الصغير صغارها ** وتصغر في عين العظيم العظائم

يكلف سيف الدولة الجيش همه ** وقد عجزت عنه الجيوش الخضارم

ويطلب عند الناس ما عند نفسه ** وذلك ما لا تدعيه الضراغم

تفدي أتم الطير عمرًا سلاحه ** نسور الملا أحداثها والقشاعم

وما ضرها خلق بغير مخالبٍ ** وقد خلقت أسيافه والقوائم

هل الحدث الحمراء تعرف لونها ** وتعلم أي الساقيين الغمائم

سقتها الغمام الغر قبل نزوله ** فلما دنا منها سقتها الجماجم

بناها فأعلى والقنا يقرع ** وموج المنايا حولها متلاطم

وكان بها مثل الجنون فأصبحت ** ومن جثث القتلى عليها تمائم

[23] . আবুল আলা' আহমাদ ইব্নে আবদিল্লাহ আল-মাআর্‌রী, প্রাগুক্ত, পৃ ১১৭০-১১৮২।

طريدة دهرٍ ساقها فرددتها ** على الدين بالخطي والدهر راغم

تفيت الليالي كل شيءٍ أخذنه ** وهن لما يأخذن منك غوارم

إذا كان ما تنويه فعلًا مضارعًا ** مضى قبل أن تلقى عليه الجوازم

وكيف ترجي الروم والروس هدمها ** وذا الطعن آساس لها ودعائم

وقد حاكموها والمنايا حواكم ** فما مات مظلوم ولا عاش ظالم

أتوك يجرون الحديد كأنهم ** أتوا بجيادٍ ما لهن قوائم

إذا برقوا لم تعرف البيض منهم ** ثيابهم من مثلها والعمائم

خميس بشرق الأرض والغرب زحفه ** وفي أذن الجوزاء منه زمازم

تجمع فيه كل لسنٍ وأمةٍ ** فما تفهم الحداث إلا التراجم

فلله وقت ذوب الغش ناره ** فلم يبق إلا صارم أو ضبارم

تقطع ما لا يقطع الدرع والقنا ** وفر من الفرسان من لا يصادم

وقفت وما في الموت شك لواقفٍ ** كأنك في جفن الردى وهو نائم

تمر بك الأبطال كلمى هزيمةً ** ووجهك وضاح وثغرك باسم

تجاوزت مقدار الشجاعة والنهى ** الى قول قوم انت بالغيب عالم

ضممت جناحيهم على القلب ضمةً ** تموت الخوافي تحتها والقوادم

بضرب أتى الهامات والنصر غائب ** وصار الى اللبات والنصر قادم

حقرت الردينيات حتى طرحتها ** وحتى كأن السيف للرمح شاتم

ومن طلب الفتح الجليل فإنما ** مفاتيحه البيض الخفاف الصوارم

نشرتهم فوق الأحيدب كله ** كما نثرت فوق العروس الدراهم

تدوس بك الخيل الوكور على الذرى ** وقد كثرت حول الوكور المطاعم

تطن فراخ الفتخ أنك زرتها ** بأماتها وهي العتاق الصلادم

إذا زلفت مشيتها ببطونها ** كما تتمشي في الصعيد الأراقم

أفى كل يوم ذا الدمستق مقدم ** قفاه على الإقدام للوجه لائم

أينكر ريح الليث حتى يذوقه ** وقد عرفت ريح الليوث البهائم

وقد فجعته بابنه وابن صهره ** وبالصهر حملات الأمير الغواشم

مضى يشكر الأصحاب في وفته الظبى ** لما شغلتها هامهم والمعاصم

ويفهم صوت المشرفية فيهم ** على أن أصوات السيوف أعاجم

يسير بما أعطاك لا من جهالةٍ ** ولكن مغنومًا نجا منك غانم

ولست مليكًا هازمًا لنظيره ** ولكنك التوحيد للشرك هازم

تشرف عدنان به لا ربيعة ** وتفتخر الدنيا به لا العواصم

لك الحمد فى الدر الذى لى لفطه ** فإنك معطيه وإنى ناظم

وإني لتعدوني عطاياك في الوغا ** فلا أنا مذموم ولا أنت نادم

على كل طيارٍ إليها برجله ** إذا وقعت في مسمعيه الغماغم

ألا أيها السيف الذي لست مغمدًا ** ولا فيك مرتاب ولا منك عاصم

هنيئا لضرب الهام والمجد والعلى ** وراجيك والإسلام أنك سالم

ولم لا يقى الرحمن حديك ما وقى ** وتفليقه هام العدى بك دائم

অর্থ :

১. দৃঢ়চেতা ব্যক্তির দৃঢ়তার অনুপাতে কঠিন সিদ্ধান্ত নিরূপিত হয় (দৃঢ়চেতা ব্যক্তির সিদ্ধান্তও দৃঢ়)। মহৎ ব্যক্তির মহানুভবতার অনুপাতে মহৎ কাজ সুসম্পন্ন হয় (মহৎ ব্যক্তির কাজও মহৎ)।

২. ক্ষুদ্রলোকের দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র কাজও বৃহৎ মনে হয়; আর মহান ব্যক্তির দৃষ্টিতে মহাকর্মযজ্ঞও ক্ষুদ্র (সাধারণ কাজ) বলেই মনে হয়।

৩. সাইফুদ্দৌলা স্বীয় পরিকল্পনা সেনাবাহিনীর ওপর চাপিয়ে দেন; কিন্তু বৃহৎ সেনাদল তা (উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা) বহন করতে সক্ষম হয়ে যায়।

৪. তিনি (সাইফুদ্দৌলা) অন্তরে যা পোষণ করেন তাই মানুষের কাছ থেকে প্রত্যাশা করেন; অথচ সেটি এমন কঠিন যা বীরকেশরী সিংহও বাস্তবায়নের দাবি করতে পারবে না।

৫. দীর্ঘায়ু পাখি তথা মরুর নবীন ও বৃদ্ধ শকুন তাঁর (সাইফুদ্দৌলার) অস্ত্রের জন্য উৎসর্গিত হয় (কেননা বাইজাইন্টাইন সৈনিকদের প্রচুর লাশ পড়ার কারণে তাদের খাবারের ভালো যোগান হয়েছে)।

৬. (নবীন ও বৃদ্ধ শকুনের) নখরবিহীন সৃষ্টি তাদের কোনো ক্ষতি করে না, যেখানে তাঁর (সাইফুদ্দৌলার) তরবারি ও কোষগুলো প্রস্তুত আছে।

৭. 'আল-হাদাছ' লালকিল্লা কি তার রঙের পরিচয় জানে? সে কি জানে কোন পরিবেশকদ্বয় তাকে পরিতৃপ্ত করেছে? মেঘমালা নাকি মাথার করোটি?

৮. তাঁর (সাইফুদ্দৌলার) শুভাগমনের আগে মেঘমালাই তাঁকে পরিতৃপ্ত করত। পরবর্তীতে তিনি যখন এর কাছে এলেন (অভিযান শুরু করলেন) তখন (বাইজান্টাইন সৈনিকদের) মাথার করোটিই একে পরিতৃপ্ত করল।

৯. তিনি একে নতুন উচ্চতায় প্রতিষ্ঠা করলেন; যখন বর্শায় বর্শায় আঘাত প্রত্যাঘাত হলো এবং মৃত্যু-তরঙ্গ চতুর্পাশে আঁচড়ে পড়ল।

১০. আল-হাদাছ দুর্গে (বাইজান্টাইনদের ফিতনার কারণে) উন্মত্তের পরিবেশ সৃষ্টি হলো; ফলে নিহতদের লাশ দিয়েই যেন একে তাবিজ পরানো হলো (দুর্গের দেয়ালে ঝুলন্ত লাশগুলোকে গলায় ঝুলানো তাবিজের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যা উম্মাদের আরোগ্য লাভের জন্য ব্যবহার করা হয়)।

১১. যুগ-প্রত্যাখ্যাত এই দুর্গকে যুগ তাড়া করেছে (বাইজান্টাইনরা একে দখল নিয়ে ইসলামচ্যুত করেছে)। আপনি খাত্তি বর্শার সাহায্যে একে ধর্মের দিকে ফিরিয়ে এনেছেন। আর যুগ এতে অপদস্ত হলো (যুগ একে রোমানদের দখলে ছেড়ে দিয়েছিল, আপনি তা মুসলমানদের দখলে এনে দিলেন। এতে যুগ ব্যর্থমনা হলো)।

১২. আপনি রজনিমালা (যুগের ঘনঘটা) হতে কিছু গ্রহণ (দখল) করলে তা চিরতরে বিলীন করে দেন (এর কিছুই ফেরত দিতে হয় না)। আর তারা (রজনিমালা) যদি আপনার কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করে তবে দেনাদার থেকে যায় (তা ফেরত দিতে বাধ্য হয়; অর্থাৎ সাইফুদ্দৌলা যুগের চেয়ে অনেক শক্তিশালী, যুগ তাঁর চাহিদার ব্যতিক্রম করতে পারে না)।

১৩. আপনি ভবিষ্যৎকালীন কোনো ক্রিয়ার ইচ্ছে করলে তা কোনো নিষেধাজ্ঞারোপের পূর্বেই অতীতকালীন ক্রিয়ায় পরিণত হয়ে যায়।

১৪. রোমক বাইজান্টাইন ও রুশরা একে (আল-হাদাছ দুর্গকে) ধ্বংস করার বাসনা কীরূপে করে? যেখানে এই (আপনার হাতের) বর্শা উক্ত দুর্গের ভিত্তি ও খুঁটি।

১৫. তারা (রোমক ও রুশরা) দুর্গের বিরুদ্ধে মোকাদ্দমা পেশ করেছে; এতে বিচারকের আসনে ছিল যুদ্ধের ঘনঘটা। সুতরাং (এই ন্যায় বিচারে) কোনো মজলুম নিহত হয়নি এবং কোনো জালিম জীবিত থাকতে পারেনি।

১৬. আপনার বিরুদ্ধে লৌহবর্ম পরিধান করে তারা আগমন করেছে। (ঘোড়ার পায়েও লৌহ-পাদুকা পরানোর কারণে) তারা যেন পা বিহীন ঘোড়ায় চড়ে নৈশ অভিযানে বের হয়েছে।

১৭. তারা যখন উজ্জ্বলরূপে আত্মপ্রকাশ করে তখন তাদের শুভ্রোজ্জ্বল তরবারি, তদানুরূপ লৌহবর্ম ও শিরস্ত্রাণের মাঝে তাদেরকে পৃথক করে চেনা যায় না (ব্যাপক সাঁজোয়া প্রস্তুতির কারণে তারা সমর-পোশাকের সাথে একাকার হয়ে যায়, যেন সর্বাঙ্গ লোহা)।

১৮. তারা এমন বৃহৎ সেনাদল (মিত্র বাহিনী) যাদের কুচকাওয়াজ প্রাচ্য-প্রতীচ্য সর্বত্র বিরাজমান। তাদের দুর্বোধ্য রণহুংকার নক্ষত্রপুঞ্জ 'কালপুরুষ' পর্যন্ত পৌঁছে।

১৯. উক্ত বৃহৎ বাহিনীতে (সাইফুদ্দৌলার বিরুদ্ধে বাইজান্টাইন মিত্র বাহিনীতে) বহুভাষী ও বহু জাতিক সৈন্য সমাবেশ ঘটেছে। ফলে অনুবাদক ছাড়া আলাপকারীদের বক্তব্য বোঝানো সম্ভব হচ্ছে না।

২০. হায় আল্লাহ! কী কঠিন মুহূর্ত! ঐ যুদ্ধের লেলিহান দুর্বল ও কৃত্রিম সৈনিকদেরকে বিলীন করে দেয়। যেখানে ধারালো তরবারি ও সিংহপুরুষ ভিন্ন আর কেউ টিকে থাকতে পারেনি (পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছে)।

২১. যেসব তরবারি বর্ম ও বর্শাকে কাটতে (প্রতিহত করতে) পারে না, সেসব তরবারি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে; এবং যেসব যুবক শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে না তারা পালিয়ে গেছে।

২২. (ওহে সাইফুদ্দৌলা) আপনি (শত্রু বাহিনীর) মুখোমুখি দাঁড়ালেন, অথচ এমনি পরিস্থিতিতে দণ্ডায়মান ব্যক্তির জন্য মৃত্যু অনিবার্য। আপনি যেন মৃত্যুর চোখের সামনে, আর সে নিদ্রিত (মৃত্যু আপনাকে দেখে না বা নাগাল পায় না)।

২৩. (বাইজান্টাইন) বীর সেনারা আহত ও পর্যুদস্ত হয়ে (আত্মসমর্পণপূর্বক) আপনার সমীপে আগমন করে। তখন আপনার চেহারা থাকে আলোকিত এবং দাঁত-মুখ থাকে হাস্যোজ্জ্বল (আপনি স্বাভাবিক এবং স্থীর থাকেন)।

২৪. বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তায় আপনি সাধারণ সীমা অতিক্রম করে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছেন যে, লোকেরা বলাবলি করছে যে, আপনি অদৃশ্যের (আসন্ন বিজয়ের) পরিজ্ঞাতা।

২৫. রোমক বাহিনীর ডানাদ্বয় (ডান-বাম উভয় দিক) আপনি আপনার অন্তরে (ভেতরে) গুটিয়ে ফেলেছেন (আয়ত্তে নিয়ে এসেছেন)। যার নিচে ছোটো-বড়ো পালকগুলো (তাদের সৈনিকরা) নিষ্পেষিত হয়ে মারা যাচ্ছে।

২৬. আপনি যখন তরবারি দিয়ে মাথায় আগাত হানেন তখনও বিজয় অধরা থাকে, আর এটি (তরবারি) যখন বক্ষে উপরিভাগে পৌঁছে যায় তখন বিজয় অত্যাসন্ন হয়ে পড়ে।

২৭. আপনি 'রুদায়নি'[২৪] বর্শাকে অবজ্ঞা করেন, এমনকি একে ছুড়ে মারেন (বর্শার পরিবর্তে তরবারিই আপনার প্রিয় হাতিয়ার। কেননা এতে কাছাকাছি থেকে জারালো আঘাত করা যায়)। ভাবখানা এমন, যেন তরবারি বর্শাকে গালমন্দ করছে।

২৮. বাস্তবেই যে ব্যক্তি মহান বিজয়ের প্রত্যাশা করে তবে নিশ্চিতই এর চাবিকাঠি হচ্ছে ধারালো শ্বেতশুভ্র ক্ষিপ্র তরবারি (বর্শা নয় বরং তরবারির সাহায্যেই নিশ্চিত বিজয় চিনিয়ে আনা সম্ভব)।

২৯. আপনি তাদেরকে (বাইজান্টাইন সৈনিকদের লাশ) 'আল-উহায়দিব' পর্বতের (আল-হাদাছ দুর্গ সংলগ্ন) সর্বত্র বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে দিলেন, যেন নববধূর ওপর দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) ছিটিয়ে দিলেন।

৩০. পাহাড় চূড়ায় আপনার সাথে সাথে ঘোড়াগুলো পাখির বাসাগুলোকে পদদলিত করে। এতে বাসাগুলোর চতুর্দিকে যেন রেস্টুরেন্টের (মরদেহ) ছড়াছড়ি।

৩১. ঈগল ছানা মনে করছে, আপনি তাদের জননী সমভিব্যাহারে তাদের পরিদর্শনে গেছেন (যেহেতু জননীই তাদের খাদ্য সংগ্রাহক)। অথচ সেটি (আপনার সঙ্গী) ছিল উন্নত জাতের সুঠামদেহী ঘোড়া।

৩২. (পর্বতারোহণে) এটি যখন পিছল খায় তখন আপনি একে উদরে ভর করে (হামাগুড়ি দিয়ে) হাঁটতে বাধ্য করেন। যেমনটি ভূপৃষ্ঠে সাপ বিচরণ করে।

৩৩. তবে কি এই রোমক সেনাপতি প্রতিদিন আপনার দিকে অগ্রসর হয়? অগ্রসর হওয়াতে তার ঘাড় তার চেহারাকে গালমন্দ করে (কেননা প্রতিবারই পিছু হটতে বাধ্য হয়)।

---

[24] . রুদায়না য়ামামার অধিবাসী এক নারী। সে এবং তার স্বামী মিলে উন্নত মানের বর্শা তৈরি করত। তাদের তৈরিকৃত বর্শাকে রুদায়নি বলা হতো। (আল-আকবারী, *দীওয়ানুল মুতানাব্বী*, খ. ৩, পৃ. ৩৮৮)।

৩৪. সে কি সিংহ-বায়ু (আভাস) ভ্রুক্ষেপ করে না, যে পর্যন্ত না এর স্বাদ গ্রহণ করে? (সিংহপুরুষ সাইফুদ্দৌলার শৌর্যবীর্য সম্পর্কে কি তার ধারণা বা অভিজ্ঞতা নেই?) অথচ বন্যপশুদেরও সিংহ-বায়ু সম্পর্কে সম্যক ধারণা আছে (বন্যপশুরাও জানে সাইফুদ্দৌলার শক্তিমত্তা কতটুকু) ।

৩৫. ইতোমধ্যে তাকে (রোমক সেনাপতি) তার সন্তান, শ্যালক ও শ্যালকের সন্তানের ওপর পরিচালিত আমির সাইফুদ্দৌলার বিধ্বংসী আক্রমণ সন্ত্রস্ত করেছে (তবু সে কেনো শিক্ষা গ্রহণ করছে না এবং কেনই-বা যুদ্ধের ময়দানে অগ্রসর হয়?)

৩৬. ধারালো তরবারি হতে মুক্তি পাওয়ায় সে তার সহচরদের (অধীনস্থ সৈনিকদের) প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে; কেননা, উক্ত তরবারি তাদের (সৈনিকদের) প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে; কেননা উক্ত তরবারি তাদের (সৈনিকদের) মাথা ও কবজি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত ছিল।

৩৭. তাদের (রোমক সৈনিকদের) মাঝে মাশরাফি তরবারির (আরবীয় উন্নত তরবারির) ঝনঝনানি সে (রোমক সেনাপতি) বুঝে (অভিজ্ঞতার আলোকে এর আওয়াজ শুনলে সে বুঝে যে, তার সৈনিকরা এর আঘাতে নিহত হচ্ছে); যদিও খড়ক-ধ্বনির ভাষা সবার কাছে অবোধ্য।

৩৮. আপনাকে যা দিয়েছে (যুদ্ধবন্ধি ও গনিমত) তাতেই সে মহাখুশি (কেননা, এতে তার জান রক্ষা পেয়েছে)। তবে এটি (খুশি) কোনো অজ্ঞতাবশত নয়; বরং একজন সর্বশ্রান্ত ব্যক্তি আপনার কাছ থেকে (আক্রমণ হতে) সফল মুক্তি পেয়েছে (সে হিসেবে খুশি)।

৩৯. রাজা হিসেবে আপনার বিজয় তার (জয়-পরাজয়ের) সাথে তুলনীয় নয়; কেননা আপনার বিজয় শিরকের ওপর তাওহিদের বিজয়।

৪০. এতে (আল-হাদাছ বিজয়ে) কেবল রাবী'য়া গোষ্ঠী নয়, আদনানীরাও গর্বিত।[২৫] নির্দিষ্ট কয়েকটি নগর (আলোপ্পো বা হিম্‌স) নয়, বরং গোটা দুনিয়া (মুসলিম জাহান) এতে গৌরবান্বিত।

৪১. মণিমুক্তা (কাব্য পঙ্‌ক্তি) দিয়ে আপনার প্রশংসা। যার শব্দমালা আমার, তবে এর দাতা (অর্থ) আপনিই। আমি তো কেবল গ্রন্থনাকারী (যেহেতু আপনাকে উপজীব্য করেই আমার কবিতা, সেহেতু আপনিই আমার কাব্য-প্রেরণাদাতা এবং প্রকারান্তরে আপনিই আমার কবিতার অর্থ)।

৪২. আপনার প্রদত্ত উপঢৌকন (ঘোড়া) আমাকে রণক্ষেত্রে নিয়ে যায়। তবে (এটি গ্রহণ করায়) আমি নিন্দিত নই এবং আপনিও (আমাকে প্রদান করায়) লজ্জিত নন (কেননা, আমি এর যথার্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি)।

৪৩. (আপনি লজ্জিত নন) প্রত্যেক ঐ দ্রুতগামী ঘোড়াতে, যার পদাঘাতে যুদ্ধের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, যখন তার কর্ণকুহরে রণধ্বনি অনুরণিত হয়।

---

[25] . উল্লেখ্য যে, সাইফুদ্দৌলার গোষ্ঠী হচ্ছে রাবী'য়া গোষ্ঠী।

৪৪. ওহে তরবারি ওরফে সাইফুদ্দৌলা! (সাইফুদ্দৌলা শব্দের অর্থ সাম্রাজ্যের তরবারি), আপনি কোষবদ্ধ নন। আপনাকে নিয়ে কেউ সন্দিগ্ধ নয় এবং আপনার কাছ থেকে কেউ রক্ষাও পায় না।

৪৫. আপনাকে অভিবাদন শত্রু-মস্তকে আঘাত হানার জন্য, মর্যাদা ও সম্মানের জন্য এবং আপনার অনুগ্রহ প্রত্যাশীদের (প্রত্যাশা পরিপূরণের) জন্য। আর ইসলামের (সুরক্ষার) জন্য, যাকে আপনি নিরাপদ করেছেন।

৪৬. কেনই-বা পরম দয়াময় (আল্লাহ) আপনার দুধারী তরবারিকে সদা সুরক্ষা দেবেন না? যেখানে আপনাকে দিয়েই তিনি সর্বদা শত্রু-শির দ্বিখণ্ডিত করেন।

উল্লিখিত পঙ্‌ক্তিমালায় কবি আল-মুতানাব্বি 'আল-হাদাছ' দুর্গের অভিযানে তাঁর স্বচক্ষে দেখা আলেপ্পোর শাসক সাইফুদ্দৌলা আল-হামদানীর কাছে বাইজাইন্টাইন বাহিনীর পর্যুদস্ত হওয়ার কাহিনি এবং তাদের সেনাপতি বুর্ডাস ফুকাসের পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে পলায়নের চিত্র অত্যন্ত মনোজ্ঞ ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আল-হাদাছ' জয়ের মতো চ্যালেঞ্জিং কাজ উচ্চাভিলাষী স্বপ্নদ্রষ্টা, দৃঢ় পরিকল্পক, দুঃসাহসী ও অকুতোভয় সাইফুদ্দৌলার জন্যই কেবল শোভা পায়। অন্য কোনো নেতা এই দুঃসাহসিক অভিযানে অগ্রসর হতে সাহস করেনি। সেদিন সাইফুদ্দৌলার নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী বাইজান্টাইন সৈনিকদের ওপর যে ভয়াবহ আক্রমণ পরিচালনা করেছে তাতে শত-সহস্র লাশ পড়েছিল, যা মৃতভোজী শকুনের উপাদেয় খোরাকে পরিণত হয়েছিল। বাইজান্টাইন শাসকগোষ্ঠী নানা জাতি ও নানা ভাষীদের নিয়ে মিত্রজোট গঠন করেও সাইফুদ্দৌলাকে পরাস্ত করতে পারেনি; উপরন্তু বাইজান্টাইন সেনাপতি নিজ সৈন্য-রসদ সর্বস্ব হারিয়ে জান নিয়ে পালিয়ে গিয়ে নিজেকে রক্ষা করাই উপযুক্ত মনে করেছেন। এভাবে কবিতার বর্ণনায় কবি আল-মুতানাব্বী সাইফুদ্দৌলাকে একজন মহাকাব্যিক বীর নায়ক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

মর্যাদার নিমিত্ত ঝুঁকি গ্রহণ

যখন আনতাকিয়া অবরুদ্ধ হয় তখন কবি আল-মুতানাব্বীর অশ্বশাবক আত্-তাখর্র এবং তদমাতা আল-হিজরের মৃত্যু হয়। তখন কবি নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন। আলোচ্য কবিতায় কবি তার প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন। একজন স্তুতিকার কবির পাশাপশি সারগর্ভ উপদেশমালায়ও যে তাঁর সরব পদচারণা রয়েছে, বর্তমান কবিতাটি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কবির অশ্বের হত্যাকারীর প্রতিশোধ নেওয়ার কথা যেমন দৃঢ়কণ্ঠে ব্যক্ত হয়েছে, তেমনি যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসিকতার সাথে বিচক্ষণতাকে যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা উপস্থাপিত

হয়েছে। কেননা, ব্যক্তির কোনো বিষয়ের যথার্থ উপলব্ধি ও সাফল্য তার বিচক্ষণতা ও অনুধাবন শক্তির ওপর অনেকটা নির্ভরশীল।[২৬]

إذا غامرت في شرفٍ مروم ** فلا تقنع بما دون النجوم

فطعم الموت في أمرٍ حقيرٍ ** كطعم الموت في أمرٍ عظيم

ستبكي شجوها فرسي ومهري ** صفائح دمعها ماء الجسوم

قربن النار ثم نشأن فيها ** كما نشأ العذارى في النعيم

وفارقن الصياقل مخلصات ** وأيديها كثيرات الكلوم

يرى الجبناء أن العجز عقل ** وتلك خديعة الطبع اللئيم

وكل شجاعة فى المرء تغنى ** ولا مثل الشجاعة فى الحكيم

وكم من عائب قولا صحيحا ** وآفته من الفهم السقيم

ولكن تأخذ الآذان منه ** على قدر القرائح والعلوم

অর্থ :

১. তুমি যখন উঁচু মর্যাদার অন্বেষণে ঝুঁকি নিয়ে অগ্রসর হবে, তবে নিচু মর্যাদা নিয়ে পরিতুষ্ট থাকার চেষ্টা করবে না।

২. কেননা, তুচ্ছ ঘটনায় মৃত্যু কিংবা বৃহৎ ঘটনায় মৃত্যু উভয় মৃত্যুস্বাদ অভিন্ন।

৩. আমার (মৃত) অশ্ব ও অশ্বশাবকের জন্য বেদনাহত হয়ে অচিরেই আমার তরবারিগুলো রোদন করবে, যার অশ্রু হবে রক্ত। (এখানে কবি তাঁর অশ্ব ও অশ্বশাবকের হত্যাকারীর প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন)।

৪. উক্ত তরবারিসমূহ (কামার কর্তৃক) অগ্নি অবগাহন করেছে এবং এতেই বর্ধিত হয়েছে (শানিত হয়েছে), যেমনটি কুমারী নারী বিলাসিতায় বর্ধিত হলো।

৫. এগুলো কর্মকারদের কাছে স্বচ্ছ ও জংমুক্ত হয়েছে এবং এতে (মেরামতে) তাদের হাত বহু ক্ষতবিক্ষত হয়েছে (অতি ধারালো হওয়ার কারণে)।

[26] . আবুল আলা' আহমাদ ইব্নে আবদিল্লাহ আল-মাআর্‌রী, প্রাগুক্ত, পৃ ১২৮১।

৬. কাপুরুষরা মনে করে, অক্ষমতাই বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ; অথচ এটি হীন স্বভাবের ছলচাতুরি মাত্র।

৭. প্রত্যেক লোকের সাহসিকতা তার প্রয়োজন মেটায় বটে, তবে বিজ্ঞ লোকের মাঝে যে সাহসিকতা তা ভিন্নরূপ (কেননা, তার সাহসিকতার সাথে বিচক্ষণতা কাজ করে ফলে তা কখনো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় না)।

৮. কতক দোষী ব্যক্তি রয়েছে, যারা সঠিক ও বিশুদ্ধ বক্তব্যকে দূষণীয় করে তুলে। আসলে এর ঘাটতিটা হচ্ছে দুর্বল অনুধাবন।

৯. বস্তুত প্রত্যেক শ্রবণেন্দ্রীয় (শ্রোতামণ্ডলি) তার স্বভাব ও জ্ঞান মোতাবেক (যোগ্যতানুসারে) তা (শ্রুত বক্তব্য) হতে আহরণ করে।

উপরোক্ত কবিতায় কবি আল-মুতানাব্বী তার অশ্বের হত্যাকারীর প্রতিশোধ নেওয়ার কথা যেমন দৃঢ়কণ্ঠে ব্যক্ত করেছেন, তেমনি যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসিকতার সাথে বিচক্ষণতাকে যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন, ব্যক্তির কোনো বিষয়ের যথার্থ উপলব্ধি ও সাফল্য তার বিচক্ষণতা ও অনুধাবন শক্তির ওপর অনেকটা নির্ভরশীল।

৪র্থ পরিচ্ছেদ
যুদ্ধের বর্ণনামূলক কবিতা

কবি আল-মুতানাব্বী আলোচ্য কবিতামালা 'আলী ইব্ন আহমাদ ইব্ন আমির আল-আনতাকী'র প্রশংসায় রচনা করেন। শুরুতে কবি যুগের দুর্বিপাকে কবির ধৈর্য ও ত্যাগের বর্ণনা দিয়েছেন। এরপর অশ্বারোহী বাহিনীর সাথে তার লড়াইয়ের বিবরণ তথা যুদ্ধের বর্ণনা তুলে ধরেছেন। সেই সাথে দানশীলতার সুন্দর বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। কবির মতে, দারিদ্র্যের শঙ্কায় যে অর্থ সঞ্চয় করে, সে বাস্তবে দারিদ্র্যের মাঝে কালাতিপাত করে; কেননা, সঞ্চয়ের মাধ্যমে সে নিজেকে সম্পদ ভোগ হতে বঞ্চিত করছে। আর এই বঞ্চনাই তো মহাদরিদ্র। এরপর কবি আলী ইব্ন আহমদের দরবারে আগমন করতে বহু বিপদসংকুল ও দূরত্বের পথ পাড়ি দেওয়ার বিবরণ দেন এবং তার বদান্যতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন। এমনকি আলী ইব্ন আহমদের গুণাবলিই যেন কবিকে এই কবিতা রচনায় তাড়িত ও উদ্বুদ্ধ করেছে এবং এই কবিতার ভাবগত উৎকর্ষ সাধন করেছে।[২৭]

أطاعن خيلًا من فوارسها الدهر ** وحيدًا وما قولي كذا ومعي الصبر

وأشجع منى كل يوم سلامتى ** وما ثبتت إلا وفى نفسها أمر

تمرست بالآفات حتى تركتها ** تقول أمات الموت أم ذعر الذعر

وأقدمت إقدام الأبى كأن لى ** سوى مهجتى أو كان لى عندها وتر

ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها ** فمفترق جاران دارهما العمر

ولا تحسبن المجد زقا وقينة ** فما المجد ألا السيف والفتكة البكر

وتضريب أعناق الملوك وأن ترى ** لك الهبوات السود والعسكر المجر

وتركك في الدنيا دويًا كأنما ** تداول سمع المرء أنمله العشر

إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقصٍ ** على هبةٍ فالفضل فيمن له الشكر

ومن ينفق الساعات في جمع ماله ** مخافة فقرٍ فالذي فعل الفقر

[27] . আবুল আলা' আহমাদ ইব্নে আবদিল্লাহ আল-মাআর্‌রী, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৩২-৫৫০।

علي لأهل الجور كل طمرةٍ ** عليها غلام ملء حيزومه غمر

يدير بأطراف الرماح عليهم ** كؤوس المنايا حيث لا تشتهى الخمر

وكم من جبالٍ جبت تشهد أنني الجبال ** وبحرٍ شاهدٍ أنني البحر

وخرقٍ مكان العيس منه مكاننا ** من العيس فيه واسط الكور والظهر

يخدن بنا في جوزه فكأننا ** على كرةٍ أو أرضه معنا سفر

ويوم وصلناه بليل كأنما ** على أفقه من برقه حلل حمر

وليل وصلناه بيوم كأنما ** على متنه من دجنه حلل خضر

وغيثٍ ظننا تحته أن عامرًا ** علا لم يمت أو في السحاب له قبر

أو ابن ابنه الباقي علي بن أحمدٍ ** يجود به لو لم أجز ويدي صفر

وإن سحابا جوده مثل جوده ** سحاب على كل السحاب له فخر

فتى لا يضم القلب همات قلبه ** ولو ضمها قلب لما ضمه صدر

ولا ينفع الإمكان لولا سخاته ** وهل نافع لو لا الاكف القنا السمر

قران تلاقى الصلت فيه وعامر ** كما يتلاقى الهندواني والنصر

فجاءا به صلت الجبين معظمًا ** ترى الناس قلا حوله وهم كثر

مفدى بآباء الرجال سميدعًا ** هو الكرم المد الذي ماله جزر

وما زلت حتى قادنى الشوق نحوه ** يساورنى فى كل ركب له ذكر

وأستكبر الأخبار قبل لقائه ** فلما التقينا صغر الخبر الخبر

إليك طعنا في مدى كل صفصفٍ ** بكل وآةٍ كل ما لقيت نحر

إذا ورمت من لسعةٍ مرحت لها ** كأن نوالًا صر في جلدها النبر

فجئناك دون الشمس والبدر في النوى ** ودونك في أحوالك الشمس والبدر

كأنك برد الماء لا عيش دونه ** ولو كنت برد الماء لم يكن العشر

دعانى إليك العلم والحلم والحجى ** وهذا الكلام النظم والنائل النشر

وما قلت من شعر تكاد بيوته ** إذا كتبت يبيض من نورها الحبر

كأن المعاني في فصاحة لفظها ** نجوم الثريا أو خلائقي الزهر

وجنبنى قرب السلاطين مقتها ** وما يقتضينى من جماجمها النسر

وإنى رأيت الضر أحسن منظرا ** وأهون من مرأى صغير به كبر

لساني وعيني والفؤاد وهمتي ** أود اللواتي ذا اسمها منك والشطر

وما أنا وحدى قلت ذا الشعر كله ** ولكن لشعرى فيك من نفسه شعر

وماذا الذى فيه من الحسن رونقا ** ولكن بدا فى وجهه نحوك البشر

وإنى وإن نلت السماء لعالم ** بأنك ما نلت الذى يوجب القدر

أزالت بك الأيام عتبى كأنما ** بنوها لها ذنب وأنت لها عذر

অর্থ :

১. আমি একাই অশ্বারোহী বাহিনীর সাথে লড়ে যাচ্ছি, যে বাহিনীতে যুগও রয়েছে। আমি এ কী বললাম! আমার সাথে তো ধৈর্যও রয়েছে (আমি ধৈর্যের সাথে যুগের দুর্বিপাকের সাথে সংগ্রাম করে যাচ্ছি; আমার সহায়ক কেউ নেই)।

২. (এত ঘনঘটার মাঝে) আমার নিত্যদিনের নিরাপত্তা আমার চেয়েও অধিক প্রবল। এটি একটি বৃহৎ কর্মসম্পাদনের জন্য বহাল রয়েছে।

৩. বিপদ অতিক্রমণে আমি এত বেশি অভ্যস্ত যে, ঐ বিপদ (বিস্মিত হয়ে) বলতে বাধ্য হয়, "মৃত্যুর কি মরণ ঘটেছে নাকি ত্রাস সন্ত্রস্ত হয়েছে?" (ধৈর্যের সাথে নির্ভয়ে নিরবচ্ছিন্ন দুর্যোগ মোকাবিলা করাতে ঐ দুর্যোগই যেন আমার নিরাপত্তা ও ধৈর্যের ব্যাপারে অবাক হয়েছে)।

৪. বাঁধভাঙা জোয়ায়ের মতো আমি (বিপদে) এগিয়ে গেছি; যেন আমার জন্য বিকল্প আরেকটি প্রাণাত্মা রয়েছে কিংবা আমার জন্য যেন তার প্রতিশোধ নেওয়া কর্তব্য ছিল।

৫. তুমি আত্মাকে ছাড়, দেহত্যাগের পূর্বে সে সাধ্যমতো যেন (অর্থ-সম্পদ, আরাম-আয়েশ) আহরণ করে নেয়; [কেননা, সে তার প্রতিবেশীকে (দেহকে) ছেড়ে যাবে (মৃত্যু হওয়ার পূর্বে)। আর উভয় প্রতিবেশীর বাসস্থান হচ্ছে আয়ুষ্কাল।] কেননা এই দুই প্রতিবেশী (আত্মা ও দেহ) পৃথক হয়ে যাবে, যাদের উভয়ের গৃহ হচ্ছে আয়ুষ্কাল।

৬. শরাব পান আর গায়িকার গান শ্রবণকে কেবল মর্যাদাকর মনে করো না। বস্তুত তরবারি আর দুর্ধর্ষ আক্রমণ ছাড়া মর্যাদার নাগাল পাওয়া যায় না।

৭. রাজা-বাদশাদের ঘাড়ে আঘাত হানা এবং রণাঙ্গনে কৃষ্ণকালো ঘূর্ণিবায়ু ও বৃহৎ সেনাদলের সাক্ষাৎ-দর্শন ছাড়া মর্যাদার নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়।

৮. তুমি দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলে তোমার (মহৎকর্মাবলির) প্রতিধ্বনি শোনা যাবে। যেমন দশ আঙুলে কর্ণকুহর বন্ধ করলে তাতে শনশন আওয়াজ শোনা যায় (মানব-কীর্তির প্রতিধ্বনি মৃত্যুর পর শোনা যায়)।

৯. তোমার মর্যাদা তোমাকে হীন লোকের দান-দক্ষিণায় কৃতার্থ হওয়া হতে উর্ধ্বে রাখতে না পারলে তবে মর্যাদা তো তারই (হীন লোকের) জন্য; কেননা যার জন্য কৃতজ্ঞতা, মর্যাদা তো তারই প্রাপ্য।

১০. যে ব্যক্তি দারিদ্র্যের শঙ্কায় অর্থসঞ্চয়ে সময় ব্যয় করে; তবে সে যা করছে (নিজেকে বঞ্চিত করে) তাই তো দারিদ্র্য।

১১. জালিমকে প্রতিহত করার জন্য আমার প্রত্যেক দ্রুতগামী ঘোড়া প্রস্তুত; যার ওপর (শত্রুর প্রতি) হিংসাভর্তি বক্ষবিশিষ্ট বালক আরোহী হয়।

১২. সেই বালক বর্শা হাতে মৃত্যু শরাবের পেয়ালা নিয়ে তাদের (জালিম শত্রুদের) ওপর চক্কর দেয়; অবশ্য সেথায় (সেই মুহূর্তে) শরাব পানের ইচ্ছা হয় না।

১৩. আমি কত পর্বতমালা অতিক্রম করেছি, যেগুলো এই মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, আমি পর্বতসম (সহিষ্ণুতা ও মর্যাদায়); তদানুরূপভাবে সমুদ্রও সাক্ষ্যদাতা যে আমি সমুদ্রসম (উদারতা ও বদান্যতায়)।

১৪. কতক দিগন্ত বিস্তৃত মরু রয়েছে, যেখানে উটের অবস্থান উটের পিঠ ও শিবিকায় আমাদের অবস্থানের মতো (উটের পিঠে আমাদের যেমন কোনো বিচরণ নেই, তেমনি মরু আয়তন বিশাল হওয়াতে চলন্ত উট যেন ঠাঁই দাঁড়িয়ে আছে)।

১৫. উটপাল উক্ত মরুর মাঝখানে আমাদের নিয়ে দ্রুত চলল (কিন্তু পথ শেষ হয় না), আমরা যেন গোলকের ওপর চলছি কিংবা এর ভূমি যেন আমাদের সাথে সফর করছে (এতই বিস্তীর্ণ ও বিশাল যে উক্ত মরুপথ শেষ হয় না)।

১৬. উক্ত মরুতে কত দিন চলতে চলতে আমরা রাতের বেলায় উপনীত হয়েছি। তখন বিদ্যুতের চমকে এর প্রান্তসীমায় যেন রক্তিমাভ অলংকার।

১৭. আর এতে কত রাত চলতে চলতে আমরা দিবসে উপনীত হয়েছি আর তখন এর পিঠে যেন মেঘমালার কৃষ্ণ অলংকার।

১৮. কত বাদলঝরা বৃষ্টি হয়েছে, যার নিচে আমরা আছি, আমাদের ধারণা যে, আমির (প্রশংসাভাজনের দাদা) মেঘমালায় চড়েছে এবং তার মৃত্যু হয়নি; কিংবা তার সমাধি মেঘমালাতেই অবস্থিত (মেঘমালা থেকে যেমন সিক্ত হওয়া যায় তেমনি তাঁর দান-দক্ষিণাতেও সবাই অভিসিক্ত)।

১৯. কিংবা তাঁর নাতি আলী ইব্ন আহমদ যিনি অদ্যাবধি জীবিত, যিনি উক্ত বারি দিয়েই সিক্ত। আমি যদি সেই বর্ষণ অতিক্রম না করি তবে আমি খালি হাতে (কপর্দকশূন্য হয়ে) থাকি।

২০. বাস্তবেই যেই মেঘের বৃষ্টি তাঁর (আলী ইব্ন আহমদ) দান-দক্ষিণার মতো সেই মেঘ অপরাপর মেঘমালার ওপর গৌরবান্বিত।

২১. তিনি এমন বীর যুবক যে, তাঁর অন্তর যে (পরিমাণ) দৃঢ় অভিপ্রায় ধারণ করে তা অন্য কোনো অন্তর ধারণ করতে পারে না। আর যদিও কোনো অন্তর তা ধারণও করে তবে তার বক্ষ তা ধারণ করতে পারবে না। (কেবল আলী ইব্ন আহমদের অন্তর ও বক্ষই বৃহৎ অভিপ্রায় ও বৃহৎ পরিকল্পনা করতে পারে)।

২২. যদি তাঁর বদান্যতা না থাকে, তবে তাঁর প্রাপ্য সম্পদ কোনো উপাদেয় হতো না। হস্তই যদি না থাকে তবে তাম্রবর্ণের বর্শা কি কোনো উপকারে আসবে? (উদার হওয়ার কারণেই তাঁর সম্পদে মানুষ উপকৃত হচ্ছে, কৃপণ হলে সেই সম্পদ কারোর জন্য উপাদেয় হতো না)।

২৩. আস-সাল্ত (আলী ইব্ন আহমাদের নানা) ও আমিরের (দাদা) মিলন যেন মণিকাঞ্চনযোগ; যেমনটি ভারতীয় তরবারির সাথে বিজয়ের মিলন হয়।

২৪. সুতরাং তাঁরা উভয়ে (আস-সাল্ত ও আমির) তাঁকে (আলী ইব্ন আহমাদকে) উন্নত ললাট ও মর্যাদাবান ব্যক্তি হিসেবে আনয়ন করলেন (জন্ম দিলেন)। তাঁর পাশ্ববর্তী (সংখ্যায়) বহু লোক দেখতে পাবে তুমি, অথচ তারা (তাঁর তুলনায় মর্যাদাগতভাবে) স্বল্প।

২৫. মানুষের পিতৃবর্গ (তাঁর অনুসারীরা) তাঁর জন্য (আলী ইব্ন আহমাদের জন্য) উৎসর্গিত হয়। তিনি এমন মহান ও উদার যার উপচেপড়া পানিতে (দান-দক্ষিণায়) কোনো ঘাটতি নেই।

২৬. প্রত্যেক উষ্ট্রারোহী কাফেলায় তাঁর খ্যাতির কথা আমার কাছে (কানে) আসতে লাগল। পরিশেষে কৌতূহল ভরা আকাঙ্ক্ষা আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে এলো।

২৭. তাঁর সাক্ষাৎ-দর্শনের পূর্বে তাঁর সম্পর্কিত তথ্যাবলিকে আমি অতিরঞ্জন মনে করতাম; কিন্তু যখন সাক্ষাৎ হলো তখন বাস্তব অভিজ্ঞতা ঐসব তথ্যকে বরং স্বল্পই মনে হলো (খ্যাতির তুলনায় তাঁর গুণাবলি বেশি)।

২৮. প্রত্যেক বিস্তৃত মরুর দূরত্ব অতিক্রম করে আমরা আপনারই অভিমুখে যাত্রা করেছি, প্রত্যেক শক্তিশালী উটে চড়ে যাদের যাত্রা-পথের কষ্ট-ক্লেশ জবাই হওয়ার (কষ্টের) মতো।

২৯. যখন কীট-পতঙ্গ দংশন করার ফলে তার দেহ ফুলে যায় তখন এর জন্য সে আহ্লাদিত হয়, যেন উপঢৌকনের থলে তার দেহ-ত্বকে বাধা হলো (কিছু প্রাপ্তির জন্য আলী ইব্ন আহমাদের দিকে সফরের কষ্ট-ক্লেশকে তোয়াক্কা করে না; বরং ফূর্তিসহ পথ চলে।

৩০. সুতরাং আমরা আপনার কাছে এলাম, এটি (এই দূরত্ব) তো চন্দ্র-সূর্যের চেয়ে বেশি দূরে নয়। আর সার্বিক পরিস্থিতিতে আপনি চন্দ্র-সূর্যের চেয়ে নিম্নতম নন (চাঁদ-সুরুজের চেয়েও বেশি উপকৃত হওয়া যায় আপনার কাছে এলে; পথ অতিক্রমণে যে কষ্টই হোক না কেন)।

৩১. আপনি যেন শীতল পানি, যেটি ছাড়া জীবন বাঁচে না। আপনি যদি শীতল জল হয়ে থাকেন, তবে দশ দিনের তৃষ্ণার্ত উটের[২৮] জলপানের প্রয়োজন পড়ে না।

৩২. আপনার বিদ্যা-বুদ্ধি ও সহনশীলতা আমাকে আপনার দিকে ডাক দিয়েছে, আর এই (আপনার জন্য রচিত) কাব্যকথা ও পরিব্যাপ্ত দান-দক্ষিণা তথা গদ্যোপহার (এ সবের আকর্ষণেই আমি আপনার দরবারে ছুটে এসেছি)।

৩৩. আপনাকে নিয়ে আমি যে কবিতা রচনা করি তার পঙ্‌তিমালা যখন লেখা হয়, তখন এর জ্যোতিতে (আপনার গুণাবলির বর্ণনায়) কলমের কালো কালি শুভ্র হওয়ার উপক্রম হয়।

৩৪. অলংকারিক শব্দভান্ডারে এর অর্থমালা যেন কৃত্রিম নক্ষত্রপুঞ্জ (সবার কাছে সমাদৃত); কিংবা এটি আপনার আলোকিত চরিত্রের মতো (উজ্জ্বল ও উন্নত কবিতা)।

৩৫. রাজা-বাদশাদের প্রতি ঘৃণা তাদের সান্নিধ্যে আসা হতে আমাকে নিবৃত্ত রেখেছে; এবং শকুন আমার কাছ থেকে তাদের মস্তক-খুলি (মরণ) প্রত্যাশা করছে।

৩৬. দারিদ্র্য এবং মনোরম দৃশ্য আমার কাছে প্রিয়, হীনলোকের দর্শনের চেয়ে যার মধ্যে অহংকার আছে।

৩৭. আমার রসনা, চক্ষু, অন্তর ও অভিপ্রায় আপনার রসনা, চক্ষু, অন্তর ও অভিপ্রায়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু; এবং আমার দেহও আপনার দেহাংশ।

---

[28]. উটের কষ্টসহিষ্ণুতার একটা নমুনা হচ্ছে, উট এক দিন জল পান করে এরপর আট দিন মরুতে চড়ে বেড়ায়। অতঃপর দশম দিনে জলপান করে।

৩৮. (আপনার প্রশংসায়) এই কবিতা এককভাবে আমি রচনা করিনি; বরং আমার কবিতা আপনার ব্যাপারে স্বপ্রণোদিত কবিতা (আমার মতো আমার কবিতাও যেন আপনার অনুরক্ত)।

৩৯. এই কবিতার চেহারায় যে নান্দনিক সৌন্দর্য উদ্ভাসিত হয়েছে, তা তো আপনারই হর্ষোৎফুল্লতা হতে (আপনাকে দেখার পরই এই কাব্য রচনার ভাবোদয় হয়েছে)।

৪০. আপনার অর্জন আকাশচুম্বী হলে আমি ভালোভাবে জানি যে, আপনি যা অর্জন করেছেন তা আপনার যথাযোগ্য নয় (আপনার মর্যাদা অনুপাতে আপনার অর্জন আরও বেশি হওয়ার কথা)।

৪১. যুগ আপনাকে দিয়েই আমার ভর্ৎসনা হতে অব্যাহতি পেয়েছে; যেন তার সন্তানদের অপরাধে আপনি অজুহাত পেশ করছেন (যুগের ওপর আমি অসন্তুষ্ট ছিলাম; কিন্তু সেই যুগ আপনার মতো লোককে উপহার দিয়ে আমার অসন্তুষ্টি হতে রেহাই পেল)।

উল্লিখিত কবিতামালায় কবি আল-মুতানাব্বী 'আলী ইব্ন আহমাদ ইব্ন আমির আল-আনতাকী' কর্তৃক অশ্বারোহী বাহিনীর সাথে তার যুদ্ধের বর্ণনা তুলে ধরেছেন। সেই সাথে তার দানশীলতার সুন্দর বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। কবি বলেছেন, দারিদ্র্যের শঙ্কায় যে অর্থ সঞ্চয় করে সে বাস্তবে দারিদ্র্যের মাঝে কালাতিপাত করে; কেননা সঞ্চয়ের মাধ্যমে সে নিজেকে সম্পদ ভোগ হতে বঞ্চিত করছে। আর এই বঞ্চনাই তো মহাদরিদ্র। এরপর কবি আলী ইব্ন আহমদের বদান্যতার প্রশংসা করেছেন।

৫ম পরিচ্ছেদ
শোকগাথা কবিতার বর্ণনা

শোকগাথা অর্থ হচ্ছে, শোকাগ্রস্ত, শোকাগ্নি, শোকানল, শোকাচ্ছ্বাস, শোকাবেগ ইত্যাদি। সুতরাং 'শোকগাথা কবিতা'-এর অর্থ দাঁড়ায় : শোকাগ্নি কবিতা, শোকাবেগমূলক কবিতা, শোকাগ্রস্ত কবিতা ইত্যাদি। আর পরিভাষায় শোকগাথা কবিতা বলতে বোঝায়–

A form of poetry or song that mourns the loss of someone who has died or something that has deteriorated. অর্থাৎ প্রিয়জন বিয়োগে রচিত শোকসূচক গান বা কবিতা। জাহেলি যুগ থেকে শুরু করে আব্বাসীয় যুগ পর্যন্ত এ জাতীয় কবিতার বহুল প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আব্বাসীয় যুগের অন্যতম কবি আল-মুতানাব্বীও সময়ে সময়ে শোকগাথা কবিতা রচনা করেছেন। ৩৫২ হিজরি সনে বানু বকর এলাকার অন্তর্গত 'মায়্যাফারিকীন' নামক স্থানে সাইফুদ্দৌলা আল-হামদানীর বোনের মৃত্যু হলে কবি আল-মুতানাব্বী নিম্নোক্ত শোকগাথা কবিতামালা রচনা করেন।[২৯]

يا أخت خير أخٍ يا بنت خير أبٍ ** كنايةً بهما عن أشرف النسب

أجل قدرك أن تسمي مؤبنةً ** ومن يصفك فقد سماك للعرب

لا يملك الطرب المحزون منتقة ** ودمعه وهما فى قبضة الطرب

غدرت يا موت كم أفنيت من عدد ** بمن أصبت وكم أسكت من لجب

وكم صحبت أخاه فى منازلة ** وكم سألت فلم يبخل ولم تخب

طوى الجزيرة حتى جاءنى خير ** فزعت فيه بآمالى الى الكذب

حتى إذا لم يدع لى صدقه أملا ** شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بى

تعثرت به في الأفواه ألسنها ** والبرد في الطرق والأقلام في الكتب

كأن فعلة لم تملأ مواكبها ** ديار بكرٍ ولم تخلع ولم تهب

ولم ترد حياة بعد تولية ** ولم تغث داعيا بالويل والحرب

[29] . আবুল আলা' আহমাদ ইব্নে আবদিল্লাহ আল-মাআর্‌রী, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৯-১০৩।

أرى العراق طويل الليل مذ نعيت ** فكيف ليل فتى الفتيان فى حلب

يظن أن فؤادى غير ملتهب ** وأن دمع جفونى غير منسكب

بلى وحرمة من كانت مراعية ** لحرمة المجد والقصاد والأدب

ومن مضت غير موروث خلائقها ** وإن مضت يدها موروثة النشب

وهمها في العلى والملك ناشئةً ** وهم أترابها في اللهو واللعب

يعلمن حين تحيا حسن مبسمها ** وليس يعلم إلا الله بالشنب

مسرة في قلوب الطيب مفرقها ** وحسرة في قلوب البيض واليلب

إذا رأى ورآها رأس لابسه ** رأى المقانع أعلى منه في الرتب

وإن تكن خلقت أنثى لقد خلقت ** كريمة غير أنثى العقل والحسب

وإن تكن تغلب الغلباء عنصرها ** فإن في الخمر معنى ليس في العنب

فليت طالعة الشمسين غائبة ** وليت غائبة الشمسين لم تغب

وليت عين التي آب النهر بها ** فداء عين التي زالت ولم تؤب

فما تقلد بالياقوت مشبهها ** ولا تقلد بالهندية القضب

ولا ذكرت جميلا من صنائعها ** إلا بكيت ولا ود بلا سبب

قد كان كل حجاب دون رؤيتها ** فما قنعت لها يا ارض بالحجب

ولا رأيت عيون الإنس تدركها ** فهل حسدت عليها أعين الشهب

وهل سمعت سلامًا لي ألم بها ** فقد أطلت وما سلمت من كثب

وكيف يبلغ موتانا التي دفنت ** وقد يقصر عن أحيائنا الغيب

يا أحسن الصبر زر أولى القلوب بها ** وقل لصاحبه يا أنفع السحب

وأكرم الناس لا مستثنيا أحدا ** من الكرام سوى آبائك النجب

قد كان قاسمك الشخصين دهرهما ** وعاش درهما المفدي بالذهب

وعاد فى طلب المتروك تاركه ** إنا لنغفل والايام فى الطلب

ما كان أقصر وقتًا كان بينهما ** كأنه الوقت بين الورد والقرب

جزاك ربك بالأحزان مغفرة ** فحزن كل آخى حزن أخو الغضب

وأنتم نفر تسخو نفوسكم ** بما يهبن ولا يسخون بالسلب

حللتم من ملوك الناس كلهم ** محل سمر القنا من سائر القصب

فلا تنلك الليالي إن أيديها ** إذا ضربن كسرن النبع بالغرب

ولا يعن عدوا أنت قاهره ** فإنهن يصدن الصقر بالخرب

وإن سررن بمحبوب فجعن به ** وقد أتينك فى الحالين بالعجب

وربما احتسب الإنسان غايتها ** وفاجأته بأمر غير محتسب

وما قضى أحد منها لبانته ** ولا انتهى أرب إلا إلى أرب

تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم ** إلا على شجبٍ والخلف في الشجب

فقيل تخلص نفس المرء سالمةً ** وقيل تشرك جسم المرء في العطب

ومن تفكر فى الدنيا ومهجته ** أقامه الفكر بين العجز والتعب

অর্থ :

১. ওহে সেরা ভাইদের (সাইফুদ্দৌলার) বোন ও সেরা পিতার (আবুল হায়জার) কন্যা! এ দুজনের সম্পৃক্ততা সেরা বংশেরই ইঙ্গিত বহন করে।

২. শোকগীতির মাধ্যমে তোমার মর্যাদাকে তোমার নামের চেয়েও মহীয়ান করে তুলছি আমি; আর যে তোমার বর্ণনা (পরিচিতি) দিবে, সে তো আরবের জন্য তোমার নামকে (আরও অধিক) চিহ্নিত করে দিলো।

৩. বিষণ্নতায় হতবিহ্বল ব্যক্তি নিজের বক্তব্য ও অশ্রুর ওপর কোনো ক্ষমতা রাখতে পারে না; দুটোই বিষাদের কবজায় চলে যায়।

৪. ওহে মৃত্যু তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করলে; কেননা যার মৃত্যু ঘটিয়েছ তার মাধ্যমে (একের মৃত্যুতে) কতজনকে তুমি নিঃশেষ করে দিলে এবং কত উচ্চকণ্ঠকে নীরব করে দিলে (যেহেতু তার মাধ্যমে বহুজন উপকৃত হতো)।

৫. রণক্ষেত্রে তুমি তাঁর ভাইয়ের কত সাঙ্গ হয়েছ এবং কতজনকে (শত্রু) মনে করেছ এবং কতজনের (মৃত্যু) কামনা করেছ! সুতরাং তিনি (সাইফুদ্দৌলা) কার্পণ্য করেননি এবং তোমাকে হতাশ করেননি (বরং বহু শত্রুর মৃত্যু ঘটিয়েছেন)।

৬. মৃত্যুসংবাদ গোটা উপদ্বীপ ছড়িয়ে পড়ল; আর যখন সংবাদটি আমার কাছে এলো তখন আমি এতে হতভম্ব হয়ে পড়লাম। আমি নিজেকে (সংবাদটি) মিথ্যা বলে প্রবোধ দিলাম।

৭. পরিশেষে সংবাদটি যখন সত্য প্রতিপন্ন হলো এবং আশার কোনো পথ থাকল না, আমি অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে গেলাম।

৮. এই দুঃসংবাদে মানুষ (শোকাভিভূত হয়ে) বাকরুদ্ধ হয়ে গেল, রাস্তার বাহন হোঁচট খেয়ে পড়ল এবং কাগজে লেখার কলম বন্ধ হয়ে গেল।

৯. তাঁর কীর্তিসমূহ যেন বানু বকর লোকালয়ে কোনো অবদান রাখেনি এবং তিনি কোনো দান-দক্ষিণাও করেননি (বাস্তবে তা নয়; বরং তাঁর মৃত্যুতে সব অন্তর্হিত হয়ে গেছে)।

১০. হায় আফসোস! তিনি যেন সংকটাপন্ন হওয়ার পর কারো জীবন ফিরিয়ে দেননি এবং কারো আর্তনাদে সাড়া দেননি।

১১. আমি লক্ষ্য করছি, তাঁর মৃত্যুসংবাদে ইরাকবাসী (শোকে মুহ্যমান হয়ে) দীর্ঘ বিনিদ্র রজনি অতিবাহিত করেছে; সুতরাং আলেপ্পোতে চিরতরুণ (তাঁর ভাই সাইফুদ্দৌলা) এর কী দশা হবে!

১২. তিনি (সাইফুদ্দৌলা) কি মনে করেন যে, (তাঁর বোনের মৃত্যুতে) আমার অন্তর জ্বলছে না এবং আমার অশ্রু ঝরছে না?

১৩. হ্যাঁ অবশ্যই। যিনি হৃদয়বান ছিলেন তাঁর মর্যাদার শপথ এবং তীর্থযাত্রী ও শিষ্টাচারীদের শপথ (আমার অন্তর তাঁর জন্য জ্বলছে)।

১৪. এবং যিনি স্বীয় চরিত্রের কোনো উত্তরাধিকার রেখে যাননি (তাঁর মতো চরিত্রবান আর কেউ নেই)। যদিও তাঁর হাত সম্পদের উত্তরাধিকার রেখে গেছেন।

১৫. আশৈশব তাঁর ভাবনা ছিল উন্নয়ন ও দেশ গঠনে, আর তাঁর সতীর্থদের ভাবনা ছিল খেল-তামাশায়।

১৬. শুভেচ্ছাজ্ঞাপনকালে সতীর্থরা তাঁর হাস্যোজ্জ্বল চেহারার সৌন্দর্য অবলোকন করে; তবে তাঁর ওষ্ঠ-দাঁতের উজ্জ্বলতা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না (কেননা, এর স্বাদ কেউ গ্রহণ করেনি)।[৩০]

১৭. তাঁর মাথা (তিনি) সুগন্ধিময় প্রসাধনসামগ্রীর জন্য আনন্দের (যেহেতু নারী হিসেবে তিনি এসব ব্যবহার করেন); তবে বর্ম ও শিরস্ত্রাণের জন্য বড়োই অনুশোচনার (কেননা, এগুলো পুরুষের পোশাক, নারী হিসেবে তিনি ব্যবহার করেন না)।

১৮. সেই বর্ম ও শিরস্ত্রাণ যখন তার পরিধানকারীকে এবং স্কার্ফ পরিহিত অবস্থায় তাঁকে (সাইফুদ্দৌলার বোনকে) অবলোকন করবে তখন স্কার্ফকেই মর্যাদায় অধিক সমুন্নত দেখতে পাবে।

১৯. যদিও তিনি নারী হিসেবে সৃজিত, তবে জ্ঞান ও আভিজাত্যে (পুরুষের ন্যায়) মহীয়ানরূপে সৃজিত; তিনি অন্য নারীর মতো (মর্যাদাহীন) নয়।

২০. যদিও তাঁর বংশমূল দিগ্বিজয়ী ও চরমপন্থি 'তাগলিব' গোত্র (তবে তাঁর মধ্যে এমন গুণ রয়েছে, যা তাঁর বংশে নেই), অবশ্য শরাবে এমন গূঢ়রহস্য নিহিত যা আঙুরে নেই (অথচ আঙুর হতেই শরাব সৃষ্ট)।

২১. (সাইফুদ্দৌলার বোনকে অস্তমিত সূর্য বিবেচনা করে কবি বলেন,) হায় সূর্যোদয়ের মধ্যে আকাশে উদিত সূর্য যদি অদৃশ্য হতো এবং অদৃশ্য সূর্য (সাইফুদ্দৌলার মৃত বোন) যদি অস্তমিত (মৃত্যু) না হতো।

২২. হায় দিবস আনয়নকারী রবি-নয়ন যদি হারিয়ে যাওয়া (মৃত) রবি-নয়নে উৎসর্গিত হতো! যে আর কখনো ফিরবার নয়।

২৩. পান্না পাথরও তাঁর মতো নয় এবং ভারতীয় শানিত তরবারিও তাঁর সাদৃশ্য নয় (তিনি রূপগুণে অতুলনীয়)।

২৪. যখনই তাঁর অবদানের কথা আমার স্মরণে আসছে তখনই (তাঁর ভালোবাসায়) আমার কান্নার উদ্রেক হয়েছে। অকারণে তো আর ভালোবাসা জন্মায় না (আমার ওপর তাঁর অবদান আছে বলেই ভালোবাসা-নিঃসৃত কান্নার উদ্রেক হয়)।

২৫. সমুদয় পর্দা (গৃহ কিংবা আসমান) তাঁকে আড়াল করত; তবে ওহে ধরিত্রী তুমি তাঁকে (মাটিতে) আড়াল করে সন্তুষ্ট হওনি! (ধরিত্রীর মাটি যেন তাঁকে ভালোবেসে নিজের ভেতরে আড়াল করে রেখেছে)।

২৬. (পর্দার আড়ালে থাকার কারণে) মানুষের দৃষ্টি তাঁর নাগাল পেতে তুমি দেখনি (কেবল তারকারাজিই তাঁকে দেখার সুযোগ হতো), তবে কি তারকারাজির দৃষ্টিতে ঈর্ষান্বিত হয়েই তাঁকে আড়াল করেছ?

২৭. ওহে ধরা! আমার পক্ষ হতে তাঁর উদ্দেশে নিবেদিত সালাম কি তুমি শুনেছ? যদিও আমি দূরে তবে আমার সালাম বহু পরিমাণে (তাঁর পানে)।

---

[30] . আল-ওয়াহিদী বলেন, মৃতজনের বিশেষত মৃতনারীর শোকগীতিতে দৈহিক রূপসৌন্দর্যের বর্ণনাদান অসংগতিপূর্ণ ও রীতিবিরুদ্ধ। তাই কবির আলোচ্য বর্ণনা যথোপযুক্ত হয়নি। (আল-বারকূকী, *শারহু দীওয়ান আল-মুতানাব্বী*, খ. ১, পৃ. ১৪০।)

২৮. সমাধিস্থ মৃতদের কাছে সালাম কীভাবে পৌঁছবে, যেখানে আমাদের অদৃশ্যমান (পর্দার আড়ালের) জীবিতদের কাছে পৌঁছত না।

২৯. ওহে ধৈর্যের সৌন্দর্য, তুমি তাঁর (মৃত বোনের) নিকটতম হৃদয়ের (সাইফুদ্দৌলার) সাথে সাক্ষাৎ করো এবং এই ধৈর্যধারীকে বলো, ওহে উপাদেয় বারি!

৩০. ওহে মানবশ্রেষ্ঠ! আপনাকে ছাড়া আর কাউকে ব্যতিক্রম মনে করি না। তবে আপনার অভিজাত পিতৃবর্গ ছাড়া।

৩১. যুগ আপনার জন্য দুই ব্যক্তিত্বকে (দুই বোন) বণ্টন করে দিয়েছে। এতদুভয়ের মধ্যে স্বর্ণের (ছোটো বোন) বিনিময়ে মুক্তা (বড়ো বোন) অবশিষ্ট রয়েছে।

৩২. তবে যুগ যাকে ছেড়ে দিয়েছে (জীবিত রয়েছে) তার সন্ধানে ফিরে এসেছে। আমরা অবচেতন থাকলেও যুগ তার সন্ধানকর্মে তৎপর।

৩৩. উভয়ের (দুই বোনের) মৃত্যুকালীন ব্যবধান কত না স্বল্প সময়ের! যেন উষ্ট্রের প্রভাতকালীন জলাবতরণ ও নিশিকালীন জলাবতরণ।

৩৪. (ভাই হারানোর) বিষণ্নতার বিনিময়ে প্রভু যেন আপনাকে ক্ষমা দ্বারা প্রতিদান দেন। কেননা, বিষণ্ন ব্যক্তির বিষণ্নতা ক্রোধান্বিত ব্যক্তির ক্রোধের মতোই (উভয় ক্ষেত্রেই আল্লাহ ধৈর্যধারণের বিনিময় দেন)।

৩৫. আপনারা তো এমন গোষ্ঠী যারা নিজেদের আত্মা প্রদত্ত বস্তুকেই (নিজেদের হাতের কামাই করা বস্তু) দান করে থাকেন; ছিনতাইকৃত বস্তুকে নয়।

৩৬. মানব অধিপতিদের মধ্যে আপনারা শ্রেষ্ঠ আসনে সমাসীন, যেমনটি বৃক্ষ ডালের মধ্যে বর্শার উন্নত কাঠ সেরা বিবেচিত।

৩৭. যুগের নৈশকালীন ঘনঘটা (দুর্বিপাক) আপনাকে যেন স্পর্শ না করে; কেননা, এর থাবা আঘাত হানলে দুর্বলকে দিয়ে সবলও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

৩৮. যুগের দুর্বিপাক আপনার শত্রুর জন্য যেন সহায়কশক্তি না হয়, যার (যেই শত্রুর) ওপর আপনি শক্তিমান; কেননা, এই যুগ দুর্বলকে দিয়ে শক্তিশালীকে শিকার করে।

৩৯. যুগ কোনো প্রিয়বস্তুকে দিয়ে আপনাকে আনন্দ দিলে আবার সেটা দিয়েই (ছিনিয়ে নিয়ে) ব্যথিত করে। আপনার কাছে একই বস্তু দুই রূপে উপস্থাপন করে, এ এক আজব কাণ্ড!

৪০. বহু ক্ষেত্রে মানুষ তার (যুগের) পরিণতির ব্যাপারে অনুমান করে। আবার কখনো হঠাৎ করে অকল্পনীয় বিষয় নিয়ে আগমন করে (যার জন্য মানুষ প্রস্তুত থাকে না)।

৪১. কেউ নিজের মনোবাসনা পূরণ করতে পারে না। এক প্রয়োজন শেষ হয় তো অন্য প্রয়োজন সমুপস্থিত হয়।

৪২. মানুষ নানা বিষয় নিয়ে বিভেদ করে, তবে মৃত্যুর ব্যাপারে সবাই একমত।[৩১] মতদ্বৈততা কেবল মৃত্যু-রহস্যে (কারো মতে, আত্মার মৃত্যু নেই, তারা পরকালে বিশ্বাসী; কারো মতে, মৃত্যুই সবকিছুর শেষ, তারা পরকালে বিশ্বাসী নয়)।

৪৩. কারো মতে মানুষের আত্মা বরাবরই বিদ্যমান থাকবে; আর কারো মতে, মানবদেহের মতো মানবাত্মাও নিঃশেষ হয়ে যাবে।

৪৪. যে ব্যক্তি দুনিয়া ও নিজ আত্মা নিয়ে চিন্তামগ্ন হবে সে (এর রহস্য উদ্‌ঘাটনে) অসহায়ত্ব ও ক্লান্তির মাঝে ঘুরপাক খাবে।

উল্লিখিত কবিতায় কবি আল-মুতানাব্বী সাইফুদ্দৌলা আল-হামদানীর বোনের মৃত্যুতে স্বীয় শোকের বর্ণনা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, তার মৃত্যুতে আমি হতভম্ব, অশ্রুভারাক্রান্ত এবং শ্বাসরুদ্ধ। অনুরূপ তার মৃত্যুতে আমার মতো গোটা ইরাকবাসী শোকে মুহ্যমান হয়ে বিনিদ্র রজনি অতিবাহিত করেছে। তিনি ছিলেন হৃদয়বান এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারিণী। আজীবনই তাঁর ভাবনা ছিল দেশের উন্নয়ন ও দেশ গঠনে। যখনই তাঁর এরূপ অবদানের কথা আমার স্মরণে আসে তখনই তাঁর প্রতি ভালোবাসায় আমার চরমভাবে কান্নার উদ্রেক হয়। পরিশেষে তিনি বলেছেন, মানুষ নানা বিষয় নিয়ে মতবিরোধ করলেও মৃত্যুর ব্যাপারে সবাই একমত। কাজেই মৃত্যুর পেয়ালা সবাইকেই পান করতে হয়।

[31] . মৃত্যু একটি নিশ্চিত বিষয়। নির্ধারিত সময়েই সকল প্রাণী মৃত্যুবরণ করে। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআন মাজিদের সূরা আরাফের ৩৪ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে, " আর প্রত্যেক জাতির জন্য রয়েছে একটি নির্ধারিত সময়কাল, কাজেই যখন তাদের নির্ধারিত সময়কাল এসে পড়ে তখন তারা খানিকের জন্য বিলম্ব করতে পারবে না, আবার এগিয়েও আনতে পারবে না।"

পঞ্চম অধ্যায়

সমসাময়িক কবিদের সাথে আল্-মুতানাব্বী এর তুলনা

১ম পরিচ্ছেদ : আল্-মুতানাব্বী ও বাশ্শার ইব্ন বুর্দ
২য় পরিচ্ছেদ : আল্-মুতানাব্বী ও আবু নুয়াস
৩য় পরিচ্ছেদ : আল্-মুতানাব্বী ও আল-মা'আররী
৪র্থ পরিচ্ছেদ : আল্-মুতানাব্বী ও আবু তাম্মাম
৫ম পরিচ্ছেদ : আল্-মুতানাব্বী সম্পর্কে পণ্ডিতগণের মন্তব্য

১ম পরিচ্ছেদ
আল্-মুতানাব্বী ও বাশ্শার ইব্ন বুর্দ

আব্বাসীয় যুগের অন্যতম প্রধান কবি ছিলেন আল্-মুতানাব্বী। তিনি আরবী সাহিত্যের প্রাচীন নীতির পরিবর্তন করে এক অভিনব রীতি প্রবর্তন করেন। কাব্য ও দর্শনকে তিনিই সর্বপ্রথম একাত্ম করে তুলেন। যৌবনকাল থেকেই তাঁর কবিত্বের ছাপ লক্ষ করা যায় সাহিত্যজগতে। যৌবনেই কবিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। গ্রামীণ ভাষা ও শৈলীতে কাব্য রচনা করে ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করেন।[১] ক্রমাগতভাবে তাঁর ভক্তদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। নিজ প্রতিভা ও অনুরাগীদের ভালোবাসা দেখে উচ্চাভিলাষী কবি নিজেকে খলিফা বলে দাবি করে বসলেন। খবর পেয়ে রাজ্যপাল তাঁকে বন্দি করেন। কিন্তু কবি বন্দিশালায় রাজ্যপালের প্রশংসা করে একটি অপূর্ব কবিতা রচনা করেন। তাঁর সেই কবিতা শুনে রাজা মুগ্ধ হয়ে তাঁকে মুক্ত করে দেন।[২]

কবি আল-মুতানাব্বীর উচ্চাভিলাষ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল আকাশছোঁয়া। তাই সিরিয়ায় কাল্ব গোত্রে, অন্য বর্ণনানুসারে বাদিয়াতুস্ সামাওয়াহ নামক স্থানে ৩২৩ হিজরি সনে তিনি নবি হওয়ার দাবি করেন। কাব্যালংকারে সজ্জিত স্বরচিত কবিতাগুলোকে নিজের মু'জিজা (অলৌকিক বিষয়) ও ঐশীবাণী বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, নবি মুহাম্মদ (সা.) আমার আগমনের এবং নবিত্বের সুসংবাদ দিয়েছেন। হিম্স প্রদেশের অধিপতি লু'লু' এ বিষয়টি জানতে পেরে তাকে বন্দি করেন। পরবর্তী সময়ে কবি নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হওয়ায় তাকে আবার মুক্ত করে দেন।[৩] কবির এই মিথ্যা দাবির কারণেই তাঁকে আল-মুতানাব্বী (নবিত্বের দাবিদার) নামে আখ্যায়িত করা হয় এবং এ নামেই তিনি অধিক পরিচিত।[৪]

কবি আল-মুতানাব্বীকে আরবী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে গণ্য করা হয়। তাঁর অধিকাংশ কাব্য তাঁর জীবনকালে সাক্ষাৎ পাওয়া নেতা ও শাসকদের প্রশংসা করে লেখা।[৫] কারো কারো মতে, তাঁর ৩২৬টি কবিতা তাঁর জীবনের প্রতিচ্ছবি হিসেবে রচিত হয়েছে। নয় বছর বয়সে তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও রসবোধের জন্য তিনি পরিচিত। তাঁর কবিতার আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে

---

[1] . আবদুর রহমান আল-বারকূকী, *শারহু দীওয়ান আল-মুতানাব্বী*, বৈরুত : দারুল কিতাব আল-আরবী, ২০০৭, খ. ১, পৃ. ২১৭।

[2] . ড. মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী, *প্রাচীন আরবী কবিতা: ইতিহাস ও সংকলন*, (আহমাদিয়া প্রিন্টিং প্রেস, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, দ্বিতীয় সং. জানু. ২০১৯), পৃ ৬৫৭।

[3] . আবুল বাকা' আবদুল্লাহ ইব্নে হুসাইন ইব্নে আবদুল্লাহ আল-বাগদাদী, *শরহু দেওয়ানিল মুতানাব্বী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭, দারুল মা'রেফাহ, বৈরুত, ৫৯৮ হি.।

[4] . ইয়াকূত আর-রূমী, *মুজামুল উদাবা*, পঞ্চম খণ্ড, (বৈরুত : দারুল ফিক্র, বি.টি), পৃ.২৩৯।

[5] . আবদুর রহমান আল-বারকূকী, *শারহু দীওয়ান আল-মুতানাব্বী*, বৈরুত: দারুল কিতাব আল-আরবী, ২০০৭, খ. ১, পৃ. ২১৮।

প্রশংসা, বদনাম, সাহস, জীবনদর্শন ও যুদ্ধের বর্ণনা। তাঁর অনেক কবিতা তৎকালীন এবং বর্তমান আরব বিশ্বেও বিস্তৃত ও সমাদৃত। তাঁর কবিতাকে প্রবাদতুল্য গণ্য করা হয়। তাঁর একটি বিখ্যাত উক্তি হলো, "সিংহের দাঁত দেখা গেলে ভেবো না সিংহটি হাসছে।"

আল-মুতানাব্বী ছিলেন একজন ভাবকবি। তিনি কাব্য ও দর্শনের মাঝে সমন্বয় সাধন করেছেন। কবিতাকে আবু তাম্মাম ও তাঁর মতালম্বীদের বন্ধন থেকে মুক্ত করেছেন। কাব্যিক রচনাশৈলীর ক্ষেত্রে আরবীয় সনাতন পদ্ধতি পরিহার করেছেন। তিনি ছিলেন আরবী কাব্যে এক অভিনব পদ্ধতির অগ্রপথিক।[৬] কবিতায় ব্যাপকহারে তিনি প্রবাদের যোগ ঘটিয়েছেন। তিনি যুদ্ধের বর্ণনায় অভিনবত্ব আনয়ন করেন এবং প্রশংসা ও নিন্দা উভয় ক্ষেত্রেই নতুনত্বের ধারা প্রবর্তন করেন। তাঁর কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট হলো ব্যক্তিত্বের ছাপ, মানুষের মনস্তত্ত্ব এবং ইচ্ছার নিখুঁত চিত্রায়ন এবং জীবনের উদ্দেশ্যাবলির বিবরণ প্রদান। এই সকল কাব্যিক গুণাবলি তাঁকে আব্বাসী যুগের শ্রেষ্ঠ কবির আসনে সমাসীন করেছে।[৭]

অধিকাংশ কবি, সাহিত্যিক ও পণ্ডিতবর্গের মন্তব্য হচ্ছে, দোষে-গুণেই মানুষ। তবে কবি আল-মুতানাব্বীর কবিতায় ভুলত্রুটি সীমিত এবং সৌন্দর্য অগণিত। সমসাময়িক কবি ও আরব কবিদের মধ্যে মুতানাব্বী এক অনন্য ও অসাধারণ প্রতিভা হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত। তিনি জাদুকরী ভাষায় কবিতা লিখতেন। তিনি চিন্তাধারাকে সমতুল্য কাব্যে, উপমাগুলোকে এক ও অভিন্নরূপে এবং উৎপ্রেক্ষাগুলোকে সংক্ষিপ্ত অথচ মিলযুক্ত শব্দে প্রকাশ করেছেন। তাঁর অধিকাংশ কাব্য তাঁর জীবনকালে সাক্ষাৎ পাওয়া নেতা ও শাসকদের প্রশংসা করে লেখা। তিনি প্রেমাস্পদের প্রশংসায় একই কথা দ্বারা দুটো দিকে ইঙ্গিত করে কবিতা লিখতেন। অতএব, তাঁর কবিতা থেকে আমাদের অনেক কিছু জানার ও শেখার আছে।[৮]

অপরদিকে আরবী সাহিত্যের এক জন্মান্ধ কবি বাশ্শার ইব্ন বুর্দ (৭১৪-৭৮৪ খ্রি.)। আব্বাসীয় যুগের প্রারম্ভিক কালের সংস্কারপন্থি কবিদের অগ্রদূত, ক্লাসিক্যালোত্তর সৃষ্টিশীল কাব্য সাহিত্যের প্রথম দ্রষ্টা ও অনন্য প্রতিভার অধিকারী কবি বাশ্শার ইব্ন বুর্দ। উমাইয়া (৬৫১-৭৫০ খ্রি.) ও আব্বাসীয় (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) উভয় যুগই তিনি পেয়েছেন, তবে আব্বাসীয় যুগেই তাঁর কাব্য প্রতিভার বিকাশ ঘটে এবং

---

[6] . আহমদ হাসান আয্-যয়্যাত, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, বৈরুত, দারুল মা'আরিফ, ১৯৯৩ খ্রি.,পৃ ২১৯।

[7] . *দীওয়ানু আল-মুতানাব্বী*, ই'যায আলী সম্পা., করাচি; মাকতাবাতুল বুশরা, ১ম সং, ২০১১, পৃ. ২৯৮।

[8] . ড. মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী, *প্রাচীন আরবী কবিতা: ইতিহাস ও সংকলন*, আহমাদিয়া প্রিন্টিং প্রেস, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, দ্বিতীয় সং. জানু. ২০১৯, পৃ ৬৬৭।

প্রচার ও প্রসার লাভ করে। আজন্ম অন্ধ হয়েও গজল, হিজা, মাদাহ, হিকমাত, মারছিয়াসহ কাব্যের প্রায় সকল শাখায় তাঁর স্বচ্ছন্দ পদচারণা ছিল অভাবনীয়।

জীবনের প্রথম দিকে মু'তাজিলা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ওয়াসিল ইব্ন আতার (মৃ. ৭৪৮ খ্রি./১৩১ হি.) সাথে কবির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং তাঁর মতাদর্শে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে কবি বাশ্শার নৈরাশ্যবাদী দর্শনের প্রবক্তা ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষের ইচ্ছাশক্তি বলতে কিছুই নেই। তিনি বলেন–

بعت على ما فى غير مخير هواى * و لو خيرت كنت المهذبا

أريد فلا أعطى و أعطى ولم أرذ * قصر علمى أن أنال المغيبا

"আমার যাবতীয় স্বভাব আচরণ আমার ইচ্ছাবিহীন আমার ওপর আরোপিত বিষয়,

যদি আমাকে ইচ্ছাশক্তি দান করা হতো তাহলে আমি মার্জিত সুসভ্য লোকে পরিণত হতাম।

আমি যা চাই তা আমাকে প্রদান করা হয় না, আবার যা চাই না তাই দান করা হয়,

এই অদৃশ্য বিষয় হৃদয়ঙ্গম করতে আমার জ্ঞান অক্ষম।"[৯]

উপরোক্ত পঙ্‌ক্তিদ্বয় দ্বারা কবির জাবারিয়া দর্শনের প্রতি দুর্বলতা প্রতীয়মান হয়। কখনো মনে হয় যে, তিনি দোদুল্যমান ছিলেন। আবার সুবিধাবাদী হিসেবে প্রায়ই মনের আসল খবর গোপন রাখতেন। পারসিক ধর্ম অগ্নিপূজার প্রতিও তাঁর আগ্রহ দেখা যায় এবং আগুনকে মাটির ওপর প্রাধান্যদান করার চেষ্টা করেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর কবিতা–

الأرض مظلمة والنار مشرقة * والنار معبودة مذ كانت النار

"মাটি অন্ধকারময়, আগুন আলোকিত, আর আগুন সৃষ্টিলগ্ন থেকেই পূজনীয়।"[১০]

সার্বিকভাবে পর্যালোচনা করলে বাশ্শারের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি দুর্বোধ্যই মনে হয়। উপর্যুক্ত নানা কারণে তাঁর সাথে ওয়াসিল ইব্ন আতার সম্পর্কচ্ছেদ ঘটে এবং ক্ষমতাসীন শাসকবর্গ ও সাধারণ মুসলমানদের বিরাগভাজন হন।

কবি বাশ্শারের মধ্যে জাত্যাভিমান ছিল প্রচণ্ড। আরবীয় পরিবেশে তিনি বেড়ে উঠলেও পারসিক বংশোদ্ভূত হওয়াতে তাঁর কবিতায় আরবদেরকে তুচ্ছ প্রতিপন্ন করার এবং পারস্যদের মর্যাদা ঊর্ধ্বে তুলে ধরার প্রয়াস লক্ষ করা যায়।[১১] এর সঠিক চিত্র কবি বাশ্শারের নিম্নোক্ত কবিতায় আমরা প্রত্যক্ষ করি।

هل من رسول مخبر * عنى جميع العرب

من كان حيا منهم * ومن ثوى فى الترب

---

[9] . জুরজী যায়দান, *তারিখু আ'দাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ*, ২য় খণ্ড, বৈরুত : দারু মাকতাবাতিল হায়াত, ১৯৭৩, পৃ. ৫৬।

[10] . আবুল ফারাজ আল-আস্পাহানী, *কিতাবুল আগানী*, খ. ৩, পৃ. ১৩৭।

[11] . মুসা আনসারী, *মধ্যযুগের মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি*, বা/এ, ঢাকা : ১৯৯৯, পৃ. ৩৬০।

بأننى ذو حسب * عال على ذى الحسب

جدى الذى أسمو به * كسرى و ساسان أبى

"জীবিত মৃত সকল আরবকে আমার পক্ষ থেকে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার কোনো সংবাদবাহক আছে কি?

আমি তো অনেক উচ্চ বংশীয় এবং অভিজাত। আমার পিতা রোমক সম্রাট আর আমার দাদা পারস্য সম্রাট, যাদের নিয়ে আমি গর্ব করি।"[১২]

সেসময় ধূর্ত বুদ্ধিজীবীরা আরবীয়দের বিরুদ্ধে স্থূল বিপ্লবের পরিবর্তে সাহিত্যিক ও বুদ্ধিভিত্তিক আক্রমণ পরিচালনা করত। আরবী কাব্যচর্চাকারী অনারব বংশোদ্ভূত কবিদের একদল পারসিক বংশ ও জাতীয়তার মহিমা কীর্তন করে প্রচুর কবিতা রচনা করেছিলেন। আর এই বিশেষ কাব্য ধারার সূচনা হয়েছিল কবি বাশ্‌শার ইব্‌ন বুরদের হাতেই।

আব্বাসীয় যুগ (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) হচ্ছে আরবীয় সভ্যতার সমৃদ্ধির যুগ। এ যুগকে আরবী সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়। এ যুগে আরবী কবিতা বিদেশি সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরশ পেয়ে উন্নতি ও সমৃদ্ধির স্বর্ণ শিখরে পৌঁছে। পূর্ববর্তী তিনটি আমলের (জাহেলি, ইসলামি ও উমাইয়া) কবিতায় যেখানে বেদুইন জীবনবোধের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়, কবিগণ তাঁদের বৈচিত্র্যময় বর্ণনায় ব্যবহার করেছেন বেদুইন ভাষা, শহরে বসেও তাঁরা স্বপ্ন দেখেছেন বেদুইন জীবনের, সেখানে এ আমলে কবিতা বেদুইন জীবনের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে নগর জীবনে পদার্পণ করে এবং মরুভূমির শুষ্ক জীবনের চর্বিত চর্বণ ছেড়ে দরবারমুখী হয়। এখানে নীরস ও আড়ম্বরমুক্ত একগুঁয়ে বেদুইন জীবনবোধের চাইতে আন্তর্জাতিকতাবোধ, চিত্তবিনোদন আর বিলাস বৈভবেরই প্রাধান্য ছিল। তাই কবিরাও স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের কবিতায় এসব বিষয়কে স্বাগত জানাল, যা আমরা বাশ্‌শারের কবিতায় প্রত্যক্ষ করি।[১৩]

আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলিম সাম্রাজ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজ করলেও পরবর্তীকালে সর্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসে। ক্রমে সমাজে বৈষয়িক প্রাচুর্যের প্রবাহ লক্ষ করা যায়। ফলে মুসলিম সাম্রাজ্যে অনেক ক্ষেত্রে পরকাল বিবর্জিত বৈষয়িক ভোগবিলাস পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক স্থিতিশীলতার সুবাদে সাম্রাজ্যের সকল অঞ্চলের অধিবাসীদের পারস্পরিক মেলামেশা ও ঘনিষ্ঠতার কারণে মুসলিম সাম্রাজ্যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি উন্নতরূপ পরিগ্রহ করে। খলিফা ও শাসকদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা এবং কবি-সাহিত্যিকদের ঐকান্তিক সাধনা সভ্যতা ও সংস্কৃতির এই

---

[12] . বাশ্‌শার ইব্‌নে বুর্‌দ, *দীওয়ানু বাশ্‌শার ইব্‌নে বুর্‌দ*, মাহদী মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন সম্পা., বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯৩, পৃ. ১৮১।

[13] . গোলাম সামদানী কোরায়শী, *আরবী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, বা/এ, ঢাকা : ১৯৭৭, পৃ. ৮৬।

বিকাশধারাকে আরও ত্বরান্বিত করে। এভাবে আব্বাসীয় যুগে বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনধারার সূচনা হয়।[১৪] নানা জাতি ও জনগোষ্ঠীর বিচিত্র সংস্কৃতি ও লোকাচারের প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিল এই জীবন। এই নবজীবনের চিত্রায়ণ আব্বাসীয় আমলের প্রারম্ভিককালে যে কজন কবি তাঁদের কাব্যে চিত্রিত করেছেন, তাঁদের সকলের অগ্রদূত হচ্ছেন কবি বাশ্‌শার ইব্‌ন বুর্‌দ।

গজল, হিজা, মাদাহ, হিকমাত, মারছিয়া তথা শোকগাথাসহ তৎকালীন কাব্যজগতের প্রায় সকল শাখায় কবি বাশ্‌শার ইব্‌ন বুর্‌দের স্বচ্ছন্দ পদচারণা ছিল। তবে প্রথমোক্ত তিনটি বিষয়ে (গজল, হিজা, মাদাহ) তিনি সমধিক কবিতা রচনা করে কাব্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। বাশ্‌শারের রচনাবলির বৃহদাংশ সংরক্ষণের অভাবে কালের অতল গহ্বরে হারিয়ে গেছে। ঐতিহাসিক জুরজী যায়দান কবি রচিত কাসিদার সংখ্যা প্রায় ১২ হাজার বলে উল্লেখ করেছেন।[১৫] এ প্রসঙ্গে কবি নিজেই দাবি করে বলেন–

لى إثنا عشر ألف بيت جيدة فقيل له كيف ؟ قال : لى إثنتا عشرة ألف قصيدة أما فى كل قصيدة منها بيت جيدا -

"আমার স্বরচিত ১২ হাজার উঁচুমানের কাব্য চরণ রয়েছে। কবিকে জিজ্ঞেস করা হলো, এ কী করে সম্ভব? প্রত্যুত্তরে কবি বলেন, আমার ১২ হাজার কাসিদা রয়েছে। প্রতি কাসিদায় একটি করেও কি উত্তম পঙ্‌ক্তি নেই!"[১৬]

তৎকালীন প্রসিদ্ধ আরবী ব্যাকরণবিদগণ বিশেষত সীব্‌ওয়ায়হ (৭৬০-৭৯৬ খ্রি.)[১৭] ও আল-আখফাশ (৭৫৫-৮৩০ খ্রি.)[১৮] কবি বাশ্‌শারের কবিতা উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করতেন। বর্তমানে কবির রচনাবলি হতে যা আমরা প্রাপ্ত হয়েছি তা তাঁর বিশাল কীর্তির কিয়দাংশ মাত্র। 'কিতাবুল আগানী' রচয়িতা কবির জীবনবৃত্তান্ত ও সামান্যসংখ্যক কবিতা সংকলন না করলে বাশ্‌শারের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কাব্যমালা আমাদের হস্তগত হতো না।[১৯]

---

14 . আ.ক.ম আবদুল কাদের ও মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ, *আবু নওয়াসে কাব্যধারা*, চ.বি. স্টাডিজ (কলা অনুষদ). একাদশ খণ্ড, জুন ১৯৯৫, পৃ. ৫৭।

15 . জুরজী যায়দান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।

16 . আবুল ফারাজ আল-আস্পাহানী, *কিতাবুল আগানী*, খ. ৩, পৃ. ১৩৭।

17 . তাঁর পুরো নাম আবু বিশর আমর ইব্‌নে ওসমান ইব্‌নে কানবার আল-বসরী। তিনি সাধারণত সীব্‌ওয়ায়হ নামে পরিচিত। তিনি ছিলেন আরবী ভাষার একজন প্রভাবশালী ভাষাবিদ ও ব্যাকরণবিদ। তাঁর লিখিত 'আল-কিতাব' আরবি ভাষার প্রথম লিখিত ব্যাকরণ। তিনি ৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭৯৬ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

18 . তাঁর নাম আবুল হাসান সাঈদ ইব্‌নে আল-বলখি আল-বসরী। তিনি ছিলেন একজন বড়ো মাপের জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তি। বাকপটুতায় তিনি ছিলেন যুগের সেরা। তিনি মানুষকে অপর আরবি ব্যাকরণবিদ সীবওয়ায়হইয়ের বই পড়তে বলতেন। মানুষ তাঁর নিকট কুরআনিক ব্যাকরণ শিখতে ও জানতে আসতেন। তিনি ৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

19 . বুতরুস আল-বুস্তানী, *উদাবা' উল আরব*, দারল জীল, বৈরুত, তা.বি., খ. ২, পৃ. ৪৬।

বাশ্‌শারের কবিতায় আমরা তাঁর প্রখর মেধা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সরল অনুভূতিশীলতার পরিচয় পাই। তাঁর কবিতায় একদিকে যেমন প্রাচীনত্বের চাপ রয়েছে তেমনি বস্তুর উপমা উপস্থাপনায়, মননশীলতা ও সূক্ষ্ম অনুভূতির বর্ণনায় ও নগর জীবনের চিত্রায়ণে আধুনিক চিন্তাচেতনা পরিলক্ষিত হয়। তিনিই প্রথম ব্যক্তিত্ব, যাঁর কবিতায় আরবদের ঐতিহ্যগত তেজস্বিতা ও আধুনিকপন্থিদের সৌকুমার্যের সংমিশ্রণ ঘটে। এ প্রসঙ্গে হান্না আল-ফাখূরী বলেন–

وهو يعد صلة بين الشعر القديم والشعر الحديث

"কবি বাশ্‌শারকে প্রাচীন ও আধুনিক কবিতার মাঝে সেতুবন্ধন রচনাকারী হিসেবে গণ্য করা যায়।"[২০]

বাস্তবেই তাঁর কবিতা খেয়াঘাটস্বরূপ, যার ওপর দিয়ে কাব্যশিল্প যাযাবর জীবনের কুটীর হতে নগর জীবনের প্রাসাদের দিকে পাড়ি জমিয়েছে। আব্বাসীয় যুগের কবিদের জন্য তিনি কাব্যাঙ্গনে মৌলিকত্ব আনয়ন ও বৈচিত্র্য সাধনের পথ সুগম করে দিয়েছেন; কবিতায় নতুনত্বের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন। জাহিলি যুগের কাব্যে ইমরুল কায়সের যে স্থান ছিল, আব্বাসীয় যুগে বাশ্‌শার ইব্‌ন বুর্‌দেরও ছিল সেই স্থান। কবিতার গঠন ও আকৃতির দিক থেকে তিনি জাহিলি কবিদের অনুসারী হলেও ভাব ও মর্মে তিনি এক নতুন পথের পথিকৃত।[২১]

বাশ্‌শারের জীবনালেখ্য ও কাব্যজগৎ পর্যালোচনায় এটি সুস্পষ্ট হয় যে, তিনি অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগতেন। জীবনে কোনো বিষয়কেই তিনি সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি। আর তাঁর এই অন্তর্জালা ও মর্মদাহের স্বরূপ আমরা তাঁর রচনাবলিতে দেখতে পাই। বাশ্‌শারের হিজা কবিতা ছিল তাঁর স্বভাব উৎসারিত। প্রশংসাগীতিকে তিনি আর্থিক স্বার্থসিদ্ধির অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। আর তাঁর গজল রচনার উদ্দেশ্য ছিল জৈবিক চাহিদা পূরণ এবং এতে তাঁর নির্লজ্জ চরিত্র ফুটে উঠেছে। তার ভালোবাসা ছিল উদ্ভূত। তিনি তার প্রিয়সী উবায়দাকে গভীর ভালোবাসার কথা কবিতার মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। প্রিয়সীর প্রতি কবির ভালোবাসা তার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।[২২] এ প্রেক্ষিতে রচিত তার কবিতার কতিপয় চরণ নিম্নরূপ–

طالَ لَيلي مِن حُبِّ * مَن لا أَراهُ مُقارِبي

أَبَداً ما بَدا * لِعَينِكَ ضَوءُ الكَواكِبِ

أَو تَغَنَّت قَصيدَةً * قَينَةٌ عِندَ شارِبِ

20 . হান্না আল-ফাখূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫।
21 . *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ১৬ (১ম ভাগ), পৃ. ১০৮-১০৯।
22 . হান্না আল-ফাখূরী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৯৬।

فَتَعَزَّيتُ عَن عُبَي * دَةَ وَالحُبُّ غالِبي

تِلكَ لَو بيعَ حُبُّها * اِبتَعتُهُ بِالحَرائِبِ

وَلَوِ اِسطَعتُ طائِعاً * في الأُمورِ النَوائِبِ

لَفَداها مِنَ الرَدى * هارِبي بَعدَ قارِبي

عَتَبَت خُلَّتي وَذو ال * حُبِّ جَمُّ المَعاتِبِ

مِن حَديثٍ نَمى إِلَي * ها بِهِ قَولُ كاذِبِ

فَتَقَلَّبتُ ساهِراً * مُقشَعِرَّ الذَوائِبِ

عَجَباً مِن صُدودِها * وَالهَوى ذو عَجائِبِ

وَلَقَد قُلتُ وَالدُمو * عُ لِباسُ التَرائِبِ

لَو بَدا اليَأسُ مِن عُبَي * دَةَ قَد قامَ نادِبي

عَبدَ بِاللَهِ أَطلِقي * مِن عَذابٍ مُواصِبِ

رَجُلاً كانَ قَبلَكُم * راهِباً أَو كَراهِبِ

يَسهَرُ اللَيلَ كُلَّهُ * نَظَراً في العَواقِبِ

فَثَناهُ عَنِ العِبا * دَةِ وَجدٌ بِكاعِبِ

شَغَلَتهُ بِحُبِّها * عَن حِسابِ المُحاسِبِ

عاشِقٌ لَيسَ قَلبُهُ * مِن هَواها بِتائِبِ

يَشتَكي مِن فُؤادِهِ * مِثلَ لَسعِ العَقارِبِ

وَكَذاكَ المُحِبُّ يَل * قى بِذِكرِ الحَبائِبِ

وَلَقَد خِفتُ أَن يَرو * حَ بِنَعشي أَقارِبي

عاجِلاً قَبلَ أَن أَرى * فيكُمُ لينَ جانِبِ

فَإِذا ما سَمِعتُ با * كِيَةً مِن قَرائِبي

نَدَبَت في المُسَلِّبا * تِ قَتيلَ الكَواعِبِ

فَاِعلَمي أَنَّ حُبَّكُم * قادَني لِلمَعاطِبِ

অর্থ :

১. যাকে কাছে আসার কোনো সম্ভাবনা দেখছি না, তার ভালোবাসায় আমার রাত (অনিদ্রায়) দীর্ঘায়িত হয়েছে।

২. কখনো না। তোমার চোখে যা ভাসছে, তা তারকারাজির জ্যোতি।

৩. কিংবা কোনো যুবতি গায়িকা যে মদ্যপায়ীর পাশে বসে গান করে।

৪. সুতরাং আমি উবায়দাকে নিয়ে সান্ত্বনা লাভ করলাম এবং ভালোবাসা আমার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করলো।

৫. যদি তার ভালোবাসা বিক্রয় হতো তবে আমি প্রচুর সম্পদ দিয়ে তা ক্রয় করে নিতাম।

৬. যদি এই মহাবিষয়ে আমার সামর্থ্য থাকত,

৭. তবে আমি যেকোনো মূল্যে তাকে বিনাশ হতে মুক্তি দিতাম।

৮. আমার প্রেমিকা এবং প্রিয় ব্যক্তি আমাকে আচ্ছামতো বকা দিলো।

৯. এক মিথ্যাবাদীর বক্তব্য তার প্রেমিকার কাছে পৌঁছানোর কারণে,

১০. সুতরাং আমি উসখুসে চুল নিয়ে নিদ্রাহীনভাবে দুলতে থাকলাম,

১১. তার প্রত্যাখ্যানে বিস্ময় বোধ করে। আসলে ভালোবাসা এক উদ্ভুত বস্তু।

১২. অথচ আমি বলেছিলাম, তখন আমার আবক্ষ অশ্রু ঝরছিল,

১৩. উবায়দার ভালোবাসা হতে আমি যদি নিরাশ হই, তখন আমার মৃত্যুর জন্য বিলাপকারী প্রস্তুত হয়ে যাবে (নির্ঘাত আমার মৃত্যু হবে)।

১৪. ওহে আবদা! আল্লাহর দোহাই, জনম জনম শান্তি প্রদান হতে তুমি আমাকে মুক্তি দাও।

১৫. ইতোপূর্বে কোনো একব্যক্তি সন্ন্যাসী কিংবা সন্ন্যাসীর মতো (সংসারবিরাগী) ছিল।

১৬. (পরকালীন) পরিণতির কথা চিন্তা করে সারা রাত সে (ইবাদতে) বিনিদ্র সময় কাটাত।

১৭. তবে (একসময় প্রেমে পড়ে) সমুন্নত স্তনের এক যুবতি তাকে ইবাদত হতে নিবৃত্ত করল।

১৮. যুবতির ভালোবাসা তাকে মহাহিসাব গ্রহণকারীর (আল্লাহর) হিসাবের চিন্তা হতে বিমুখ করল।

১৯. সে এমন প্রেমিক হয়ে গেল যে, প্রেমিকার ভালোবাসা হতে তার অন্তর আর ফিরে আসে না।

২০. বিচ্ছুর দংশনের মতো সে অন্তরে (প্রেমিকার জন্য) ব্যথা অনুভব করে।

২১. তেমনিভাবে একজন প্রেমিক প্রেমিকার স্মরণে যাতনা উপলব্ধি করে।

২২. আমার ভয় হয় যে, আমার নিকটাত্মীয়রা আমার লাশ বহন করে নিয়ে যাবে।

২৩. অতি শীঘ্রই, তোমার পক্ষ হতে সহমর্মিতা প্রদর্শনের আগেই।

২৪. সুতরাং তুমি যখন আমার কোনো আত্মীয়কে কাঁদতে শুনবে,

২৫. তখন (বুঝে নেবে যে,) সে তরুণী কর্তৃক নিহত ব্যক্তির জন্য কফিন পরিধানকারিণীদের মাঝে বিলাপ করছে।

২৬. সুতরাং জেনে রাখো, একমাত্র তোমার ভালোবাসাই আমাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

উল্লিখিত কবিতামালার মাধ্যমে কবি বাশ্‌শার তার প্রিয়সী উবায়দাকে গভীর ভালোবাসার কথা ব্যক্ত করেছেন। কবি বলেছেন, প্রিয়সীর প্রতি ভালোবাসা তার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। যদি তার ভালোবাসা বিক্রি হতো তাহলে আমি প্রচুর সম্পদ দিয়ে হলেও তা ক্রয় করে নিতাম। আমি তাকে এত ভালোবাসি যে, সে যদি আমাকে নিরাশ করে তাহলে মৃত্যু ছাড়া আমার গত্যন্তর নেই। এভাবে কবি তার প্রেমিকা উবায়দার এমন এক প্রেমিক হয়ে গেল যে, প্রেমিকার ভালোবাসা হতে তার অন্তর আর ফিরে আসে না। শয়নে-স্বপনে শুধু তাকে নিয়েই তার ভাবনা।

কবি বাশ্‌শারের স্বভাবের নীচতার কারণে তাঁর মধ্যে সাহিত্যিক উন্নাসিকতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু গতানুগতিক কাব্যধারার নাগপাশ থেকে বেরিয়ে তিনিই প্রথম কবিতার জগতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করে যথেচ্ছ বিচরণ করে গেছেন; যা পরবর্তী কবিদের জন্য পথনির্দেশক হিসেবে আলোকবর্তিকার কাজ করেছে। ঐতিহাসিক হান্না আল-ফাখূরী যথার্থই মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন–

وقد عد بشار بحق خاتمة الشعراء الأقدمين و فاتحة الشعراء المحدثين -

"সত্যিকার অর্থে বাশ্‌শারকে দিয়েই প্রাচীনপন্থি কবিদের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং নব্যপন্থি কবিদের সূত্রপাত হয়।"[২৩] এদিক থেকে বাংলা সাহিত্যের ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১২-১৮৫৯ খ্রি.) ন্যায় বাশ্‌শার ইব্‌ন বুর্‌দকে আমরা আরবী সাহিত্যের "যুগসন্ধিক্ষণের কবি" বলে আখ্যায়িত করতে পারি।

এককথায়, কাব্য রচনার ক্ষেত্রে জাহেলি যুগে যে সমস্ত নিয়ম-কানুন চলে আসছিল, বাশ্‌শার ইব্‌ন বুর্‌দ কবিতা রচনার ক্ষেত্রে সেই নিয়ম পরিবর্তন করে একটা নতুন ধারার প্রবর্তন করেন। কিন্তু তিনি এতে

[23] . হান্না আল-ফাখূরী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৯৫।

একেবারে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারেননি। অতঃপর আল-মুতানাব্বী এ ধারার পূর্ণতা দান করেন। প্রাচীন আরবী কবিতায় সত্য ঘটনা বর্ণনা করা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। কল্পনার কোনো স্থান তাদের মাঝে ছিল না। বাশ্‌শার ইব্‌ন বুর্‌দ এ নীতির পরিবর্তন ঘটান আর আল-মুতানাব্বী এর চূড়ান্ত রূপ এমনভাবে দান করেন, যার পরে আর কিছু অবশিষ্ট থাকেনি।[২৪]

[24] . ড. মুহাম্মদ নিজামুদ্দিন, আবু তাইয়্যিব আল-মুতানাব্বী; *হায়াতুহু ওয়া শা'য়েরিয়্যাতুহু*, মারকাযুল বুহুস আল-ইসলামিয়্যাহ, রাজশাহী, ২০০৮, পৃ. ১৫ ।

২য় পরিচ্ছেদ
আল্-মুতানাব্বী ও আবু নুয়াস

শৈশবকাল থেকেই আব্বাসীয় কবি আল্-মুতানাব্বীর মেধা ও কাব্য প্রতিভার স্ফুরণ লক্ষ করা যায়। বিদ্যানুরাগ নিয়েই তৎকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু কুফা নগরীতে কবি বেড়ে ওঠেন। যেখানে ছিলেন ভাষাতাত্ত্বিক ও প্রাচীন অভিধানপ্রণেতা আবু বকর মুহাম্মদ ইব্ন দুরায়দ (মৃ. ৯৩৩ খ্রি./৩২১ হি.) ও আবুল কাসিম উমার ইব্ন সায়ফ আল-বাগদাদীর মতো প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গ। এসব মহৎ ব্যক্তির সান্নিধ্য আল্-মুতানাব্বীকে একজন যুগসেরা কবি হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।[২৫] উপরন্তু কবি ছিলেন প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী; যেকোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে প্রাচীন আরবী গদ্য বা কবিতা হতে উদাহরণ পেশ করে তা উপস্থাপন করতেন।[২৬]

কবি আল-মুতানাব্বী ছিলেন ভাবের কবি; শব্দের দিকে বেশি ভ্রুক্ষেপ না করে অর্থের প্রতিই সজাগ দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন তিনি। কবিতায় কাব্য ও দর্শনের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। আরবী কবিতাকে আবু তাম্মাম যেসব শর্তে গণ্ডিবদ্ধ করেছেন এবং অলংকারবিদরা যে সাজসজ্জার প্রলেপ মেখেছেন, তা হতে তিনি একে মুক্তি দিয়েছেন। আরবদের গতানুগতিক রীতিনীতি হতে তিনি বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। আল-মুতানাব্বীকে আরবী কবিতায় সংস্কার আন্দোলনের প্রবর্তক বলা যায়। তাঁর কবিতায় প্রবাদ ও নীতিবাক্যের সমাহার লক্ষ করা যায়। যুদ্ধের অভিনব বর্ণনা, চমৎকার উপমা উৎপ্রেক্ষা, একই পঙ্‌ক্তিতে দুই উপমার ব্যবহার, রূপকের অসাধারণ প্রয়োগে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কবিতায় স্বীয় ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদাকে তুলে ধরতে এবং স্বাধীন মত প্রকাশে আত্মনিষ্ঠ হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁকে অতুলনীয় বলতে হবে।[২৭]

কবি আল্-মুতানাব্বীর কবিতায় জনপরিবেশের প্রভাব লক্ষ করা যায়। হিজরি ৪র্থ শতাব্দীর গণমানুষের সার্বিক অবস্থা তাঁর কবিতায় চিত্রায়িত হয়েছে। একইভাবে কবির মানসিক অস্থিরতা, তীক্ষ্ণ মেজাজ ও কঠিন স্বভাবও যথার্থভাবে প্রতিবিম্ব হয়েছে এতে। শৈশব হতে কবি যে পরিবেশে লালিত-পালিত হয়েছেন তাতে কেবল তরবারির ঝনঝনানিই শুনতে পেয়েছিলেন; আরব সাম্রাজ্য তখন ভাঙন ও বিভক্তির মুখে খণ্ডরাজ্যের রূপধারণ করে। মুসলমান ও রোমকদের মাঝে সংঘটিত বহু যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী কবি

---

25 . মুহাম্মদ ইউসুফ ফার্‌বান, *আবুত্ ত্বায়্যিব আল-মুতানাব্বী নাশীদুস সাহ্‌রা আল-খালিদ*, ১ম সং, বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯০, পৃ. ৩৩-৩৪।

26 . আহমাদ আল-ইসকান্দী ও মোস্তফা আনানী, *আল-মুফাস্‌সাল ফী তারীখিল আদাবিল আরবী*, ড. হাস্‌আন হাল্লাক সম্পা., বৈরুত : দারু ইহ্‌য়াইল উলূম, ১৯৯৪, পৃ. ২৭২।

27 . আহমদ হাসান আয্-যয়্যাত, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, বৈরুত, দারুল মা'আরিফ, ১৯৯৩ খ্রি.,পৃ ২১৯।

আল-মুতানাব্বী। তখন তিনি ছিলেন সাইফুদ্দৌলার একান্ত সহচর। ফলে যুদ্ধের বর্ণনা, বর্শা ও তরবরির আঘাতের আওয়ায সুনিপুণভাবে অনুরণিত হয়েছে তাঁর লেখনীতে; এবং এই শিল্পে তথা যুদ্ধের শৈল্পিক বর্ণনায় সমসাময়িক অপরাপর কবিকে ছাড়িয়ে গেছেন কবি আল্-মুতানাব্বী।[২৮]

আর অপরদিকে আব্বাসীয় খিলাফতের প্রারম্ভিক পর্বে যখন বিলাসিতা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও অনৈতিকতার সয়লাব চলছিল, ঠিক তখনই কবি আবু নুয়াস (১৪৫-১৯৯ হি./৭৬২-৮১৫ খ্রি.)-এর আবির্ভাব ঘটে। বসরা, কুফা ও বাগদাদের প্রধান প্রধান বিনোদনকেন্দ্র ও মদ্যশালাগুলো ছিল কবির বিচরণক্ষেত্র। ফলে একদিকে যেমন কবি অতিমাত্রায় মদ্যাসক্ত হয়ে পড়েন, অপরদিকে কবির মধ্যে ধর্মীয় অনুশাসনের ভিত একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ে। স্বভাবতই এসবের প্রভাব আবু নুয়াসের কবিতায় দেদীপ্যমান।[২৯]

কবি নিজের কবিতাকে বাস্তব জীবনের সঠিক প্রতিচ্ছবি হিসেবে দাঁড় করানোর প্রয়াস পেয়েছেন। সাহিত্য ও বাস্তবতার মাঝে তিনি কোনো দেয়াল নির্মাণের চেষ্টা করেননি, কোনো রাখঢাক রাখেননি, যেমনটি তাঁর পূর্ববর্তী অধিকাংশ কবি করে গিয়েছেন। ফলে আমোদ-ফুর্তি ও মদ্যপানের কথা কবি খোলাখুলি তাঁর লেখনীতে আলোচনা করেছেন। বিশেষত, মদের বর্ণনায় অন্য কোনো আরব কবি তাঁর সমকক্ষ হতে পারেননি।[৩০]

আবু নুয়াস ধর্ম ও ভোগের মাঝে উদ্ভট সমন্বয় সাধন করেছেন। তাঁর ধর্মদর্শন হচ্ছে, আল্লাহ হলেন উদার ও ক্ষমাশীল; শিরক ব্যতীত তিনি যেকোনো অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন। এই দর্শনের ভিত্তিতে কবি নির্ভয়ে শরিয়ত নিষিদ্ধ অশ্লীল কাজে বেপরোয়াভাবে লিপ্ত হতেন এবং এতে গর্ববোধ করতেন। এমনকি শরাব নিষিদ্ধসংক্রান্ত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিস নিয়ে তিনি নিজ কবিতায় উপহাস করেছেন এবং এক্ষেত্রে নিজেকে শয়তানের অনুসারী হওয়ারও ঘোষণা দিয়েছেন।[৩১] এতৎসংক্রান্ত কবির নিম্নোক্ত কবিতা প্রণিধানযোগ্য।

فقل لمن يدعى فى العلم فلسفة * عرفت شيئا و غابت عنك أشياء

لا تحظر العفو إن كنت امرا حرجا * فإن حظركه فى الدين إزراء

---

28 . আবুল বাকা' আল-আকবারী, *শারহু দীওয়ান আবিত্ ত্বায়্যিব আল-মুতানাব্বী*, মুস্তফা আস্-সাক্কা ও অন্যান্য সম্পা., বৈরুত : দারুল মা'রিফা, তা.বি., ক. ১, পৃ. ওয়া।

29 . ড. মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী, *প্রাচীন আরবী কবিতা : ইতিহাস ও সংকলন*, আহমাদিয়া প্রিন্টিং প্রেস, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, দ্বিতীয় সং. জানু. ২০১৯, পৃ ৫৮৫।

30 . আবদুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৮৭।

31 . কার্ল ব্রুক্যালমান, *তারিখুল আদাবিল আরবী*, খ. ২, পৃ. ২৮।

"যে ব্যক্তি জ্ঞানদর্শনের দাবি করে তুমি তাকে বলে দাও,
তুমি অল্প জেনেছ, তোমার অজানা অনেক কিছু রয়ে গেছে।
(আল্লাহর পক্ষ থেকে) ক্ষমাকে তুমি নিষিদ্ধ করো না;
কেননা, এটি ধর্মে বড়ো অপরাধ।"[৩২]

উল্লেখ্য যে, আবু নুয়াসের কবিতায় যে পাপাচারিতা ও ধর্মহীনতার চর্চা স্থান পেয়েছে, তা সমকালীন বাগদাদ, বাসরা ও কুফার সামগ্রিক চিত্র নয়; বরং কিছু বিলাসী মানুষের খণ্ডচিত্র। কেননা, একই সময়ে এতদঞ্চলে তাফসির, হাদিস, ফিকাহ ও ইসলামি দর্শনের ব্যাপক চর্চা হয়েছিল এবং ইসলামি রেনেঁসার সূত্রপাত হয়েছিল। তবে এত বিশাল সাম্রাজ্যে বিচিত্র জাতির হাজার হাজার নাগরিককে আইনের বলয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা কঠিন বৈকি।[৩৩]

আবু নুয়াস আব্বাসীয় যুগের একজন সব্যসাচী কবি। বহুমাত্রিক কবি হিসেবে তাঁর প্রসিদ্ধি রয়েছে। বেদুইনী রীতি হতে বেরিয়ে এসে তিনি কবিতায় নগররীতি প্রবর্তন করেন। মরুতে অবস্থিত প্রিয়ার পরিত্যক্ত বাস্তুভিটাকে বাদ দিয়ে নগরের মদ্যশালার দিকে আহ্বান জানান তিনি। বেদুইনের রুক্ষ জীবনের চেয়ে নগরবাসীর প্রমোদ জীবন তার কাছে অনেক প্রিয়। এ বিষয়টি কবির নিম্নলিখিত কবিতায় সুন্দরভাবে চিত্রায়িত হয়েছে–

دَعِ الأَطلالَ تَسفيها الجَنوبُ * وَتُبلي عَهدَ جِدَّتِها الخُطوبُ

وَخَلِّ لِراكِبِ الوَجناءِ أَرضاً * تَخُبُّ بِها النَجيبَةُ وَالنَجيبُ

بِلادٌ نَبتُها عُشَرٌ وَطَلحٌ * وَأَكثَرُ صَيدِها ضَبعٌ وَذيبُ

وَلا تَأخُذ عَنِ الأَعرابِ لَهواً * وَلا عَيشاً فَعَيشُهُم جَديبُ

دَعِ الأَلبانَ يَشرَبُها رِجالٌ * رَقيقُ العَيشِ بَينَهُمُ غَريبُ

إِذا رابَ الحَليبُ فَبُل عَلَيهِ * وَلا تُحرَج فَما في ذاكَ حوبُ

---

32 . আবু নুয়াস আল-হাসান ইব্নে হানী, *দীওয়ানু আবী নুয়াস*, আহমাদ আবদুল মাজীদ আল-গাযালী সম্পা., বৈরুত : দারুল কিতাব আল-আরবী, ১৯৮২, পৃ. ৭।

33 . আহমাদ আল-ইসকান্দারী ও অন্যান্য, *আল-মুফাস্সাল ফী তারীখিল আদাবিল আরবী*, ড. হাস্সান হাল্লাক সম্পা., বৈরুত : দারু ইহ্য়াইল উলূম, ১৯৯৪, পৃ. ১৯১।

فَأَطيَبُ مِنهُ صافِيَةٌ شَمولٌ * يَطوفُ بِكَأسِها ساقٍ أَديبُ

أَقامَت حِقبَةً في قَعرِ دَنٍّ * تَفورُ وَما يُحَسُّ لَها لَهيبُ

كَأَنَّ هَديرَها في الدَنِّ يَحكي * قِراةَ القَسِّ قابَلَهُ الصَليبُ

تَمُدُّ بِها إِلَيكَ يَدا غُلامٍ * أَغَنُّ كَأَنَّهُ رَشَأٌ رَبيبُ

غَذَتهُ صَنعَةُ الدِاياتِ حَتّى * زَها فَزَها بِهِ دَلٌّ وَطيبُ

يَجُرُّ لَكَ العِنانَ إِذا حَساها * وَيَفتَحُ عَقدُ تَكَّتِهِ الدَبيبُ

وَإِن جَمَّشتُهُ خَلَبَتكَ مِنهُ * طَرائِفُ تُستَخَفُّ لَها القُلوبُ

يَنوءُ بِرِدفِهِ فَإِذا تَمَشّى * تَثَنّى في غَلائِلِهِ قَضيبُ

يَكادُ مِنَ الدَلالِ إِذا تَثَنّى * عَلَيكَ وَمِن تَساقُطِهِ يَذوبُ

وَأَحمَقَ مِن مُغَيِّبَةٍ تَراءى * إِذا ما اِختانَ لَحظَتَها مُريبُ

أَعاذِلَتي اِقصُري عَن بَعضِ لَومي * فَراجي تَوبَتي عِندي يَخيبُ

تَعيبينَ الذُنوبَ وَأَيُّ حُرٍّ * مِنَ الفِتيانِ لَيسَ لَهُ ذُنوبُ

فَهَذا العَيشُ لا خِيَمُ البَوادي * وَهَذا العَيشُ لا اللَبَنُ الحَليبُ

فَأَينَ البَدوُ مِن إِيوانِ كِسرى * وَأَينَ مِنَ المَيادينِ الزُروبُ

غُرُرتِ بِتَوبَتي وَلَجَجتِ فيها * فَشُقّي اليَومَ جَيبَكِ لا أَتوبُ

<u>অর্থ :</u>

১. প্রিয়ার পরিত্যক্ত বাস্তুভিটাকে তুমি ছাড়ো, যাকে দক্ষিণা হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে গেছে এবং যার ভিটেমাটির যুগ নানা ঘনঘটায় জীর্ণশীর্ণ হয়ে গেছে।

২. উষ্ট্রারোহীর জন্য তুমি ভূমিকে ছেড়ে দাও, যেখানে উন্নত জাতের উট ও উষ্টী দুলকি চালে টলতে পারে।

৩. এমন ভূমি যে ভূমির উদ্ভিদ হচ্ছে বৃহৎ বৃক্ষ ও বাবলা বৃক্ষ এবং যার অধিকাংশ শিকার হচ্ছে হায়েনা ও নেকড়ে বাঘ।

৪. আমোদ-প্রমোদ ও জীবনাচার বেদুইনের কাছ থেকে তুমি গ্রহণ করো না; কেননা তাদের জীবন তো রুক্ষ জীবন।

৫. তুমি সে দুগ্ধকে পরিত্যাগ করো, যাকে পান করে দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিরা, যাদের অধিকাংশ ভবঘুরে।

৬. (উষ্ট্রীর) দুধ যখন দধিতে পরিণত হয় তখন তুমি এতে মূত্র ত্যাগ কর; আর এতে কী পাপ হলো তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা চাই।

৭. উত্তরা হিমেল হাওয়ায় দলিত নির্মল স্বচ্ছ শরাব তার (উষ্ট্রীর দুধের) চেয়ে বেশি পবিত্র, যার পাত্র নিয়ে ভদ্রশিষ্ট পরিবেশনকারী (বালক) প্রদক্ষিণ করে।

৮. যে শরাব বিশাল মটকার গভীরে দীর্ঘকাল টগবগ করে উতলে উঠেছে; অথচ এতে আগুনের উত্তাপ অনুভূত হয়নি।

৯. মটকার অভ্যন্তরে এর বুদবুদ শব্দ যেন গণকের মন্ত্রপাঠ, যার মুখোমুখি রয়েছে ক্রুশ।

১০. ঐ মদ নিয়ে সুরেলাকণ্ঠী বালক তোমার দিকে তার হাত বাড়ায়; সে যেন প্রতিপালিত হরিণশাবক।

১১. প্রসবকারীর যত্নআত্তি তাকে (বালককে) পরিপুষ্ট করেছে। ক্রমান্বয়ে সে বেড়ে উঠেছে এবং সৌন্দর্য ও আভিজাত্য নিয়ে বেড়ে উঠেছে।

১২. সে যখন তা (মদ) পান করে তখন তোমার জন্য লাগাম প্রলম্বিত করে দেয় অর্থাৎ অনুগত হয়। তার লাগামের গিঁট খুলে দেয়।

১৩. তুমি যদি তাকে আদর সোহাগ কর, তবে তার হৃদয়হরী অভিনব আচরণ তোমাকে বিমহিত করবে।

১৪. সে ভারী নিতম্ব নিয়ে অতি কষ্টে উঠে দাঁড়ায়। আর যখন স্বীয় পোশাকে পথচলে তখন মনে হবে যেন পাতার মাঝে সবুজ বৃক্ষডালি দুলছে।

১৫. সে (বালক) যখন তোমার প্রতি মনোনিবেশ করবে তখন আভিজাত্য ও বিনয়বশত বিগলিত হওয়ার উপক্রম হয়।

১৬. এবং আত্মগোপনকারিণী (বিধবা) হতে সে অধিক নির্বোধ (লাজুক) যে নিজেকে প্রদর্শন করে; যখন সংশয়কারী ব্যক্তি তার দৃষ্টি চুরি করতে চায়।

১৭. ওহে আমার গঞ্জনাকারিণী! আমাকে নিন্দা করা হতে তুমি ক্ষান্ত হও। কেননা, আমার (মদ্যপান হতে) তওবা প্রত্যাশাকারী বারবার ব্যর্থ হয়।

১৮. আমাকে পাপাচারে অভিযুক্ত কর; তবে কী এমন কোনো যুবক রয়েছে, যার কোনো পাপ নেই।

১৯. তবে জেনে রাখো, এ জীবন কেবল মরুভূমির তাঁবু নয় এবং কেবল দোহনকৃত দুগ্ধও নয়।

২০. হে বেদুইন! কোথায় পারস্য সম্রাটের রাজপ্রাসাদ আর কোথায় গরু-ছাগলের গোয়ালঘর (নগর জীবন ও বেদুইন জীবনের মাঝে ঢের তফাত রয়েছে)।

২১. আমার তওবার ব্যাপারে তুমি ধোঁকায় আছ এবং এক্ষেত্রে তুমি বাড়াবাড়ি করছ। সুতরাং আজ তুমি তোমার জামার গলা ছিঁড়লেও (মাথা মারলেও) আমি (মদ্যপান হতে) প্রত্যাবর্তন করব না।

উল্লিখিত পঙ্‌ক্তিগুলোতে কবি আবু নুয়াস মরুতে অবস্থিত প্রিয়ার পরিত্যক্ত বাস্তুভিটাকে বাদ দিয়ে নগরের মদ্যশালার দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ তিনি মনে করেন, বেদুইনের রুক্ষ জীবনের চেয়ে নগরবাসীর প্রমোদ জীবন অধিক শ্রেয়। তিনি বলেছেন, আগুনের উত্তাপ ছাড়াই যে শরাব বিশাল মটকার গভীরে দীর্ঘকাল টগবগ করে উতলে উঠেছে তা কতই-না সুস্বাদু। এরূপ মদের প্রতি আসক্তির কারণে অনেকে কবিকে মন্দ বলেছেন। এর জবাবে কবি বলেছেন, আমাকে পাপাচারে অভিযুক্ত করার কিছু নেই। কারণ, এমন কোনো যুবক নেই, যার কোনো পাপ নেই। এরপর কবি বেদুইনদের লক্ষ্য করে বলেছেন, তোমরা বেদুইন জীবন পরিত্যাগ করে নগর জীবনে অভ্যস্ত হও। কেননা, নগর জীবন ও বেদুইন জীবনের মাঝে ঢের তফাৎ রয়েছে। কাজেই নগর জীবনে প্রবেশ করে এর স্বাদ গ্রহণ করো।

কবি বাশ্‌শার ইব্‌ন বুর্‌দের পর ক্লাসিক্যালোত্তর কবিদের তিনিই পথিকৃৎ। একজন স্বভাবকবি হিসেবে কবিতার প্রতিটি শাখায় তিনি সদর্প বিচরণ করেছেন। তাঁর শৈল্পিক প্রতিভাগুণের কারণে বলতে হয়, ক্লাসিক্যাল সাহিত্যে ইমরুল কায়েসের যে অবস্থান ক্লাসিক্যালোত্তর জগতে আবু নুয়াস সেই স্থান দখল করতে সক্ষম হয়েছেন। পার্থক্য এতটুকু, ইমরুল কায়েস প্রিয়ার পরিত্যক্ত বাস্তুভিটার জন্য ক্রন্দন করেছেন আর আবু নুয়াস জরাজীর্ণ মদ্যশালার জন্য অশ্রু ঝরিয়েছেন। তবে আবু নুয়াসের অতিমাত্রায় মদ্যাসক্তি ও শরিয়ত-নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি চরম শৈথিল্য সুস্থধারার সাহিত্যভান্ডার তৈরিতে বাধা সৃষ্টি করেছে। কবিতায় লাগামহীন চরিত্রহীনতা, পাপাচারিতাকে হালকাভাবে গ্রহণ, শরাবপানে বুঁদ হওয়া, নারী প্রেমের পরিবর্তে বালক-প্রেমের প্রবর্তন ইত্যাকার বিষয়গুলো তাঁর নবসৃষ্টি হলেও একে আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে উলঙ্গ সাহিত্যের আমদানি ও কলঙ্ক লেপনই বলতে হবে।[৩৪] তবে জীবনসায়াহ্নে এসে কবি

[34]. আহমদ হাসান আয্-যয়্যাত, প্রাগুক্ত, পৃ ১১৯।

অতীত জীবনের প্রতি অনুতপ্ত হয়ে ধর্মের প্রতি ঝুঁকে পড়েন এবং এ সময় যুহ্দকেন্দ্রিক (সুফিতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় তপস্যামূলক) বেশ কিছু কবিতা রচনা করেন।

এককথায়, কাব্য রচনার ক্ষেত্রে জাহেলি যুগে যে সমস্ত নিয়ম-কানুন চলে আসছিল, বাশ্শার ইব্ন বুর্দ কবিতা রচনার ক্ষেত্রে সেই নিয়ম পরিবর্তন করে একটা নতুন ধারার প্রবর্তন করেন। কিন্তু তিনি এতে একেবারে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারেননি। অতঃপর আবু নুয়াস ও আল-মুতানাব্বী এ ধারার পূর্ণতা দান করেন। প্রাচীন আরবী কবিতায় সত্য ঘটনা বর্ণনা করা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। কল্পনার কোনো স্থান তাদের মাঝে ছিল না। বাশ্শার ইব্ন বুর্দ এ নীতির পরিবর্তন ঘটান, আবু নুয়াস এতে অবদান রাখেন আর আল-মুতানাব্বী এর চূড়ান্ত রূপ এমনভাবে দান করেন যার পরে আর কিছু অবশিষ্ট থাকেনি।[৩৫]

[35] . *দীওয়ানু আল-মুতানাব্বী*, ই'যায আলী সম্পা., করাচি; মাকতাবাতুল বুশরা, ১ম সং, ২০১১, পৃ. ৩১২।

৩য় পরিচ্ছেদ
আল্-মুতানাব্বী ও আল-মা'আররী

কবি আল-মা'আররী ছিলেন কবি আল-মুতানাব্বীর পরবর্তী দার্শনিক কবি। আরবী সাহিত্যের পণ্ডিতগণ মনে করেন, আল-মুতানাব্বীর পর আল-মা'আররীর ন্যায় আর কোনো কবি তাঁর সমকক্ষতা অর্জন করতে পারেননি। আল-মা'আররী নিজে এত বড়ো প্রতিভাবান কবি হওয়া সত্ত্বেও নিজের ওপর কবি আল-মুতানাব্বীকে স্থান দিয়েছেন। আহমদ আল-হাশেমী তাঁর গ্রন্থ جواهر الادب এ উল্লেখ করেন–

المعرى على بعد غورة و فرط ذكانه و توقد خاطره و شدة تعميقه و فى المعانى و التصورات الفلسفية يعترف بابى الطيب و يقدمه على نفسه و غيره -

"আল-মা'আররী অনেক দূরদর্শী, তাঁর বুদ্ধিমত্তা অত্যধিক, তার চিন্তাভাবনা প্রজ্বলিত, তাঁর (জ্ঞানের) গভীরতা তীব্র। এতদসত্ত্বেও তিনি দার্শনিক ধ্যাণ-ধারণার ক্ষেত্রে আল-মুতানাব্বীকে স্বীকার করেন এবং তাকে নিজের এবং অন্যদের চেয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করেন।"

কবি আল-মা'আররীর বয়স যখন চার বছর তখন তিনি বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়ে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। জীবনের ঊষালগ্নের এই দুর্ঘটনা তাঁর লেখনী ও চিন্তায় গভীর রেখাপাত করে। তবে এই অন্ধত্ব কবির জ্ঞানারোহণের ক্ষেত্রে অন্তরায় হতে পারেনি। পিতার কাছ থেকে প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর জ্ঞানান্বেষণের মানসে সিরিয়ার নানা প্রান্তে কবি সফর করেন। মা'আর্‌রাতুন নু'মান ছেড়ে আলেপ্পো, আনতাকিয়া, তারাবলিসসহ বহু স্থানে গমন করেন এবং তথাকার বিদোৎসাহী ও ধর্মযাজকদের মজলিসে বসে বিচিত্র জ্ঞান ও মতাদর্শের সাথে পরিচয় লাভ করেন। এরপর বিচিত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের তৎকালীন বিদ্যাপীঠ বাগদাদে গমন করে গ্রিক ও ভারতীয় দর্শনজ্ঞান আহরণ করেন।[৩৬]

এসময় আবুল আলা আল-মা'আররীর ধর্মীয় চিন্তাদর্শনে ব্যাপক পরিবর্তন আসে এবং স্রষ্টা এবং জীবন সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারা প্রসার লাভ করে। তখন শাসকগোষ্ঠীসহ সাধারণ জনগণ কবির আকিদা-বিশ্বাসকে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে। ফলে কবির কাছে জগজ্জীবন অতিষ্ঠ মনে হতে লাগল এবং তিনি মনে মনে নিঃসঙ্গ ও একাকী জীবন কাটানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এ লক্ষ্যে তিনি বাগদাদ ত্যাগ করে জন্মভূমি মা'আর্‌রাতুন নু'মানে ফিরে আসেন। সারাক্ষণ গৃহে অবস্থানকে নিজের ওপর বাধ্যতামূলক করে নেন।[৩৭]

---

[36] . হান্না আল-ফাখূরী, *আল-জামি' ফিল আদাবিল আরাবী ওয়া তারীখিহী*, ২য় সং, বৈরুত : দারুল জীল, ১৯৯১, খ. ১, পৃ.৮৪৪ এবং আহমদ হাসান আয্-যয়্যাত, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, বৈরুত, দারুল মা'আরিফ, ১৯৯৩ খ্রি.,পৃ ২২৪।

[37] . আহমদ হাসান আয্-যয়্যাত, প্রাগুক্ত,পৃ ২২৪।

তবে এই নিভৃত জীবনে তিনি আরবী সাহিত্যের জন্য বিপুল সম্পদ রেখে যান। তাঁর সাড়াজাগানো গদ্যগ্রন্থ 'রিসালাতুল গুফরান' (رسالة الغفران) এবং কাব্যগ্রন্থ 'আল-লুযূমিয়্যাত' (اللزميات) এ সময় রচনা করেন। 'আল-লুযূমিয়্যাত' (اللزميات)-এর কারণে তিনি সর্বমহলে দার্শনিক কবির মর্যাদা পান।[৩৮] আশৈশব কাব্যচর্চায় দক্ষতা অর্জন করলেও কবি কবিতাকে উপার্জনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেননি।[৩৯]

কবি আবুল আলা আল-মা'আররী আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে নির্দিষ্ট ধর্মদর্শন লালনকারী ব্যতিক্রমধর্মী এক কবি। তিনি তাঁর জীবনদর্শন 'আল-লুযূমিয়্যাত' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য 'আল-লুযূমিয়্যাত' প্রকাশের পর সমকালীন অনেকেই তাঁর ধর্মদর্শন নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন এবং তাঁকে নানা অপবাদ ও অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। আরবী সাহিত্যে তিনিই প্রথম কবি, যিনি দর্শনের ওপর একটি পূর্ণাঙ্গ দীওয়ান (কাব্য সংকলন) রচনা করেন। এটি সমসাময়িক কালের বৌদ্ধিক চিন্তাধারা, নানা মতবাদ ও বিশ্বাসের চিত্র আমাদের সামনে চিত্রায়িত করেছে। গ্রন্থটি কবির জ্ঞান, বুদ্ধি, আবেগ ও স্বভাবকে সার্থকরূপে তুলে ধরেছে। এতে রয়েছে একাধারে দর্শন, উপদেশ ও জীবন পর্যালোচনা। এটি বাগদাদ হতে জন্মভূমি মা'আর্‌রাতুন নু'মানে ফিরে এসে কবির শেষ জীবনে এসে রচনা করেন। ঐ সময় কবি তাঁর শিষ্যদের কাছে যেসব বক্তব্য উপস্থাপন করতেন, এটি মূলত তারই সারসংক্ষেপ। তখন দেশ-বিদেশের নানা প্রান্ত হতে আগত বিদ্যার্থীদের কবি ছিলেন মানসগুরু। বিদ্যার্থীদের জীবন সমস্যার নানা দিক আলোচনা, তাদের আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক পরিশুদ্ধকরণের নানা পন্থা তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিকভাবে শিক্ষাদানের প্রয়াস পেতেন তিনি। কবির দর্শনের উৎস হচ্ছে তাঁর বিবেক এবং তাঁর জ্ঞানের পরীক্ষাগার হচ্ছে নিজ দেহ। আসলে তাঁর বিদ্যাপীঠে যেসব জ্ঞান ও শিক্ষা শিষ্যদের তিনি বিতরণ করেছেন তার নির্যাস হচ্ছে 'আল-লুযূমিয়্যাত' (اللزميات) এবং এতেই উপস্থাপিত হয়েছে কবির দার্শনিক চিন্তাধারা।[৪০] উক্ত গ্রন্থে কবি একজন গভীর চিন্তক ও উঁচু মাপের শিক্ষকরূপে প্রতিভাত হয়েছেন।

কবি আবুল আলা আল-মা'আররীর রয়েছে সভ্যতা, ধর্ম ও মানবসমাজ নিয়ে স্বতন্ত্র দর্শন। কবির দৃষ্টিতে সভ্যতা হচ্ছে বিপর্যয়সৃষ্টিকারী; কেননা এটি ধোঁকাবাজি, ঘুষ ও অশ্লীলতার পথনির্দেশক। অপরদিকে ধর্মীয় গুরুরা কবির চোখে লোকদেখানো সাধু, বকধার্মিক, প্রতারক ও লোভী। যারা ধর্মকে মানব

---

38 . হান্না আল-ফাখূরী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ.৮৪৪।

39 . আহমাদ আল-ইসকান্দারী ও অন্যান্য, *আল-মুফাস্‌সাল পী তারীখিল আদাবিল আরবী*, ড. হাস্‌সান হাল্লাক সম্পা., বৈরুত : দারু ইহ্‌য়াইল উলূম, ১৯৯৪, পৃ. ৩০০।

40 . হান্না আল-ফাখূরী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৫৩-৮৫৪।

শিকারের ফাঁদ হিসেবে ব্যবহার করছে। মানবসমাজ নিয়েও কবি আবুল আলা আল-মা'আররী বিরূপ চিন্তাধারা লালন করেন। সামাজিক অন্যায় অনাচারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ভাব পোষণ করে তিনি এর কঠিন প্রতিবাদ করেন। তাঁর মতে সকল মানুষ মন্দ ও দুষ্ট প্রকৃতির; সুতরাং মানব প্রজন্ম বৃদ্ধি করা উচিত নয়। মানব পরিণতি নিয়েও কবি অস্থিরতায় ভুগতেন। মানবদেহকে আত্মার জন্য 'কদর্য পাত্র' আখ্যায়িত করে মানবাত্মা নিয়ে নানা মত ব্যক্ত করেন। কখনো এর চিরন্তনতা স্বীকার করেছেন, আবার কখনো একে তরুলতা ও উদ্ভিদের সাথে তুলনা করে এর নশ্বরতার পক্ষে মত দিয়েছেন।[৪১]

কবির বহুমুখী চিন্তাধারার কারণে তাঁর আকিদা-বিশ্বাসের ব্যাপারে নানাজন নানা মত দিয়েছেন। কারো মতে, আল-মা'আররী একজন স্বধর্মত্যাগী, যে ব্রাহ্মণ মতাদর্শ পোষণ করতেন। কারো মতে, কবির কবিতা সুফিদের বাক্যের মতো, যার বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত দুটো অর্থ রয়েছে। আবার কারো মতে, কবির ভ্রষ্ট কবিতাগুলো শত্রু কর্তৃক তাঁর ওপর আরোপিত, বাস্তবে এগুলো তাঁর কবিতা নয়। তবে অধিকাংশের মত হচ্ছে, কবি একজন সংশয়বাদী ছিলেন; যিনি একটি বিষয়কে একবার প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন, পরক্ষণেই আবার তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। এ কারণে কবির বহু কবিতায় স্ববিরোধী বক্তব্য ও বৈপরীত্ব লক্ষ করা যায়।[৪২] আসলে আবুল আলা আল-মা'আররীর দর্শনের ভিত্তি ছিল তিক্ত নৈরাশ্যবাদের উপর, যা তাঁকে ক্রমান্বয়ে সংশয়বাদের দিকে ধাবিত করত।

কবি আবুল আলা আল-মা'আররী মানব জীবনকে চটকদার ও তাৎপর্যহীন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তবে এরই মাধ্যমে তিনি জীবন-মৃত্যুর আসল চিত্র চিত্রায়িত করার প্রয়াস পেয়েছেন। মানবদেহকে কবি আত্মার জন্য একটি 'কদর্য পাত্র' হিসেবে চিহ্নিত করেন। মানুষের আত্মা মৃত্যুর জন্য উৎসুক হয়ে আছে অথচ মানুষ ছুটছে ভ্রান্তিময় পৃথিবীর দিকে। পৃথিবীতে মানুষ একে অপরকে চটকদার ও মুখরোচক কথা বলে ঠকবাজি ও প্রতারণা করতেই অভ্যস্ত। ধোঁকাবাজিতে ভরপুর প্রার্থিব জীবনকে মানুষ ভালোবাসে; অথচ তার অনিবার্য পরিণতি মৃত্যু তথা পরকাল; আর ঐ পথেই সে এগিয়ে যাচ্ছে। মানুষ যত বড়ো শক্তিধর কিংবা সুখী সমৃদ্ধশালী হোক না কেন, তাকে প্রতিদিন পরকালের পথে হাঁটতে হচ্ছে। কোনো মনীষীর বাণী, কোনো দার্শনিকের দর্শন কিংবা কোনো বিজ্ঞানীর সূত্র মৃত্যুকে প্রতিহত করতে পারবে না। যেমনটি দর্শনের জনক সক্রেটিস এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক হিপোক্রেটিসও মৃত্যু থেকে রক্ষা পাননি। এ বিষয়ে তার কবিতার কতিপয় শ্লোক নিম্নে পেশ করা হলো–

نُفوسٌ لِلقِيامَةِ تَشرَئِبُ * وَغَيٌّ في البَطالَةِ مُتلَئِبُّ

[41] . হান্না আল-ফাখূরী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৫৪-৮৫৫।

[42] . আহমদ হাসান আয্-যয়্যাত, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, বৈরুত : দারুল মা'আরিফ, ১৯৯৩ খ্রি.,পৃ ২২৫।

تَأَبّى أَن تَجيءَ الخَيرَ يَوماً * وَأَنتَ لِيَومِ غُفرانٍ تَئِبُّ

فَلا يَغرُرك بِشرٌ مِن صَديقٍ * فَإِنَّ ضَميرَهُ إِحَنٌ وَخَبُّ

وَإِنَّ الناسَ طِفلٌ أَو كَبيرٌ * يَشيبُ عَلى الغَوايَةِ أَو يَشِبُّ

تُحِبُّ حَياتَكَ الدُنيا سَفاهاً * وَما جادَت عَلَيكَ بِما تُحِبُّ

وَإِنَّك مُنذُ كَونِ النَفسِ عَنساً * لَتوضِعُ في الضَلالَةِ أَو تُخِبُّ

وَإِن طالَ الرُقادُ مِنَ البَرايا * فَإِنَّ الراقِدينَ لَهُم مَهَبُّ

غَرامُكَ بِالفَتاةِ خَنىً وَغَمٌّ * وَلَيسَ يَسَرُّ مَن يَشتاقُ غِبُّ

لَو أَنَّ سَوادَ كَيوانٍ خِضابٌ * بِكَفِّكَ وَالسُهى في الأُذنِ حَبُّ

لَما نَجّاكَ مِن غَيرِ اللَيالي * سَناءٌ فارِعٌ وَغِنىً مُرِبُّ

وَما يَحميكَ عِزٌّ إِن تَسَبّى * وَلَو أَنَّ الظَلامَ عَلَيكَ سِبُّ

أَرى جِنحَ الدُجى أَوفى جَناحاً * وَماتَ غُرابُهُ الجَونُ المُرِبُّ

فَما لِلنَسرِ لَيسَ يَطيرُ فيهِ * وَعَقرَبُهُ المُضِبَّةُ لا تَدُبُّ

أَيَجلو الشَمسَ لِلرائي نَهارٌ * فَقَد شَرَقَت وَمَشرِقُها مُضِبُّ

وَلَم يَدفَع رَدى سُقراطَ لَفظٌ * وَلا بِقراطُ حامى عَنهُ طِبُّ

إِذا آسَيتَني بِشَفاً صَريعاً * فَدَعني كُلُّ ذي أَمَلٍ يَتِبُّ

وَلا تَذبُب هُناكَ الطَيرَ عَنّي * ولا تَبلُل يَداكَ فَماً يَذِبُّ

অর্থ :

১. আত্মাগুলো পরকালের জন্য উৎসুক হয়ে আছে; অথচ মানুষ (এই আত্মাধারী ব্যক্তিরা) ভ্রান্তিতে চিরনিমজ্জিত।

২. পার্থিব জীবনে তুমি ভালো কাজ প্রত্যাখ্যান করো; অথচ তুমি ক্ষমার দিনের প্রত্যাশা করছ (আল্লাহর অবাধ্য হয়ে তাঁর ক্ষমার প্রত্যাশা করছ)।

৩. বন্ধুর হাস্যোজ্জ্বল চেহারা (মুখরোচক কথা) তোমাকে যেন ধোঁকায় না ফেলে; কেননা তার অন্তর বিদ্বেষ ও ঠকবাজিতে পরিপূর্ণ।

৪. মানুষ শিশু হোক বা বয়োজ্যেষ্ঠ হোক সে ভ্রান্তিতে (ভুলে লিপ্ত থেকে) বার্ধক্যে উপনীত হয় কিংবা তওবা করে।

৫. বোকামিবশত তুমি পার্থিব জীবনকেই ভালোবাসো; অথচ এই জীবন তুমি যা চাও তা তোমাকে প্রদান করতে পারে না।

৬. তোমার আত্মা যখনই প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছে তখন থেকেই তুমি কমবেশি ভ্রান্তিতে লিপ্ত।

৭. সৃষ্টিজীবের নিদ্রা যতই দীর্ঘায়িত হোক না কেনো; সকল ঘুমন্ত ব্যক্তি পরিণতির অপেক্ষা করছে।

৮. যুবতির প্রেম তোমার জন্য দুঃখ-কষ্ট বয়ে আনে। প্রিয়পাত্রের সাথে বিলম্বে সাক্ষাৎ সুখকর নয়।

৯. যদি শনি গ্রহের কালো রঙে তোমার হাত রাঙাও এবং নক্ষত্র তোমার কানের দুল হয় (তুমি যত শক্তিধর হও না কেন),

১০. উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা এবং চিরসমৃদ্ধি তোমাকে যুগের অমানিশা হতে মুক্তি দেবে না।

১১. (আখিরাতে) বন্দিদশা হতে কোনো সম্মান তোমাকে রক্ষা করবে না; পর্দা দিয়ে যতই তোমাকে আড়াল করা হোক না কেন।

১২. আমি দেখছি (কখনো কখনো) কারো ওপর অন্ধকারের ডানা পূর্ণরূপে মেলে দিয়েছে; অথচ তার চির অলক্ষণে কালো কাকের মরণ হয়েছে।

১৩. দেখা যায়, সেখানে শকুন আর উড়তে পারছে না এবং দংশনকারী বিচ্ছু আর বিচরণ করতে পারছে না।

১৪. দিবস কি সূর্যকে দেখিয়ে দিবে দর্শকের জন্য? উদয়ক্ষণ কুহেলিকাময় হলেও সূর্য সুস্পষ্টরূপে উদিত হবেই। (সত্য ও ন্যায় সুস্পষ্ট; জ্ঞান দিয়ে একে ভ্রান্তি হতে বেচে নিতে হবে)।

১৫. কোনো বাক্যবাণী (সূত্র) সক্রেটিসের মৃত্যু প্রতিহত করতে পারেনি এবং কোনো চিকিৎসাই হিপোক্রেটিসকে (গ্রিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক) মৃত্যু হতে সুরক্ষা দেয়নি।

১৬. তুমি আমাকে চিকিৎসা দিয়ে যতই সুস্থ করো না কেন, আমাকে ছাড়তেই হবে (মৃত্যু হবেই হবে); প্রত্যেক আশাবাদীকে নিরাশ হতে হয়।

১৭. সেখানে আমাকে রক্ষা করতে কোনো মঙ্গল পাখি উড়ে আসবে না এবং তৃষ্ণার্ত মুখের জন্য তোমার হাতও সিক্ত হবে না (কিয়ামতের দিন কেউ কাউকে রক্ষায় এগিয়ে আসবে না)।

উল্লিখিত কবিতায় কবি আবুল আলা আল-মা'আররী জীবন-মৃত্যুর আসল চিত্র চিত্রায়িত করেছেন। কবি বলেছেন, মানুষের আত্মা মৃত্যুর জন্য উৎসুক হয়ে আছে; অথচ মানুষ ভ্রান্তিময় পৃথিবীর দিকে ছুটছে। পৃথিবীতে মানুষ একে অপরকে চটকদার ও মুখরোচক কথা বলে ঠকবাজি ও প্রতারণা করতেই অভ্যস্ত। ধোঁকাবাজিতে ভরপুর পার্থিব জীবনকে মানুষ ভালোবাসে; অথচ তার অনিবার্য পরিণতি মৃত্যু তথা পরকাল; আর ঐ পথেই সে এগিয়ে যাচ্ছে। মানুষ যত বড়ো শক্তিধর কিংবা সুখী সমৃদ্ধশালী হোক না কেন, তাকে প্রতিদিন পরকালের পথে হাঁটতে হচ্ছে। কোনো মনীষীর বাণী, কোনো দার্শনিকের দর্শন কিংবা কোনো বিজ্ঞানীর সূত্র মৃত্যুকে প্রতিহত করতে পারবে না। যেমনটি দর্শনের জনক সক্রেটিস এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক হিপোক্রেটিসও মৃত্যু থেকে রক্ষা পাননি। সুতরাং মানুষের উচিত পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য না দিয়ে পরকালিন জীবনকে প্রাধান্য দেওয়া। এটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

কবি আবুল আলা আল-মা'আররীর স্মৃতিশক্তি ছিল বিস্ময়কর। অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ব্যাপক সৃষ্টিকর্ম তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তিরই প্রমাণ বহন করে। কবিতার পাশাপাশি গদ্য রচনার সংখ্যাও তাঁর কম নয়। তাঁর মুদ্রিত গ্রন্থের মধ্য উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'আল-লুযূমিয়্যাত' বা 'লুযূম মা-লা য়ালযাম', সিকতুয্ যান্দ, যিক্‌রা হাবীব, আল-ফুসূল ওয়াল গায়াত, আবসুল ওয়ালীদ। 'আল-লুযূমিয়্যাত'-এর মতো আল-মা'আররীর অপর দুটো গ্রন্থ 'রিসালাতুল মালা'ইকা' ও 'রিসালাতুল গুফরান' তাঁর অমর সৃষ্টি। এ দুটো গ্রন্থের সাথে ইটালীয় কবি দান্তে রচিত 'ডিভাইন কমেডি' ও ইংরেজ কবি মিল্টন রচিত 'প্যারাডাইজ লস্ট' মহাকাব্যের বিষয়গত সাদৃশ্য রয়েছে। কেননা, কবি এখানে এমন এক ব্যক্তিকে কল্পনা করেছেন, যে ঊর্ধ্বাকাশে উঠে যা অবলোকন করেছে তার বর্ণনা দিয়েছে। কবি আবুল আলা আল-মা'আররীর গ্রন্থ সংখ্যা সত্তরের কম নয়। তবে তাঁর অধিকাংশ রচনাবলি ক্রুসেড যুদ্ধের ডামাডোলে হারিয়ে যায়।[৪৩]

[43] . আহমদ হাসান আয্-যয়্যাত, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, বৈরুত, দারুল মা'আরিফ, ১৯৯৩ খ্রি.,পৃ ২২৬ এবং হান্না আল-ফাখূরী, *আল-জামি' ফিল আদাবিল আরাবী ওয়া তারীখিহী*, ২য় সং, বৈরুত : দারুল জীল, ১৯৯১, খ. ১, পৃ. ৮৪৫।

৪র্থ পরিচ্ছেদ
আল্-মুতানাব্বী ও আবু তাম্মাম

আব্বাসীয় কবি আল্-মুতানাব্বীর মেধা ও কাব্য প্রতিভার স্ফুরণ লক্ষ করা যায় শৈশবকাল থেকেই। বিদ্যানুরাগ নিয়েই তৎকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু কুফা নগরীতে কবি বেড়ে ওঠেন। যেখানে ছিলেন ভাষাতাত্ত্বিক ও প্রাচীন অভিধানপ্রণেতা আবু বকর মুহাম্মদ ইব্ন দুরায়দ (৮৩৭-৯৩৩ খ্রি.)[৪৪] ও আবুল কাসিম উমার ইব্ন সায়ফ আল-বাগদাদীর মতো প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গ। এসব মহৎ ব্যক্তির সান্নিধ্য আল-মুতানাব্বীকে একজন যুগসেরা কবি হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।[৪৫] উপরন্তু কবি ছিলেন প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী; যেকোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে প্রাচীন আরবী গদ্য বা কবিতা হতে উদাহরণ পেশ করে তা উপস্থাপন করতেন।[৪৬]

আল্-মুতানাব্বী ভাবের কবি; শব্দের দিকে বেশি ভ্রুক্ষেপ না করে অর্থের প্রতিই সজাগ দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন তিনি। কবিতায় কাব্য ও দর্শনের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। আরবী কবিতাকে আবু তাম্মাম যেসব শর্তে গণ্ডিবদ্ধ করেছেন এবং অলংকারবিদরা যে সাজসজ্জার প্রলেপ মেখেছেন তা হতে তিনি একে মুক্তি দিয়েছেন। আরবদের গতানুগতিক রীতিনীতি হতে তিনি বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। আল-মুতানাব্বীকে আরবী কবিতায় সংস্কার আন্দোলনের প্রবর্তক বলা যায়। তাঁর কবিতায় প্রবাদ ও নীতিবাক্যের সমাহার লক্ষ করা যায়। যুদ্ধের অভিনব বর্ণনা, চমৎকার উপমা উৎপ্রেক্ষা, একই পঙ্‌ক্তিতে দুই উপমার ব্যবহার, রূপকের অসাধারণ প্রয়োগে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কবিতায় স্বীয় ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদাকে তুলে ধরতে এবং স্বাধীন মত প্রকাশে আত্মনিষ্ঠ হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁকে অতুলনীয় বলতে হবে।[৪৭]

---

[44] . তার নাম আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আল-হাসান ইবনে দুরাইদ ইবনে আত্তাহ আল-আজদি আল-বসরি আদ-দাওসি আল-জাহরানি। তিনি ইব্নে দুরায়দ নামে খ্যাত। তিনি আব্বাসীয় যুগে ২২৩ হি. মোতাবেক ৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বসরার অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যাকরণবিদ, নিপুণ পণ্ডিত, দক্ষ আইনজ্ঞ এবং সমসাময়িককালের বিখ্যাত কবি। তিনি বিশেষত একজন অভিধানবিদ হিসেবে সুপরিচিত। তার লিখিত অভিধানের নাম হচ্ছে 'আল-জামহারাতু ফি ইলমিল লুগাত'। আরবি ভাষার এই বিস্তৃত অভিধানটি জনপ্রিয়তার দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। তিনি আরবের রাজা মালিক বিন ফাহম আদ-দাওসি আল-আজদির বংশধর। তিনি একজন ভাষা পণ্ডিত, আরব লেখক এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ আরব কবি। তার সম্পর্কে বলা হয়, ইব্নে দুরায়দ কবি ও পণ্ডিতদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী। তিনি ৩২১ হি. মোতাবেক ৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

[45] . মুহাম্মদ ইউসুফ ফার্‌বান, *আবুত্ ত্বায়্যিব আল-মুতানাব্বী নাশীদুস সাহ্‌রা আল-খালিদ*, ১ম সং, বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯০, পৃ. ৩৩-৩৪।

[46] . আহমাদ আল-ইসকান্দী ও মোস্তফা আনানী, *আল-মুফাস্‌সাল ফী তারীখিল আদাবিল আরবী*, ড. হাস্‌আন হাল্লাক সম্পা., বৈরুত : দারু ইহ্‌য়াইল উলূম, ১৯৯৪, পৃ. ২৭২।

[47] . আহমদ হাসান আয্-যয়্যাত, প্রাগুক্ত, ১৯৯৩ খ্রি.,পৃ ২১৯।

আল্-মুতানাব্বীর কবিতায় জনপরিবেশের প্রভাব সুস্পষ্ট। হিজরি ৪র্থ শতাব্দীর গণমানুষের সার্বিক অবস্থা তাঁর কবিতায় চিত্রায়িত হয়েছে। একইভাবে কবির মানসিক অস্থিরতা, তীক্ষ্ণ মেজাজ ও কঠিন স্বভাবও যথার্থভাবে প্রতিবিম্ব হয়েছে এতে। শৈশব হতে কবি যে পরিবেশে লালিত হয়েছেন তাতে কেবল তরবারির ঝনঝনানিই শুনতে পেয়েছিলেন; আরব সাম্রাজ্য তখন ভাঙন ও বিভক্তির মুখে খণ্ডরাজ্যের রূপধারণ করে। মুসলমান ও রোমকদের মাঝে সংঘটিত বহু যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী কবি আল-মুতানাব্বী। তখন তিনি ছিলেন সাইফুদ্দৌলার একান্ত সহচর। ফলে যুদ্ধের বর্ণনা, বর্শা ও তরবারির আঘাতের আওয়াজ সুনিপুণভাবে অনুরণিত হয়েছে তাঁর লেখনীতে; এবং এই শিল্পে তথা যুদ্ধের শৈল্পিক বর্ণনায় সমসাময়িক অপরাপর কবিকে ছাড়িয়ে গেছেন আল-মুতানাব্বী।[৪৮]

আর অপরদিকে কবি আবু তাম্মাম সিরিয়ার জাসিম নামক এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। বড়ো হলে কবি 'হিমস' নগরে গিয়ে দায়কুল জিন্ন (৭৭৭-৮৪৯ খ্রি.) নামক একজন কবির সান্নিধ্যে এসে কাব্যচর্চা শুরু করেন। কবির খ্যাতির কথা শুনে খলিফা আল-মু'তাসিম কবিকে বাগদাদে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে প্রাসাদ কবির মর্যাদা প্রদান করেন। এমনকি আমুরিয়্যাহ অভিযানের সময় কবিকে সফরসঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করেন। খলিফার প্রশংসায় কবি বহু কবিতা রচনা করেন এবং নিজের আর্থিক সচ্ছলতা আনয়ন করেন। তা ছাড়া অর্থোপার্জনের মানসে কবি বিভিন্ন সময় প্রায় ৬০ জন ব্যক্তির প্রশংসা করে কবিতা রচনা করেন।[৪৯] এই সুবাদে কবির প্রশংসাগীতির ভান্ডার সমৃদ্ধি হয়। দেশ-বিদেশে সফর করা কবির অন্যতম সখ ছিল; ফলে কবির চিন্তার দিগন্ত সম্প্রসারিত হয়। দীর্ঘ দেশ ভ্রমণ ও নানা স্থানে বিচরণের ফলে তাঁর অভিজ্ঞতার ভান্ডার যেমন সমৃদ্ধ হয়েছে, তেমনি তাঁর নিজস্ব সংস্কৃতির পরিধিও ব্যাপকতা লাভ করে। ব্যক্তিগতভাবে কবি আবু তাম্মাম চরম অনুভূতিপ্রবণ, প্রবল আত্মমর্যাদাশালী ও ঐতিহ্যানুরাগী ছিলেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। হাজার হাজার প্রাচীন আরবী কবিতা তাঁর স্মৃতির ভান্ডারে রক্ষিত ছিল। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ তাঁর দুই কাব্য সংকলন 'দীওয়ানুল হামাসা' ও 'আল-ওয়াহশিয়্যাত'। প্রথমোক্ত সংকলন গ্রন্থের মূল্যায়ন করতে গিয়ে খাতীব আত-তাবরিযী বলেন, "আবু তাম্মামের কাব্য প্রতিভা তাঁর স্বরচিত কবিতার তুলনায় তাঁর সংকলিত 'দীওয়ানুল হামাসা'য় অধিক প্রস্ফুটিত।" সমসাময়িক অপর বিখ্যাত কবি আল-বুহতুরী আবু তাম্মামের শিষ্য ছিলেন।

---

[48] . আবুল বাকা' আল-আকবারী, *শারহু দীওয়ান আবিত্ ত্বায়্যিব আল-মুতানাব্বী*, মুস্তফা আস্-সাক্কা ও অন্যান্য সম্পা., বৈরুত : দারুল মা'রিফা, তা.বি., ক. ১, পৃ. ওয়া।

[49] . হান্না আল-ফাখূরী, *আল-জামি' ফিল আদাবিল আরাবী ওয়া তারীখিহী*, ২য় সং, বৈরুত : দারুল জীল, ১৯৯১, খ. ১, পৃ.৭৩১।

কবি আবু তাম্মাম আব্বাসীয় খলিফা আল-মুতাসিমের প্রশংসা করে অনেকগুলো কবিতা রচনা করেন। খলিফা আল-মুতাসিম বিল্লাহ কর্তৃক বিজিত (২২৩হি./৮৩৮খ্রি.) বাইজান্টাইনের সুরক্ষিত নগর 'আমুরিয়্যাহ'র বিজয়গাঁথার বর্ণনা তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর কবিতায়। ঐ সময় জ্যোতির্বিদগণ আমুরিয়্যায় অভিযান না চালানোর জন্য খলিফাকে পরামর্শ দেন। পাশাপাশি তখন রোমক বাইজান্টাইনরাও খলিফার কাছে এ মর্মে বার্তা প্রেরণ করে যে, তাদের পবিত্র গ্রন্থে লেখা আছে, ডুমুর ফুল ও আঙুর ফল যখন পাকবে তখনই উক্ত শহর বিজয় করা সম্ভব; নয়তো সম্ভব নয়।[৫০] খলিফা উক্ত সময়ের জন্য কালক্ষেপণ না করে এবং এসব ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করেই তাৎক্ষণিক অভিযান পরিচালনা করেন এবং সফলতা লাভ করেন। কবি তার কবিতায় খলিফার সামরিক পদক্ষেপের প্রশংসা করেন। কবিতায় দেখা যায়, কবি আবু তাম্মাম ভৌতিক ও অতিমানবীয় শক্তির চেয়ে বাহুবল ও অস্ত্রবলে অধিক বিশ্বাসী। এ ছাড়া এতে আব্বাসীয় জ্ঞান-দর্শনের যুগপ্রভাবও প্রতিফলিত হয়েছে।[৫১]

এই প্রেক্ষিতে রচিত কবি আবু তাম্মামের কবিতার কিছু অংশ নিম্নে তুলে ধরা হলো–[৫২]

السَّيفُ أَصدَقُ أَنباءً مِنَ الكُتُبِ * في حَدِّهِ الحَدُّ بَينَ الجِدِّ وَاللَّعِبِ

بيض الصفائح لاسود الصفائح في * متونهن جلاء الشك والريب

وَالعِلمُ في شُهُبِ الأَرماحِ لامِعَةً * بَينَ الخَميسَينِ لا في السَّبعَةِ الشُّهُبِ

أين الرواية بل أين النجوم وما * صاغوه من زخرف فيهاومن كذب

تخرصا وأحاديثاملفقة * ليست بنبع إذا عدت ولاغرب

عَجائِبًا زَعَموا الأَيّامَ مُجفِلَةً * عَنهُنَّ في صَفَرِ الأَصفارِ أَو رَجَبِ

وخوفوا الناس من دهياء مظلمة * إذا بدا الكوكب الغربى ذو الذنب

وَصَيَّروا الأَبرُجَ العُليا مُرَتِّبَةً * ما كانَ مُنقَلِبًا أَو غَيرَ مُنقَلِبِ

يقضون بالأمر عنها وهى غافلة * مادار فى فلك منها وفى قطب

---

[50] . আল-খাতীব আত্-তাবরীযী, *শারহু দীওয়ান আবী তাম্মাম*, রাজী আল-আসমার সম্পা., বৈরুত : দারুল কিতাব আল-আরবী, ১৯৯৮ খ্রি., খ. ১, পৃ. ৩২।

[51] . ড. মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৩১-৬৩২।

[52] . আবু বকর মুহাম্মদ ইব্নে ইয়াহইয়া ইব্নে আবদিল্লাহ আস-সাওলী (মৃত ৩৩৫ হি.), *আখবারু আবী তাম্মাম*, রাজী আল-আসমার সম্পা., বৈরুত : দারুল কিতাব আল-আরবী, ১৯৯৮ খ্রি., খ. ১, পৃ. ৬-১৪।

لو بينت قط أمرا قبل موقعه * لم تخف ما حل بالأوثان والصلب

فَتحُ الفُتوحِ تَعالى أَن يُحيطَ بِهِ * نَظمٌ مِنَ الشِعرِ أَونَثرٌ مِنَ الخُطَبِ

فتحٌ تَفَتَّحُ أبوابُ السماءِ له * وتَبْرُزُ الأرضُ في أبرادِها القُشُبِ

يا يومَ وقعةِ عَمُّورِيَّةَ انصرفتْ * عنكَ المُنَى حُفَّلا مَعْسُولةَ الحَلَبِ

أبَقيْتَ جَدَّ بني الإسلامِ في صَعَدٍ * والمشركينَ ودَارَ الشِّركِ في صَبَبِ

أُمٌّ لَهُمْ لَوْ رَجَوْا أن تُفْتَدَى جَعلُوا * فداءَها كلَّ أَمٍّ منهمُ وأب

وبَرْزَةُ الوجهِ قد أعْيتْ رياضَتُها * كِسْرَى وصدَّتْ صُدوداً عن أبي كرَبِ

بِكْرٌ فما افتَرَعَتْها كفُّ حادثَةٍ * ولا ترقَّتْ إليها هِمَّةُ النُّوَبِ

من عهدِ إسكندرٍ أو قبلَ ذلكَ قَدْ * شابتْ نواصِي الليالي وَهيْ لم تَشِبِ

تدبيرُ معتصمٍ باللهِ منتقمٍ * لله مُرْتقبٍ في الله مُرْتَغبِ

خليفة الله جازى الله سعيك عن * جرثومة الدين والإسلام والحسب

بَصُرْتَ بالراحةِ الكُبرى فلم تَرَها * تُنالُ إلا عَلَى جِسْرٍ من التّعَبِ

إن كانَ بينَ مرورِ الدهرِ من رحمٍ * مَوْصُولةٍ وذِمامٍ غيرِ مُنْقَضِبِ

فبينَ أيامِكَ اللائِي نُصِرْتَ بِها * وبين أيامِ بدرٍ أقربُ النَّسَبِ

أبقت بنى الأصفر الممراض كاسمهم * صفر الوجوه وجلت أوجه العرب

<u>অর্থ :</u>

১. (জ্যোতির্বিদদের) লিখিত তথ্যের চেয়ে তরবারি অধিক সত্যভাষী; এর ধারেই রয়েছে বাস্তবতা ও তামাশার নিষ্পত্তি।

২. সন্দেহের অপনোদন নিহিত রয়েছে তরবারির ধারালো শুভ্রতায়, (রোমকদের ধর্মীয়) গ্রন্থের কালো লেখায় নয়।

৩. (জ্যোতির্বিদদের) সপ্ত জ্যোতিষ্কে নয়; বরং দুই সেনা বিগ্রেডের মাঝে সঞ্চালিত বর্শার ফলাতেই জ্ঞান উদ্ভাসিত।

৪. কোথায় (জ্যোতির্বিদদের) বর্ণনা, কোথায় নক্ষত্রপুঞ্জ। তারা যা উপস্থাপন করেছে তা সাজানো কল্পকথা ও মিথ্যার বেসাতি।

৫. তাদের (জ্যোতির্বিদদের) গালগল্প ও মুখরোচক কথাবার্তা সবল দুর্বল কোনো বৃক্ষের সাথেই তুলনীয় নয় (সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বক্তব্য)।

৬. কী অদ্ভুত কাণ্ড! তারা (জ্যোতির্বিদগণ) দাবি করল, দুর্দিনের আগমন (আমুরিয়্যার পতন) ঘটবে সফর কিংবা রজব মাসে (অথচ ততদিন অপেক্ষা করতে হয়নি)।

৭. এবং যখন পূর্ব দিগন্তের দীর্ঘপুচ্ছ তারকা প্রকাশমান হলো তখন তারা মানুষকে ঘোর অমানিশার (মহাবিপদের) ভয় দেখাল।[৫৩]

৮. তারা উপরস্থ নক্ষত্রপুঞ্জকে মনগড়া সাজিয়েছে; সেটা ঘূর্ণায়মান হোক বা স্থির হোক।

৯. নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে তারা সিদ্ধান্ত প্রদান করে; অথচ নক্ষত্রগুলো এসবের কিছুই জানে না। এগুলোর কক্ষপথে এবং গোলকে এসবের কিছুই ঘটে না।

১০. যদি কোনো ঘটনা ঘটার আগেই এসব নক্ষত্র প্রকাশ করত তবে মূর্তিপূজারি ও ক্রুশধারী খ্রিষ্টানদের ওপর যা আপতিত হয়েছে (আমুরিয়্যার পতন) তা গোপন থাকত না।

১১. (আমুরিয়্যা বিজয়) এ এক মহাবিজয়, কবিতার কোনো শ্লোক কিংবা অভিভাষণের কোনো বিবৃতি এর বর্ণনা দিতে পারবে না।

১২. এটি এমন বিজয় যার আকাশ তার সকল দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে এবং পৃথিবী নব পরিচ্ছেদে প্রকাশলাভ করেছে।

১৩. ওহে আমুরিয়্যার বিজয় দিবস! তোমার কাছ থেকে আমাদের প্রত্যাশাগুলো সুমিষ্ট দুগ্ধভর্তি হয়েই ফিরে এসেছে।

১৪. তুমি ইসলামের সন্তানদের ভাগ্য সমুচ্চে রেখেছ, আর অংশীবাদী ও তাদের গৃহকে নিম্নগামী রেখেছ।

১৫. এটি (আমুরিয়্যা) তাদের জননীর মতো। তারা ইচ্ছা করলে প্রত্যেকেই তারা মা-বাবার জন্য উৎসর্গিত হবে।

১৬. সে খোলা চেহারাবিশিষ্ট, পারস্য সম্রাট তার সাথে খেলায় পরাস্ত হয়েছে এবং (ইয়ামানের তুব্বাগোষ্ঠীর) আবু কারিবকে রুখে দিয়েছে।

---

[53] . উক্ত তারকা প্রকাশ পাওয়ার পর জ্যোতির্বিদরা ভবিষ্যৎ বার্তা দিলো যে, দেশ মহাসংকটে পতিত হবে এবং শাসনক্ষমতায় পরিবর্তন আসবে।

১৭. (আমুরিয়্যা) এমন কুমারী, কোনো দুর্ঘটনার হাত যার সতীত্ব বিনষ্ট করতে পারেনি এবং কোনো যুগের ঘনঘটা তাকে স্পর্শ করতে পারে নি (অর্থাৎ আমুরিয়্যা ইতোপূর্বে কেউ বিজয় করতে পারেনি)।

১৮. আলেকজান্ডারের যুগ হতে এমন কি তারও আগে রজনি অলকগুচ্ছ শুভ্ররূপ ধারণ করেছে; কিন্তু সে (আমুরিয়্যা) শুভ্র হয়নি (এর সজীবতা হ্রাস পায়নি)।

১৯. আমুরিয়্যা জয় এমন ব্যক্তির পরিকল্পনা (খলিফা আল-মুতাসিম), যিনি আল্লাহকে আঁকড়ে ধরেন, আল্লাহর জন্য প্রতিশোধ নেন, যিনি আল্লাহরই প্রত্যাশী এবং তিনি আল্লাহকে অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেন।

২০. ওহে আল্লাহর খলিফা! ধর্মের ভিত্তি, ইসলাম ও মর্যাদার জন্য আপনার এই যুদ্ধ প্রচেষ্টার প্রতিদান আল্লাহ আপনাকে দান করুন।

২১. আপনি মহাশান্তি (বিজয়) প্রত্যক্ষ করলেন; তবে বহু কষ্টের সেতুর ওপর দিয়েই এর নাগাল পাওয়া গেল।

২২. যদি কালের ঘটনা প্রবাহের মাঝে পারস্পরিক কোনো সংযুক্ত বন্ধন কিংবা অবিচ্ছেদ্য অধিকার থেকে থাকে।

২৩. তাহলে আপনার অর্জিত বিজয়ের দিনগুলো সাথে বদরের যুদ্ধের দিনগুলোর নিকটাত্মীয়ের বন্ধন রয়েছে।

২৪. (বিজয়ের দিন) রুগ্‌ণ বানুল আসফার (বাইজান্টাইনরা) তাদের নামানুসারে (আসফার শব্দের অর্থ হলুদ বর্ণ) ফ্যাকাশে চেহারার হয়ে থাকল; আর আরবদের চেহারা সমুজ্জ্বল হলো।

উল্লিখিত কবিতায় কবি আবু তাম্মাম আব্বাসীয় খলিফা আল-মুতাসিম বিল্লাহ কর্তৃক বিজিত বাইজান্টাইনের সুরক্ষিত নগর 'আমুরিয়্যাহ'র বিজয়গাথার বর্ণনা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, ঐ সময় জ্যোতির্বিদগণ আমুরিয়্যায় অভিযান না চালানোর জন্য খলিফাকে পরামর্শ দিলেও তিনি তা ভ্রুক্ষেপ না করে এবং সময়ক্ষেপণ না করে তাৎক্ষণিক অভিযান পরিচালনা করেন এবং সফলতা লাভ করেন। কবি তার কবিতায় খলিফার সামরিক পদক্ষেপের প্রশংসা করেছেন। প্রশংসা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, আমুরিয়্যা জয় এমন ব্যক্তির পরিকল্পনা যিনি আল্লাহকে আঁকড়ে ধরেন, আল্লাহর জন্য প্রতিশোধ নেন, যিনি আল্লাহরই রহমত ও সাহায্যপ্রত্যাশী এবং তিনি আল্লাহকে জীবনের অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেন। ফলে আমুরিয়্যা অভিযানে রুগ্‌ণ বানুল আসফার তথা বাইজান্টাইনদের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল আর আরবদের চেহারা সমুজ্জ্বল হলো।

৫ম পরিচ্ছেদ
আল্-মুতানাব্বী সম্পর্কে পণ্ডিতগণের মন্তব্য

কবি আল-মুতানাব্বী সমসাময়িক কবি ও আরব কবিদের মধ্যে এক অনন্য ও অসাধারণ প্রতিভা হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত। আরবী কাব্যজগতে কবি আল-মুতানাব্বীর স্থান নির্ণয় করতে গিয়ে বিভন্ন পণ্ডিতগণ তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং অন্যান্য কবিদের ওপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে তুলে ধরেছেন। নিম্নে আল-মুতানাব্বী সম্পর্কে পণ্ডিতগণের কতিপয় মন্তব্য তুলে ধরা হলো–

১. ইব্ন রাশীক আল-কায়রাওয়ানী (মৃ. ১০৭১ খ্রি./৪৬৩ হি.) বলেন–

ليس فى المؤلدين أشهر إسما من الحسن أبى نواس ثم حبيب أبى تمام و البحترى و يقال انهما أخملا فى زمانهما خمس مأة شاعر كلهم مجيد ثم جاء المتنبى فملأ الدنيا و شغل الناس -

"ক্লাসিক্যালোত্তর কবিদের মাঝে আল-হাসান আবু নুয়াসের চেয়ে প্রসিদ্ধ নাম আর নেই। এরপর হাবীব আবু তাম্মাম ও আল-বুহতুরীর নাম এসে যায়। বলা হয়ে থাকে, তাঁরা দুজন সমসাময়িক কালের পাঁচ'শ মর্যাদাশীল কবির খ্যাতিকে ম্লান করে দিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে আল-মুতানাব্বী দুনিয়াজুড়ে খ্যাতি নিয়ে আসেন এবং মানুষকে বিমুগ্ধ করেন।"[৫৪]

২. ড. সালিহ আল-আশতার তাঁর 'আল-জাহিয ও আল-মুতানাব্বীর সাথে সাক্ষাৎ দর্শন' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন–

وأما المتنبى قد وعى الفلسفة اليونانية و أثرها كبير فى حكمته و قد رد بعض المؤلفين أصول الحكمة فى شعر المتنبى إلى كلمات مشهورة لإرسطو -

"কবি আল-মুতানাব্বী গ্রিক দর্শনকে ধারণ করেছেন; তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ কবিতায় এর প্রভাব অত্যন্ত শক্তিশালী। কোনো কোনো লেখক মনে করেন, আল-মুতানাব্বীর কবিতার চিন্তা-দর্শন অ্যারিস্টটলের প্রসিদ্ধ উক্তিগুলোতে নিহিত রয়েছে।"[৫৫]

৩. ড. শাওকী দ্বায়ফ বলেন–

قد تركزت فى نفس المتنبى خصائص العرب حتى لكأنما نفسه قطعة من جميع أنفسهم -

"কবি আল-মুতানাব্বীর অন্তরাত্মায় আরবদের বৈশিষ্ট্যাবলি সুসংহত হয়ে আছে। তিনি যেন তাদের সকলের এক দেহাংশ।"[৫৬]

---

54 . মুহাম্মদ ইউসুফ ফার্‌বান, *আবুত্ ত্বায়্যিব আল-মুতানাব্বী নাশীদুস সাহ্‌রা আল-খালিদ*, ১ম সং, বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯০, পৃ. ১৩৪।

55 . মুহাম্মদ ইউসুফ ফার্‌বান, *আবুত্ ত্বায়্যিব আল-মুতানাব্বী নাশীদুস সাহ্‌রা আল-খালিদ*, ১ম সং, বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯০, পৃ. ১৩৭-১৩৮।

৪. ড. সালাহ উদ্দীন আল-হাদী বলেন–

- و يكفى أن نعلم أن المتنبى شغل بشخصيته وقنه علماء الادب و طلابه منذ عصره حتى أيامنا هذا

"এবং এটা জেনে রাখা যথেষ্ট যে, নিশ্চয় আল-মুতানাব্বী তাঁর ব্যক্তিত্বের সাথে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর সময় থেকেই আমাদের সময় অবধি সাহিত্যের পণ্ডিত এবং শিক্ষার্থীরা তাঁকে সম্মান করতেন।"[৫৭]

৫. কবি আল-মুতানাব্বী প্রসঙ্গে আবুল কাসেম আল-মুজাফ্ফার ইব্ন আলী আত-ত্বাবাসী মন্তব্য করেন, তিনি ছিলেন কবিতার ক্ষেত্রে নবিস্বরূপ। যেমন তিনি বলেন–

- ما رأى الناس ثانى المتنبى * أى ثان يرى لبكر الزمان
- كان من نفسه الكبيرة فى جى * ش و فى الكبرياء ذا سلطان
- هو فى شعره نبى و لكن * ظهرت معجزاته فى المعانى

'দ্বিতীয় নবুয়তের দাবিদারকে মানুষ কী দেখল
এমন দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি রয়েছে যে যুগের ঊষালগ্নকে প্রত্যক্ষ করেছে?
নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন মহান
আর অহংকার প্রদর্শনে ছিলেন গর্বিত।
তিনি তার কবিতার ক্ষেত্রে নবিস্বরূপ
আর তার মুজিযা প্রকাশিত হয়েছে কবিতার ভাবার্থে।'[৫৮]

কবি আল-মুতানাব্বী ছিলেন প্রাচীন আরবী কবিতার ইতিহাসে সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন। যার ফলে তিনি প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের গবেষকদের গবেষণার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে তাঁর কবিতার ওপর বেশি গুরুত্বারোপ করা হয় এবং ল্যাটিন, ফরাসি, জার্মানি ও ইংরেজি ভাষায় তাঁর কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হয়। প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ যেমন : হা'মের, ত্বরানজারিয়া, বেলায়েশর, দিস্যাসী, ব্রোকেলম্যান, নিকলস প্রমুখ তাঁর কবিতার মূল্যায়ন করেছেন। আল-মুতানাব্বীর ন্যায় অন্য কোনো কবির কবিতার এত ব্যাপক আলোচনা, সমালোচনা ও ব্যাখ্যা হয়নি। তাঁর কবিতার সর্বমোট ৫১টি শরাহগ্রন্থ রচিত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত অগণিত পণ্ডিতবর্গ তাঁর ও তাঁর কবিতার ব্যাপারে সুন্দর

---

[56] . আবুল বাকা' আল-আকবারী, *শারহু দীওয়ান আবিত্ ত্বায়্যিব আল-মুতানাব্বী*, মুস্তফা আস্-সাক্কা ও অন্যান্য সম্পা., বৈরুত : দারুল মা'রিফা, তা.বি., খ. ১, পৃ. ২৯০-২৯১।

[57] . মুহাম্মদ ইউসুফ ফার্‌বান, *আবুত্ ত্বায়্যিব আল-মুতানাব্বী নাশীদুস সাহ্‌রা আল-খালিদ*, ১ম সং, বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯০, পৃ. ১৩৮-১৩৯।

[58] . আবুল আব্বাস শামসুদ্দিন আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবি বকর ইব্ন খালকান, *ওয়াফিয়াতুল আইয়ান ওয়া আন্‌বায়ে আবনায়িয যা'মান*, বৈরুত : দারুস সা'দের, ১৯৭১, খ. ৪, পৃ. ১৯২।

মন্তব্য করেছেন। এককথায় সমসাময়িক কবি ও আরব কবিদের মধ্যে আল-মুতানাব্বী এক অনন্য ও অসাধারণ প্রতিভা হিসেবে সাহিত্যের জগতে স্বীকৃতি লাভ করেছেন।[৫৯]

[59] . মাহমূদ মুহাম্মদ শাকির, *আল-মুতানাব্বী*, কায়রো : মাতবা'আতু আল-মাদানী, তা. বি., খ. ১, পৃ. ১৩২।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আরবী কাব্যসাহিত্যে আল্-মুতানাব্বী এর অবস্থান

১ম পরিচ্ছেদ : আরবী কাব্য সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র

২য় পরিচ্ছেদ : কবিতার জগৎকে সমৃদ্ধিদান

৩য় পরিচ্ছেদ : কাব্যপ্রতিভার মূল্যায়ন

৪র্থ পরিচ্ছেদ : আল্-মুতানাব্বী সম্পর্কে সমালোচকদের অভিমত

১ম পরিচ্ছেদ

আরবী কাব্য সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র

আরবী সাহিত্যাকাশের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র আবু তাইয়্যেব আল্-মুতানাব্বী। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা তাঁকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করেছে। প্রাচ্যের সাহিত্যবিশারদগণ বিশেষত তাঁর সমসাময়িক পণ্ডিতগণ তাঁর কাব্যপ্রতিভা মূল্যায়ন করতে গিয়ে তাঁকে শ্রেষ্ঠতম আরব কবি বলে আখ্যায়িত করেছেন। এমনকি আবুল আলা আল-মা'আর্‌রী (৯৩৭-১০৫৮ খ্রি.) পর্যন্ত তাঁর কাব্যিক প্রতিভার সম্মুখে মাথা অবনত করেছেন। ইব্‌ন খাল্লিকান (১২১১-১২৮২ খ্রি.) তাই নিঃসন্দেহে বলেছেন, It is perfecion.[1]

কবিকে কেউ কেউ কবিসম্রাট ইমরুল কায়েসের (৫০১-৫৪৪ খ্রি.) ওপর স্থান দিয়েছেন। কিছুসংখ্যকের মতানুযায়ী তিনি চূড়ান্তভাবে কাব্যসাহিত্যে প্রথম স্থানের অধিকারী। আবুল আলা আল-মা'আর্‌রী (৯৩৭-১০৫৮ খ্রি.) কখনো কখনো আল-মুতানাব্বীর কবিতার দু-একটি শব্দ পরিবর্তন করার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন। কিন্তু কখনো তাঁর ওপর ওঠার চিন্তা করতে সক্ষম হননি।[২]

সমালোচকদের মধ্যে প্রথম কাতারের সমালোচক সা'লাবী (মৃত্যু ১০৩৫ খ্রি)[৩] কবি আল-মুতানাব্বীর সমালোচনা করলেও তাঁর সম্পর্কে উঁচু ধারণা পোষণ করতেন। সা'লাবী ছাড়াও আবুল ফারাজ আল-ইসবাহানি (৮৯৭-৯৬৭ খ্রি.), সাহেব ইব্‌ন আব্বাদ (৯৪৭-৯৯৫ খ্রি.) ও জুরজানীসহ (১০৪০-১১৩৬ খ্রি.) প্রাচ্যপণ্ডিতগণ আল-মুতানাব্বীর কবিতার দোষত্রুটি উল্লেখ করলেও তাঁর কবিতার প্রশংসা করেছেন। মোটকথা, তাঁর কবিতার মূল্যায়নে তৎকালীন এবং পরবর্তী পণ্ডিতগণ তাঁকে আরবী কবিতার শ্রেষ্ঠ কবি না বললেও শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম কবি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর সম্পর্কে কবি, সাহিত্যিক ও পণ্ডিতগণের বিবিধ মন্তব্য রয়েছে। যেমন :

১. কেউ বলেছেন, আরবী সাহিত্যাঙ্গনে আলোড়ন সৃষ্টিকারী কবি আল-মুতানাব্বীর স্বাভাবিকভাবে সমালোচনার জুড়ি নেই। তবে তাঁর প্রতিকূল সমালোচনার তেমন কোনো জোরালো যুক্তি পাওয়া যায় না। সুতরাং আমরা তাঁকে সাহিত্যাঙ্গনের শ্রেষ্ঠ রত্ন বলতে পারি। সমালোচনার দৃষ্টিকোণ থেকে তার দোষত্রুটি খুব কমই পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন–

من ذا الذى ترضى شحاياه كلها * كفى الحراء فضلا أن تعد سحائبه

---

[1] . ইব্‌নে খাল্লিকান, খণ্ড ২, পৃ ৩৪২।

[2] . বুতরুস আল-বুস্তানী, *উদাবা'উল আরব ফিল আসরিল আব্বাসী*, (বৈরুত, দারল জীল, ১৯৮৯, তা.বি.), খ. ২, পৃ. ৫৩-৫৪।

[3] . তিনি হলেন আবু ইসহাক আহমাদ ইব্‌নে মুহাম্মদ ইব্‌নে ইব্রাহীম আল-নিশাপুরী আল-সা'লাবী। তিনি ১০৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। তিনি ছিলেন একাদশ শতাব্দীর পারস্য বংশোদ্ভূত একজন ইসলামি পণ্ডিত। কুরআন সম্পর্কে তাঁর প্রভূত জ্ঞান ছিল। তিনি ছিলেন তাঁর সময়কার সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম ও পণ্ডিত।

'কে আছে যে তার গোটা আত্মাকে সন্তুষ্ট করতে পারে?

তার দোষত্রুটি গণনা করার চাইতে তার মর্যাদার দিক আলোচনা করাই যথেষ্ট।'[৪]

২. কেউ বলেছেন, আল-মুতানাব্বী নিজেকে শ্রেষ্ঠ কবি, বাদশাহ, খলিফা এমনকি নবি বলেও দাবি করতেন, যা একমাত্র তাঁর কাব্যিক শ্রেষ্ঠত্বের কারণেই তিনি করতেন।[৫]

৩. আবুল আলা আল-মা'আর্‌রী বলেন–

أبو تمام والمتنبى حكيمان و أنا شاعر و البحترى

'আবু তাম্মাম এবং মুতানাব্বী হলেন বিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব আর আমি এবং বুহতরী হলাম (শুধু) কবি।'[৬]

৪. আহমাদ হাসান আয-যাইয়্যাত বলেন–

فهو إمام الطريقة الاعتبارية فى الشعر العربى

'তিনি হলেন আরবী কবিতার ক্ষেত্রে আইনি (গ্রহণীয়) পদ্ধতির ইমাম।'[৭]

৫. জুরজী যায়দান বলেন–

ولم يدع بابا من الشعر الاطرفة و أجار فيه خصوصا الحكم و ماسية المديح و الفخر و العتاب

'কবিতার কোনো দরজা (দিক) তিনি পরিত্যাগ করেননি, স্বীয় কবিতায় তিনি প্রজ্ঞা, প্রশংসা, গৌরব এবং তিরস্কারের রূপ তুলে ধরেছেন।'[৮]

৬. ইব্‌ন খালদুন বলেন–

إنما قيل له المتنبى لأنه إدعى النبوة فى بادية الماوة و تبع حلف كثير من بنى كلب و غسان

'তাঁকে মুতানাব্বী বলা হয়, কেননা তিনি মাওয়া উপত্যকায় নবুয়তের দাবি করেছেন। আর বনু কাল্‌ব এবং বনু গাচ্ছান গোত্রের অনেক লোক তাঁর অনুসরণ করেছিল।'[৯]

---

[4] . *দীওয়ানু আল-মুতানাব্বী*, ই'যায আলী সম্পা., করাচি; মাকতাবাতুল বুশরা, ১ম সং, ২০১১, পৃ. ৩০৮।

[5] . আবুল বাকা' আল-আকবারী, *শারহু দীওয়ান আবিত্ ত্বায়্যিব আল-মুতানাব্বী*, (বৈরুত : দারুল মা'রিফা), খ. ১, পৃ. ৩৩২।

[6] . বুতরুস আল-বুস্তানী, *উদাবা'উল আরব ফিল আসরিল আব্বাসী*, (বৈরুত, দারল জীল, ১৯৮৯, তা.বি.), খ. ২, পৃ. ৩২।

[7] . আহমদ হাসান আয্-যয়্যাত, তারিখুল আদাবিল আরাবী, বৈরুত, দারুল মা'আরিফ, ১৯৯৩ খ্রি.,পৃ ২১৮।

[8] . জুরজী যায়দান, *তারীখু আ'দাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ*, ২য় খণ্ড, (বৈরুত : দারু মাকতাবাতিল হায়াত, ১৯৭৩), পৃ. ৫৫৬।

[9] . ইউছুফ আল্-বাদিয়ী আদ্-দামেস্কী, *আস্-সুবহুল মুনাব্বী আন হায়ছিয়্যাতিল মুতানাব্বী*, আল্-মাতবা'আতুল আ'মেরাহ আশ্-শারকিয়্যাহ, ১৩০৮ হি. পৃ ৬৭।

৭. ইব্ন আসির[১০] বলেন, "আবু তাম্মাম[১১], বুহতুরী[১২] ও আল-মুতানাব্বী" এই তিনজন কবির মধ্যে কবিতার রাজ্যে আল-মুতানাব্বীর অবস্থান হলো লা'ত, মানা'ত ও উজ্জা নামক মূর্তিসমূহের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে উজ্জা মূর্তির মতো। অর্থাৎ লা'ত, মানা'ত ও উজ্জা এই তিনটি মূর্তির মধ্যে জাহেলি যুগে মুর্তিপূজারিদের নিকট 'উজ্জা' নামক মূর্তিটির অবস্থান ছিল মর্যাদার দিক থেকে শ্রেষ্ঠ; অনুরূপ "আবু তাম্মাম, বুহতুরী ও আল-মুতানাব্বী" এই তিনজন কবির মধ্যে কবিতার রাজ্যে আল-মুতানাব্বীর অবস্থানও মর্যাদার দিক থেকে শ্রেষ্ঠ।

৮. আবুল আলা আল-মা'আর্‌রী আরও বলেন–

كان المتنبى أشهر الشعراء المحثين إذا أمسك

'থেমে যাওয়া বিষয়ে উদ্বুদ্ধকারী কবিদের মধ্যে আল-মুতানাব্বি ছিলেন সবচেয়ে বিখ্যাত কবি।'[১৩]

৯. আবুল কাসেম ইসমাঈল ইব্ন আব্বাস তাঁর সমালোচনা করলেও বলতে বাধ্য হয়েছেন যে-

إنه بعيد المرى فى شعره كثير الإصابة فى نظمه إلا أنه قبيحا يأتى بكثرة العراء

'তিনি কবিতায় সুদূর লক্ষ্যে উপনীত হয়েছেন; ছন্দের সার্থক প্রয়োগ দেখিয়েছেন। তবে অনেক ক্ষেত্রেই তিনি উচ্চমানের শব্দের সাথে নিম্নমানের শব্দ সংযুক্ত করেছেন।'[১৪]

---

[10] . তিনি হলেন ইউসুফ ইব্নে আবদুল কাদের ইব্নে মুহাম্মদ আল-হুসাইনী আল-আজহারী। তিনি আল-আসির গোত্রের লোক। এজন্য তাকে ইবনুল আসির বলা হয়। তিনি ১২৩২ হিজরিতে সিডনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩০৭ হিজরিতে বৈরুতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখা-পড়া করেন। তিনি একজন কবি ছিলেন।

[11] . কবি আবু তাম্মাম সিরিয়ার জাসিম নামক এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। বড়ো হলে কবি 'হিমস' নগরে গিয়ে দায়কুল জিন্ন (৭৭৭-৮৪৯ খ্রি.) নামক একজন কবির সান্নিধ্যে এসে কাব্যচর্চা শুরু করেন। কবির খ্যাতির কথা শুনে খলিফা আল-মু'তাসিম কবিকে বাগদাদে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে প্রাসাদ কবির মর্যাদা প্রদান করেন। এমনকি আমুরিয়্যাহ অভিযানের সময় কবিকে সফরসঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করেন। খলিফার প্রশংসায় কবি বহু কবিতা রচনা করেন এবং নিজের আর্থিক সচ্ছলতা আনয়ন করেন। তা ছাড়া অর্থোপার্জনের মানসে কবি বিভিন্ন সময় প্রায় ষাটজন ব্যক্তির প্রশংসা করে কবিতা রচনা করেন। এই সুবাদে কবির প্রশংসাগীতির ভান্ডার সমৃদ্ধি হয়। দেশ-বিদেশে সফর করা কবির অন্যতম সখ ছিল; ফলে কবির চিন্তার দিগন্ত সম্প্রসারিত হয়। দীর্ঘ দেশ ভ্রমণ ও নানা স্থানে বিচরণের ফলে তাঁর অভিজ্ঞতার ভান্ডার যেমন সমৃদ্ধ হয়েছে, তেমনি তাঁর নিজস্ব সংস্কৃতির পরিধিও ব্যাপকতা লাভ করে। ব্যক্তিগতভাবে কবি আবু তাম্মাম চরম অনুভূতিপ্রবণ, প্রবল আত্মমর্যাদাশালী ও ঐতিহ্যানুরাগী ছিলেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। হাজার হাজার প্রাচীন আরবি কবিতা তাঁর স্মৃতির ভান্ডারে রক্ষিত ছিল। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ তাঁর দুই কাব্য সংকলন 'দীওয়ানুল হামাসা' ও 'আল-ওয়াহশিয়্যাত'। প্রথমোক্ত সংকলন গ্রন্থের মূল্যায়ন করতে গিয়ে খাতীব আত-তাবরিযী বলেন, "আবু তাম্মামের কাব্য প্রতিভা তাঁর স্বরচিত কবিতার তুলনায় তাঁর সংকলিত *দীওয়ানুল হামাসায়* অধিক প্রস্ফুটিত।" এই স্বনামধন্য কবি ৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দে মুত্যুবরণ করেন।

[12] . তিনি হলেন আল-ওয়ালিদ ইব্নে উবায়দিল্লাহ আল-বুহতুরী। তার ডাক নাম আবু আল-হাসান। আলেপ্পো এবং ফুরাত নদীর মধ্যবর্তী ইসলামিক সিরিয়ার মানবিজে তিনি ২০৪ হিজরি সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন আরব কবি ছিলেন। তিনি ব্যাপক খ্যাতির অধিকারী বিখ্যাত কবিদের একজন। আব্বাসীয় খিলাফতের সময় স্বীয় জন্মস্থান মানবিজে বসবাস করেন, তারপর বাগদাদে চলে আসেন। পরিশেষে আবারো মানবিজে ফিরে আসেন এবং সেখানেই ২৮০ হিজরি সালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি মোট ৮০ বছর বেঁচে ছিলেন। আল-বুহতুরী তাঁর যুগে বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন এবং সে সময়ের তিনজন বিশিষ্ট কবিদের একজন ছিলেন। তিনি আবু নাওয়াসের পরে সবচেয়ে বিখ্যাত কবি হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

[13] . *বুতরুস আল-বুস্তানী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩২।

[14] . মুহাম্মদ ইউসুফ ফার্‌রান, *আবুত্ ত্বায়্যিব আল-মুতানাব্বী নাশীদুস সাহ্‌রা' আল-খালিদ*, ১ম সং, বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলামিয়্যাহ, ১৯৯০, পৃ ২৪।

১০. ইব্ন খাল্লিকান (১২১১-১২৮২ খ্রি.) তাঁর দেওয়ান সম্পর্কে বলেছেন, আল-মুতানাব্বীর দীওয়ান কাব্যক্ষেত্রে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও চরম উৎকর্ষীয় কাব্যগ্রন্থ।[১৫]

১১. কেউ কেউ আল-মুতানাব্বীকে শেক্সপিয়ারের সাথে তুলনা করেছেন।

১২. কেউ বলেছেন আল-মুতানাব্বী ছিলেন আব্বাসীয় যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর রচিত দেওয়ানের ব্যাখ্যার আধিক্যও তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে। ইব্ন খাল্লিকান বলেছেন, আল-মুতানাব্বীর দেওয়ানের প্রায় চল্লিশটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রয়েছে।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, আল-মুতানাব্বী আরবি কাব্যসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। অসংখ্য সমালোচক ও পণ্ডিতবর্গ সমসাময়িক কাল থেকে অদ্যাবধি পর্যন্ত তাঁর কবিতার আলোচনা-সমালোচনা করেছেন। এটাও তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের বিশেষ কারণই বলতে হবে। কেননা, তাঁর কবিতা যদি উন্নত ও শ্রেষ্ঠ না হবে তবে এত আলোচনা-সমালোচনার কি প্রয়োজন ছিল? সে দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করতেই হবে।[১৬]

আল-মুতানব্বী ছিলেন আব্বাসীয় যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর মেধা ও কাব্য প্রতিভার স্ফুরণ লক্ষ করা যায় শৈশবকাল থেকেই। বিদ্যানুরাগ নিয়েই তৎকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু কুফা নগরীতে কবি বেড়ে ওঠেন। যেখানে ছিলেন ভাষাতাত্ত্বিক ও প্রাচীন অভিধানপ্রণেতা আবু বকর মুহাম্মদ ইব্ন দুরায়দ (মৃ. ৯৩৩ খ্রি./৩২১ হি.)[১৭] ও আবুল কাসিম উমার ইব্ন সায়ফ আল-বাগদাদীর মতো প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গ। এসব মহৎ ব্যক্তির সান্নিধ্য আল-মুতানাব্বীকে একজন যুগসেরা কবি হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।[১৮] উপরন্তু কবি ছিলেন প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী; যেকোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে প্রাচীন আরবি গদ্য বা কবিতা হতে উদাহরণ পেশ করে তা উপস্থাপন করতেন।[১৯]

---

15 . ইব্নে খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, খণ্ড ২, পৃ ৩৪৯।

16 . জি. এম. মেহেরুল্লাহ; *আরবী কবি, সাহিত্যিক ও সাহিত্য*, ঢাকা: নাহ্দা প্রকাশনী, ১৯৯৩ খ্রি., পৃ ১০৪-১০৬।

17 . তার নাম আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আল-হাসান ইবনে দুরাইদ ইবনে আত্তাহ আল-আজদি আল-বসরি আদ-দাওসি আল-জাহরানি। তিনি ইবনে দুরায়দ নামে খ্যাত। তিনি আব্বাসীয় যুগে ২২৩ হি. মোতাবেক ৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বসরার অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যাকরণবিদ, নিপুণ পণ্ডিত, দক্ষ আইনজ্ঞ এবং সমসাময়িক কালের বিখ্যাত কবি। তিনি বিশেষত একজন অভিধানবিদ হিসেবে সুপরিচিত। তার লিখিত অভিধানের নাম হচ্ছে 'আল-জামহারাতু ফি ইলমিল লুগাত'। আরবি ভাষার এই বিস্তৃত অভিধানটি জনপ্রিয়তার দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। তিনি আরবের রাজা মালিক বিন ফাহম আদ-দাওসি আল-আজদির বংশধর। তিনি একজন ভাষা পণ্ডিত, আরব লেখক এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ আরব কবি। তার সম্পর্কে বলা হয়, ইবনে দুরায়দ কবি ও পণ্ডিতদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী। তিনি ৩২১ হি. মোতাবেক ৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করন।

18 . মুহাম্মদ ইউসুফ ফার্বান, *আবুত্ ত্বায়্যিব আল-মুতানাব্বী নাশীদুস সাহ্রা আল-খালিদ*, ১ম সং, বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯০, পৃ. ৩৩-৩৪।

19 . আহমাদ আল-ইসকান্দী ও মোস্তফা আনানী, *আল-মুফাস্সাল ফী তারীখিল আদাবিল আরবী*, ড. হাস্আন হাল্লাক সম্পা., বৈরুত : দারু ইহ্য়াইল উলূম, ১৯৯৪, পৃ. ২৭২।

আল-মুতানাব্বী ভাবের কবি; শব্দের দিকে বেশি ভ্রুক্ষেপ না করে অর্থের প্রতিই সজাগ দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন তিনি। কবিতায় কাব্য ও দর্শনের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। আরবি কবিতাকে আবু তাম্মাম যেসব শর্তে গণ্ডিবদ্ধ করেছেন এবং অলংকারবিদরা যে সাজসজ্জার প্রলেপ মেখেছেন, তা হতে তিনি একে মুক্তি দিয়েছেন। আরবদের গতানুগতিক রীতিনীতি হতে তিনি বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। আল-মুতানাব্বীকে আরবি কবিতায় সংস্কার আন্দোলনের প্রবর্তক বলা যায়। তাঁর কবিতায় প্রবাদ ও নীতিবাক্যের সমাহার লক্ষ করা যায়। যুদ্ধের অভিনব বর্ণনা, চমৎকার উপমা উৎপ্রেক্ষা, একই পঙ্‌ক্তিতে দুই উপমার ব্যবহার, রূপকের অসাধারণ প্রয়োগে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কবিতায় স্বীয় ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদাকে তুলে ধরতে এবং স্বাধীন মত প্রকাশে আত্মনিষ্ঠ হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁকে অতুলনীয় বলতে হবে।[২০]

আল-মুতানাব্বীর কবিতায় জনপরিবেশের প্রভাব সুস্পষ্ট। হিজরি ৪র্থ শতাব্দীর গণমানুষের সার্বিক অবস্থা তাঁর কবিতায় চিত্রায়িত হয়েছে। একইভাবে কবির মানসিক অস্থিরতা, তীক্ষ্ণ মেজাজ ও কঠিন স্বভাবও যথার্থভাবে প্রতিবিম্ব হয়েছে এতে। শৈশব হতে কবি যে পরিবেশে লালিত হয়েছেন, তাতে কেবল তরবারির ঝনঝনানিই শুনতে পেয়েছিলেন; আরব সাম্রাজ্য তখন ভাঙন ও বিভক্তির মুখে খণ্ডরাজ্যের রূপ ধারণ করে। মুসলমান ও রোমকদের মাঝে সংঘটিত বহু যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী কবি আল-মুতানাব্বী। তখন তিনি ছিলেন সাইফুদ্দৌলার একান্ত সহচর। ফলে যুদ্ধের বর্ণনা, বর্শা ও তরবারির আঘাতের আওয়াজ সুনিপুণভাবে অনুরণিত হয়েছে তাঁর লেখনীতে; এবং এই শিল্পে তথা যুদ্ধের শৈল্পিক বর্ণনায় সমসাময়িক অপরাপর কবিকে ছাড়িয়ে গেছেন আল-মুতানাব্বী।[২১]

বস্তুত কবি আল-মুতানাব্বীর কবিতায় খণ্ডিতভাবে কিছু দোষত্রুটি থাকলেও তুলনামূলকভাবে তাঁর কবিতার সৌন্দর্য অনেক বেশি। আল-মুতানাব্বীর কবিতা সমকালীন যুগ ও তাঁর ব্যক্তি মানসের প্রতিচ্ছবি। এটি তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা, স্বীয় অভিলাষ ও শক্তিশালী চরিত্রের দর্পণস্বরূপ। তাঁর মৃত্যু-সহস্রবার্ষিকী ইতোমধ্যেই পূর্তি হয়েছে; অথচ তাঁর কবিতা পাঠকসমাজের হৃদয়ে অদ্যাবধি জাগরূক হয়ে আছে। জীবদ্দশায় ক্ষমতালিপ্সু কবি তাঁর প্রত্যাশিত শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে না পারলেও মৃত্যুর পর তিনি ঠিকই সাহিত্য-পিপাসুদের অন্তরে স্থায়ীভাবে সমাসীন হতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর রচিত কবিতাতেই তিনি চিরঞ্জীব হয়ে থাকবেন। কবি নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিদ্বয়ে যথার্থ ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন।

وما الدهر إلا من رواة قلائدى * إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا

فسار به من لا يسير مشمرا * و غنى به من لا يغني مغردا

---

[20] . আহমদ হাসান আয্-যয়্যাত, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, বৈরুত, দারুল মা'আরিফ, ১৯৯৩ খ্রি.,পৃ ২১৯।

[21] . আবুল বাকা' আল-আকবারী, *শারহু দীওয়ান আবিত্ ত্বায়্যিব আল-মুতানাব্বী*, মুস্তফা আস্-সাক্কা ও অন্যান্য সম্পা., বৈরুত : দারুল মা'রিফা, তা.বি., ক. ১, পৃ. ওয়া।

"যুগে যুগে লোকেরা আমার মুক্তামালা সদৃশ কবিতা বর্ণনা করতে থাকবে। যখনই কোনো কবিতা আমি বলি তখনই লোকেরা এর আবৃত্তিকার হয়ে যায়,

আমার কবিতা পেলে অপ্রস্তুত ব্যক্তিও পথ চলতে তৎপর হয়ে যায়; যে কখনো গায়নি, সেও আমার কবিতা পেলে সুরারোপ করে গাওয়া আরম্ভ করে।" [২২]

বাস্তবেই আরবি সাহিত্যের ইতিহাসে কবি আল-মুতানাব্বী এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব, যিনি বহুবিধ জ্ঞানের যেমন অধিকারী ছিলেন, তেমনি বিচিত্র দুষ্টচক্রও তাঁর জীবনচক্রে একাকার হয়েছিল। উচ্চমানের প্রতিভা ও উন্নত স্বভাব যেমন লালন করতেন, তেমনি বিদ্রোহী চরিত্র ও রূঢ় পন্থা অবলম্বনেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।[২৩] এতদসত্ত্বেও আব্বাসীয় যুগের সবচেয়ে খ্যাতিমান কবি হলেন আল-মুতানাব্বী। সমকালীন আরব দুনিয়াতেই কবির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। কেননা, প্রাচ্যীয় রাজকুটিরেই কবির জীবনের অধিকাংশ সময় কাটে। হামদানী, ইখশিদী ও বুয়াইহী শাসকদের দরবার এবং তৎকালীন মুসলিম রাজধানী বাগদাদ, আলেপ্পো, কুফা ও সিরাজ নগরী ছিল কবির বিচরণক্ষেত্র। ফলে উক্ত স্থানের শাসককুল, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী সকলেই কবিকে যেমন ভালোভাবে চিনে নেন, তেমনি তাঁদের মাধ্যমে কবির পরিচয়ও জগৎবিস্তৃত হয়।[২৪]

---

[22] . আবুল বাকা' আল-আকবারী, *শারহু দীওয়ান আবিত্ ত্বায়্যিব আল-মুতানাব্বী*, মুস্তফা আস্-সাক্কা ও অন্যান্য সম্পা., বৈরুত : দারুল মা'রিফা, তা.বি., খ. ১, পৃ. ২৯০-২৯১।

[23] . হান্না আল-ফাখূরী, *আল-জামি' ফিল আদাবিল আরাবী ওয়া তারীখিহী*, ২য় সং, বৈরুত : দারুল জীল, ১৯৯১, খ. ১, পৃ.৭৮৬।

[24] . ড. মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী, *প্রাচীন আরবী কবিতা : ইতিহাস ও সংকলন*, আহমাদিয়া প্রিন্টিং প্রেস, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, দ্বিতীয় সং. জানু. ২০১৯, পৃ ৬৬৭-৬৬৮।

২য় পরিচ্ছেদ

কবিতার জগৎকে সমৃদ্ধিদান

আল্-মুতানাব্বী ছিলেন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী একজন নামকরা কবি। তিনি আরবি সাহিত্যে কবিতার জগৎকে স্বীয় অবদানে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি ভাষাসাহিত্যে অসামান্য দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। তাঁকে চতুর্থ শতাব্দীর অভিযান নেতৃত্বদানকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করা হয়।[২৫]

বাশ্শার ইব্ন বুরদের (৯৬-১৬৮ হি.)[২৬] হাতে যে আধুনিক কাব্যের উৎপত্তি এবং আবু নুয়াসের (৭৫৬-৮১৪ খ্রি.)[২৭] হাতে যার বিকাশ, তাকে আল-মুতানাব্বী পরিণতি দান করেন। তিনি আরবি সাহিত্যে এমন

---

[25]. *সীওয়ানুল মুতাক্বাফফী শরহে দীওয়ানুল মুতানাব্বী*, অনুবাদ : মুফতী মুতীউর রহমান, ঢাকা : মাকতাবাতুল ফাতাহ বাংলাদেশ, ২০১৪, পৃ. ১০।

[26] . আরবি সাহিত্যের এক জন্মান্ধ কবি বাশ্শার ইব্নে বুর্দ। তিনি ৭১৪ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আব্বাসীয় যুগের প্রারম্ভিককালের সংস্কারপন্থি কবিদের অগ্রদূত, ক্লাসিক্যালোত্তর সৃষ্টিশীল কাব্য সাহিত্যের প্রথম দ্রষ্টা ও অনন্য প্রতিভার অধিকারী কবি বাশ্শার ইব্নে বুর্দ। উমাইয়া (৬৫১-৭৫০ খ্রি.) ও আব্বাসীয় (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) উভয় যুগই তিনি পেয়েছেন, তবে আব্বাসীয় যুগেই তাঁর কাব্যপ্রতিভার বিকাশ ঘটে এবং প্রচার ও প্রসার লাভ করে। আজন্ম অন্ধ হয়েও গজল, হিজা, মাদাহ, হিকমাত, মারছিয়াসহ কাব্যের প্রায় সকল শাখায় তাঁর স্বচ্ছন্দ পদচারণা ছিল অভাবনীয়। জীবনের প্রথম দিকে মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ওয়াসিল ইব্নে আতার (মৃ. ৭৪৮ খ্রি./১৩১ হি.) সাথে কবির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং তাঁর মতাদর্শে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে কবি বাশ্শার নৈরাশ্যবাদী দর্শনের প্রবক্তা ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষের ইচ্ছেশক্তি বলতে কিছুই নেই। কবি বাশ্শারের মধ্যে জাত্যাভিমান ছিল প্রচণ্ড। আরবীয় পরিবেশে তিনি বেড়ে উঠলেও পারসিক বংশোদ্ভূত হওয়াতে তাঁর কবিতায় আরবদেরকে তুচ্ছ প্রতিপন্ন করার এবং পারস্যদের মর্যাদা ঊর্ধ্বে তুলে ধরার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। গজল, হিজা, মাদাহ, হিকমাত, মারছিয়া তথা শোকগাথাসহ তৎকালীন কাব্যজগতের প্রায় সকল শাখায় কবি বাশ্শার ইব্নে বুর্দের স্বচ্ছন্দ পদচারণা ছিল। তবে প্রথমোক্ত তিনটি বিষয়ে (গজল, হিজা, মাদাহ) তিনি সমধিক কবিতা রচনা করে কাব্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। বাশ্শারের রচনাবলির বৃহদাংশ সংরক্ষণের অভাবে কালের অতল গহ্বরে হারিয়ে গেছে। ঐতিহাসিক জুরজী যায়দান কবি রচিত কাসিদার সংখ্যা প্রায় ১২ হাজার বলে উল্লেখ করেছেন। কাব্য রচনার ক্ষেত্রে জাহেলি যুগে যে সমস্ত নিয়ম-কানুন চলে আসছিল, বাশ্শার ইব্নে বুর্দ কবিতা রচনার ক্ষেত্রে সেই নিয়ম পরিবর্তন করে একটা নতুন ধারার প্রবর্তন করেন। এই প্রতিভাবান কবি ৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

[27] . আব্বাসীয় খিলাফতের প্রারম্ভিক পর্বে যখন বিলাসিতা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও অনৈতিকতার সয়লাব চলছিল, ঠিক তখনই কবি আবু নুয়াসের আবির্ভাব ঘটে। তিনি ১৪৫ হিজরি মোতাবেক ৭৬২ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করন। বসরা, কুফা ও বাগদাদের প্রধান প্রধান বিনোদনকেন্দ্র ও মদ্যশালাগুলো ছিল কবির বিচরণক্ষেত্র। ফলে একদিকে যেমন কবি অতিমাত্রায় মদ্যাসক্ত হয়ে পড়েন, অপরদিকে কবির মধ্যে ধর্মীয় অনুশাসনের ভিত একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ে। স্বভাবতই এসবের প্রভাব আবু নুয়াসের কবিতায় দেদীপ্যমান। কবি নিজের কবিতাকে বাস্তব জীবনের সঠিক প্রতিচ্ছবি হিসেবে দাঁড় করানোর প্রয়াস পেয়েছেন। সাহিত্য ও বাস্তবতার মাঝে তিনি কোনো দেয়াল নির্মাণের চেষ্টা করেননি, কোনো রাখঢাক রাখেননি, যেমনটি তাঁর পূর্ববর্তী অধিকাংশ কবি করে গিয়েছেন। ফলে আমোদ-ফুর্তি ও মদ্যপানের কথা কবি খোলাখুলি তাঁর লেখনীতে আলোচনা করেছেন। বিশেষত মদের বর্ণনায় অন্য কোনো আরব কবি তাঁর সমকক্ষ হতে পারেননি। আবু নুয়াস ধর্ম ও ভোগের মাঝে উদ্ভট সমন্বয় সাধন করেছেন। তাঁর ধর্ম-দর্শন হচ্ছে, আল্লাহ হলেন উদার ও ক্ষমাশীল; শিরক ব্যতীত তিনি যেকোনো অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন। এই দর্শনের ভিত্তিতে কবি নির্ভয়ে শরিয়তনিষিদ্ধ অশ্লীল কাজে বেপরোয়াভাবে লিপ্ত হতেন এবং এতে গর্ববোধ করতেন। এমনকি শরাব নিষিদ্ধসংক্রান্ত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিস নিয়ে তিনি নিজ কবিতায় উপহাস করেছেন এবং এ ক্ষেত্রে নিজেকে শয়তানের অনুসারী হওয়ারও ঘোষণা দিয়েছেন। আবু নুয়াসের কবিতায় যে পাপাচারিতা ও ধর্মহীনতার চর্চা স্থান পেয়েছে তা সমকালীন বাগদাদ, বসরা ও কুফার সামগ্রিক চিত্র নয়; বরং কিছু বিলাসী মানুষের খণ্ডচিত্র। কেননা একই সময়ে এতদঞ্চলে তাফসির, হাদিস, ফিকাহ ও ইসলামি দর্শনের ব্যাপক চর্চা হয়েছিল এবং ইসলামি রেনেঁসার সূত্রপাত হয়েছিল। তবে এত বিশাল সাম্রাজ্যে বিচিত্র জাতির হাজার হাজার নাগরিককে আইনের বলয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা কঠিন বৈকি। আবু নুয়াস আব্বাসীয় যুগের একজন সব্যসাচী কবি। বহুমাত্রিক কবি হিসেবে তাঁর প্রসিদ্ধি রয়েছে। বেদুইনী রীতি হতে বেরিয়ে এসে তিনি কবিতায় নগররীতি প্রবর্তন করেন। মরুতে অবস্থিত প্রিয়ার পরিত্যক্ত বাস্তুভিটাকে বাদ দিয়ে নগরের মদ্যশালার দিকে আহ্বান জানান তিনি। বেদুইনের রুক্ষ জীবনের চেয়ে নগরবাসীর প্রমোদ জীবন তার কাছে অনেক প্রিয়। এই সব্যসাচী কবি ১৯৯ হিজরি মোতাবেক ৮১৫ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

নতুনত্ব দান করেন, যাকে অতিক্রম করা পরবর্তী সময়ে কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাঁর সবচেয়ে বড়ো অবদান হচ্ছে কবিতার আঙ্গিক নির্মাণ ও প্রকাশ কৌশলের অভিনবত্ব আনয়ন। এ কারণে সে সময় তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। তিনি ছিলেন স্বভাব কবি।[২৮] তাঁর কবিতার স্বরূপকে চারভাগে ভাগ করা যায়।[২৯] যেমন–

১. কিছু কবিতায় তিনি বুহতুরী ও আবু তাম্মামের অনুসরণ করেছেন। এ স্তরে তাঁর খুব বেশি কবিতা নেই।

২. নবুয়ত দাবি করার কবিতাসমূহে তাঁর রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও স্বাধীন চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়েছে।

৩. কিছু কবিতায় তিনি খলিফা, আমির-ওমারাহ, বাদশাহ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের প্রশংসা ব্যক্ত করেছেন।

৪. সাইফুদ্দৌলা এর দরবারে থাকাবস্থায় তিনি কখনো তাঁর দানের প্রশংসায়, কখনো তাঁর বীরত্বগাথা বর্ণনায়, কখনো তাঁর যুদ্ধের বর্ণনায় আবার কখনো তাঁর শোকগাথা বর্ণনায় কবিতা রচনা করেছেন।

আল্-মুতানাব্বী তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে বহুমুখী কবিতা রচনা করেন। তাঁর কবিতায় আঙ্গিক গঠন, শব্দচয়ন ও ভাবের সমন্বয় সাধনের অপূর্ব শিল্পশৈলীর পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর কবিতায় স্বীয় স্বকীয়তা এমন সমৃদ্ধ যে, এর পরিবর্তন, সংযোজন বা অপসারণ করা কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না। আবুল আ'লা আল-মাআর্‌রী[৩০] অনুরূপ কবিতা রচনার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে তিনি কবিতাকে পূর্ব পদ্ধতির জিঞ্জির থেকে মুক্ত করে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কবিতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাঁর দৃঢ় ইচ্ছা, আত্মপ্রত্যয়,

---

28. *দীওয়ানু আল-মুতানাব্বী*, ই'যায আলী সম্পা., করাচি; মাকতাবাতুল বুশরা, ১ম সং, ২০১১, পৃ. ২৯৫।

29 . আবুল বাকা' আল-আকবারী, *শারহু দীওয়ান আবিত্ ত্বায়্যিব আল-মুতানাব্বী*, (বৈরুত : দারুল মা'রিফা), খ. ১, পৃ. ৩৩৮।

30 . কবি আল্-মা'আররী ছিলেন কবি আল্-মুতানাব্বীর পরবর্তী দার্শনিক কবি। তিনি ৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে সিরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। আরবী সাহিত্যের পণ্ডিতগণ মনে করেন আল্-মুতানাব্বীর পর আল্-মা'আররীর ন্যায় আর কোনো কবি তাঁর সমকক্ষতা অর্জন করতে পারেননি। কবি আল-মা'আররীর বয়স যখন চার বছর তখন তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। জীবনের উষালগ্নের এই দুর্ঘটনা তাঁর লেখনী ও চিন্তায় গভীর রেখাপাত করে। তবে এই অন্ধত্ব কবির জ্ঞানারোহণের ক্ষেত্রে অন্তরায় হতে পারে নি। পিতার কাছ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর জ্ঞানান্বেষণের মানসে সিরিয়ার নানা প্রান্তে কবি সফর করেন। মা'আর্‌রাতুন নু'মান ছেড়ে আলেপ্পো, আনতাকিয়া, তারাবলিসসহ বহু স্থানে গমন করেন এবং তথাকার বিদোৎসাহী ও ধর্মযাজকদের মজলিসে বসে বিচিত্র জ্ঞান ও মতাদর্শের সাথে পরিচয়লাভ করেন। এরপর বিচিত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের তৎকালীন বিদ্যাপীঠ বাগদাদে গমন করে গ্রিক ও ভারতীয় দর্শনজ্ঞান আহরণ করেন। কবি আবুল আলা আল-মা'আররী আরবি সাহিত্যের ইতিহাসে নির্দিষ্ট ধর্ম-দর্শন লালনকারী ব্যতিক্রমধর্মী এক কবি। তিনি তাঁর জীবনদর্শন 'আল-লুযূমিয়্যাত' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। কবি আবুল আলা আল-মা'আররী মানব জীবনকে চটকদার ও তাৎপর্যহীন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তবে এরই মাধ্যমে তিনি জীবন-মৃত্যুর আসল চিত্র চিত্রায়িত করার প্রয়াস পেয়েছেন। মানবদেহকে কবি আত্মার জন্য একটি 'কদর্য পাত্র' হিসেবে চিহ্নিত করেন। মানুষের আত্মা মৃত্যুর জন্য উৎসুক হয়ে আছে অথচ মানুষ ছুটছে ভ্রান্তিময় পৃথিবীর দিকে। পৃথিবীতে মানুষ একে অপরকে চটকদার ও মুখরোচক কথা বলে ঠকবাজি ও প্রতারণা করতেই অভ্যস্ত। ধোঁকাবাজিতে ভরপুর প্রার্থিব জীবনকে মানুষ ভালোবাসে; অথচ তার অনিবার্য পরিণতি মৃত্যু তথা পরকাল; আর ঐ পথেই সে এগিয়ে যাচ্ছে। মানুষ যতবড় শক্তিধর কিংবা সুখী সমৃদ্ধশালী হোক না কেন তাকে প্রতিদিন পরকালের পথে হাঁটতে হচ্ছে। কোনো মনীষীর বাণী, কোনো দার্শনিকের দর্শন কিংবা কোনো বিজ্ঞানীর সূত্র মৃত্যুকে প্রতিহত করতে পারবে না। যেমনটি দর্শনের জনক সক্রেটিস এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক হিপোক্রেটিসও মৃত্যু থেকে রক্ষা পান নি। এই মহান কবি ১০৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সিরিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন।

সৃষ্টি রহস্য ইত্যাদি বিষয় কবিতায় পরিস্ফুটিত হয়েছে। যা যুগ-যুগ ধরে কবি ও সাহিত্যিকদেরকে অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে। তিনি কাব্য ও দর্শনের সমন্বয় সাধন করেছেন। স্তুতিবাদে তিনি ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি।[৩১] আল-মুতানাব্বী সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। এটি সর্বসম্মতিক্রমেই স্বীকৃতি পেয়েছিল। তাঁর কবিতায় বেশকিছু গুণাগুণ পরিলক্ষিত হয়। আরবি কবিতায় প্রাচীন রীতির পরিবর্তে আধুনিক রীতি প্রবর্তনের মাধ্যমে তিনি আবু তাম্মাম ও তাঁর অনুসারীদেরকে কবিতার বন্দিত্ব অবস্থা হতে মুক্ত করেছিলেন। তিনি আরবি কবিতায় Romantic style প্রবর্তন করেন।[৩২] R.A Nicholson এর Literary of the Arab-এ মুতানাব্বী এর কবিতার পাঁচটি বিশেষ গুণ তিনি আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য তিনটি গুণ হলো–[৩৩]

১. إستعمال ألفاظ الغزل و النسيب فى أوصاف الحرب যেমন-

مجد شجاع كان الحرب عاشقه له * إذا زارها فدته بالخيل والرجل

২. البدع فى سائر التشبيهات و التمثيلات যেমন-

إن نهارى ليلة صد لهمة * على مقلة من قفدكم فى مخياهر

৩. حسن التشبيه بغير أداة التشبيه যেমন :

بدت قمرا و ما لك غصن بان * وفاصت عنبرا رنت عزالا

কবি আল-মুতানাব্বী (৯১৫-৯৬৫ খ্রি.) ছিলেন আব্বাসীয় যুগের (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি কবিতার জগৎকে সমৃদ্ধি দিয়েছেন। তাঁর কবিতায় তিনি কাব্য ও দর্শনের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। কবিতা রচনায় তিনি আরবদের গতানুগতিক রীতিনীতি হতে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁকে আরবী কবিতায় সংস্কার আন্দোলনের প্রবর্তক বলা যায়। তাঁর কবিতায় প্রশংসা, নিন্দা, শোক, বীরত্বের বর্ণনা, যুদ্ধের বর্ণনাসহ চমৎকার উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও রূপকের অসাধারণ প্রয়োগ পাওয়া যায়।[৩৪] যেমন, তাঁর প্রশংসামূলক কবিতার কতিপয় পঙ্‌ক্তি; যা তিনি আব্বাসীয় যুগে আবু আলী হারুন ইব্‌ন আবদুল্লাহ 'আল-কাতিব' পদধারী একজন দানবীর ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে রচনা করেছিলেন। এতে তিনি প্রশংসিত আবু আলীর দানশীলতা, বদান্যতা ও সাহসিকতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁর দানশীলতার বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি নানা উপমা ও রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করেন। যেমন–[৩৫]

---

31 . আবুল আলা' আহমাদ ইব্‌নে আবদিল্লাহ আল-মাআর্‌রী, *আল-লামেউল আযিযী শরহু দেওয়ানিল মুতানাব্বী*, মারকাযুল মালিক ফয়সাল লিল বুহুসে ওয়াদ দিরাসাতিল ইসলামিয়া; সৌদি আরব, ১৪২৯ হি., পৃ ১৩-২২।

32 . আবদুর রহমান আল-বারকূকী, *শারহু দীওয়ান আল-মুতানাব্বী*, (বৈরুত : দারুল কিতাব আল-আরবী, ২০০৭), খ. ১, পৃ. ৪০৯।

33 . মাহমূদ মুহাম্মদ শাকির, *আল-মুতানাব্বী*, কায়রো : মাতবা'আতু আল-মাদানী, তা. বি., খ. ১, পৃ ১৯২।

34 . মাহমূদ মুহাম্মদ শাকির, *আল-মুতানাব্বী*, কায়রো : মাতবা'আতু আল-মাদানী, তা. বি., খ. ১, পৃ ১৯২।

35 . আবদুর রহমান আল-বারকূকী, *শারহু দীওয়ান আল-মুতানাব্বী*, (বৈরুত : দারুল কিতাব আল-আরবী, ২০০৭), খ. ১, পৃ. ৪৫৮।

شم الجبال و مثلهن رجاء ** بينى وبين ابى على مثله

وهو الشتاء و صيفهن شتاء ** وعقاب لبنان و كيف بقطعها

فكأنها ببياضها سوداء ** لبس الثلوج بها علي مسالكي

سال النضار بها وقام الماء ** وكذا الكريم إذا أقام ببلدةٍ

بهتت فلم تتبجس الأنواء ** جمد القطار ولو رأته كما رأى

حتى كان مداده الاهواء ** فى خطة من كل قلب شهوة

حتى كان مغيبه الاقذاء ** ولكل عين قرة فى قربه

في القول حتى يفعل الشعراء ** من يهتدي في الفعل مالا يهتدي

في قلبه ولأذنه إصغاء ** في كل يوم للقوافي جولة

في كل بيتٍ فيلق شهباء ** وأغاره فيما احتواه كأنما

أن يصبحوا و هم له أكفاء ** من يظلم اللؤماء فى تكليفهم

وبضدها تتبين الاشياء ** ونذيمهم و بهم عرفنا فضله

فى تركه لو تفطن الاعداء ** من نفعه فى ان يهاج و ضره

بنواله ما تجبر الهيجاء ** فالسلم يكسر من جناحي ماله

وترى برؤية رأيه الآراء ** يعطي فتعطى من لهى يده اللهى

فكانه السراء و الضراء ** متفرق الطعمين مجتمع القوى

متمثلا لوفوده ما شاؤوا ** وكانه ما لا تشاء عداته

إذ ليس يأتيه لها استجداء ** يا ايها المجدى عليه روحه

অর্থ :

১. আমি এবং আবু আলীর (হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ) মাঝে পাহাড়চূড়া সম তফাত; এবং তাঁর ব্যাপারে প্রত্যাশাও পাহাড় পরিমাণ।

২. এবং লুবনান পর্বতের গিরিপথ। এই শীত মৌসুমে আমি এটি কীভাবে অতিক্রম করব? অথচ এর গ্রীষ্মকালটা শীতকালের মতো (দুর্গম)।

৩. এর বরফখণ্ড আমার চলার পথকে আচ্ছাদিত করে ফেলেছে; ফলে এ যেন শুভ্রতার কারণে (অন্ধকারে পথচলার ন্যায়) কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করল।

৪. (বরফের শুভ্রতা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করা যেমন রীতিবিরুদ্ধ ঠিক) তেমনি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও যখন কোনো নগরীতে অবস্থান করে তখন স্বর্ণমুদ্রা প্রবাহিত হয় এবং পানি প্রবাহবিহীন হয়ে যায়। (উক্ত ব্যক্তির বদান্যতা দেখে সবাই হতভম্ব হয়ে যায়)।

৫. (তাঁর বদান্যতা দেখে) বৃষ্টিবিন্দু জমাটবদ্ধ হয়ে যায়। বৃষ্টির অস্তগামী তারকা যদি তাঁকে দেখে তাহলে হতভম্ব হয়ে যায় এবং আর বৃষ্টি ঝরায় না। (বৃষ্টির তারকা তাঁর বদান্যতা দেখে লজ্জিত হয়ে যায়, ফলে তাঁর সম্মানার্থে আর বারি বর্ষণ করে না)।

৬. তাঁর হস্তলিপিতে প্রত্যেক মানবমনের আসক্তি রয়েছে; যেন মানুষের মনস্কামনাই এর কালি (তাঁর লেখায় জনসাধারণের চিন্তাচেতনার প্রতিফলন রয়েছে)।

৭. তাঁর নৈকট্য প্রতিটি চোখের জন্য শীতলতা (তাঁর সান্নিধ্য সবার কাছে আকাঙ্ক্ষিত ও প্রীতিকর)। যার ফলে তাঁর অনুপস্থিতি পীড়াদায়কের মতো।

৮. তিনি (আবু আলী হারুন) এমন ব্যক্তিত্ব, যিনি স্বীয় কীর্তি দিয়ে সুপথ প্রদর্শন করে; সুতরাং তিনি সুকর্ম সম্পাদন না করা পর্যন্ত কবিরা স্বীয় বক্তব্যে (প্রশংসাগীতিতে) সঠিকভাবে পরিচালিত হয় না।

৯. প্রতিদিনই তাঁর অন্তরে ও শ্রবণে কবিতার ছড়াছড়ি (কবিগণ প্রশংসায় তাঁর মজলিস মুখরিত রাখে।

১০. কবিতা তাঁর সঞ্চিত সম্পদকে প্রতিদিনই লুট করে নিচ্ছে (প্রশংসাগীতিকাররা উপঢৌকন নিয়ে যাচ্ছে); যার ফলে কবিতার প্রতিটি পঙ্‌ক্তি যেন একজন দক্ষ সেনা সদস্য (যারা তাঁর সম্পদ উপঢৌকনস্বরূপ হরণ করে নিচ্ছে)।

১১. যিনি হীন ব্যক্তিদের অবিচার করে, যারা (বিদ্বেষবশত) তাঁর সমকক্ষ হওয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত।

১২. আমরা হীন ব্যক্তিদের নিন্দা করি বটে, তবে তাদের দিয়েই (তুলনা করে) তাঁর (আবু আলীর) পরিচয় পাই। বস্তুত বৈসাদৃশ্য দিয়েই বস্তুর প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পায়।

১৩. তাঁকে ক্ষেপিয়ে তোলাটা লোকের জন্য লাভজনক (কেননা, তখন ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি প্রতিপক্ষের মাল লুটে নেবেন)। আর তাঁকে না ক্ষেপিয়ে এমনিতেই ছেড়ে দেওয়া জনসাধারণের জন্য অলাভজনক। বিষয়টি যদি তাঁর শত্রুরা উপলব্ধি করত!

১৪. শান্তিকালীন অবস্থা তাঁর সম্পদের ক্ষতিসাধন করে, যা যুদ্ধকালে (গনিমতের মালের মাধ্যমে) তিনি অর্জন করেন।

১৫. তিনি এত বেশি দান করেন যে, তাঁর হস্তপ্রদত্ত দান হতে অন্যরা দান করে (তাঁর উপকারভোগকারীরাও দাতা হয়ে যায়); এবং তাঁর প্রদত্ত রায় হতে অন্যরা দিকনির্দেশনা লাভ করে।

১৬. তিনি স্বাদের দিক থেকে দুই স্বাদে বিভক্ত (মিত্রদের জন্য মিষ্টি ও শত্রুদের জন্য তিক্ত), ফলে তিনি যেন একই সাথে আনন্দ ও বেদনা; তবে ক্ষমতায় অবিভক্ত।

১৭. তিনি যেন তাঁর শত্রুদের নিরাকাঙ্ক্ষা এবং তাঁর শরণাগতদের আকাঙ্ক্ষার প্রতিকৃতি।

১৮. ওহে ঐ ব্যক্তি! যার আত্মা বদান্যতার ওপর স্থাপিত; কেননা, কোনো দানপ্রার্থী তাঁর কাছে আসতে হয় না।

ভর্ৎসনামূলক কবিতা রচনায়ও কবি আল-মুতানাব্বীর জুড়ি মেলা দায়। আলেপ্পোর শাসক সাইফুদ্দৌলা আল-হামদানী (৯১৫-৯৬৭ খ্রি.) কবি আল-মুতানাব্বীর ওপর অন্য কবিকে প্রাধান্য দেওয়ায় তিনি আলোচ্য কবিতা রচনা করেন। কবি বলেন, আমার হৃদয় সাইফুদ্দৌলার ভালোবাসায় অস্থির হলেও আমার জন্য তাঁর অন্তরে কোনো উপলব্ধি নেই। যদি ভালোবাসা অনুপাতে উপঢৌকন বণ্টিত হতো, তবে আমি বিশাল একটি অংশ লাভ করতাম; কিন্তু তিনি আমার ভালোবাসার অবমূল্যায়ন করেছেন। তাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও বিচক্ষণতা প্রশংসার দাবি রাখলেও তিনি আলো ও অন্ধকারের মাঝে তথা ভালো ও মন্দের মাঝে পার্থক্য সূচনা করতে পারেননি। তার দু-চোখ থেকেও কোনো লাভ নেই।[৩৬] কবি বলেন, অন্ধ, বধির সকলেই আমার সাহিত্যের সাথে সুপরিচিত। সুতরাং যারা আমাকে হিংসা ও অবমূল্যায়ন করে তারা হালে পানি পাবে না। এরপর সাইফুদ্দৌলাকে উদ্দেশ্য করে কবি অনেকগুলো নিন্দামূলক কবিতা রচনা করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পঙ্‌ক্তি হচ্ছে–[৩৭]

إن المعارف فى اهل النهى ذمم ** وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة

ويكره الله ما تأتون والكرم ** كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم

أنا الثريا وذان الشيب والهرم ** ما أبعد العيب والنقصان من شرفي

يزيلهن إلى من عنده الديم ** ليت الغمام الذي عندي صواعقه

لا تستقل بها الوخادة الرسم ** أرى النوم تقتضيني كل مرحلةٍ

ليحدثن لمن ودعتهم ندم ** لئن تركن ضميرًا عن ميامننا

ألا تفارقهم فالراحلون هم ** إذا ترحلت عن قومٍ وقد قدروا

وشر ما يكسب الإنسان ما يصم ** شر البلاد مكان لا صديق به

---

[36] . ড. উমার ফাররূখ, *তারীখুল আদাবিল আরাবী*, ৫ম সং, বৈরুত : দারুল ইলম লিল মালাঈন, ১৯৮৪, খ. ২, পৃ ৪৫।

[37] . আবদুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৭০।

شهب البزاة سواء فيه والرخم ** وشر ما قنصته راحتي قنص

تجوز عندك لا عرب ولا عجم ** بأي لفظٍ تقول الشعر زعنفة

قد ضمن الدر إلا أنه كلم ** هذا عتابك إلا أنه مقة

অর্থ :

১. আমাদের (আপনার এবং আমার) মাঝে হৃদ্যতা না থাকলেও চেনাজানা তো রয়েছে, যদি একে আপনি বিচার্য (মাপকাঠি) ধরেন। আর জ্ঞানী ব্যক্তির মাঝে পরিচয়ের বিষয়টিও দায়দায়িত্ব পালন পর্যন্ত বর্তায় (জ্ঞানী ব্যক্তি পরিচয়ের সূত্র ধরেই উপকার করার দায়িত্ব পালন করে)।

২. আমাকে অভিযুক্ত করার জন্য আপনি আর কত ছিদ্রান্বেষণ করবেন (দোষ খুঁজবেন)? তবে আপনি ব্যর্থ হচ্ছেন। আপনি যা করছেন তা আল্লাহ অপছন্দ করেন এবং এটি মহত্ত্বেরও পরিপন্থি।

৩. আমার মর্যাদাগত অবস্থান দোষত্রুটি ও বিচ্যুতি হতে অনেক দূরে (আমার অবস্থান দোষত্রুটির ঊর্ধ্বে)। আমি সপ্তর্ষিমণ্ডল, আর ঐ দুটি শুভ্র চুল ও বার্ধক্য (উভয়ের মাঝে বহু ব্যবধান)।

৪. হায় মেঘমালার (সাইফুদ্দৌলা) বজ্রপাত (ক্রোধ) আমার ওপর, আর এর বৃষ্টিপাত (অনুগ্রহ) এমন ব্যক্তির ওপর যে মুষলধারায় সিক্ত।

৫. আমি লক্ষ করছি, আপনার কাছ থেকে দূরত্ব গোছাতে আমার জন্য অনেক কষ্টদায়ক (আমার ও আপনার মাঝে দূরত্ব দূর করা আমার পক্ষে খুবই কঠিন)। এর প্রতিটি স্তর অতিক্রমণে ধীরগতি কিংবা দ্রুতগতির উট অক্ষম হয়ে পড়ে।

৬. যদি তারা (আমার উটগুলো) ডান পার্শ্বস্থ 'দুমায়র' পর্বত অতিক্রম করে, তবে আমি যাদেরকে বিদায় জানাব এটি তাদের জন্য (সাইফুদ্দৌলার জন্য) লজ্জার কারণ হবে।

৭. যখন তুমি এমন সম্প্রদায় হতে গ্রহণ করো, যারা তোমাকে বিদায় না জানাতে সক্ষম, তবে সেক্ষেত্রে তারাই হবে প্রস্থানকারী (তোমার প্রস্থানে তারা অনুশোচিত হবে)।

৮. সহচরহীন স্থান সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান। আর যা (মানুষকে) অসম্মান করে তা মানুষের জন্য নিকৃষ্ট অর্জন।

৯. আর আমার হস্তার্জিত সবচেয়ে নিকৃষ্ট শিকার হচ্ছে, যেটিতে বাজ পাখির সাথে শকুনও সমান অংশগ্রহণ করেছে (কবির প্রস্থানের পর হীন কবিরা সাইফুদ্দৌলার অনুদানের অংশীদার হলো)।

১০. ঐসব হীন ব্যক্তিরা, যারা আপনার কাছে জড়ো হয়েছে, তারা কোন ভাষায় কাব্য রচনা করবে? যেহেতু তারা আরবও নয় আবার অনারবও নয়।

১১. এটি আপনার বিরুদ্ধে আমার নিন্দাকাব্য; তবে তা মুক্তাখচিত ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ। ব্যতিক্রম এটুকু যে, এই মুক্তা (আসল মুক্তা নয়), এটি হলো শব্দমালার তথা কবিতার (মুক্তা)।

কবি আল-মুতানাব্বী (৯১৫-৯৬৫ খ্রি.) আব্বাসীয় শাসক সাইফুদ্দৌলা আল-হামদানীর (৯১৫-৯৬৭ খ্রি.) একান্ত ভক্ত এবং নিত্য সহচর ছিলেন। রোমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত বহু যুদ্ধে কবি তাঁর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। রোমানদের সাথে সাইফুদ্দৌলার সাহসিকতা, বীরত্ব ও রণ-নৈপুণ্যের ভূয়সী প্রশংসা করে কবি কতিপয় কবিতামালা রচনা করেন।[৩৮] তিনি বলেন, আলেপ্পোর আমির সাইফুদ্দৌলার স্বভাব হচ্ছে শত্রুদের আঘাত করা। কেউ তার ক্ষতিসাধন করতে চাইলে, তাকে আঘাত করতে চাইলে তিনি দ্রুত পাল্টা আঘাতের ব্যবস্থা নেন। তাঁর কারণে (তার গৃহীত কৌশলের কারণে) বহু আত্মম্ভরি লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে। কবি বলেন, সাইফুদ্দৌলা সমুদ্রের ন্যায়, যা শান্ত থাকলে প্রভূত উপকৃত হওয়া যায় আর অশান্ত হলে সমূহ বিপদের কারণ হয়। তিনি কারো প্রতি রুষ্ট হলে তার ক্ষতি অনিবার্য। পৃথিবীর কোনো বাদশাহ তাঁর সাথে মতবিরোধ করে টিকে থাকতে পারেনি; বরং তাঁর কাছে নতজানু হয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে রচিত কবির উল্লেখযোগ্য কবিতার কয়েকটি চরণ হচ্ছে–[৩৯]

على الدر واحذره إذا كان مزبدا ** هو البحر غص فيه إذا كان ساكنا

وهذا الذي يأتي الفتى متعمدًا ** فإني رأيت البحر يعثر بالفتى

تفارقه هلكى وتلقاه سجدا ** تظل ملوك الارض خاشعة له

ويقتل ما يحيى التبسم والجدا ** ويحيى له المال الصوارم والقنا

وعيد لمن سمى وضحى و عيدا ** هنيئا لك العيد الذى أنت عيده

كما كنت فيهم أوحدا كان أوحدا ** فذا اليوم فى الأيام مثلك فى الورى

وأنعلت أفراسى بنعماك عسجدا ** تركت السرى خلفى لمن قل ماله

<u>অর্থ :</u>

১. তিনি (সাইফুদ্দৌলা) সমুদ্র সমতুল্য; সুতরাং এটি যখন শান্ত সমাহিত থাকে তখন মুক্তা আহরণের লক্ষ্যে এতে ডুব দাও। তবে এটি যখন উত্তাল থাকে তখন সতর্কতা অবলম্বন করো।

২. কেননা আমি সমুদ্রকে দেখেছি (তার উত্তাল সময়ে) যুবককে অনিচ্ছাকৃতভাবে ধরাশায়ী করতে (ডুবিয়ে দিতে); আর এই ব্যক্তি (সাইফুদ্দৌলা) তো ইচ্ছাকৃতভাবে যুবককে ধ্বংস করে।

---

38 . *দীওয়ানু আল-মুতানাব্বী*, ই'যায আলী সম্পা., করাচি; মাকতাবাতুল বুশরা, ১ম সং, ২০১১, পৃ. ২৯৮।

39 . আবদুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৭৬।

৩. পৃথিবীর সকল বাদশাহ তাঁর অনুগত হয়ে থাকে। যারা তাঁর সাথে মতবিরোধ করে তারা ধ্বংশপ্রাপ্ত হয়, আর যারা তাঁর সাথে একত্ম হয়ে যায় তারা নতজানু হয়ে থাকে।

৪. ধারালো তরবারি ও বর্শা তাঁর জন্য সম্পদ নিয়ে আসে (গনিমত অর্জিত হয়) এবং তাঁর হর্ষোচ্ছ্বাস ও দানশীলতা উক্ত সম্পদ নিঃশেষ করে দেয় (তিনি যেমন অনেক সম্পদ আহরণ করেন আবার নিজের কাছে জমা না রেখে অকাতরে তা বিলিয়েও দেন)।

৫. ঈদের দিনে আপনাকে অভিবাদন, যার জন্য আপনি ঈদ। যারা আল্লাহর নাম নেয় এবং কুরবানি করে তাদের (সকল মুসলমানের) জন্য আপনি (খুশির) ঈদস্বরূপ।

৬. অন্যান্য দিবসের মাঝে দিবসটি তেমন (খুশির), যেমনটি আপনি অন্যান্য মানুষের মাঝে। আপনি যেমন তাদের মাঝে অনন্য, তেমনি দিবসটিও।

৭. অন্য কোনো অভাবী লোক আমার পেছনে আপনার পথে যাত্রা করুক তা আমি চাইনি। আপনার উপঢৌকনে আমি আমার ঘোড়াকে পর্যন্ত স্বর্ণের পাদুকা পরাতে সক্ষম হয়েছি।

কবি আল-মুতানাব্বী সুন্দর উপস্থাপনায় যুদ্ধের বর্ণনামূলক কবিতা রচনা করেছেন। এরূপ একটি কবিতায় কবি 'আলী ইব্ন আহমাদ ইব্ন আমির আল-আনতাকি'[৪০]-এর প্রশংসা করেছেন। শুরুতে কবি যুগের দুর্বিপাকে ধৈর্য ও ত্যাগের বর্ণনা দিয়েছেন। এরপর অশ্বারোহী বাহিনীর সাথে তার লড়াইয়ের বিবরণ তথা যুদ্ধের বর্ণনা তুলে ধরেছেন। সেই সাথে তার দানশীলতার সুন্দর বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। যেমন–[৪১]

فما المجد ألا السيف والفتكة البكر ** ولا تحسبن المجد زقا وقينة

لك الهبوات السود والعسكر المجر ** وتضريب أعناق الملوك وأن ترى

تداول سمع المرء أنمله العشر ** وتركك في الدنيا دويًا كأنما

على هبةٍ فالفضل فيمن له الشكر ** إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقصٍ

مخافة فقرٍ فالذي فعل الفقر ** ومن ينفق الساعات في جمع ماله

عليها غلام ملء حيزومه غمر ** علي لأهل الجور كل طمرةٍ

[40] . তিনি ৩৬৭ হিজরি সালে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাগদাদেই বসবাস করেন। তার পুরো নাম আবুল কাসেম আলী ইব্নে আহমাদ ইব্নে আমির আল-মুজতাবা আল-আনতাকি। অভিবাসনের চতুর্থ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক ও প্রকৌশলী। তিনি বাগদাদের শাসক আদুদ-দৌলাহ ইব্নে বুওয়ায়ার খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তার বাগ্মিতা, বাগ্মিতার মাধুর্য, অতিপ্রাকৃতিক বুদ্ধিমত্তা এবং অন্তর্দৃষ্টির জন্য তিনি সমসাময়িক যুগে খুবই খ্যাতি অর্জন করেন। শাসক ও রাজকুমাররা তাকে খুব ভালোবাসতেন।

[41] . আবদুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৭৮।

كؤوس المنايا حيث لا تشتهى الخمر ** يدير بأطراف الرماح عليهم

وبحرٍ شاهدٍ أنني البحر ** وكم من جبالٍ جبت تشهد أنني الجبال

من العيس فيه واسط الكور والظهر ** وخرقٍ مكان العيس منه مكاننا

على كرةٍ أو أرضه معنا سفر ** يخدن بنا في جوزه فكأننا

على أفقه من برقه حلل حمر ** ويوم وصلناه بليل كأنما

على متنه من دجنه حلل خضر ** وليل وصلناه بيوم كأنما

অর্থ :

১. শরাব পান আর গায়িকার গান শ্রবণকে কেবল মর্যাদাকর মনে করো না। বস্তুত তরবারি আর দুর্ধর্ষ আক্রমণ ছাড়া মর্যাদার নাগাল পাওয়া যায় না।

২. রাজা-বাদশাদের ঘাড়ে আঘাত হানা এবং রনাঙ্গনে কৃষ্ণকালো ঘূর্ণিবায়ু ও বৃহৎ সেনাদলের সাক্ষাৎ-দর্শন ছাড়া মর্যাদার নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়।

৩. তুমি দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলে তোমার (মহৎকর্মাবলির) প্রতিধ্বনি শোনা যাবে। যেমন দশ আঙুলে কর্ণকুহর বন্ধ করলে তাতে শনশন আওয়াজ শোনা যায় (মানব-কীর্তির প্রতিধ্বনি মৃত্যুর পর শোনা যায়)।

৪. তোমার মর্যাদা তোমাকে হীন লোকের দান-দক্ষিণায় কৃতার্থ হওয়া হতে ঊর্ধ্বে রাখতে না পারলে তবে মর্যাদা তো তারই (হীন লোকের) জন্য; কেননা যার জন্য কৃতজ্ঞতা, মর্যাদা তো তারই প্রাপ্য।

৫. যে ব্যক্তি দারিদ্র্যের শঙ্কায় অর্থসঞ্চয়ে সময় ব্যয় করে; তবে সে যা করছে (নিজেকে বঞ্চিত করে) তাইতো দারিদ্র্য।

৬. জালিমকে প্রতিহত করার জন্য আমার প্রত্যেক দ্রুতগামী ঘোড়া প্রস্তুত; যার ওপর (শত্রুর প্রতি) হিংসাভর্তি বক্ষবিশিষ্ট বালক আরোহী হয়।

৭. সেই বালক বর্শা হাতে মৃত্যু শরাবের পেয়ালা নিয়ে তাদের (জালিম শত্রুদের) ওপর চক্কর দেয়; অবশ্য সেথায় (সেই মুহূর্তে) শরাব পানের ইচ্ছা হয় না।

৮. আমি কত পর্বতমালা অতিক্রম করেছি, যেগুলো এই মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, আমি পর্বতসম (সহিষ্ণুতা ও মর্যাদায়); তদানুরূপভাবে সমুদ্রও সাক্ষ্যদাতা যে, আমি সমুদ্রসম (উদারতা ও বদান্যতায়)।

৯. কতক দিগন্ত বিস্তৃত মরু রয়েছে, যেখানে উটের অবস্থান উটের পিঠ ও শিবিকায় আমাদের অবস্থানের মতো (উটের পিঠে আমাদের যেমন কোনো বিচরণ নাই, তেমনি মরু আয়তন বিশাল হওয়াতে চলন্ত উট যেন ঠাঁই দাঁড়িয়ে আছে)।

১০. উটপাল উক্ত মরুর মাঝখানে আমাদের নিয়ে দ্রুত চলল (কিন্তু পথ শেষ হয় না), আমরা যেন গোলকের ওপর চলছি কিংবা এর ভূমি যেন আমাদের সাথে সফর করছে (এতই বিস্তীর্ণ ও বিশাল যে উক্ত মরুপথ শেষ হয় না)।

১১. উক্ত মরুতে কত দিন চলতে চলতে আমরা রাতের বেলায় উপনীত হয়েছি। তখন বিদ্যুতের চমকে এর প্রান্তসীমায় যেন রক্তিমাভ অলংকার।

১২. আর এতে কত রাত চলতে চলতে আমরা দিবসে উপনীত হয়েছি আর তখন এর পিঠে যেন মেঘমালার কৃষ্ণ অলংকার।

শোকগাথা কবিতা রচনার ক্ষেত্রেও কবি আল-মুতানাব্বীর সমকক্ষ কবি মেলা বড়োই দায়। 'শোকগাথা কবিতা'-এর মানে হলো, শোকাগ্নি কবিতা, শোকাবেগমূলক কবিতা, শোকাগ্রস্ত কবিতা ইত্যাদি। জাহেলি যুগ থেকে শুরু করে আব্বাসীয় যুগ পর্যন্ত এ জাতীয় কবিতার বহুল প্রচলন পরিলক্ষিত হয়।[৪২] এরই ধারাবাহিকতায় আব্বাসীয় যুগের অন্যতম কবি আল-মুতানাব্বীও সময়ে সময়ে শোকগাথা কবিতা রচনা করেছেন। ৩৫২ হিজরি সনে বনু বকর এলাকার অন্তর্গত 'মায়্যাফারিকীন' নামক স্থানে সাইফুদ্দৌলা আল-হামদানীর বোনের মৃত্যু হলে কবি কতিপয় শোকগাথা কবিতামালা রচনা করেন। এর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পঙ্‌ক্তি হচ্ছে–[৪৩]

ومن يصفك فقد سماك للعرب ** أجل قدرك أن تسمي مؤبنةً

ودمعه وهما فى قبضة الطرب ** لا يملك الطرب المحزون منتقة

بمن أصبت وكم أسكت من لجب ** غدرت يا موت كم أفنيت من عدد

وكم سألت فلم يبخل ولم تخب ** وكم صحبت أخاه فى منازلة

فزعت فيه بآمالى الى الكذب ** طوى الجزيرة حتى جاءنى خبر

---

42 . হান্না আল-ফাখূরী, *আল-জামি' ফিল আদাবিল আরাবী ওয়া তারীখিহী*, (২য় সং, বৈরুত : দারুল জীল, ১৯৯১), খ. ১, পৃ.৭৮৬।

43 . আবদুর রহমান আল-বারকূকী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৮৫।

شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بى ** حتى إذا لم يدع لى صدقه أملا

والبرد في الطرق والأقلام في الكتب ** تعثرت به في الأفواه ألسنها

ديار بكرٍ ولم تخلع ولم تهب ** كأن فعلة لم تملأ مواكبها

ولم تغث داعيا بالويل والحرب ** ولم ترد حياة بعد تولية

فكيف ليل فتى الفتيان فى حلب ** أرى العراق طويل الليل مذ نعيت

وأن دمع جفونى غير منسكب ** يظن أن فؤادى غير ملتهب

لحرمة المجد والقصاد والأدب ** بلى وحرمة من كانت مراعية

وإن مضت يدها موروثة النشب ** ومن مضت غير موروث خلائقها

وهم أترابها في اللهو واللعب ** وهمها في العلى والملك ناشئةً

وليس يعلم إلا الله بالشنب ** يعلمن حين تحيا حسن مبسمها

وحسرة في قلوب البيض واليلب ** مسرة في قلوب الطيب مفرقها

رأى المقانع أعلى منه في الرتب ** إذا رأى ورآها رأس لابسه

كريمة غير أنثى العقل والحسب ** وإن تكن خلقت أنثى لقد خلقت

অর্থ :

১. শোকগীতির মাধ্যমে তোমার মর্যাদাকে তোমার নামের চেয়েও মহীয়ান করে তুলছি আমি; আর যে তোমার বর্ণনা (পরিচিতি) দিবে সে তো আরবের জন্য তোমার নামকে (আরও অধিক) চিহ্নিত করে দিলো।

২. বিষণ্নতায় হতবিহ্বল ব্যক্তি নিজের বক্তব্য ও অশ্রুর ওপর কোনো ক্ষমতা রাখতে পারে না; দুটোই বিষাদের কব্জায় চলে যায়।

৩. ওহে মৃত্যু তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করলে; কেননা, যার মৃত্যু ঘটিয়েছ তার মাধ্যমে (একের মৃত্যুতে) কত জনকে তুমি নিঃশেষ করে দিলে এবং কত উচ্চকণ্ঠকে নীরব করে দিলে (যেহেতু তার মাধ্যমে বহুজন উপকৃত হতো)।

৪. রণক্ষেত্রে তুমি তাঁর ভাইয়ের কত সাঙ্গ হয়েছ এবং কতজনকে (শত্রু) মনে করেছ এবং কতজনের (মৃত্যু) কামনা করেছ! সুতরাং তিনি (সাইফুদ্দৌলা) কার্পণ্য করেননি এবং তোমাকে হতাশ করেননি (বরং বহু শত্রুর মৃত্যু ঘটিয়েছেন)।

৫. মৃত্যু সংবাদ গোটা উপদ্বীপ ছড়িয়ে পড়ল; আর যখন সংবাদটি আমার কাছে এলো তখন আমি এতে হতভম্ব হয়ে পড়লাম। আমি নিজেকে (সংবাদটি) মিথ্যা বলে প্রবোধ দিলাম।

৬. পরিশেষে সংবাদটি যখন সত্য প্রতিপন্ন হলো এবং আশার কোনো পথ থাকল না, আমি অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে গেলাম।

৭. এই দুঃসংবাদে মানুষ (শোকাভিভূত হয়ে) বাকরুদ্ধ হয়ে গেল, রাস্তার বাহন হোঁচট খেয়ে পড়ল এবং কাগজে লেখার কলম বন্ধ হয়ে গেল।

৮. তাঁর কীর্তিসমূহ যেন বনু বকর লোকালয়ে কোনো অবদান রাখেনি এবং তিনি কোনো দান-দক্ষিণাও করেননি (বাস্তবে তা নয়; বরং তাঁর মৃত্যুতে সব অন্তর্হিত হয়ে গেছে)।

৯. হায় আফসোস! তিনি যেন সংকটাপন্ন হওয়ার পর কারো জীবন ফিরিয়ে দেননি এবং কারো আর্তনাদে সাড়া দেননি।

১০. আমি লক্ষ করছি, তাঁর মৃত্যু সংবাদে ইরাকবাসী (শোকে মুহ্যমান হয়ে) দীর্ঘ বিনিদ্র রজনি অতিবাহিত করেছে; সুতরাং আলেপ্পোতে চিরতরুণ (তাঁর ভাই সাইফুদ্দৌলা) এর কী দশা হবে!

১১. তিনি (সাইফুদ্দৌলা) কি মনে করেন যে, (তাঁর বোনের মৃত্যুতে) আমার অন্তর জ্বলছে না এবং আমার অশ্রু ঝরছে না?

১২. হ্যাঁ অবশ্যই, যিনি হৃদয়বান ছিলেন, তাঁর মর্যাদার শপথ এবং তীর্থযাত্রী ও শিষ্টাচারীদের শপথ (আমার অন্তর তাঁর জন্য জ্বলছে)।

১৩. এবং যিনি স্বীয় চরিত্রের কোনো উত্তরাধিকার রেখে যাননি (তাঁর মতো চরিত্রবান আর কেউ নেই)। যদিও তাঁর হাত সম্পদের উত্তরাধিকার রেখে গেছেন।

১৪. আশৈশব তাঁর ভাবনা ছিল উন্নয়ন ও দেশ গঠনে, আর তাঁর সতীর্থদের ভাবনা ছিল খেল-তামাশায়।

১৫. শুভেচ্ছাজ্ঞাপনকালে সতীর্থরা তাঁর হাস্যোজ্জ্বল চেহারার সৌন্দর্য অবলোকন করে; তবে তাঁর ওষ্ঠ-দাঁতের উজ্জ্বলতা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না (কেননা, এর স্বাদ কেউ গ্রহণ করেনি)।

১৬. তাঁর মাথা (তিনি) সুগন্ধিময় প্রসাধনসামগ্রীর জন্য আনন্দের (যেহেতু নারী হিসেবে তিনি এসব ব্যবহার করেন); তবে বর্ম ও শিরস্ত্রাণের জন্য বড়োই অনুশোচনার (কেননা, এগুলো পুরুষের পোশাক, নারী হিসেবে তিনি ব্যবহার করেন না)।

১৭. সেই বর্ম ও শিরস্ত্রাণ যখন তার পরিধানকারীকে এবং স্কার্ফ পরিহিত অবস্থায় তাঁকে (সাইফুদ্দৌলার বোনকে) অবলোকন করবে তখন স্কার্ফকেই মর্যাদায় অধিক সমুন্নত দেখতে পাবে।

১৮. যদিও তিনি নারী হিসেবে সৃজিত, তবে জ্ঞান ও আভিজাত্যে (পুরুষের ন্যায়) মহীয়ানরূপে সৃজিত; তিনি অন্য নারীর মতো (মর্যাদাহীন) নয়।

৩য় পরিচ্ছেদ
কাব্যপ্রতিভার মূল্যায়ন

কবি আল্-মুতানাব্বীর মেধা ও কাব্যপ্রতিভার ক্ষুরধার লক্ষ করা যায় শৈশবকাল থেকেই। বিদ্যানুরাগ নিয়েই তৎকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু কুফা নগরীতে কবি বেড়ে ওঠেন। যেখানে ছিলেন ভাষাতাত্ত্বিক ও প্রাচীন অভিধানপ্রণেতা আবু বকর মুহাম্মদ ইব্নে দুরায়দ (মৃ. ৯৩৩ খ্রি./৩২১ হি.) ও আবুল কাসিম উমার ইব্নে সায়ফ আল-বাগদাদীর মতো প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গ। এসব মহৎ ব্যক্তির সান্নিধ্য আল-মুতানাব্বীকে একজন যুগসেরা কবি হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।[৪৪] উপরন্তু কবি ছিলেন প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী; যেকোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে প্রাচীন আরবি গদ্য বা কবিতা হতে উদাহরণ পেশ করে তা উপস্থাপন করতে পারতেন।[৪৫]

আল্-মুতানাব্বী ভাবের কবি : শব্দের দিকে বেশি ভ্রুক্ষেপ না করে অর্থের প্রতিই সজাগ দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন তিনি। কবিতায় কাব্য ও দর্শনের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। আরবি কবিতাকে আবু তাম্মাম যেসব শর্তে গণ্ডিবদ্ধ করেছেন এবং অলংকারবিদরা যে সাজসজ্জার প্রলেপ মেখেছেন, তা হতে তিনি একে মুক্তি দিয়েছেন। আরবদের গতানুগতিক রীতিনীতি হতে তিনি বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। আল-মুতানাব্বীকে আরবি কবিতায় সংস্কার আন্দোলনের প্রবর্তক বলা যায়। তাঁর কবিতায় প্রবাদ ও নীতিবাক্যের সমাহার লক্ষ করা যায়। যুদ্ধের অভিনব বর্ণনা, চমৎকার উপমা উৎপ্রেক্ষা, একই পঙ্ক্তিতে দুই উপমার ব্যবহার, রূপকের অসাধারণ প্রয়োগে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কবিতায় স্বীয় ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদাকে তুলে ধরতে এবং স্বাধীন মত প্রকাশে আত্মনিষ্ঠ হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁকে অতুলনীয় বলতে হবে।[৪৬]

আল্-মুতানাব্বীর কবিতায় জনপরিবেশের প্রভাব সুস্পষ্ট। হিজরি ৪র্থ শতাব্দীর গণমানুষের সার্বিক অবস্থা তাঁর কবিতায় চিত্রায়িত হয়েছে। একইভাবে কবির মানসিক অস্থিরতা, তীক্ষ্ণ মেজাজ ও কঠিন স্বভাবও যথার্থভাবে প্রতিবিম্ব হয়েছে এতে। শৈশব হতে কবি যে পরিবেশে লালিত হয়েছেন, তাতে কেবল তরবারির ঝনঝনানিই শুনতে পেয়েছিলেন; আরব সাম্রাজ্য তখন ভাঙন ও বিভক্তির মুখে খণ্ডরাজ্যের রূপধারণ করে। মুসলমান ও রোমকদের মাঝে সংঘটিত বহু যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী কবি আল-মুতানাব্বী। তখন তিনি ছিলেন সাইফুদ্দৌলার একান্ত সহচর। ফলে যুদ্ধের বর্ণনা, বর্শা ও তরবরির আঘাতের আওয়াজ সুনিপুণভাবে

---

[44] . মুহাম্মদ ইউসুফ ফার্বান, *আবুত্ ত্বায়্যিব আল-মুতানাব্বী নাশীদুস সাহ্রা আল-খালিদ*, ১ম সং, বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯০, পৃ. ৩৩-৩৪।

[45] . আহমাদ আল-ইসকান্দী ও মোস্তফা আনানী, *আল-মুফাস্সাল ফী তারীখিল আদাবিল আরবী*, ড. হাস্আন হাল্লাক সম্পা., বৈরুত : দারু ইহ্য়াইল উলূম, ১৯৯৪, পৃ. ২৭২।

[46] . আহমদ হাসান আয্-যয়্যাত, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, বৈরুত, দারুল মা'আরিফ, ১৯৯৩ খ্রি.,পৃ ২১৯।

অনুরণিত হয়েছে তাঁর লেখনীতে; এবং এই শিল্পে তথা যুদ্ধের শৈল্পিক বর্ণনায় সমসাময়িক অপরাপর কবিকে ছাড়িয়ে গেছেন আল-মুতানাব্বী।[৪৭]

আল্-মুতানাব্বী আরবী সাহিত্যাকাশের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা তাঁকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করেছে। প্রাচ্যের সাহিত্যবিশারদগণ বিশেষত তাঁর সমসাময়িক পণ্ডিতগণ তাঁর কাব্যপ্রতিভা মূল্যায়ন করতে গিয়ে তাঁকে শেষ্ঠতম আরব কবি বলে আখ্যায়িত করেছেন। এমনকি আবুল আলা আল-মা'আর্‌রী পর্যন্ত তাঁর কাব্যিক প্রতিভার সম্মুখে মাথা অবনত করেছেন। ইবনে খাল্লিকান তাই নিঃসন্দেহে বলেছেন, It is perfecion.[48]

আল্-মুতানাব্বীকে কেউ কেউ কবিসম্রাট ইমরুল কায়েসের (৫০১-৫৪৪ খ্রি.) ওপর স্থান দিয়েছেন। কিছুসংখ্যকের মতানুযায়ী তিনি চূড়ান্তভাবে কাব্যসাহিত্যে প্রথম স্থানের অধিকারী। আবুল আলা আল-মা'আর্‌রী কখনো কখনো আল-মুতানাব্বীর কবিতার দু-একটি শব্দ পরিবর্তন করার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন। কিন্তু কখনো তাঁর ওপর ওঠার চিন্তা করতে সক্ষম হননি।[৪৯]

প্রথম কাতারের সমালোচক সা'লাবী কবি আল-মুতানাব্বীর সমালোচনা করলেও তাঁর সম্পর্কে উঁচু ধারণা পোষণ করতেন। সা'লাবী ছাড়াও আবুল ফারাজ আল-আসবাহানী, সা'হেব ইব্‌ন আয়াদ ও জুরজানীসহ প্রাচ্যপণ্ডিতগণ আল-মুতানাব্বীর কবিতার দোষত্রুটি উল্লেখ করলেও তাঁর কবিতার প্রশংসা করেছেন। মোটকথা, তাঁর কবিতার মূল্যায়নে তৎকালীন এবং পরবর্তী পণ্ডিতগণ তাঁকে আরবী কবিতার শ্রেষ্ঠ কবি না বললেও শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম কবি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর সম্পর্কে কবি, সাহিত্যিক ও পণ্ডিতগণের বিবিধ মন্তব্য রয়েছে। যেমন :

১. আবুল আলা আল-মা'আর্‌রী বলেন–

أبو تمام والمتنبى حكيمان و أنا شاعر و البحترى

'আবু তাম্মাম এবং মুতানাব্বী হলেন বিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব আর আমি এবং বুহতরী হলাম (শুধু) কবি।'[৫০]

---

47 . আবুল বাকা' আল-আকবারী, *শারহু দীওয়ান আবিত্ ত্বায়্যিব আল-মুতানাব্বী*, মুস্তফা আস্-সাক্কা ও অন্যান্য সম্পা., বৈরুত : দারুল মা'রিফা, তা.বি., ক. ১, পৃ. ওয়া।

48 . ইব্‌নে খাল্লিকান, খণ্ড ২, পৃ ৩৪২।

49 . বুতরুস *আল-বুস্তানী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৩-৫৪।

50 . বুতরুস আল-বুস্তানী, *উদাবা' উল আরব ফিল আসরিল আব্বাসী*, (বৈরুত, দারল জীল, ১৯৮৯, তা.বি.), খ. ২, পৃ. ৩২।

২. আবুল আলা আল-মা'আর্‌রী আরও বলেন–

كان المتنبى أشهر الشعراء المحثين إذا أمسك

'থেমে যাওয়া বিষয়ে উদ্বুদ্ধকারী কবিদের মধ্যে আল-মুতানাব্বি ছিলেন সবচেয়ে বিখ্যাত কবি।'[৫১]

৩. ইব্‌ন আসির[৫২] বলেন, "আবু তাম্মাম, বুহতুরী ও আল-মুতানাব্বী" এই তিনজন কবির মধ্যে কবিতার রাজ্যে আল-মুতানাব্বীর অবস্থান হলো লা'ত, মানা'ত ও উজ্জা নামক মূর্তিসমূহের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে উজ্জা মূর্তির মতো। অর্থাৎ লা'ত, মানা'ত ও উজ্জা এই তিনটি মূর্তির মধ্যে জাহেলি যুগে মূর্তিপূজারিদের নিকট 'উজ্জা' নামক মূর্তিটির অবস্থান ছিল মর্যাদার দিক থেকে শ্রেষ্ঠ; অনুরূপ "আবু তাম্মাম, বুহতুরী ও আল-মুতানাব্বী" এই তিনজন কবির মধ্যে কবিতার রাজ্যে আল-মুতানাব্বীর অবস্থানও মর্যাদার দিক থেকে শ্রেষ্ঠ।

৪. আহমাদ হাসান আয-যাইয়্যাত বলেন–

فهو إمام الطريقة الاعتبارية فى الشعر العربى

'তিনি হলেন আরবী কবিতার ক্ষেত্রে আইনি (গ্রহণীয়) পদ্ধতির ইমাম।'[৫৩]

৫. ইব্‌নে খালদুন বলেন–

إنما قيل له المتنبى لأنه إدعى النبوة فى بادية الماوة و تبع حلف كثير من بنى كلب و غسان

'তাঁকে মুতানাব্বী বলা হয়, কেননা তিনি মাওয়া উপত্যকায় নবুয়তের দাবি করেছেন। আর বনু কাল্‌ব এবং বনু গাচ্ছান গোত্রের অনেক লোক তাঁর অনুসরণ করেছিল।'[৫৪]

৬. জুরজী যায়দান বলেন–

ولم يدع بابا من الشعر الاطرفة و أجار فيه خصوصا الحكم و ماسية المديح و الفخر و العتاب

'কবিতার কোনো দরজা (দিক) তিনি পরিত্যাগ করেননি, স্বীয় কবিতায় তিনি প্রজ্ঞা, প্রশংসা, গৌরব এবং তিরস্কারের রূপ তুলে ধরেছেন।'[৫৫]

৭. আবুল কাসেম ইসমাঈল ইব্‌ন আব্বাস তাঁর সমালোচনা করলেও বলতে বাধ্য হয়েছেন যে–

إنه بعيد المرى فى شعره كثير الإصابة فى نظمه إلا أنه قبيحا يأتى بكثرة العراء

---

51 . বুতরুস আল-বুস্তানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩২।

52 . তিনি হলেন ইউসুফ ইব্‌নে আবদুল কাদের ইব্‌নে মুহাম্মদ আল-হুসাইনী আল-আজহারী। তিনি আল-আসির গোত্রের লোক। এজন্য তাকে ইবনুল আসির বলা হয়। তিনি ১২৩২ হিজরিতে সিডনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩০৭ হিজরিতে বৈরুতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন। তিনি একজন কবি ছিলেন।

53 . আহমদ হাসান আয্-যয়্যাত, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, বৈরুত, দারুল মা'আরিফ, ১৯৯৩ খ্রি.,পৃ ২১৮।

54 . ইউছুফ আল্-বাদিয়ী আদ্-দামেস্কী, *আস্-সুবহুল মুনাব্বী আন হায়াছিয়্যাতিল মুতানাব্বী*, আল্-মাতবা'আতুল আ'মেরাহ আশ্-শারকিয়্যাহ, ১৩০৮ হি. পৃ ৬৭।

55 . জুরজী যায়দান, *তারীখু আ'দাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ*, ২য় খণ্ড, (বৈরুত : দারু মাকতাবাতিল হায়াত, ১৯৭৩), পৃ. ৫৫৬।

‘তিনি কবিতায় সুদূর লক্ষ্যে উপনীত হয়েছেন; ছন্দেও সার্থক প্রয়োগ দেখিয়েছেন। তবে অনেক ক্ষেত্রেই তিনি উচ্চমানের শব্দের সাথে নিম্নমানের শব্দ সংযুক্ত করেছেন।’[৫৬]

৮. ইবনে খাল্লিকান তাঁর দেওয়ান সম্পর্কে বলেছেন, আল-মুতানাব্বীর দিওয়ান কাব্যক্ষেত্রে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও চরম উৎকর্ষীয় কাব্যগ্রন্থ।[৫৭]

৯. কেউ বলেছেন, আরবী সাহিত্যাঙ্গনে আলোড়ন সৃষ্টিকারী কবি আল-মুতানাব্বীর স্বাভাবিকভাবে সমালোচনার জুড়ি নেই। তবে তাঁর প্রতিকূল সমালোচনার তেমন কোনো জোরালো যুক্তি পাওয়া যায় না। সুতরাং আমরা তাঁকে সাহিত্যাঙ্গনের শ্রেষ্ঠ রত্ন বলতে পারি। সমালোচনার দৃষ্টিকোন থেকে তার দোষত্রুটি খুব কমই পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন-

من ذا الذى ترضى شحاياه كلها * كفى الحراء فضلا أن تعد سحائبه

‘কে আছে যে তার গোটা আত্মাকে সন্তুষ্ট করতে পারে?

তার দোষত্রুটি গণনা করার চাইতে তার মর্যাদার দিক আলোচনা করাই যথেষ্ট।’[৫৮]

১০. কেউ বলেছেন, আল-মুতানাব্বী নিজেকে শ্রেষ্ঠ কবি, বাদশাহ, খলিফা এমনকি নবি বলেও দাবি করতেন যা একমাত্র তাঁর কাব্যিক শ্রেষ্ঠত্বের কারনেই তিনি করতেন।[৫৯]

১১. কেউ কেউ আল-মুতানাব্বীকে শেক্সপিয়ারের সাথে তুলনা করেছেন।

১২. কেউ বলেছেন, আল-মুতানাব্বী ছিলেন আব্বাসীয় যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর রচিত দেওয়ানের ব্যাখ্যার আধিক্যও তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে। ইব্ন খাল্লিকান বলেছেন, আল-মুতানাব্বীর দেওয়ানের প্রায় চল্লিশটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রয়েছে।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, আল-মুতানাব্বী আরবি কাব্যসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। অসংখ্য সমালোচক ও পণ্ডিতবর্গ সমসাময়িক থেকে অদ্যাবধি পর্যন্ত তাঁর কবিতার আলোচনা-সমালোচনা করেছেন। এটাও তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের বিশেষ কারণই বলতে হবে। কেননা, তাঁর কবিতা যদি উন্নত ও শ্রেষ্ঠ না হবে তবে এত আলোচনা-সমালোচনার কি প্রয়োজন ছিল? সে দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করতেই হবে।[৬০]

---

56 . মুহাম্মদ ইউসুফ ফার্‌রান, আবুত্ ত্বায়্যিব *আল-মুতানাব্বী* নাশীদুস সাহ্‌রা’ আল-খালিদ, ১ম সং, বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলামিয়্যাহ, ১৯৯০, পৃ ২৪।

57 . ইব্নে খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, খণ্ড ২, পৃ ৩৪৯।

58 . *দীওয়ানু আল-মুতানাব্বী*, ই‘যায আলী সম্পা., করাচি; মাকতাবাতুল বুশরা, ১ম সং, ২০১১, পৃ. ৩০৮।

59 . আবুল বাকা’ আল-আকবারী, *শারহু দীওয়ান আবিত্ ত্বায়্যিব আল-মুতানাব্বী*, (বৈরুত : দারুল মা’রিফা), খ. ১, পৃ. ৩৩২।

60 . জি. এম. মেহেরুল্লাহ; *আরবী কবি, সাহিত্যিক ও সাহিত্য*, ঢাকা: নাহ্‌দা প্রকাশনী, ১৯৯৩ খ্রি., পৃ ১০৪-১০৬।

৪র্থ পরিচ্ছেদ
আল্-মুতানাব্বী সম্পর্কে সমালোচকদের অভিমত

যেকোনো কবি কিংবা সাহিত্যিকের জীবনী আলোচনা করলে দেখা যায় যে, কিছু না কিছু ভুলত্রুটি হতে কেউই মুক্ত নন। সুতরাং কবি আল-মুতানাব্বীর বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। তবে তাঁর কবিতায় দোষত্রুটি সীমিত এবং সৌন্দর্য অগণিত। সমালোচকগণ বিশেষ করে সা'লাবী[৬১] ও নিকল্সন[৬২] যেসব মতামত উল্লেখ করেছেন তার কয়েকটি নিম্নে তুলে ধরা হলো। যেমন–

১. আল্-মুতানাব্বী কাজী আবু আবদিল্লাহ ইব্ন আবদিল্লাহ এনতাকির প্রশংসায় রচিত কাসিদার مطلع কত চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন, তা অনুভব করার মতো। যেমন তিনি বলেছেন–

أفاضل الناس اغراض لدى الزمن * يخلو من الهم أخلاهم من الفطن

২. উৎকৃষ্ট مقطع ব্যবহার করে কবি আল-মুতানাব্বী কোনো কোনো সময় জাদুকরী ভাষায় কবিতা লিখেছেন। যেমন, আবু সুহায়েল সাঈদ ইব্ন আবদিল্লাহির প্রশংসায় কবি বলেছেন–

قد شرف الله أرضا أنت ساكنها * و شرف الناس إذ سواك إنسانا

৩. চিন্তাধারাকে সমতুল্য কাব্যে তিনি প্রকাশ করেছেন, আর উপমাগুলো এক ও মিলযুক্ত শব্দে এবং উৎপ্রেক্ষাগুলো সংক্ষিপ্ত অথচ মিলযুক্ত শব্দে প্রকাশ করেছেন। যেমন :

فنحن فى وجل والروم فى وجل * والبر فى شغل والبحر فى خجل

৪. তিনি কবিতায় রূপকের চমৎকার ব্যবহার করেছেন; যা খুবই চিত্তাকর্ষক। যেমন :

فأسبلت لؤلوا من نرجس و سقت * وردا و عضت إلى العناب بالبرد

৫. কবিতার ক্ষেত্রে এক বিষয়বস্তু থেকে অন্য বিষয়বস্তুতে সূক্ষ্মতার সাথে পদার্পণের ক্ষেত্রে কবি আল্-মুতানাব্বী সিদ্ধহস্ত ছিলেন। যেমন তিনি বলেন–

و غيث ظلنا تحته أن عامرا * علا لم يمت أو فى السحاب له قبر

৬. প্রেমাস্পদের প্রশংসায় তিনি একই কথা দ্বারা দুটো দিকে ইঙ্গিত করতে পারদর্শী ছিলেন। যেমন :

فلم أرى قبلى مشى البحر تحول * ولا رجلا قامت اتعاتقه الاسد

نهبت من الاعمار مالوحويته * لهنت الدنيا لانك خالد

---

61 . তিনি হলেন আবু ইসহাক আহমাদ ইব্নে মুহাম্মদ ইব্নে ইব্রাহীম আল-নিশাপুরী আল-সা'লাবী। তিনি ১০৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। তিনি ছিলেন একাদশ শতাব্দীর পারস্য বংশোদ্ভূত একজন ইসলামি পণ্ডিত। কুরআন সম্পর্কে তাঁর প্রভূত জ্ঞান ছিল। তিনি ছিলেন তাঁর সময়কার সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম ও পণ্ডিত।

62 . তিনি হলেন উইলিয়াম ফস্ট নিকলসন। তিনি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের একজন প্রখ্যাত রাজীতিবীদ ও পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি ১৯০০ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৭৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

৭. কিছু চাইলে তিনি বীর পুরুষের মতো চাইতেন; ভিক্ষুকের মতো নয়। যেমন, ইব্ন রাশীক তাঁর 'কিতাবুল ওমরাহ'-এর মধ্যে বলেছেন–

أبو الطيب كالملك الجبار يأخذ ما حوله قهرا * أو كالشجاع الحرى بهم على ما يريده

৮. কবি আল-মুতানাব্বী মৌলিক চিন্তাধারাকে বাস্তব চিত্র সমতুল্য বাক্যে প্রকাশ করতে পারতেন, যেমন–

كان سهار الليل يعشق مقلتى * فيها فى كل هجر لنا وصل

৯. বর্ণনার ক্ষেত্রে নতুনত্ব ও অভিনবত্ব, যা কবি আল-মুতানাব্বীকে সকল কবিদের মাঝে এক অনন্য প্রতিভা হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। যেমন :

أنام مل جفونى عن سواردها * ويسهر القوم جراها و يختصم

১০. প্রশংসামূলক শব্দসমূহের সার্থক বিন্যাস ও অনুক্রমিক পারস্পরিক বিধান সাজানোর ক্ষেত্রে কবি আল-মুতানাব্বী ছিলেন সিদ্ধহস্ত। যেমন : সাইফুদ্দৌলার প্রশংসায় কবি বলেন–

فالخيل والليل والبيداء تعرفنى * والسيف والرمح والقرطاس والقلم

এ ধরনের অসংখ্য গুণাবলি সমালোচকগণ বর্ণনা করেছেন। গুণাবলির পাশাপাশি সমালোচকগণ তাঁর কবিতার কিছু দোষত্রুটিও তুলে ধরেছেন।[৬৩] যেমন–

১. قبح المطالع : কবিতার مطلع খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। কিন্তু কবি আল-মুতানাব্বী তাঁর কোনো কোনো কবিতায় مطلع-তে এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন; যাতে ব্যাকরণগত ভুল রয়েছে। শাব্দিক ও অর্থগত জটিলতাসহ শ্রুতিকটু শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন। এভাবে শব্দবিন্যাসের ক্ষেত্রে مطلع-তে ত্রুটি রয়েছে।

২. قبح المقاطع : কবিতার ক্ষেত্রে مقطع অত্যন্ত গুরুত্বের দাবিদার। তাঁর কবিতার কোনো কোনো ক্ষেত্রে مقطع-তে সাধারণ ও অবোধগম্য শব্দ ব্যবহার করেছেন; যা পাঠকদের বিরুক্তির উদ্রেক করে।

৩. غرائب الألفاظ তথা অপ্রচলিত শব্দ তিনি তাঁর কবিতায় ব্যবহার করেছেন। অথচ এরূপ শব্দের ব্যবহার দ্বারা বাক্যের বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়ে যায়। যেমন :

بالواحدات و حاديها و بى قمر * يظل من وخوها فى الخمر احشيانا

এখানে احشيان শব্দটি অপ্রচলিত ও দুর্বোধ্য শব্দ।

৪. কবি আল-মুতানাব্বী তাঁর কবিতার অনেক স্থানে غلط الالفاظ ও إعراب ব্যবহার করেছেন। যেমন :

فدى من على الغبراء او لهم انا * بهذا الأبى الماجد الحائل القرح

এখানে الماجد শব্দটিকে দানশীল অর্থে ব্যবহার করা ভুল হয়েছে।

৫. আল-মুতানাব্বী কখনো কখনো শব্দবিন্যাসে ভুল করেছেন। যেমন :

---

[63] . *দীওয়ানু আল-মুতানাব্বী*, ই'যায আলী সম্পা., করাচি; মাকতাবাতুল বুশরা, ১ম সং, ২০১১, পৃ. ৩৪২।

انى يكون ابا البرايا آدم * وابوك والثقلان وانت محمد

আল্লামা সাআ'লাবী এটা বিন্যাস করেছেন এভাবে–

انى يكون آدم ابا البرايا * وابوك محمد وانت الثقلان

৬. আল-মুতানাব্বী একই চরণে একই শব্দ একাধিকবার ব্যবহার করেছেন। যেমন :

ولا الضعف حتى يتبع الضعف ضعفه * ولا ضعف الضعف بل مثله الف

এতে কবিতার সৌন্দর্য নষ্ট হয়েছে।

৭. আল-মুতানাব্বী কারো প্রশংসার সময় অতিরঞ্জিত করে ফেলেছেন। যেমন :

ونالوا ما اشتهوا بالحزم هونا * وصاد الوحش فلهم دبيبا

৮. আল-মুতানাব্বী স্বীয় কবিতায় অনেক সময় যে রূপক অর্থ ব্যবহার করেছেন; তা বোঝা সকল পাঠকের পক্ষে সম্ভব হয় না। যেমন :

تجمعت فى فؤادهم همم * ملء فؤاد الزمان احداها

৯. আল-মুতানাব্বী কোনো কোনো কবিতায় হীন অর্থসম্পন্ন শব্দ ব্যবহার করেছেন; যা সাধারণত ভদ্র ও সভ্য ব্যক্তি ব্যবহার করে না। যেমন :

رمانى خساس الناس صاحب إسمه

এ ধরনের আরও অনেক ত্রুটি সম্পর্কে সমালোচকগণ আল-মুতানাব্বীর বিরূপ সমালোচনা করেছেন। এরপরও আমরা বলতে পারি যে, আল-মুতানাব্বী আরবি কাব্য সাহিত্যে এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী কবি। কাসিদাজাতীয় কবিতা রচনার ক্ষেত্রে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কবিতা রচনায় অলংকার, সৌন্দর্য ও উচ্চাঙ্গের বর্ণনা চাতুর্যতায় তাঁর স্থান ছিল সকলের ঊর্ধ্বে।[৬৪] তিনি উপযোগী করে সর্বস্তরের মানুষের সুনাম ও দুর্নাম এবং এবং দর্শকের ভাবধারা বর্ণনায় সুনিপুণ শিল্পীর ন্যায় অপরূপ কারুকার্য ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।[৬৫] প্রাচীন ও আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ আল-মুতানাব্বীর কবিতার মূল্যায়ন করেছেন। তাদের কেউ তাঁর প্রশংসা করেছেন, কেউ বা তাঁর দোষত্রুটি তুলে ধরেছেন আবার কেউ তাঁর দোষ-গুণ উভয় দিক আলোচনা করেছেন। তাঁর কবিতার সমালোচকগণকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।[৬৬] যেমন :

এক. যারা কেবল তাঁর দোষত্রুটি তুলে ধরে তাঁর সমালোচনা করে পুস্তক রচনা করেছেন। তাঁরা হলেন–

১. সাহেব ইব্ন আব্বাদ (৯৪৭-৯৯৫ খ্রি.)

২. ইব্ন খালদুন (১৩৩২-১৪০৬ খ্রি.)

৩. আবু সা'দ মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ আল-উমায়দী (মৃ. ১০৪১ খ্রি.)

---

64 . বুতরুস আল-বুস্তানী, *উদাবা' উল আরব ফিল আসরিল আব্বাসী*, (বৈরুত, দারল জীল, ১৯৮৯, তা.বি.), খ. ২, পৃ. ৯০-৯৬।

65 . আবুল বাকা' আল-আকবারী, *শারহু দীওয়ান আবিত্ ত্বায়্যিব আল-মুতানাব্বী*, (বৈরুত : দারুল মা'রিফা), খ. ১, পৃ. ৩৫০।

66 . আহমদ হাসান আয্-যয়্যাত, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, বৈরুত, দারুল মা'আরিফ, ১৯৯৩ খ্রি.,পৃ ২১৯।

এদের মধ্যে কয়েকজন রয়েছেন ইউরোপীয়ান। তাঁরা হলেন–

৪. রা'য়াসকী

৫. দী সাসী

৬. বূ'লীন

৭. ব্রুকালম্যান

৮. নিকল্সন (১৯০০-১৯৭৫ খ্রি.)

৯. আবু মানসূর সা'আলাবী (মৃ. ১০৩৫ খ্রি.)

১০. আবুল ফারাজ আল-আসবাহানী (১১১৬-১২০১ খ্রি.) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

দুই. যারা কেবল তাঁর প্রশংসা বর্ণনা করে পুস্তক রচনা করেছেন। তাঁরা হলেন–

১. ইব্ন রাশীক (৯৯৯-১০৬৪ খ্রি.)

২. ইউসুফ বাদীয়ী

৩. আবুল আলা আল-মা'আররী (৯৭৩-১০৫৭ খ্রি.)

৪. ইব্ন খাল্লিকান (১২১১-১২৮২ খ্রি.)

৫. নাসীফ আল-ইয়াযিজী (১৮০০-১৮৭১ খ্রি.)

৬. আবুল ফাতাহ ওসমান আল-জানী (৯৩৪-১০০২ খ্রি.)

৭. আবুল হাসান আলী আল-ওয়াহিদী (মৃ. ১০৭৬ খ্রি.) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

তিন. যারা দোষ-গুণ উভয় দিকের সমালোচনা করে পুস্তক রচনা করেছেন। তাঁরা হলেন–

১. কাজি আবদুল আযীয আল-জুরজানী (৯৩৩-১০০১ খ্রি.)

২. আহমদ হাসান আয-যায়্যাত (১৮৮৫-১৯৬৮ খ্রি.)

৩. জুরজী যায়দান (১৮৬১-১৯১৪ খ্রি.)

৪. আবু মানসুর সা'লাবী (৯৬১-১০৩৮ খ্রি.)

৫. ড. ত্বাহা হোসইন (১৮৮৯-১৯৭৩ খ্রি.) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

সাহিত্য সমালোচকগণ আল-মুতানাব্বীর কবিতায় সৌন্দর্যের পাশাপাশি কিছু সীমাবদ্ধতা ও বিচ্যুতিও আবিষ্কার করেন। তাঁর কবিতায় নিম্নোক্ত ত্রুটি চিহ্নিত করা হয়।[৬৭] যেমন :

ক. তাঁর কোনো কোনো কবিতার পঙ্‌ক্তিতে ভাষাগত, ব্যাকরণগত ও ছন্দগত নিয়মরীতি উপেক্ষিত হয়েছে।

খ. কোনো কোনো পঙ্‌ক্তিতে অর্থগত জটিলতা পরিলক্ষিত হয়েছে।

---

[67] . আহমদ হাসান আয্-যয়্যাত, প্রাগুক্ত,পৃ ২২৫।

গ. বক্তব্য জোরালো করার লক্ষ্যে অতিশয়োক্তির (মুবালাগা) ক্ষেত্রে অনেক সময় পরিমিত সীমা লঙ্ঘিত হয়েছে।

ঘ. অপরিচিত ও বিরল শব্দের ব্যবহার অধিকমাত্রায় লক্ষণীয়।

ঙ. কবিতার সূচনালগ্ন অনেক সময় অসুন্দর হয়েছে।

চ. অনেক সময় অতি সুন্দরের পর অতি তুচ্ছ বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে।

ছ. অনেক সময় কাব্যিক রীতি বাদ দিয়ে দার্শনিক রীতির অনুসরণ করা হয়েছে।

এ ছাড়াও সাহিত্য সমালোচকগণের নানাজন তাঁর সম্পর্কে নানা মন্তব্য করেছেন। যেমন :

১. আব্বাসীয় যুগের বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্য সমালোচক আস্-সাহিব ইব্ন আব্বাদ (মৃ. ৯৯৫ খ্রি./৩৮৫ হি.) বলেন-

إنه بعيد المرمى فى شعره كثير الإصابة فى نظمه إلا أنه ربما يأتى بالفقرة الغراء مشفوعة بالكلمة العوراء

'তিনি কবিতায় সুদূর লক্ষ্যে উপনীত হয়েছেন; ছন্দেও সার্থক প্রয়োগ দেখিয়েছেন। তবে অনেক ক্ষেত্রেই তিনি উচ্চমানের শব্দের সাথে নিম্নমানের শব্দ সংযুক্ত করেছেন।'[৬৮]

২. অপর সাহিত্য সমালোচক ইব্ন রাশীক আল-কায়রাওয়ানী (মৃ. ১০৭১ খ্রি./৪৬৩ হি.) বলেন-

ليس فى المؤلدين أشهر إسما من الحسن أبى نواس ثم حبيب أبى تمام و البحترى و يقال انهما أخملا فى زمانهما خمس مأة شاعر كلهم مجيد ثم جاء المتنبى فملأ الدنيا و شغل الناس

"ক্লাসিক্যালোত্তর কবিদের মাঝে আল-হাসান আবু নুয়াসের চেয়ে প্রসিদ্ধ নাম আর নেই। এরপর হাবীব আবু তাম্মাম ও আল-বুহতুরীর নাম এসে যায়। বলা হয়ে থাকে, তাঁরা দুজন সমসাময়িক কালের পাঁচ'শ মর্যাদাশীল কবির খ্যাতিকে ম্লান করে দিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে আল-মুতানাব্বী দুনিয়াজুড়ে খ্যাতি নিয়ে আসেন এবং মানুষকে বিমুগ্ধ করেন।"[৬৯]

৩. ড. সালিহ আল-আশতার তাঁর 'আল-জাহিয ও আল-মুতানাব্বীর সাথে সাক্ষাৎ দর্শন' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন–

وأما المتنبى قد وعى الفلسفة اليونانية و أثرها كبير فى حكمته و قد رد بعض المؤلفين أصول الحكمة فى شعر المتنبى إلى كلمات مشهورة لإرسطو -

---

68 . মুহাম্মদ ইউসুফ ফার্‌বান, *আবুত্ ত্বায়্যিব আল-মুতানাব্বী নাশীদুস সাহ্‌রা আল-খালিদ*, ১ম সং, বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯০, পৃ. ১৩৪।

69 . মুহাম্মদ ইউসুফ ফার্‌বান, *আবুত্ ত্বায়্যিব আল-মুতানাব্বী নাশীদুস সাহ্‌রা আল-খালিদ*, ১ম সং, বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯০, পৃ. ১৩৪।

"কবি আল-মুতানাব্বী গ্রিক দর্শনকে ধারণ করেছেন; তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ কবিতায় এর প্রভাব অত্যন্ত শক্তিশালী। কোনো কোনো লেখক মনে করেন, আল-মুতানাব্বীর কবিতার চিন্তা-দর্শন অ্যারিস্টটলের প্রসিদ্ধ উক্তিগুলোতে নিহিত রয়েছে।"[৭০]

৪. ড. শাওকী দ্বায়ফ বলেন–

- قد تركزت فى نفس المتنبى خصائص العرب حتى لكأنما نفسه قطعة من جميع أنفسهم

"কবি আল-মুতানাব্বীর অন্তরাত্মায় আরবদের বৈশিষ্ট্যাবলি সুসংহত হয়ে আছে। তিনি যেন তাদের সকলের এক দেহাংশ।"[৭১]

৫. ড. সালাহ উদ্দীন আল-হাদী বলেন–

- و يكفى أن نعلم أن المتنبى شغل بشخصيته وقنه علماء الادب و طلابه منذ عصره حتى أيامنا هذا

"এবং এটা জেনে রাখা যথেষ্ট যে, নিশ্চয় আল-মুতানাব্বী তাঁর ব্যক্তিত্বের সাথে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর সময় থেকেই আমাদের সময় অবধি সাহিত্যের পণ্ডিত এবং শিক্ষার্থীরা তাঁকে সম্মান করতেন।"[৭২]

পরিশেষে বলা যায়, নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে কবি আল-মুতানাব্বীর যৎসামান্য দোষত্রুটি থাকলেও তিনি আরব বিশ্বের এমনকি সমগ্র বিশ্বের আলোড়ন সৃষ্টিকারী একজন বিখ্যাত কবি। তাঁর মতো একজন প্রতিভাধর কবির জন্ম না হলে আরবি সাহিত্য অনেকটাই পিছিয়ে পড়ত।

---

[70] . মুহাম্মদ ইউসুফ ফার্‌বান, *আবুত্ ত্বায়্যিব আল-মুতানাব্বী নাশীদুস সাহ্‌রা আল-খালিদ*, ১ম সং, বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯০, পৃ. ১৩৭-১৩৮।

[71] . আবুল বাকা' আল-আকবারী, *শারহু দীওয়ান আবিত্ ত্বায়্যিব আল-মুতানাব্বী*, মুস্তফা আস্-সাক্কা ও অন্যান্য সম্পা., বৈরুত : দারুল মা'রিফা, তা.বি., খ. ১, পৃ. ২৯০-২৯১।

[72] . মুহাম্মদ ইউসুফ ফার্‌বান, *আবুত্ ত্বায়্যিব আল-মুতানাব্বী নাশীদুস সাহ্‌রা আল-খালিদ*, ১ম সং, বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯০, পৃ. ১৩৮-১৩৯।

উপসংহার

বস্তুত কবি আল-মুতানাব্বীর কবিতায় খণ্ডিতভাবে কিছু দোষত্রুটি থাকলেও তুলনামূলকভাবে তাঁর কবিতার সৌন্দর্য অনেক বেশি। আল-মুতানাব্বীর কবিতা সমকালীন যুগ ও তাঁর ব্যক্তিমানসের প্রতিচ্ছবি। এটি তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা, স্বীয় অভিলাষ ও শক্তিশালী চরিত্রের দর্পণস্বরূপ। তাঁর মৃত্যু-সহস্রবার্ষিকী ইতোমধ্যেই পূর্তি হয়েছে; অথচ তাঁর কবিতা পাঠক সমাজের হৃদয়ে অদ্যাবধি জাগরূক হয়ে আছে। জীবদ্দশায় ক্ষমতালিপ্সু কবি তাঁর প্রত্যাশিত শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে না পারলেও মুত্যুর পর তিনি ঠিকই সাহিত্য-পিপাসুদের অন্তরে স্থায়ীভাবে সমাসীন হতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর রচিত কবিতাতেই তিনি চিরঞ্জীব হয়ে থাকবেন। কবি নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিদ্বয়ে যথার্থ ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন–

وما الدهر إلا من رواة قلائدى * إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا

فسار به من لا يسير مشمرا * و غنى به من لا يغني مغردا

"যুগে যুগে লোকেরা আমার মুক্তামালা সদৃশ কবিতা বর্ণনা করতে থাকবে। যখনই কোনো কবিতা আমি বলি তখনই লোকেরা এর আবৃত্তিকার হয়ে যায়।

আমার কবিতা পেলে অপ্রস্তুত ব্যক্তিও পথ চলতে তৎপর হয়ে যায়; যে কখনো গায়নি, সেও আমার কবিতা পেলে সুরারোপ করে গাওয়া আরম্ভ করে।"[৭৩]

বাস্তবেই আরবি সাহিত্যের ইতিহাসে কবি আল-মুতানাব্বী এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব, যিনি বহুবিধ জ্ঞানের যেমন অধিকারী ছিলেন, তেমনি বিচিত্র দুষ্টচক্রও তাঁর জীবনচক্রে একাকার হয়েছিল। উচ্চমানের প্রতিভা ও উন্নত স্বভাব যেমন লালন করতেন, তেমনি বিদ্রোহী চরিত্র ও রূঢ় পন্থা অবলম্বনেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।[৭৪] এতদসত্ত্বেও আব্বাসীয় যুগের সবচেয়ে খ্যাতিমান কবি হলেন আল-মুতানাব্বী। সমকালীন আরব দুনিয়াতেই কবির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। কেননা, প্রাচ্যীয় রাজকুটিরেই কবির জীবনের অধিকাংশ সময় কাটে। হামদানী, ইখশিদী ও বুয়াইহী শাসকদের দরবার এবং তৎকালীন মুসলিম রাজধানী বাগদাদ, আলেপ্পো, কুফা ও সিরাজ নগরী ছিল কবির বিচরণক্ষেত্র। ফলে উক্ত স্থানের শাসককুল, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী সকলেই কবিকে যেমন ভালোভাবে চিনে নেন, তেমনি তাঁদের মাধ্যমে কবির পরিচয়ও জগৎবিস্তৃত হয়।[৭৫] সুতরাং তাঁকে শ্রেষ্ঠ কবি বলতেই হয়।

---

[73] . আবুল বাকা' আল-আকবারী, *শারহু দীওয়ান আবিত্ ত্বায়্যিব আল-মুতানাব্বী*, মুস্তফা আস্-সাক্কা ও অন্যান্য সম্পা., বৈরুত : দারুল মা'রিফা, তা.বি., খ. ১, পৃ. ২৯০-২৯১।

[74] . হান্না আল-ফাখূরী, আল-জামি' ফিল আদাবিল আরাবী ওয়া তারীখিহী, ২য় সং, বৈরুত : দারুল জীল, ১৯৯১, খ. ১, পৃ.৭৮৬।

[75] . ড. মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী, প্রাচীন আরবী কবিতা: ইতিহাস ও সংকলন, আহমাদিয়া প্রিন্টিং প্রেস, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, দ্বিতীয় সং. জানু. ২০১৯, পৃ ৬৬৭-৬৬৮।

গ্রন্থপঞ্জি

আল কুরআনুল কারীম :

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী : সহীহ বুখারী, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন; বাংলাদেশ, ১৯৮৯-৯৫ খ্রি.)।

আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী : সহীহ মুসলিম, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন; বাংলাদেশ, ১৯৯০-৯৬ খ্রি.)।

আবু ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত তিরমিযি : জামে তিরমিযি, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন; বাংলাদেশ, ১৯৯১-৯৬ খ্রি.)।

আবু আবদুর রহমান আহমদ ইব্ন শুয়াইব আন নাসায়ী : সুনানে নাসায়ী, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন; বাংলাদেশ, ১৯৯২-৯৭ খ্রি.)।

আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশআছ আস সিজিস্তানী : সুনানে আবি দাউদ, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন; বাংলাদেশ, ১৯৯২-৯৭ খ্রি.)।

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মাযাহ আল কাযভীনি : সুনানে ইবনে মাযাহ, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন; বাংলাদেশ, ১৯৯৩-৯৮ খ্রি.)।

আবু আবদুল্লাহ আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাম্বল : আল-মুসনাদ, (তাহকীক : আহমদ শাকের, দারুল হাদীস, ১৯৯৫ খ্রি.), খ. ১২।

আবুল বাকা' আবদুল্লাহ ইব্ন হুসাইন ইব্ন আবদুল্লাহ আল্-বাগদাদী : শরহু দীওয়ানিল মুতানাব্বী, (বৈরুত: দারুল মা'রেফাহ, ৫৯৮ হি.)।

ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন যাকারিয়া : শরহু শে'রিল মুতানাব্বী, মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, (বৈরুত, লেবানন: ১৯৯২ খ্রি.)।

আহমদ ইব্ন আলী ইব্ন মা'কাল : আল-মা'খাজু আলা শুর্‌রাহি দীওয়ানি আবু তাইয়্যিব আল্-মুতানাব্বী, মারকাযুল মালিক ফায়সাল লিল বুহুস ওয়াত দিরাসাতিল ইসলামিয়্যাহ, (রিয়াদ: ২০০৩ খ্রি.)।

ইউছুফ আল্-বাদিয়ী আদ্-দামেস্কী : আস্-সুবহুল মুনাব্বী আন হায়ছিয়্যাতিল মুতানাব্বী, (আল্-মাতবা'আতুল আ'মেরাহ আশ্-শারকিয়্যাহ: ১৩০৮ হি.)।

আবদুল মালিক ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আবু মানসুর আস্-সা'লাবী : আবু তাইয়্যিব আল্-মুতানাব্বী ওমা লাহু ওয়া আলাইহি, (মাকতাবাতুল হুসাইন আত্-তিযারিয়্যাহ, মিশর: ১৯৬৬ খ্রি.)।

আবুল হাসান আলী ইব্ন আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী আল্-ওয়াহিদী আন্-নিসাপুরী আশ্-শাফেয়ী : শরহু দীওয়ানিল মুতানাব্বী, (দারুল মা'রেফাহ, বৈরুত: ৪৫০ হি.)।

আবুল হাসান আলী ইব্ন আবদিল আযিয, আল্-ওয়াসেতাতু বাইনাল মুতানাব্বী ওয়া খুসুমিহি : মাতবা'আতু ঈসা আল্-বা'বী আল্-হালাবী, (কায়রো: ১৯৬৮ খ্রি.)।

আহমদ হাসান আয্-যয়্যাত : তারিখুল আদাবিল আরাবী, (বৈরুত, দারুল মা'আরিফ: ১৯৯৩ খ্রি.),পৃ. ২১৮-২১৯।

ইসমাঈল ইব্ন আব্বাদ ইব্ন আব্বাস, আল্-কাশফু আল্-মাসাবী লি-শে'রিল মুতানাব্বী : মাকতাবাতুন নাহদাহ, (বাগদাদ, ১৯৬৫ খ্রি.)।

বাসারী ও আহমদ দায়ফ : আল মুফাস্সাল ফী তারীখ আল-আদব আল-আরবী, (বৈরুত: দারু এহয়া আল-উলুম, ১৯৯৪ খ্রি.), সং. ১ম।

আজীজ আল-বশারী আহমদ দায়ফ : তারীখ আল-আদব আল-আরবী, (মিশর: মাতবা'আহ আল- মা'আরিফ), তা.বি. খ. ১ম ও ৪র্থ।

মুস্তফা সাদি আল-রাফি'ঈ : তারীখু আদাবিল আরব, (লুবনান: দারুল কিতাব আল-আরাবী, ২০০৩ খ্রি.)।

মুস্তফা আল-জাব্বাহ : আল-রায়িদ ফী দিরাসাহ আল-আদাব আল-আরবী আল-হাদীস, (রাবাত: মাকতাবাতু আল-মাআরিফ, ১৯৮২ খ্রি.), সং. ২।

জি. এম. মেহেরুল্লাহ : আরবী কবি,সাহিত্যিক ও সাহিত্য, (ঢাকা: নাহ্দা প্রকাশনী, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ ১০৫।

ওমর ফররুখ : তারীখ আল-আদব আল-আরবী, (বৈরুত: দার আল-ইলম লিল-মালায়িন, ১৯১২ খ্রি.) সং. ৬ষ্ঠ।

মুহাম্মদ বেক দাব্বাব : কিতাবু তারীখ আল-আদব আল-লুগাহ আল-আরাবিয়্যাহ, (মাতবা'আতু আল-তারাক্কী: ১৯৯০ খ্রি.)।

বদভী তাবানা : আল-বায়ান আল-আরবী, (কায়রো: মাকতাবা আল উনজলু, ১৯৭৬ খ্রি.) সং ৬ষ্ঠ।

আ.ত.ম মুছলেহ উদ্দিন : আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন; বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রি.), ৩য় প্রকাশ।

ড. আহমদ আলী : আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস, (চট্টগ্রাম: আল-আকিব প্রকাশনী; ২০০৪), পৃ. ৪৫।

গোলাম সামদানী কোরায়শী : আরবী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭ খ্রি.)।

সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন : আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, (ঢাকা: বুক ফোরাম, ১৯৭৫ খ্রি.)।

মুকতাদা হাসান : অনু: ড. মুজীবুর রহমান, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, (রাজশাহী: ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ৩৫।

মোঃ আবু বকর সিদ্দীক : আরবী সাহিত্য সমালোচনা, (ঢাকা: সুলতানা প্রকাশনী, ১৯৮৯ খ্রি.)।

আবদুস সাত্তার : আধুনিক আরবী সাহিত্য, (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭৪ খ্রি.)।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ : ১ম খন্ড-২৪শ খন্ড, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় মুদ্রণ, জুন, ১৯৯৫ খ্রি.)।

আল্-মুফাদ্দাল ইব্ন মুহাম্মদ আদ্-দাব্বী আল্ কূফী : আল্-মুফাদ্দালিয়াত, (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১৯৪৩ খ্রি.)।

আবূ সা'ঈদ আবদুল মালিক ইব্ন কারীব আল্-আসমা'ঈ : আল্-আসমাইয়্যাত, (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১৯৪৩ খ্রি.)।

আল্লামা আবুল আব্বাস মুহাম্মদ ইয়াজীদ ওরফে আল-মুবাররাদ : আল-কামিল ফিল্ লোগাহ ওয়াল আদাব, (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১৯৫১ খ্রি.)।

সীওয়ানুল মুতাক্বাফফী শরহে দীওয়ানুল মুতানাব্বী : অনুবাদ : মুফতী মুতীউর রহমান, (ঢাকা : মাকতাবাতুল ফাতাহ বাংলাদেশ, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ০৭।

জুরজী যায়দান : তারীখু আ'দাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ, (বৈরুত : দারু মাকতাবাতিল হায়াত, ১৯৭৩), খ. ২, পৃ. ৫৫৬।

ড. মুহাম্মদ নিজামুদ্দিন : আবু তাইয়্যিব আল্-মুতানাব্বী; হায়াতুহু ওয়া শা'য়েরিয়্যাতুহু, (রাজশাহী: মারকাযুল বুহুস আল-ইসলামিয়্যাহ, ২০০৮ খ্রি.)।

আবু বকর আহমদ ইবন আলী ইবন সাবেত ইবন আহমাদ ইবন মাহদী আল-খাতীব আল-বাগদাদী : তারীখু বাগদাদ, (বৈরুত: দারুল গারাবিল ইসলামী, ১৪২২ হি.)।

মাহমূদ মুহাম্মদ শাকির : আল-মুতানাব্বী, (কায়রো: মাতবা'আতু আল-মাদানী), তা. বি., খ. ১।

আবদুর রহমান আল-বারকূকী : শারহু দীওয়ান আল-মুতানাব্বী, (বৈরুত: দারুল কিতাব আল-আরবী, ২০০৭ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪৪৭।

ড. মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী : প্রাচীন আরবী কবিতা: ইতিহাস ও সংকলন, (আহমাদিয়া প্রিন্টিং প্রেস, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, দ্বিতীয় সং. জানু. ২০১৯)।

হান্না আল-ফাখূরী : আল-জামি' ফিল আদাবিল আরাবী ওয়া তারীখিহী, (২য় সং, বৈরুত: দারুল জীল, ১৯৯১), খ. ১।

” : তারীখুল আদাবিল আরাবী, (বৈরুতঃ দারুল জীল, ১৯৮৬ খ্রি.)।

” : তারীখু লুগাতি আল-আরাবীয়্যাহ ওয়া আল-আদাবিল আরাবী (তা. বি.)।

” : আল-মুজিয ফিল আদাবিল আরাবী, (বৈরুতঃ দারুল জীল, ১৯৯১ খ্রি.), খ. ৪।

শিহাবুদ্দিন আবু আবদুল্লাহ ইয়াকূত ইবন আবদিল্লাহ আর-রুমী : ইরশাদুল আরীব ইলা মা'রেফাতিল আদীব, (বৈরুত, দারুল আরাব আল-ইসলামীঃ ১৪১৪ হি.)।

আবুল আলা' আহমাদ ইবন আবদিল্লাহ আল-মাআর্‌রী : আল-লামেউল আযিযী শরহু দেওয়ানিল মুতানাব্বী, (সৌদি আরবঃ মারকাযুল মালিক ফয়সাল লিল বুহুসে ওয়াদ দিরাসাতিল ইসলামিয়া; ১৪২৯ হি.)।

আবুল বাকা' আল-আকবারী : শারহু দীওয়ান আবিত্ ত্বায়্যিব আল-মুতানাব্বী, মুস্তফা আস্-সাক্কা ও অন্যান্য সম্পা., (বৈরুত : দারুল মা'রিফা)।

আবুল ফারাজ আল-আস্পাহানী : কিতাবুল আগানী, (কায়রোঃ তা. বি) খ. ৩।

বাশ্‌শার ইব্‌ন বুর্‌দ : দীওয়ানু বাশ্‌শার ইব্‌ন বুর্‌দ, মাহদী মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন সম্পা., (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯৩ খ্রি.)।

আ.ক.ম আবদুল কাদের ও মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ : আবু নওয়াসের কাব্যধারা, [চ.বি. স্টাডিজ (কলা অনুষদ). একাদশ খণ্ড, জুন ১৯৯৫ খ্রি.]।

বুতরুস আল-বুস্তানী : উদাবা'উল আরব ফিল আসরিল আব্বাসী, (বৈরুতঃ দার আল জীল, ১৯৮৯ খ্রি.), খ. ২।

কার্ল ব্রুক্যালমান : তারীখুল আদাবিল আরবী, খ. ২।

আবূ নুয়াস আল-হাসান ইব্‌ন হানী : দীওয়ানু আবী নুয়াস, আহমাদ আবদুল মাজীদ আল-গাযালী সম্পা., (বৈরুত : দারুল কিতাব আল-আরবী, ১৯৮২ খ্রি.)।

আহমাদ আল-ইসকান্দারী ও অন্যান্য : আল-মুফাস্‌সাল ফী তারীখিল আদাবিল আরবী, ড. হাস্‌সান হাল্লাক সম্পা., (বৈরুত : দারু ইহ্‌য়াইল উলূম, ১৯৯৪ খ্রি.)।

আল-খাতীব আত্-তাবরীযী : শারহু দীওয়ান আবী তাম্মাম, রাজী আল-আসমার সম্পা., (বৈরুত : দারুল কিতাব আল-আরবী, ১৯৯৮ খ্রি.), খ. ১।

আবু বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া ইব্‌ন আবদিল্লাহ আস-সাওলী (মৃত ৩৩৫ হি.) : আখবারু আবী তাম্মাম, রাজী আল-আসমার সম্পা., (বৈরুত : দারুল কিতাব আল-আরবী, ১৯৯৮ খ্রি.), খ. ১।

ফিলিপ. কে. হিট্টি : আরব জাতির ইতিহাস, তন্ময় ভট্টাচার্য সম্পা., (কলকাতা ; দ্বিজেন্দ্র অফসেট, ১৯৭০ খ্রি.), দশম সংস্করণ।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল বাকা' আল-আকবারী : শারহু দীওয়ান আবিত্ ত্বায়্যিব আল-মুতানাব্বী, (বৈরুত: দারুল মা'রিফা), খ. ১।

আহমাদ আল-ইসকান্দারী ও অন্যান্য : আল-মুফাস্সাল ফী তারীখিল আদাবিল আরবী, ড. হাস্সান হাল্লাক সম্প., (বৈরুত: দারু ইহ্য়াইল উলূম, ১৯৯৪ খ্রি.)।

ড. ত্বহা হোসাইন : হাদীসুল আরাবিয়্যাহ, ১১শ সং, (মিশর: দারুল মা'আরিফ, তা. বি.), খ. ২।

দীওয়ানু আল-মুতানাব্বী : ই'যায আলী সম্পা., (করাচি: মাকতাবাতুল বুশরা, ১ম সং, ২০১১ খ্রি.)।

ড. উমার ফাররূখ : তারীখুল আদাবিল আরাবী, ৫ম সং, (বৈরুত: দারুল ইলম লিল মালাঈন, ১৯৮৪ খ্র.), খ. ২।

ড. ইউসুফ খালীফ : তারীখুশ শি'র ফিল আসরিল আব্বাসী, (কায়রো: দারুস সাকাফাহ, ১৯৮১ খ্রি.)।

ড. আলী মুহাম্মদ হাসান ও যাকী আলী সুওয়ায়লাম : আল-আদাবু ওয়া তারীখুহু ফিল আসরাইন: আল-উমাভী ওয়াল আব্বাসী, (কায়রো: জমহুরিয়্যাতু মিসর আল-আরাবিয়্যাহ, ১৯৯০ খ্রি.)।

ড. শাওকী দ্বায়ফ : তারীখুল আদাবিল আরাবী: আল-আসরুল আব্বাসী আল-আউয়াল, ৬ষ্ঠ সং, (কায়রো: দারুল মা'আরিফ), তা. বি.।

আবুল হাসান আলী ইব্ন হুসাইন ইব্ন আলী আল-মাসউদী : আত-তানবীহ ওয়াল ইশরাফ, সম্পা: ডি গোজে (লিডেন: ১৮৯৩ খ্রি.), ৭ম খণ্ড।

আহমদ ইব্ন ইব্রাহীম আল-হাশেমী : পূর্বোক্ত, খ. ২।

দ্য গোজে : সম্পাদনা: ১৫শ খণ্ড (লিডেন, ১৯৭৯-১৯০১ খ্রি.)।

আলী ফাহমী মু'সতারী : হুস্নুস সাহাবা ফি শরহে আশআ'র আস-সাহাবা, খ. ১০, তা. বি।

মিনতি কুমার রায় : সাহিত্য সমালোচনা তত্ত্ব, (ভূমিকা ও সম্পাদনা: মোস্তফা আহাদ তালুকদার, ঢাকা: ভাষা প্রকাশ, ১৯৭৮)।

আবুল ফিদা হাফিয ইব্ন কাসির আদ-দামেস্কী : আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, (বৈরুত: দারু ইহইয়ায়িত তুরাছ আল-আরাবী, ১৯৮৮ খ্রি.) খণ্ড ৭।

আবুল ফিদা হাফেয ইমাদুদ্দীন ইব্ন কাসীর : তাফসির ইবন কাসীর, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), খ. ৮।

আল-মাওসু'আহ আল ফিকহিয়্যাহ : ওযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুয়ূন আল-ইসলামিয়া, সৌদি আরব, খ. ২৬।

ইব্ন কুদামাহ আল-মাকদিসী : আল মুগনী, (রিয়াদ, সৌদি আরব: ওযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুয়ূন আল-ইসলামিয়া), খ. ১০।

Dhaka University Institutional Repository

ইব্ন খাল্লিকান : ওয়াফায়াতুল আইয়ান ওয়া আন্বা আবনাউয যামান, (বৈরুত: দা'রুস সাদের, ১৯৭২ খ্রি.) খণ্ড ২।

মুহাম্মদ ইউসুফ ফার্‌রান : আবুত্ ত্বায়্যিব আল-মুতানাব্বী নাশীদুস সাহ্‌রা' আল-খালিদ, (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলামিয়্যাহ, ১৯৯০ খ্রি.), ১ম সং।

P. J. Vatikitis : The History of Egypt (London: 1980), 2nd Edition.

A. J. Butler : The Arab conquest in Egypt', (London): 1902).

Breasted : A History of Egypt (London: 1910).

Dr. Syed M. Nadvi : Muslim Thought and its Sources (Lahore: 1965).

Dr. S. H. Nadeem : A Critical Appreciation of Arabic Mystical Poetry (Delhi: Adam Publication, 1993) First Edition.

Gabriel Baer : A History of Landownership in Modern Egypt, 1800-1950 (London: 1962).

Ismat Mahdi : Modern Arabic Literature (1900-1967) (Hyderabad: Da`iratul Ma`arif,1983).

J. Brugman : An Introduction to the History of Modern Arabic Literature in Egypt (Lieden: E.J. Brill, 1984).

J. E. Marshall : The Egyption Eniqca, 1890-1928 (London, John Muary, 1928).

John A. Haywood : Modern Arabic Literature (1800-1970) (London: Lund-Humphries, 1971).

K. W. Morgan : Islam, The Straight Path (London: 1985).

K. Ali : A Short History of Muslim Culture (Dhaka: 1978).

K. A. Fariq : A History of Arabic Literature, (Delhi: Institute of Islamic Studies, 1972).

P .K. Hitti : History of the Arabs (London: 1970). 10th Edition.

Dhaka University Institutional Repository

R. A. Nicholson : A Literary History of the Arabs, 2nd Edition (London: Cambridge University Press, 1969).

পত্র-পত্রিকা, জার্নাল, প্রবন্ধ ও সাময়িকী

মাজাল্লা এ্যাপোলোদ : সেপ্টেম্বর-১৯৩৪ খ্রি.
আশ-শাওকীয়্যাত আল-মাজহুলাহ : আহমাদ শাওকী, খ. ২
মাজাল্লাতু আল-মাজমা' আল-'ইলমী আল-আরাবী : দিমাশক: স. ৩১, ১৯৫৬ খ্রি.
বায়েছুল হারাকাতিল ওয়াতানিয়্যা, মাজাল্লাতু লেওয়া : মোস্তফা কামাল, মে-১৯০৬ খ্রি., ২য় সংখ্যা

অভিধান, বিশ্বকোষ ও অন্যান্য

ইবন মানযুর আল-ইফ্‌রীকী : লিসানুল 'আরব (বৈরুত : দারুল বৈরত লিত তাবাআতি ওয়ান নাশরি, ১৯৫৬ খ্রি.)।
ইব্রাহীম মোস্তফা, আহমদ আয্ যিয়াত, হামেদ আবদুল কাদের, মুহাম্মদ আন্ নাজ্জার : (যৌথ রচনা) ; আল মুজামুল অসিত, (জমহুরিয়াতু মিসর আল আরাবিয়্যাহ : ৫ম সংস্করণ; জানুয়ারী ২০১১ খ্রি.)।
মুনীর বা'লা মাক্কী : আল-মাওরিদ (বৈরুত : দার আল-ইলম লিল মালায়ীন, ১৯৯৩ খ্রি.), জীবনী অধ্যায়।
আহমাদ ইবন মুহাম্মদ আল-সুকরী : আল-মিসবাহুল মুনীর (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়া, ১৯৯০ খ্রি.)।
ড. ফজলুর রহমান : আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান, (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৩ খ্রি.)।
মুহাম্মদ আলা উদ্দিন আযহারী : আরবী-বাংলা অভিধান, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩ খ্রি.), খ. ২য়।
জামিল চৌধুরী (সম্পাদক) আধুনিক বাংলা অভিধান, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারী ২০১৬ খ্রি.)।
বাংলা বিশ্বকোষ : ১ম সংস্করণ (ঢাকা: নওরোজ কিতাব মহল, ১৯৭৬ খ্রি.), খ. ৪।
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত : ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রি.), খণ্ড ৪।
" : ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রি.), খণ্ড ৫।
" : ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ খ্রি.), খণ্ড ১১।

Dhaka University Institutional Repository

ওয়েব সাইট

www.mawdo3.com

www.arwikipedia.org

www.al-maktaba-shamila